প্রকাশক
স্নুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫/বি, চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ
কলিকাতা-২০

পুনর্মুদ্রণ—১৯৫৯

মুদ্রাকর
শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্বাশা লিঃ
৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গতঃ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি-তর্পণে—

সুকুমার

*   *   *   *

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গতঃ পুর্ণচন্দ্র রায়

স্মৃতি-স্মরণে—

সুচরিতা

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা

ভূমিকা

[সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত]

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাকে কোন মতেই পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। তাঁহার প্রতিভা ও জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মানব-জীবনের রহস্যোদ্ভেদের অভিনব নৈপুণ্য বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত হইয়াছে সত্য—কিন্তু তাঁহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবিকাশের ধারাটি এখনও সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। তাঁহার প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ক রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার শক্তির বিবর্তনের যে রেখাটি অস্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর হয়, সমালোচনার সাহায্যে তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার বিশেষ কোন প্রয়াসের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং শরৎচন্দ্রের অতর্কিত আবির্ভাবের বিস্ময় এখনও আমাদের মনকে অধিকার করিয়া আছে। অবশ্য সর্বদেশে ও কালে প্রতিভার আবির্ভাব পূর্বানুমানের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। তথাপি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত ছোটখাট অস্পষ্ট ইঙ্গিতের তাৎপর্য অনুধাবন করিলে আমরা প্রতিভার-জন্মরহস্য খানিকটা উদ্ঘাটন করিতে পারি।

দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতপূর্বা ছাত্রী শ্রীমতী সুচরিতা রায় যুগ্ম-ভাবে "গল্পকার শরৎচন্দ্র" নামে শরৎ-সাহিত্যের একটি ব্যাপক আলোচনা প্রকাশ করিয়া এই অপূর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে শরৎ-প্রতিভার ক্রমবিকাশের উপর যেরূপ আলোকপাত

করা হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে ইহার উন্মেষের আকস্মিকতা অনেক পরিমাণে খণ্ডিত হইবে ও যে নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় নবোদ্ভিন্ন কুসুমে সুরভিসঞ্চারের মত প্রতিভাবানের রচনায় স্বকীয়তার রস সঞ্চারিত হয় তাহা রসবোধসম্পন্ন পাঠকের বোধগম্য হইবে। তরুণ মনের আগ্রহ-কৌতূহল ও তীব্র জ্ঞানার্জন স্পৃহার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছাত্রের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিচার ও সিদ্ধান্ত যে সর্বথা অভ্রান্ত এরূপ দাবী কোন সমালোচক সম্বন্ধেই করা চলে না—গ্রন্থকারদ্বয়ও নিশ্চয়ই সেরূপ দাবী উত্থাপন করিবেন না। তবে তাঁহাদের হাতে শরৎ-সাহিত্য আলোচনা যে নিষ্ঠা, রসবোধ ও তথ্যবিন্যাস-কুশলতার দিক দিয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে ও ইহা যে এই আলোচনাকে বিস্ময়-বিহ্বল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ প্রশস্তি-রচনা হইতে তথ্য-প্রাচুর্য-সমর্থিত, যুক্তি-নিষ্ঠ, বিচার-প্রতিষ্ঠিত মূল্য-নির্ধারণের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদরলাভ করিবে ও গ্রন্থকারদ্বয়ের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণাকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা বৈশাখ, ১৩৬১।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

কবিগুরুর কাছে শিখিয়াছি, অন্তরের ভক্তি ও পূজা নিবেদন-ই প্রকৃষ্ট সমালোচনা। আমরা পূজা করিয়াছি, ত্রুটি যাহা ঘটিয়াছে তাহা পূজারীর, দেবতার নহে। তবে শুধু স্তবপাঠ মাত্র করি নাই, দেবত্বের চ্যুতি লক্ষ্য করিলে দ্বিধাহীন, কুণ্ঠাহীন চিত্তে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেকটি গ্রন্থ অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পাঠ করিয়া অন্তর্নিহিত যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। নামকরণ, আঙ্গিক, প্রকৃতি-বিচার, সম্পর্কবিচার, ভাষা-সংলাপ, অলঙ্করণ প্রভৃতি বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তবে 'টাকাকে পাঁচসিকা' হয় নাই কেন বলিয়া ধিক্কার দিই নাই, টাকাকে টাকা রূপেই বিচার করিয়াছি—কতখানি মেকি ও কতখানি খাঁটি তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থ-রচনায় কোনও ব্যক্তি বা গ্রন্থের সাহায্য লই নাই—বিশেষ কোনও মতের দ্বারাও আচ্ছন্ন হই নাই। গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া শরৎ-প্রতিভা সম্পর্কে যে তত্ত্ব আহরণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তথ্য সম্পর্কে কিছু সংবাদ পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থ হইতে লইয়াছি—যাচাই করিয়া। গ্রন্থ রচনায় না হউক গ্রন্থরচনার পটভূমিকায় থাকিয়া যাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থ-প্রকাশে উৎসাহ দিয়াছেন ও সহায়তা করিয়াছেন, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করিয়াছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা আমাদের অনভ্যস্ত যাত্রা-পথের পাথেয়। আমাদের অধ্যাপক পরম পূজনীয় সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বহুবিধ কাজের মধ্যেও অবসর করিয়া গ্রন্থখানি শুধু যে পাঠ করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার একটি মুখবন্ধ রচনা করিয়া দিয়া বিশেষ গৌরব বৃদ্ধিও করিয়াছেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে

উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরম পূজনীয় অধ্যাপকবৃন্দ শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডাঃ সুকুমার সেন উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ছবি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থ-প্রকাশনা ব্যাপারে ও প্রতিলিপি রচনায় সহায়তা করিয়াছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদীনবন্ধু চক্রবর্তী, শ্রীআশালতা রায়, শ্রীসমরেন্দ্র গুহ। তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গ্রন্থ আলোচনার পরিধি বিরাট—এতো ব্যাপক পরিধি লইয়া সম্পূর্ণাঙ্গ সমালোচনায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবার দাবি করি না। তবে যদি নূতন-ভাবে আলোকপাত করিবার চেষ্টা কোথাও হইয়া থাকে সুধীসমাজ তাহার যাথার্থ্য বিচার করিবেন। সুচিন্তিত মতামত ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিব। গ্রন্থখানি পাঠে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে নূতনভাবে ঔৎসুক্য জাগিলে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬১
কলিকাতা

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সুচরিতা রায়

গল্পকার শরৎচন্দ্র

অবতরণিকা

'গল্পকার শরৎচন্দ্রে'র সৃষ্টি-প্রতিভা তথা মননশীলতার বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতির শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা প্রাসঙ্গিক। মহান্ কোন শিল্পী, কবি বা দার্শনিক জাতির মধ্যে যখন আবির্ভূত হন, তখন জাতির অতীত ও বর্তমানের জীবনগত সমস্ত সাধনসংস্কার 'বিশেষ সেই ব্যক্তিটির আত্মনিষ্ঠ ধী ও ধৃতিকে কেন্দ্র ক'রে যুগোচিত একটি স্বতন্ত্র শিল্প-সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে। সাধন-ব্যাপারে শিল্পী একা হ'লেও—যে বিষয়ে তিনি সাধন করেন তা সমাজগত এবং জাতিগত, এবং অনেকাংশে বিশ্বগত'।

শরৎ-প্রতিভাকে আমরা বাঙালীপ্রতিভা ও মননশক্তির একটি বিশেষ শিল্পপ্রকাশ ব'লে মনে করেছি। তাঁর প্রতিভা-বিশ্লেষণের ভূমিকায় বাঙলা তথা বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতির ধারানুসরণ তাই অপরিহার্য। বাঙালীকে জানতে হ'লে শরৎচন্দ্রকে জানতে হবে—এবং শরৎচন্দ্রকে যদি সম্যকভাবে বুঝতে চাই বাঙলা-সংস্কৃতির মর্মকথায় ধীরভাবে একবার প্রবেশলাভও করতে হবে।

ক

বাঙালীর জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বাঙলার ইতিহাস জটিলতার সর্পিল গতিপথে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের এক মহান চিত্র প্রকাশ করেছে। বাঙলা দেশের স্বতঃউৎসারিত এই জীবনবৈচিত্র্য ভারতীয় মিলনতত্ত্বের অঙ্গীভূত হ'লেও স্বাতন্ত্র্যধর্মী। মিলন বিরোধকে প্রতিহত করলেও বিরোধের বীজ সর্বাংশে বিনষ্টির পথে না গিয়ে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো ধীরে ধীরে করেছে শক্তিসঞ্চয়। তবুও একথা মানতেই হয়, ভারতীয় ঔদার্যে মৌলিক-

আগন্তুক সমস্ত বিপরীত শক্তি একটি সংহত বৈশিষ্ট্যে নিমজ্জিত হ'য়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণক্ষেত্রকে উর্বরতা দান করেছে। ভারতের সাম্য-মৈত্রী-প্রীতির বন্ধন পরকে ঘরে বেঁধেছে, ঘরকে উন্মুক্ততার ঔদার্যে উন্নীত করেছে। অধ্যাত্মবাদী ভারতের গৌরব এইখানেই।

'পাণ্ডব-বর্জিত' বাঙলাদেশের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আর্য-আর্যেতর সভ্যতার মিলনপর্ব থেকে সূচিত হয়। তখন থেকেই দেখা যায় যে, কোন পূর্ণাঙ্গ ধর্মচেতনা আর্যাবর্ত থেকে বাঙলার নিজস্ব শক্তিকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার প্রভুত্ব করা চলেনি। বাঙলার লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আর্যের উন্মার্গগামী চেতনা দেব-দেবীর রূপকে চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে চেষ্টা করেছে। প্রচুর অসন্তোষ এবং বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন হ'য়ে আর্য-আর্যেতর সংস্কৃতি অবশেষে একান্ত বাঙালীর সংস্কৃতি হ'য়েই দেখা দিয়েছে। এই সুবিশাল জাতিগত অন্তঃপ্রেরণা জৈন বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য এবং দেশজ ধর্ম এবং কর্মপ্রেরণা থেকে উদ্বুদ্ধ।

বাঙালীর মৌলিক সত্তায় যে শক্তি এবং অশক্তির বীজ নিহিত তাতে ভারতীয় সমন্বয়ের সদাচার, বিপ্লবের অনাচারে প্রায়ই হয়েছে রূপান্তরিত। ভারতীয় গৃহাশ্রম বাঙলায় পরিণতিলাভ করেছে গৃহারণ্যে ; সাধকের সৌম্য-মূর্তির দেহান্তর ঘটেছে তান্ত্রিকের উগ্ররূপী আচারে। ষড়রিপুর সাধনা বাঙালীর সর্ব সাধনার পার্শ্বচর। ঐহিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণভাবে দীক্ষিত হ'য়েও বাঙালী 'আত্মার' মহিমা উপলব্ধি করেছে ; তবুও ভোগের সীমা অতিক্রম ক'রে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য তার আদিম চেতনাতেই যথেষ্ট শক্তিশালী হ'য়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের আপাত পরিমার্জন ঘটলেও, জীবনকে ভাবের আধারে বারবার নমনীয়তা দান করলেও, স্বগত শক্তি-অশক্তির দ্বন্দ্বে বাঙালীর জীবন-সাধনা এবং ভাব-কল্পনা বিচিত্র ধারায় অধ্যাত্ম-সমুদ্রগামী হয়নি। জাতীয় জীবনে বাঙালীর চিত্তগত ভাব-রস সজীব স্রোতস্বিনীর মতো একসময় দু'কূল প্লাবিত করেছে, আবার ক্ষীণতর

হ'য়ে আপন অস্তিত্বটুকু রক্ষা করতেই হয়েছে ব্যগ্র। তাই বাঙালীর ভাবের ইতিহাস, ধর্মের ইতিবৃত্ত রচনায় যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা একদিকে আত্মনিগ্রহ, অধঃপতন এবং পশ্বাচারিতা অন্যদিকে আত্মউন্নয়ন, আত্মপ্রতিষ্ঠা এককথায় আধ্যাত্মিক সদাচারিতা। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যধর্মী সংস্কৃতিতে 'আত্মার' নিরুত্তাপ অপেক্ষা 'প্রাণের' অত্যুত্তাপের স্পর্শ পাওয়া যায়। এতে বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে কি পায়নি সে বিচারের ভার সংস্কৃতি বিশারদের ওপর। তবে এটুকু বলা চলতে পারে, মহাএশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর ভারতে বাঙালী জাতির ধর্মসাধনা এবং ভাব-সাধনার স্বরূপ ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সাহিত্য অনন্যতন্ত্র।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সাহিত্য বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংস্কৃতিগত প্রভাব নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সাহিত্যে উচ্চতর ভাবমার্গ অপেক্ষা লৌকিকতার পথ দিয়েই বাঙালীর ধর্মজীবন তথা বাস্তবজীবন আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালীর লৌকিক এবং অতিলৌকিক জীবন এগিয়ে চলেছে ধর্মসাধনার সঙ্গে একীকৃত হ'য়ে। সাহিত্যেও জীবন-ধারণের বিশেষ আধার স্বরূপ এক একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা বাঙালী সংস্কৃতির উত্থান-পতনের দিক নির্ণয় করেছে। তুর্কী-অধ্যুষিত বাঙলাদেশ যখন সৃষ্টি-নীরব, জাতীয় জীবনের সেই বিপর্যয়ের দিনে আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্য। বাঙালীর ভাব-জীবন বৈষ্ণবীয় প্রেম-সাধনায় মুখর হ'য়ে উঠলো। বাঙালীর চিন্তাজগতে, ভাবজগতে এই বৈষ্ণবতার বদ্ধমূল প্রভাব এতই গভীর এবং গূঢ় যে, কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বাঙলার সাহিত্য বৈষ্ণবতারই গান গেয়েছে। পঞ্চরসের সাধনা করেছে বাঙালী। বাৎসল্য রস এবং মধুর রস বাঙালীর ভাবপ্রবণতাকে করেছে নিয়মিত। রাধা ভাবে বিভাবিত হ'য়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা বৈষ্ণব বাঙালীর একটি নূতন রূপ। প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়জাত রস বৈষ্ণব ধর্মের প্রলেপে ভাব-সম্মিলনে প্রয়াণ করলেও হৃদয়ের আর্তিটুকু জৈবিক বাসনা সম্বলিত। বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য প্রেম মধুর রস-সঞ্চারী প্রেমকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

প্রেমিক বাঙালীর ভাবজীবন প্রেমের চূড়ান্ত কর্ষণে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ায় রসমণ্ডিত বৈষ্ণবতা বৈচিত্র্যহীন এবং প্রতিক্রিয়াকামী হ'য়ে উঠলো। বাঙালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের শক্তি এবং অশক্তির স্বরূপ এই বৈষ্ণবতাকেও কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মকে হৃদয় দিয়ে আত্মসাৎ ক'রে বাঙলাদেশ একসময় যেমন 'মরমী' কবির পীঠস্থান হ'য়ে উঠেছিল, আবার প্রাণধর্মের তাগিদে বাঙালী 'ব্যাকুল-হিয়া' (চিত্ত-দৌর্বল্য) স্মরণ করেছিল শক্তি-রূপিণী প্রকৃতিকে ; কারণ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বাঙালীর প্রেম-ব্যাকুলতাকে উদ্বুদ্ধ করলেও পরিণামে তাদের নিবীর্য ক'রে তুলেছিল।

বাঙালীর চিত্ত-দৌর্বল্যের এই সন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদের মাতৃমন্ত্রে অসির ঝঙ্কার শোনা গেল। মাতৃপূজায় বাঙলাদেশ শক্তি সঞ্চয়ে মগ্ন হ'লো। প্রেমিক বাঙালী একদিকে যেমন বাৎসল্যপ্রাণতায় নিশ্চিন্ত হ'লো, অন্যদিকে ধর্মীয় রূপকের আবরণ উন্মোচন ক'রে রোমান্স রস সাহিত্যে স্থান নির্দিষ্ট ক'রে নিলো। ভারতচন্দ্র এই ধারার পুরোধা। বাঙালী মধ্যযুগ অতিক্রম ক'রে শক্তি সাধনার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। তবে প্রতিক্রিয়ার সূচনা দেখা যায় বৈষ্ণবধারার অন্যতম প্রতিস্পর্ধী মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। শাক্ত-পন্থী মতাবলম্বীরা বৈষ্ণবীয় ক্ষীণ ধারাটিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই পশ্চাতে ফেলে প্রাধান্য-শালী হ'য়ে ওঠে। বাঙালীর ধর্মানুসরণের আর এক নবতর অভিব্যক্তি। বৈষ্ণবতা তখন আত্মগোপন করেছে পরোক্ষলোকে।

বাঙালীর মন বিকারগ্রস্ত হ'য়ে ধর্মীয় রূপান্তর-প্রয়াসী হ'য়ে উঠলেও প্রাণচেতনায় স্ব-শক্তির অভিলাষটুকু তারা কখনও ত্যাগ করেনি। বাঙালীর জৈব-বোধ তাদের সর্ববিধ ভাবসাধনার আড়ালে সঞ্জীবিত হয়েছে। এই বোধের প্রকাশ তান্ত্রিক সাধনায়। যান-পন্থী, সহজিয়া-পন্থী এবং নাথ বা যোগী পন্থীদের ধ্যান-ধারণা ও সাহিত্য বাঙালীর জৈব-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। তন্ত্রসাধনার ফলেই বাঙালী-সংস্কৃতিতে স্থান পেলো দেহবাদ অর্থাৎ প্রাণধর্মী বাঙালীর জৈব-রূপ। এখানে শক্তি দৈবাধারে নিমজ্জিত নয়। 'আত্মা'র আকাশবিহারী মননশীলতা নিয়ে বাঙালীর তুষ্টিবিধান সম্ভব হ'লো না ব'লেই

তার সংস্কৃতির ধারায় দেহবাদের প্রাধান্য দেখা দিল। কিন্তু বাঙালীর প্রকৃতি-সাধনা মাতৃমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হ'য়েও আর একবার অবৈধাচরণে করলো আত্মসমর্পণ। উনিশ শতকের ঠিক পূর্ববর্তী বাঙালীর ইতিহাস প্রতিক্রিয়া-মুখর। বংশীধ্বনি একসময়ে অসির ঝঙ্কারে লুপ্তপ্রায় হ'য়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু বাঙালী-চরিত্রের দুর্বলতা ও উচ্ছ্বাস রূপান্তরিত হয়েছিল ব্যভিচারে। প্রকৃতির আরাধনা ক'রে বাঙালী প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি নারীর প্রতি করেছিল অবজ্ঞা-প্রদর্শন। ফলে আসন্ন পতনকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুললো বাঙালীর জাতীয় অশক্তি।

এ পর্যন্ত বাঙলার সাহিত্যে জাতীয় উত্থান-পতনের সমতালে কখনো অধ্যাত্মবোধে, কখনো বা জৈববোধে চিত্রিত হ'য়ে এসেছে। সাহিত্যের পটভূমিকা ধর্মানুশীলনের অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যে প্রাণবন্ত। মধুর রসাশ্রিত প্রেম এবং বাৎসল্য রসাশ্রিত স্নেহ তন্ত্র-সাধনার যুগেও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি; যার পরিমার্জিত রূপ উনবিংশ শতকের এমন কি বিংশ শতকের সাহিত্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। তবে বৈষ্ণবীয় রসের অমৃতটুকু ছাড়া রূপের বা আধারের পরিবর্তন হয়েছে সাধিত।

প্রকৃতি প্রেমিকা; ব্রহ্মের লীলা চপলতার বিগ্রহকান্তি। প্রকৃতির আবেগ-বেদনা 'রাধা'কে মধুরের সাধনায় নিয়োজিত করেছে। এই মধুরাশ্রিত অনুভূতিকেই দেহভূত যৌন-প্রেরণার অনুমোদনে মানবীয় আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে উনবিংশ শতকের সাহিত্যে। মাতৃবন্দনার দিনে শাক্তবাদীর নারী-বন্দনায় প্রকৃতি 'প্রেমিকার' ভূমিকা ত্যাগ ক'রে 'জননী' রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। বাঙালী স্বস্তি লাভ করেছিল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদাত্রী' প্রকৃতির সান্নিধ্যে। সুতরাং প্রকৃতি-সাধক বাঙালীর জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যে নারী-সত্তার একটি বিশেষ স্থান নির্দেশিত হ'য়ে যায় এই প্রকৃতি-তত্ত্বের রূপান্তরে। শক্তিমান বাঙালী প্রকৃতির মাধুর্য-বন্দনায় একসময়ে নারীকে জানিয়েছে মহিমা, আবার শক্তিভ্রষ্ট বাঙালীকেই দেখা যায় নারীমেধযজ্ঞের হোতারূপে। জাতীয় চেতনার এই অসামঞ্জস্য জীবনকে

সুস্থতর রূপ দান করতে পারেনি। বাঙলা সাহিত্যে জাতির এই দুর্বলতার পরিচয় অনুধাবন করা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সংস্কৃতিপুষ্ট মনীষীদের দ্বারা।

বাঙালীর প্রাণের বীর্যবত্তা জীবনরস সিঞ্চনে যখন অসমর্থ হ'য়ে পড়েছিল, ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বাঙালী তার চিরাচরিত সংস্কার এবং সংস্কৃতির পরিশোধনে করলো আত্মনিয়োগ। বাঙালীর স্ব-ধর্মে আঘাত লাগলো খৃষ্ট ধর্মের প্রসারতায়। কারণ হিঁদুয়ানী তখন শাস্ত্রের নিক্তিতে ওজনদরে যাচাই হচ্ছে অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে বাঙালী তথা ভারতের স্বধর্মচ্যুতির সম্ভাবনার মুহূর্তে বৈদেশিক নূতনত্ব ক্রমশঃ এদেশের প্রাণকেন্দ্রে বিস্তারলাভ করলো। কুসংস্কারের শৈবালে আপাদমস্তক পরিবেষ্টিত জাতি খেউর, তর্জা, কবিগানের প্রাকৃতমোহ ত্যাগ ক'রে নব-জন্মের সূচনা অনুভব করলো পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রলেপে। ফলশ্রুতি স্বরূপ শক্তিমান বাঙালী পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবতাবোধকে আত্মসাৎ ক'রে নবজাগরণের সম্ভাবনাকে পরিবর্তিত করেছিল সত্যে। অন্যদিকে দাসত্বের শৃঙ্খল জড়িয়ে নিলো বাঙালীর শক্তি-অপলাপকারী সত্তা। এখানেও লক্ষ্য করা যায়, জাতীয় সত্তার অসামঞ্জস্যই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পতনের বীজ উপ্ত করলো।

বৃটিশ শাসনের অভিঘাতে প্রতাপান্বিত ভূস্বামীরা তাদের একাধিপত্য হারালেন। গড়ে উঠলো ছোট ছোট ইংরেজপুষ্ট জমিদার এবং চাকরীজীবী বাঙালী সম্প্রদায়। বাঙালীর 'জাত যাওয়া'র এক আশঙ্কা একশ্রেণীর সমাজ-সংস্কারকের চিন্তার কারণ হ'য়ে দেখা দিলে, ঈশ্বর গুপ্তের উন্নাসিকতায় তা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। ধর্ম এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার নূতন পথ নির্ধারণ করলেন মনীষী রামমোহন। 'ব্রাহ্ম' মুহূর্তে বাঙালী বৈদেশিক ধর্মের মুক্ত প্রাঙ্গণের আলো স্বদেশীয় খাতেই অনুভব করলো। সেদিন রামমোহনের বিরোধিতা করবার জন্য হিন্দু-পণ্ডিতদের যে অভিযান, তাকে ব্যর্থ ক'রে পাশ্চাত্যের আত্মাকে সম্বর্ধনা জানালেন বিদ্যাসাগর। বাঙালীর বৃথা আস্ফালনে তিনি ভাবিত এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। পণ্ডিতী শাস্ত্রানু-

শাসনের মিথ্যা অহমিকাকে প্রতিরোধ ক'রে বিদ্যাসাগরের 'মাতৃপুজা', বাঙালীর শ্রদ্ধাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল নারীধর্মের প্রতি। একথা স্বীকার করতেই হবে, বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ ক'রে গেছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী যার পুরোভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর।

পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং সেই সঙ্গে ধর্মের মোহ অনেক প্রতিভাবান বাঙালীকে স্বজাতি এবং স্বধর্ম ত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর জাতির এই মোহমুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন তাঁদের মনীষার প্রচণ্ডতায়। উচ্ছ্বসিত প্রাণাবেগ সংযত করতে পারেননি মধুসূদন। মধুকবি হিঁদুয়ানী ত্যাগ করলেন বটে, বাঙালীয়ানা পুরোপুরিভাবেই তাঁর জীবন এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলো। মধুসূদনের জীবন তদানীন্তন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। প্রাণধর্মের প্রাচুর্যে সর্বসংস্কার মুক্ত হ'য়ে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিষ এবং অমৃত দুই পান করেছিলেন। অমৃতজাত সৃষ্টি-প্রতিভা বাঙালীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের যুগে। মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিবাদের চেষ্টা ছিল তাঁর লেখনীতে। রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের হাহাকারে মানবতার বিলাপ-ধ্বনি, প্রমীলা-জনা বীরাঙ্গনাদের বীরোচিত প্রেম, ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধার আর্তি একাধারে মধুসূদনের রচনায় স্থান লাভ করেছিল। জীবনের ভিত্তিতে মানবীয়শক্তির বিচরণক্ষেত্র প্রথম রচনা করেছিলেন তিনি। রাবণের পুত্র-বাৎসল্য এবং প্রমীলার পতিপ্রেম বাঙলা সাহিত্যের নব-সংগঠনে সংস্কৃতরূপে দেখা দিল। মধুসূদনের কবিধর্ম তাঁকে মননশীল হ'তে দেয়নি; যেজন্য তিনি নিজেই বিষ-প্রয়োগে আত্মঘাতী বাঙালীর অশক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে প্রাণবান কবি-শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ধর্মজীবনের মহান প্রবর্তক। ধর্ম উনিশ শতকের বাঙালীকে দৈবনিষ্ঠ ক'রে তোলেনি, করেছে মানবনিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিপুজা বাঙালীর দৃষ্টিতে ফিরিয়ে এনেছে সত্যানুসন্ধী আলো। শুধু প্রেম, ভক্তি বা জ্ঞান নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়ে বাঙালীর ত্রাণকর্তা

বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের যুগের বাঙালীর ধর্মচেতনা মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিল গুরু-শিষ্যের অনুপ্রেরণায়। বাঙালী আর একবার আধ্যাত্মিক সাগরে ডুব দিল অরূপ রতন পাবার আশায়। এবার কিন্তু অরূপ দেখা দিল মানুষের মধ্য দিয়ে। মানব-চরিত্রের অতল রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে জাগতিক সত্তাকে মিথ্যা ব'লে পরিহার করা চললো না। 'আত্মা' জীবনের পটভূমিকায় 'অনাত্মার' আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে বাঙালীকে বিভ্রমমুক্ত হ'তে দেয়নি বটে, বৈচিত্র্যশালী জীবনের একমুখী লক্ষ্যটুকু তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। জীবন এবং জীবনাতীতের সাধনা বাঙালী একযোগে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছে।

বাঙালীর সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি ভাঙনের পর্ব অতিক্রম ক'রে বিবর্তিত, নূতনতর পরিণতি অভিমুখী। বাঙলার সাহিত্য আর জীবনকে অস্বীকার ক'রে নয়, জীবনকে 'দর্শন' ক'রে অভিনব জাতীয় সংস্কৃতির মান গঠনে অগ্রসর হ'লো। বর্ণ-বিশেষেরা আভিজাত্য লোপ ক'রে সর্বজনীন মানুষের মানসিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার একক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই উনিশ শতকের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং চিরাচরিত রীতি-নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হ'লো। এই সমস্যা-বিজড়িত জীবনচিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলেন সুধীসমাজ। সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে দেখা গেল, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বৈধ-অবৈধ প্রভৃতি জীবনের মূল তত্ত্বগুলিকে স্বচ্ছন্দে একটি থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া চলে না। মানবমনের রহস্যাবৃত বয়নশিল্প প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ত দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। আপাতভাবে ভাল-মন্দের নজির তুলে সমাজ-সংস্কারক হওয়া চলে, কিন্তু সমাজের হিত সাধন সহজ-সাধ্য হ'য়ে ওঠে না। সমাজ মানব-কেন্দ্রিক। কোন একযুগে মানুষের ব্যক্তি-চেতনার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হ'লেও, ব্যক্তি-প্রাধান্যের যুগে আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর Soul-এর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। Self-কে জেনে, তার limitation সম্পর্কে সচেতন থেকে

Soul-এর সমাধান শিরোধার্য। তাই বলছিলাম, সমাজের সামগ্রিক আত্মার ভাল-মন্দ নির্ভর করে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত Self-এর শ্রেয়সাধনার চরিতার্থতায়।

খ

সমাজ যখন আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক প্রভাবমুক্ত হ'য়ে আত্মশক্তিতে বলবান হ'তে চেষ্টা করে, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সাহিত্য-সংগঠনের অনুপ্রেরণায়। উনবিংশ শতাব্দী বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগে সাহিত্যের দরবারে যাঁরা তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, সেইসব আধুনিক রূপদক্ষের সৃষ্টি-প্রতিভার মূল সূত্রগুলি সে যুগের সাহিত্য মঞ্চের পটোত্তলন এবং পটক্ষেপনে নিয়োজিত ছিল। সূত্রধার ছিলেন রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যমঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সামগ্রিক যুগ-চেতনা। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবকাব্যের সরসতা যখন 'কবিগানে'র তরলতায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল, জাতীয় সাহিত্যের সেই আত্মবিলোপের অবকাশে পাশ্চাত্য ভাব-বন্যার কঠিন আঘাত এসে পৌছলো। এই আঘাতে রক্ষণশীল যুগ-চেতনার মোহমুক্তি এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নবতম ব্যাপকতায় আত্মদর্শন এবং জাতীয় জীবন-দর্শন।

প্রাণধর্মী বাঙালীর জীবনে তখন আদর্শবাদের জয় জয়কার। সমাজ-পরিবার-জাতি-দেশ সবকিছুর মধ্যেই মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্বের পরিচয়কে পরিস্ফুট ক'রে তোলার চেষ্টা। সর্বক্ষেত্রেই বিশাল পরিবেশ, বিরাট কল্পনা এবং অদম্য অথচ দুঃসাধ্য কর্মপ্রেরণা। জীবনকে কেবলমাত্র পর্যালোচনা করা নয়, জীবনকে আলিঙ্গন ক'রে বিষামৃত পান করবার উন্মাদনায় উনিশ শতকের যুগচেতনা উন্মুখ। তাই দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের 'হেমচন্দ্র' যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে 'প্রতাপ', রাজা 'সীতারাম' হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। এইসব বিরাট এবং ঐশ্বর্যবান চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অভূতপূর্ব সংগ্রাম। দেহচেতনা ,আত্মসংযমের সীমা

অতিক্রম ক'রে পুরুষাকারের ঘটিয়েছে অনিবার্য পতন। রাষ্ট্রসংগঠক 'সীতারাম' রূপমোহে রাষ্ট্রকে এগিয়ে দিয়েছে ধ্বংসের মুখে। চরিত্রের কি বিরাট ট্র্যাজিডি! ইয়োরোপীয় "হিউম্যানিজিম্" বাঙলা সাহিত্যের আসরে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল।

বাঙালী জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য যুগ পরম্পরা দোলাচলগামী হয়েছে। সৃষ্টিময়ী বাঙালী শক্তি এবং বিনষ্টিভূত বাঙালীর অশক্তি চিরকাল দ্বন্দ্বসঙ্কুল পথ অতিক্রম ক'রে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছে। সমাজপুষ্ট বাঙালীর কাছে তার গৃহশক্তির বড় আর কিছু নয়। এই গৃহশক্তি গড়ে তুলেছে সমাজশক্তি এবং তা থেকে প্রাণ পেয়েছে জাতীয়শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়েছিল গৃহশক্তির অপলাপের কারণ। বহিঃশক্তি তথা আত্মশক্তিতে বীর্যবান পুরুষ রূপ-সৌন্দর্যের দাসানুদাস? সৌন্দর্য-সান্নিধ্যে একমাত্র দেহবুদ্ধি জাগবে কেন? আত্মিকবুদ্ধি দেহকে অতিক্রম করতে পারে না কি? জাতির ব্রহ্মজ্ঞানে এই ত্রুটির অস্তিত্ব কোথায়? বাঙালীর ধ্যানলব্ধ প্রকৃতিতে শক্তি-মাতৃকার অধিষ্ঠান—এখানে ব্রহ্মের প্রকাশ প্রতিপদে ব্যাহত। পুরুষাকারের শক্তি-অশক্তির ফলদান করেছে সৃষ্টিময়ী দেহচেতনায় প্রেমকল্প অনুভূতিশালিনী 'নারী'। 'ভবানন্দের' কর্মফল 'কল্যাণী'র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হ'লো কেন? শক্তি তো পূজার্হা, আত্মিক সংস্কারের একমাত্র পথ। 'ভবানন্দ' সন্ন্যাসী, 'চন্দ্রশেখর' শাস্ত্রানুসারী গৃহষি, 'অমরনাথ' জন-কারুনিক; নারীসমক্ষে চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দিয়েছে এরা। এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তাদের দিতে হয়নি—পুরুষাকারের এখানেই পরম পরাজয়, দেহচেতনার চরম জয়। তারপর আত্মশুদ্ধি—গোবিন্দলালের 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' পাওয়া না-পাওয়ায় মন ভরে না। ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে গোবিন্দলালের বিকার-মূর্ছা-প্রলাপবাচন জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজিডির পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-মানসে জীবনের এই জয়-পরাজয়ের কোন সঠিক সমাধান দেখা দেয়নি বটে, স্নেহ এবং আত্মার সমন্বয়সাধন তিনি করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে দেখি সাহিত্যের

পটভূমিকায় কর্মোন্মাদনা এবং ভাবোচ্ছ্বাস অনেকাংশে স্তিমিত। এই ভাব-কল্পনাকে বাস্তবের মায়াময় পরিবেশে সর্বপ্রথম স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ। মনোবিজ্ঞানের বাস্তবতাই এখন থেকে প্রধান হ'য়ে সাহিত্যকে আত্মসাৎ করলো। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব উপন্যাসের ক্ষেত্রে তখনও বেশ গৌণ-পরিচয়েই বিস্তৃত হয়েছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে বাঙলা-সাহিত্যে গভীর মননশীলতার প্রবর্তন। মনের অন্তর্মুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জীবনের বিচিত্র বিস্ময়কে পরিস্ফুট ক'রে সাহিত্যের ধারা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হ'তে থাকে। আদর্শবাদী "বিহারী"র (চোখের বালি) চিত্ত-চাঞ্চল্য তার বহির্জীবনেই কেবলমাত্র বিপ্লব আনেনি, মনের গভীর প্রদেশে তা বিস্তৃত।

বিদেশী শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যায় বঙ্গভূমি একদিকে যেমন প্লাবিত হয়েছিল, অন্যদিকে একদল সুবিধাবাদীর আত্মপ্রকাশে উদার জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতায় হয়েছিল পরিণত। জাতির সামগ্রিক উত্থান পর্যবসিত হ'লো ব্যক্তির একক উন্নতিতে। আবার ভাঙনের পব দেখা দিল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই, বাঙালীর অশক্তি এবার থেকে ধীরে ধীরে ক্রিয়া করেছে। কারণ জাতির মর্মমূলে অশক্তির বিষ বিগত শতকে পৌঁছতে পারেনি, আপাতভাবে বাঙালীর প্রাণশক্তিকে নির্বীর্য করেছে মাত্র। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের ভাঙন পর্বের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে বাঙালীর দেশপ্রাণতা অথবা জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন কর্মে প্রত্যক্ষ না হ'য়ে, ভাবলোকে হয়েছে বিলীয়মান। কাজে এবং কথায় একটা গভীর অসঙ্গতির সৃষ্টি হওয়াতে বাঙালী বিক্ষুব্ধচিত্তে সম্পূর্ণ কর্মবিরতির পর্বে পদার্পণ করেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে বাঙালীমন অত্যন্ত বেশী চিন্তাশীল হ'য়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট অত্যুগ্র আদর্শপরায়ণ নিখিলেশ আন্তর্জাতীয় পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেছে, পাশ্চাত্য দেহধর্মের জয়গান করেছে সন্দীপ। উভয়েই কর্মহীন, বুদ্ধির চাতুর্যে শুধুই তারা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জয়ের আনন্দ, পরাজয়ের গ্লানি, মহত্ত্বের পুরস্কার—কিছুই তাদের ভাগ্যে ঘটেনি; তা ছাড়া এ সবের জন্য intellectual যুগের দেশ-প্রেমিকেরা ব্যাকুল নয়।

বাঙালী-চিন্তাধারার অন্তর্মুখী গতি বিংশ শতাব্দীর অগ্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর এবং জটিলতর হ'তে থাকে। বাঙালী-চরিত্রে তখন একদিকে বুদ্ধি ও চিন্তার বিচিত্র অভিযান, অন্যদিকে উদ্যমহীনতা এবং কর্মহীনতার চরম নৈরাশ্য। বিরামের অলসতায় বাঙালী মন স্পর্শকাতর অনুভূতিগুলিকে নিয়ে বিলাস শুরু করলো। তার সূক্ষ্ম অনুরণনে জীবনের শাশ্বত সুরে জেগেছে স্পন্দন। বিলেত প্রত্যাগত অমিত রায়ের রসনায় ভাষণের কলালিপি, কল্পনায় আন্তর্দেশীয় স্বপ্নবিলাস, ব্যবহার ও বেশভূষায় স্বদেশীয়তার চূড়ান্ত অনুসরণ। বাস্তব-বিরহিত এই জীবন-চিত্রের ট্র্যাজিডি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল, সেই যুগের বাস্তব প্রতিভূরূপেই। গোরার অদম্য কর্মপ্রাণতা পথ পায়না আত্মপ্রকাশের। জীবনের প্রচণ্ড বেগ রুদ্ধ জলস্রোতের মতো একই স্থানে হ'তে থাকে ফেনায়িত এবং আবর্তিত। মুক্তির পথ অনাবিষ্কৃত, আশার আলো ক্ষীয়মান; কেবলমাত্র বুদ্ধিকে শান দিয়ে জাতির মনোজগতে চলছে রসের কর্ষণ। রবীন্দ্র-প্রতিভার অমৃত-রসে জাতি নবজীবনের আনন্দাস্বাদ করেছে এবং সেই সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অমরত্ব; কিন্তু নীলকণ্ঠ হলেন কে?

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য জাতীয় জীবনে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। উপনিষদের রসপায়ী কবি অপ্রশমিত আবেগে, দুর্বার চিন্তাশীলতায়, নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি-মত্ততায় জাতীয় চেতনায় নির্বাক মুখরতা দান করলেন। দেহ-আত্মার সংগ্রাম-চিত্র অঙ্কন কবির অভিপ্রেত নয়। দেহ-আত্মা, খণ্ড সুষমা-অখণ্ড মাধুর্য, সীমার অশক্তি-অসীমের শক্তির মিলন কামনা করলেন বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে মিলনোৎসবের জয়ধ্বনি। বিচ্ছেদ নয়, দুঃসহ সংযম নয়, সঙ্কীর্ণ ভোগ নয় আবার বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বও নয়—সম্পূর্ণ ঐক্যের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিত্রাণ। 'বিহারী'র আদর্শবাদ 'বিনোদিনী'কে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। সংগ্রামকাতর নর-নারীর চিত্তদীর্ণ বেদনা কী ব্যর্থ হবে? তৃপ্তি তো ত্যাগে, ভোগে নয়। জীবন দুঃখের সৃষ্টি করে, মানুষ দুঃখকে করে অতিক্রম। 'কুমুদিনী'র কুসুম-পেলব চিত্ত 'মধুসূদনে'র

নিষ্করুণ কামনা-কাঠিন্যে হয়েছে নিষ্পিষ্ট। অবশেষে সাংসারিক জীবনে শান্তিবিধান করেছে 'জায়া' কুমুদিনী 'জননী'র পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে নর-নারীর যাত্রাপথ কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও "আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" কবি বলেছেন, জীবনে দুঃখ থাকবেই, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। প্রেম আমাদের কাছে ততখানিই সত্য, যতখানি সে দুঃখকে বহন করে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে মহিমামণ্ডিত করেছেন দুঃখাতীতের ধ্যান ক'রে। কিন্তু দুঃখ যে জীবনে আর্তরেখা টেনে দিয়ে যায়, সেই ক্ষতের সাম্প্রতিক বেদনা কত চোখের জলে নিষিক্ত! জীবন প্রতিদিন বহুবেদনার পাপড়ি খুলে ফুটে ওঠে; বেদনাবহুল জীবনাবরণ খুলতে গিয়ে ভাগ্যবানের ঘটে স্বর্গপ্রাপ্তি; হতভাগ্যের দল ব্যর্থ হয় অনেকবার, স্বর্গ-জীবন তাদের কাছে সুদূরপরাহত। রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত তাদের যাত্রাপথ—দুঃখ-অতিক্রান্ত নয়, অনতিক্রমণীয় যে ইতিহাস তার পরিচয় রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিরল। বাঙলা-সাহিত্যের প্রাণ-উদ্দীপন যজ্ঞের রবীন্দ্রনাথ যদি ঋত্বিক, শরৎচন্দ্র হোতা।

কাব্যে জীবনের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে। 'Criticism of life' নয় 'Synthesis of life'—এর প্রকাশ ঘটায় কবিতা। এখানে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতার দিক থেকে বিচার চলবে না, কারণ আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র পথ-যাত্রী। রবীন্দ্রনাথের সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিতে জীবনের যে অখণ্ড সত্তা খণ্ড খণ্ড বৈষম্যে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছে, তার ঐক্যরূপের সাধনা সাহিত্যের সাধনা হওয়া দরকার। জীবনের ক্ষুদ্র বিচ্যুতি বৃহত্তর বিচ্যুতিকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলবে কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববিহারী অনুভূতিকেই ঘটনাবিহারী ক'রে তুলে 'গল্পগুচ্ছের' প্রাণসঞ্চার করলেন। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলি এক একটি পুষ্প—গঠনে-রঙে-সৌরভে ত্রুটি নেই বললেই চলে। রোমান্স-অতিরোমান্স, প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত, প্রেম-সৌন্দর্য প্রত্যেক গল্পেই কম বেশী স্থান পেয়েছে। সুখ-দুঃখ বিজড়িত, মিলন-বিরহ সমাদৃত, প্রেম-সৌন্দর্য সমৃদ্ধ বাঙলার পল্লীপ্রাঙ্গণের জীবন-চিত্র গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটে উঠেছে

কবির অন্তর্দৃষ্টির মায়াতে। কবির রচিত এই বিচিত্র বিলসিত গল্পগুলি পাঠককে মুহূর্তে প্রেরণ করে স্বপ্নালোকে।- যেখানে প্রকৃতিকে পটভূমি ক'রে মানুষের সচলতা, মানুষকে পটভূমি ক'রে জীবনের শত সমৃদ্ধি, শতচ্যুতি—সবকিছুকে পরিবৃত ক'রে অখণ্ড জীবন-প্রবাহ।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কুসুমিত বিকাশকে অতিক্রম করতে পেরেছেন কি? প্রশ্ন জাগে অনেকের মনে। অতিক্রম করার মধ্যে কবিকে অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ শরৎচন্দ্র সাহিত্যে গুরুবাদ স্বীকার করেছেন। কবিকে পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের গতি মন্থর হয়েছে। গীতিধর্মী গল্প শরৎচন্দ্রের হাতে ঘটনাপ্রধান হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে জীবনের বিস্তৃত কাহিনী শোনাতে চান্‌নি, জীবনের বিশেষ মুহূর্তের আলোকচ্ছটায় সচকিত ক'রে মুগ্ধ করেছেন। 'দিদি' (গল্পগুচ্ছ) তার ভাইটিকে নিজের ক'রে পেলো না, কারণ স্বামীর নির্দেশ তাকে মানতে হয়েছে। অপরদিকে 'হেমাঙ্গিনী' 'কেষ্ট'কে সমস্ত বিপত্তি সত্ত্বেও পেয়ে গেলো চিরকালের মতো—গল্পের উপসংহারে এ তৃপ্তি পাঠকের কাছে বড় কাম্য। কাহিনী-রচয়িতার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সামাজিক। সহৃদয়-হৃদয়ের সংবাদ না নিয়ে তিনি কখনো অগ্রসর হননি। 'ব্যবধান' (গল্পগুচ্ছ) ঘোচেনা 'বনমালী' এবং 'হিমাংশু'র মধ্যে, বরং চিরস্থায়ী হয়। 'বিনোদ' কিন্তু পারলো না 'গোকুলে'র স্নেহকে অস্বীকার করতে। প্রকৃতি-বৈষম্য উভয় পক্ষেই প্রবল ছিল। রচনাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং গঠন-কৌশলের জন্য গল্পের গতি ও পরিণতি স্বতন্ত্রধর্মী।

ভাল-মন্দের বা উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্টের তর্ক তুলে কবি এবং ঔপন্যাসিকের গল্প বিচার অপ্রাসঙ্গিক। কারণ প্রকৃতিগত প্রবণতার পার্থক্য যেখানে স্পষ্টতর সেখানে স্বতন্ত্র আস্বাদের অনুভূতি নিয়ে গল্প-পাঠক উভয় লেখকের গল্প পাঠ করবেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বস্তুতে অসীম বৈচিত্র্য—সুরে নিত্য নবত্ব। গীতিধর্মী গল্পের ছন্দ-পতনে বাস্তব ঘটনাবলীর আবির্ভাব। কবির পল্লী-চিত্র বিরচনে বিশ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতীত-ও।

শরৎচন্দ্রের গল্পে পল্লীর সঙ্কীর্ণ পরিবেশ অপরিবর্তনীয় জীবন-যাত্রা নিয়ে আবির্ভূত। হৃদয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'লেও অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটলেও পটভূমির বিস্তার রুদ্ধ। কারণ এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কল্পনা বা ভাবলোক বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের মুখাপেক্ষী। জ্যোৎস্নালোকিত পদ্মার তটভূমি বাঙলা পল্লীর সবটুকু নয় শরৎচন্দ্র তা জানতেন। সেজন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, পানা পুকুরে সমাচ্ছন্ন, হৃতসর্বস্ব বাঙলার কথা-চিত্রে তাঁর রচনা পরিপূর্ণ।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেও কোন স্থলে তিনি গল্প-রসিক হিসেবে অনন্যতা অর্জন করেছেন, বাঙালীজীবনের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি চিত্রণে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা, সর্বজনীন গল্প-রচনায় কোথায় এবং কী কারণে তাঁর অমৃতত্বের দাবি—তাঁর শিল্পকীর্তির স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে সেই সমস্ত বিষয় উত্থাপনই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

গ

বিংশ শতকের বিরাম পর্বের নীলকণ্ঠ শরৎচন্দ্র। প্রাণবান জাতির জীবনের অবসরে চূড়ান্ত অভিশাপের চিত্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে একটি বিশেষ মূল্য দান করেছে। বহু সুখ-দুঃখ-হাসিকান্না সমৃদ্ধ, বহু হৃদয়বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের স্তূপীকৃত ঘটনা নিয়ে বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের তখন ভগ্নদশা উপস্থিত। বিচিত্র সম্বন্ধযুক্ত একান্নবর্তী পরিবার পোষ্য বাঙালী জীবনের হৃদয়-রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র খুঁজে পেলেন আসন্ন পরিবার-বিনষ্টির কারণ। যুগ-প্রবণতাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারুর নেই। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ব্যক্তিসত্তা তার প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেয়েছে, চিরাচরিত স্নেহ-মমতা-কর্তব্যের নীতি অনুসরণে জানিয়েছে অসম্মতি। অসীম সহনশীলতা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ একসময় বাঙালীর গৃহে জীবনের সম্পদ বহন ক'রে এনেছিল। সমাজবদ্ধ সেই একাগ্র জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে অসন্তোষ। শরৎচন্দ্রের পারিবারিক

গল্পগুলিতে ব্যক্তি মনের বিরোধমুখর মনোভাবের ক্রিয়াশীলতা সুবিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে বাৎসল্য-প্রীতির আতিশয্যজনিত প্রকাশে। পরিবার-জীবন গড়ে ওঠে একে অন্যের মধ্যে স্নেহ-প্রেম ও কর্তব্যবোধের যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধি (ব্যাপক অর্থে) যদি পরার্থকামী না হয়, তবে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে না। কিন্তু বিংশ শতকের ব্যক্তি-ভিত্তিক মতামতের প্রাধান্যে একদিকে যেমন অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে বাৎসল্য-প্রীতির সংজ্ঞা বিচিত্র পন্থী হওয়ায় স্বার্থ এবং পরার্থের দ্বন্দ্বে অনর্থেরই সৃষ্টি হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী-অন্নপূর্ণার স্নেহ অন্ধ, শৈলজা-বিন্দুবাসিনীর স্নেহ অকল্যাণকে প্রশ্রয় দেয় না, নয়নতারা-এলোকেশীর স্নেহ অপরিশুদ্ধ। পাত্র-পাত্রী নির্বিশেষে নিরবচ্ছিন্ন স্নেহরসে পরিপ্লুত সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-প্রণালী বাঙালী অনুসরণ করতে পারছে না, এর কার্য-কারণ সম্বন্ধটিও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

বিবিধ সম্পর্কযুক্ত পারিবারিক জীবন ছাড়া নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এক নূতনতর সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি শরৎচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সমাজের উপরিস্থভাগে ভাসমান পুরুষসম্প্রদায় প্রত্যেক পরিবর্তনসূচক অবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে ভোগ করেছে। বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভেঙে ফেলে চিন্তায় এবং কাজে নূতনতর অভিজ্ঞতাকেই পুরুষ একবার ক'রে আস্বাদ ক'রে দেখেছে। এই দেখার কাজে তার সাহস এবং শক্তির কখনো অভাব ঘটেনি ; কারণ তার দাঁড়াবার ক্ষেত্রভূমি অতি সবল অর্থাৎ গৃহাঙ্গণের স্থিতিশীলতা পুরুষকে গতিশীলতা দান করেছে। পরিবার এবং সমাজের ন্যায়-অন্যায় সর্বপ্রকার নীতি-বিধানকে নারী-সম্প্রদায় চিরকাল স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। গৃহগতপ্রাণা নারীর এই স্বাতন্ত্র্যধর্মিত্বকে মর্যাদা দিয়ে একসময় বাঙালীজাতি মাতৃপূজারী হ'য়ে ওঠে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সমাজ-নিষ্ঠা একসময় নারীকে মহিমা দান করেছে, সেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পুরুষই নারীর পায়ে জড়িয়ে দিয়েছে সামাজিক শৃঙ্খল। কর্মহীন অবসরে শাস্ত্রানুসারী হ'য়ে পুরুষ-সমাজ নিত্যনূতন বন্ধন-গ্রন্থি আবিষ্কার করতে থাকে

আত্মঘাতী হবার জন্য। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে নিষ্ক্রিয় জীবনানুশীলনকারী পুরুষ নারীকে দুর্ভাগ্যের পথ থেকে রক্ষা না ক'রে এগিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর পথে।

শরৎ-সাহিত্যে নারীর একনিষ্ঠ প্রেম, গৃহসুখীপ্রাণ, স্নেহবৎসলচিত্ত নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। নারীজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে রূপায়িত করতে গিয়ে নারী-শক্তির মহিমায় হয়েছেন মুগ্ধ। তাঁর এই মুগ্ধতাই সাহিত্যে নারী প্রাধান্যের কারণ নির্দেশ করেছে। প্রকৃতি-প্রেমিক বাঙালীর সাহিত্য এবং জীবনে নারীই প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। প্রেমের পরিপূর্ণ বিগ্রহ স্বরূপ নারী-সত্তার বিচিত্র রূপভেদ ঘটেছে যুগে যুগে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী নানা বিপরীত শক্তির সমবায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুরের সাধনা ক'রে কখনো নারী মাধুর্যময়ী, শক্তির সাধনায় কখনো বা শক্তিমতি। পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে তার হৃদয়াবেগ অপ্রতিহত। স্নেহ-মমতা-করুণা-দয়া-সহানুভূতি -বেদনাপূর্ণ অশ্রুপাত সামগ্রিকভাবে নিঃশেষিত হয়েছে পুরুষের উদ্দেশ্যে। এখানে নারী মাতৃরসে বিহ্বলা। শরৎচন্দ্র নারীর প্রেমপূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ ও ভোগের অপূর্ব সমন্বয় পরিদর্শন করেছিলেন। পিয়ারী হয়তো প্রেমিকা, কিন্তু 'রাজলক্ষ্মী' একাধারে প্রেমিকা এবং বঙ্কুর মা। 'শ্রীকান্তে'র প্রতি তীব্র আকর্ষণ তার প্রশমিত হয়েছে মাতৃভাবের হৃদয়াবেগ আস্বাদের ফলে। নারীর রক্ষণশীল চরিত্রে যখন প্রবৃত্তির প্রভাব গভীরতরভাবে বিস্তার লাভ করে, তখন প্রেমের জৈবভাব প্রাধান্যলাভ করলেও একটি সূক্ষ্মতম পবিত্রতার আবরণ যেন তাদের চারপাশ থেকে কখনই বিদূরিত হয় না। সরযূর মা সমাজ-ত্যাজ্যা রমণী—কন্যাবাৎসল্যই হয়তো তার চরিত্রের শেষ সুরুচিটুকু রক্ষা করেছে। কিন্তু চন্দ্রমুখী! দেহবিবিক্ত প্রেমে পরিতুষ্টি লাভ তার পক্ষে অসম্ভব মনে হয় না কি? জীবনটাকে যে কানা কড়ির মূল্য দেয় না, তাকেই দেখা যায়, দেবদাসের ক্ষত-বিক্ষতপূর্ণ দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কি আপ্রাণ চেষ্টা! এই মঙ্গলেচ্ছাকে নারীর সেই এক মাতৃত্ববোধজনিত রূপে ব্যাখ্যা দেওয়া চলে।

গৃহজীবনের গণ্ডীতে যে সব নারী সুখ-মণ্ডিত জীবন-যাপন করতে পারেনি, তাদের ক্ষেত্রে তথাকথিত সতীত্বের বিড়ম্বনা ঘটেনি। সমাজের বন্ধনে যারা অনায়াসেই সুখী, সেই বন্ধন বিচ্যুতিতে অসামাজিক জীবনে পদার্পণ ক'রেও তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেনা। অনির্বচনীয় দুঃখ ভোগ ক'রে নারী প্রেমকেই মহিমান্বিত করে। এই মহিমা সংস্থাপনে কেবলমাত্র আদর্শায়িত ভাব-প্রেরণাই সবটুকু নয়, জৈবিক চেতনাপুষ্ট কর্ম প্রেরণাকেও সক্রিয় হ'তে দেখা যায়। পুরুষের নির্বিকার চিত্তকে পরিবেষ্টন ক'রে নারীর প্রেম অঙ্কুরিত, বিকশিত শেষ পর্যন্ত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেমের এই গতিশীলতাকে রূপ দেয় নারীর সর্বাঙ্গীণ প্রকৃতিধর্ম। এই প্রকৃতিতে আছে শ্রীরাধার অনন্ত বিরহানুভূতি, মাতা অন্নপূর্ণার মমত্ব, প্রমীলার বীরোচিত প্রেম, সূর্যমুখীর আত্মপ্রত্যয়, ভ্রমরের ভবিষ্যৎদর্শন এবং লাবণ্যের ক্ষণিকতা-ভীতি।

শরৎ-সাহিত্যে যে সমস্ত নারী-চরিত্র প্রেমিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের চরিত্রে সন্তান-বাৎসল্য অনেকাংশে "পুরুষ-বাৎসল্যে" রূপান্তরিত। প্রতিপালনের একটি সহজাতবৃত্তি নারী তার জন্ম মুহূর্তেই লাভ করে। সন্তান পালন কিংবা স্বামী-সেবা অবস্থাবিশেষে প্রিয়জন-পরিচর্যা নারী-প্রকৃতির একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষত্বের অধিকারী হ'য়েই নারী শরৎ-সাহিত্যে সন্তান-নিষ্ঠ ও পারিবারিক চিত্রের নায়িকা, কান্ত-নিষ্ঠ ও চিরন্তন জীবন-সমস্যার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্তৃত্ব-পরায়ণতা নারীকে অকৃতার্থ জীবনে তৃপ্তিদান করেছে। পুরুষ নারীকে আকৃষ্ট করেছে বিশেষভাবে তার অসহায়, পরনির্ভরশীল প্রকৃতির দ্বারা। স্বয়ং সম্পূর্ণ পুরুষ নারীর দৃষ্টি-বহির্ভূত। দায়িত্ববোধে পরিচালিতা নারী শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের ভার বহন করেছে, এখানেই তার আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি। দেহ-সর্বস্বতা শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত নারী-চরিত্রে বিরল; কারণ হৃদয়-প্রসূত ধর্মবুদ্ধি দেহবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে আপন সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। নারীপ্রেম সেখানেই সঞ্চারিত, যেখানে পুরুষ তার মুখাপেক্ষী। পুরুষের অপূর্ণত্বকে নিজের পূর্ণতর

শক্তির দ্বারা পরিপূরণ ক'রে নারী প্রেমে সঞ্জীবতা দান করেছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিজের দুঃখ-বিক্ষুব্ধ চিত্ত-দীর্ণতায় আপনার মর্মে আপনই হয়েছে জীবন্মৃত। শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণী শক্তির কাছে ধরা পড়েছে নর-নারীর আদিমতম স্বভাব-বৃত্তির কথা। সুতরাং স্বভাব-ধর্মের বলিষ্ঠ চিত্রই তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

শরৎ-সাহিত্যে দুই শ্রেণীর পুরুষ দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুরুষ নারীর সম্মুখীন হয়েছে তাদের প্রসুপ্ত বাসনার বহির্বিকাশের জন্য। পুরুষের মোহব্যাকুল চিত্ত এখানে নারী-নিষ্ঠ হ'য়েই নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়েছে। বহির্জীবনের উন্মাদনা প্রশমিত হ'লে পুরুষ সঙ্কীর্ণতর পরিবেশে আত্মগোপন করেছে, তার ফলে নারীর দুর্ভাগ্যাকাশে ঘনীভূত হয়েছে বিপর্যয়ের মেঘ। অসীম প্রেম সসীম গণ্ডীতে মালিন্যে আবৃত হওয়ায় নিকৃষ্টতর চেতনার হয়েছে উদ্ভব। বাঙালীর জাতীয় অশক্তি মহতের কণ্ঠরোধ ক'রে অসৎ প্রবৃত্তির ইন্ধন প্রজ্জলিত করেছে। প্রধূমিত এবং প্রজ্জলিত বহ্নিতে আত্মদান করতে হয়েছে নারীকে, কারণ নর-নারীর সম্পর্ক এখানে খাদ্য-খাদকের। নারীর সর্ববিধ কর্মক্ষমতা এ ক্ষেত্রে অসাড়তায় মগ্ন। অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নারী পরিণাম-প্রয়াসী হয়েছে—কারণ তার চরিত্রের মধ্যেই নিয়তির লীলা-বিহার। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর অপ্রতিহত আকর্ষণের মতই নারীর শক্তিকে পুরুষ-শক্তি আকর্ষণ করেছে—করেছে হীনবল।

পুরুষের শক্তিহীন নির্বীর্য সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর। প্রকৃতি-সাধক বাঙালী নারীকে অবমাননার চূড়ান্ত অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছে তার দুর্বুদ্ধিজনিত প্রচেষ্টায়। পুরুষ এবং নারীর অখণ্ড শক্তি জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী গতিতে প্রাণবেগ সঞ্চার করেনি। একটা নিরুদ্ধ স্রোতে আবর্তিত হ'য়ে জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে আরও জটিলতর ক'রে তুলেছে মাত্র। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র যুগের পটভূমিকায় অনিবার্যভাবে সৃষ্ট। নিরলস জীবনকে বরণ ক'রে নিয়ে একদল পুরুষ ছন্নছাড়া নিস্পৃহ, আর একদল কাপুরুষোচিত মনোভাব পোষণ ক'রে সমাজ এবং পরিবারের করেছে

অনিষ্টসাধন। দু'পক্ষের কারুরই যেন কোন দায়িত্ব নেই সমাজ এবং পরিবারকে রক্ষা করবার। নিষ্ক্রিয় জীবন পুরুষগুলিকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে।

উদাসীন পুরুষকে ভালবেসে নারী চরম দুঃখ পেয়েছে, কারণ তাকে নিজের একক ক্ষমতার ওপর সর্বাংশে করতে হয়েছে নির্ভর। পুরুষ ভালবেসেছে, করেছে আকাশ কুসুম রচনা, কিন্তু বাস্তব পরিবেশকে ভয়ও তাদের কম নয়। আত্ম-প্রত্যয়হীন না হ'য়েও, আত্ম-প্রতিষ্ঠ তারা নয়। পথকে তারা ভালবেসেছে, নারী তাদের পথের ছায়া। ঘরের প্রতি মমতা থাকলেও আশঙ্কা যায় না, পাছে ঘর ভেঙে পড়ে। ঘরনীদের স্বাধীনতা হরণ করেছে তারাই, ঘর বাঁধবে কে? শরৎচন্দ্র দেখেছেন, ঘরনীরা পুরুষের দয়ার প্রত্যাশী নয়। পথেই তারা ঘর বেঁধেছে ছুঁৎমার্গপন্থীদের সমস্ত বিরোধিতা অবজ্ঞা ক'রে। গায়ে ধূলো লেগেছে ব'লেই যে ধূলো মেখে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, পথ ছেড়ে দেবে—এসব জীর্ণ মস্তিষ্ক, শীর্ণহৃদি পণ্ডিতম্মন্যদের এতবড় humiliation-কে নারী প্রশ্রয় দেয়নি। ধূলো তাদের অন্তরের অমৃতস্পর্শে স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়েছে। এই স্বর্ণরেণুর বিন্দুমাত্র কুড়িয়ে পেলে গোলক চাটুজ্জে, বেণী ঘোষাল, তারিণী খুড়োর অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটতো। কিন্তু যারা নারীকে ভালবেসেও তাকে সামাজিক মর্যাদা দিতে পারলো না, সতীশ, রমেশ, মহিম, দেবদাস, শ্রীকান্তের মতো, তারা সত্যি হতভাগ্য। স্ব-প্রকৃতির প্রাধান্যে এইসব পুরুষেরা নারীর রক্ষাকর্তা হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নিজেরাই আশ্রিত হ'তে বাধ্য হয়েছে। নারীর প্রেমে এরা আত্মরক্ষা করেছে, কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে নারীত্বের এবং পত্নীত্বের। নারীর চরিত্রগত দ্বন্দ্ব পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিলেও দ্বন্দ্বের নিরসন হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। মাতার মমত্ব নিয়ে পুরুষকে নারী সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। বৈষ্ণব এবং শাক্ত বাৎসল্য প্রেম শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীদের বহুলাংশে আত্মসাৎ করেছে ব'লে মনে হয়; যেজন্য জৈববোধের তাগিদে তারা বিচলিত নয়। সমগ্র শরৎ-সাহিত্য নারীসত্তার স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট।

শৃঙ্খলিত সুকুমার পেলব পদযুগলের নর্তন-চাঞ্চল্যে অভিযাত্রিনীর জয়যাত্রা। এই যাত্রাপথের পান্থ-পাদপ শরৎচন্দ্র এবং তাঁর সাহিত্য।

শরৎ-সাহিত্যে নারী প্রাধান্য পেয়েছে পুরুষের সর্বাঙ্গীণ নিষ্ক্রিয়তায়। পুরুষের দিক থেকে যতটুকু সক্রিয়তা দেখা যায় তা নারীর ইচ্ছাকৃত উদাসীন হবার চেষ্টায়। বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছেন পুরুষের চিত্ত-পরিশুদ্ধি এবং চরিত্র সংশোধনের জন্য। বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়িকারা পুরুষকে আত্মরক্ষার পথ দেখিয়েছে তাদের নিজস্ব শক্তিকে নির্ভর ক'রে। পুরুষের সংযমচ্যুতিতে একমাত্র সূর্যমুখী ছাড়া কোন নারীর কর্তব্যপ্রাণতা লক্ষ্য করা যায় না। অসংযমী পুরুষকে তারা মৃত্যুর অতল গহ্বরে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নায়িকারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিতান্ত অবজ্ঞাতকেও তারা মধুর করস্পর্শে সান্ত্বনা দিয়েছে—এজন্য নিজের ক্ষতি করতে তারা বিচলিত হয়নি।

নিতান্ত নিকৃষ্টের প্রতি একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমনের বিশেষ প্রবণতা। এই প্রবণতা থেকেই উপজাত হয়েছে সাহিত্যে সমাজ-অনাদৃতাদের প্রাধান্য দেওয়া। পৃথিবীতে করুণাপ্রার্থী যে কে এবং কে নয়, মানুষ তার কী বিচার করবে! উপেন্দ্র কিরণময়ীর মুখাপেক্ষী হয়েছে দিবাকরকে মানুষ করবার জন্য; অথচ কিরণময়ীর প্রতি সামান্য ভাল ব্যবহার করতেও সে কুণ্ঠিত। উপেন্দ্রের এ সংযমের মূল্য পুরুষাকারের অব্যর্থ প্রাপ্য হ'তে পারে, কিন্তু কিরণময়ীর অভিশপ্ত আত্মা কোনদিন তাকে ক্ষমা করবে কি না কে জানে! শরৎচন্দ্রের অনন্ত সহানুভূতি নিয়ে গড়ে উঠেছে রাজলক্ষ্মী-জ্ঞানদা-অভয়া-অচলা-সাবিত্রী-কিরণময়ী-চন্দ্রমুখী—"...আমি তো জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে, আমি তো জানি। সুনীতি-দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই। এবস্তু এদের অনেক উচ্চে।" পৃথিবীর বুকে যেসব

অনাঘ্রাত ফুল অজান্তে বিকশিত হ'য়ে অজান্তেই ঝরে যায়, কথাশিল্পীর লেখনীর মুখে তাদের সজীব আনন্দ-বেদনার ইতিহাস রহস্যপূর্ণ জীবনের কয়েকটি পাতা খুলে দিয়েছে। প্রতিটি চরিত্রাঙ্কনে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত বেদনা-বোধ পাঠকের বেদনাবোধের অপেক্ষা রাখে। কারণ এখানেই কবি বা কথাশিল্পী এবং তাঁর সহৃদয় পাঠকের সামাজিকতা রক্ষা। তা না হ'লে সাহিত্যের সার্বজনিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে এগুলি হৃদশতদলবাসী। প্রাণবান বাঙালীর প্রাণের কথা এতে ধরা পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে শরৎচন্দ্র সাহিত্য-জীবন যাপন করেন। আন্তর্জাতীয় টানা-পোড়েনে মানুষ যখন তার পায়ের তলার মাটিটুকু অবলম্বন ক'রে স্থিতিশীল হ'তে পারছে না, নিরন্তর শুধু এ প্রশ্নই তারা করেছে—কেন তাদের ভেঙে গেছে আশার স্বপ্ন, লোকাচার দেশাচার রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন তারা হচ্ছে বন্ধনগ্রস্ত, মানবিক বৃত্তিগুলিকে শ্বাসরোধ ক'রে ফেলা হয়েছে কেন—এইসব ভীত-সঙ্কুচিত প্রশ্নের উত্তর মিলেছে শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিতে। প্রাণের এই মর্মান্তিক জিজ্ঞাসার সমাধান হয়েছে শরৎ-সাহিত্যের অন্তরঙ্গতায়। কোন সুকল্পিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা না জেনে বাঙালী-চরিত্রে আত্মবিশ্বাসের সংগঠনী শক্তির এবং সৎচিন্তার অভাব দেখা দিয়েছিল। এদিকে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা এবং অভিনবত্বের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বাঙালী স্ব-ভাবের প্রয়োজনীয় বস্তুকে গ্রহণ ক'রে চলেছে নির্বিবাদে। বিজ্ঞান-অধ্যুষিত যুগে বাঙালীর পক্ষে ভাবমার্গে বিচরণ করা অসম্ভব, অথচ অ-ভাবের ক্ষেত্রেও স্বাধীন বিহারের সাহস নেই। সুতরাং একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পথে জীবনের গতিকে চালিত না করলে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। সাহিত্যের মধ্যেই শরৎচন্দ্র পরিবর্তনশীল যুগের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী পথিক। দেহজাত ক্ষুধাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু সর্বাংশে স্বীকার করায় সাহসের পরিচয় কোথাও নেই, আছে সবলকে পথ ছেড়ে দেবার স্বীকৃতি। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে দেহ-সংস্কারকেই মুখ্যভাবে ধ'রে নেননি, যেজন্য কোনও শ্লীল-বিচ্যুতিতে তিনি

অতিসতর্ক। জৈবিক সত্যকে পরিপূর্ণভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে তিনি যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত নন, জৈবাতীত অনুভূতির দিকে মানুষের আত্মিক অভিযানকে নৈরাত্মার সংক্রামক শক্তির দ্বারা ব্যাহত হ'তেও তিনি দেননি।

ঘ

শরৎচন্দ্র কল্পিত সাহিত্য-সংসারের পর্যালোচন-প্রসঙ্গে বাঙালীজাতির সমাজ-জীবন সম্বন্ধে দু'টিএকটি কথা উত্থাপন করার প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিকদের কাছে এটা অবিদিত নেই যে বর্ণাশ্রমী সমাজ-জীবন যখন প্রতিষ্ঠিত হ'লো তখন ব্রাহ্মণ নিজ ধী-শক্তি, বিদ্যা, ত্যাগ, ঔদার্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর জন্য সমাজ-জীবনে শীর্ষস্থান পেলো। বৈদিক ব্রাহ্মণ তাই সমাজ-গঠনের দায়িত্ব নিলো। ব্রাহ্মণত্বের অসীম ঐশী শক্তির কাছে সবাই শুধু শ্রদ্ধায় নয়, তেজস্বিতার জন্যও মাথা নত করলো। অর্থে-সামর্থ্যে শ্রেয় যিনি, তাঁকেও ব্রাহ্মণত্বের কাছে নতি জানাতেই হ'লো। চাণক্য-চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণাদর্শের একটি নিখুঁত চিত্র পাই।

নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার নির্ধারণে মনোনিবেশ করলো। এই সব বিধি-বিধান দিতে গিয়ে যে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিল না, তা জোর ক'রে বলা যায় না। তবে পরিচালনার দক্ষতায় তাঁরা সমাজের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে সমাজ-গঠনকে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। আধুনিক কালে রাজনীতি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্টের দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করে। পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও জীবনের গতি-প্রকৃতির নিয়ামক হন তাঁরাই। বর্তমান জীবন রাষ্ট্রমূলা। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় জীবনের নিয়ামক ছিল সমাজ; সে যুগ ছিল সমাজমূলা। তাই ব্রাহ্মণগোষ্ঠী অনিবার্যভাবে সমাজমূলা জীবনের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা নির্ধারিত হয়েছিলেন।

যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরল জীবনযাত্রা সমস্যা-সঙ্কুল, জটিলায়িত পথে যাত্রা করলো। ব্রাহ্মণগোষ্ঠী যে মহত্ত্বের শক্তিদ্বারা সমাজের কর্ণধার

হয়েছিলেন, তাঁদের সে ঔদার্য আর রইল না। হীনবীর্য ব্রাহ্মণসম্প্রদায় শক্তি হারিয়ে বহিরঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরলো—নিমজ্জমান সম্প্রদায়ের তৃণখণ্ড অবলম্বন। প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বোঝা চাপিয়ে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। স্বার্থ-ই সেখানে মুখ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। স্বার্থান্বেষী, দীনহীন চরিত্রের মানুষ অতীত ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণত্বের মুখোশ (খোলস) এঁটে সমাজ-জীবনে কুসংস্কার ও হীন রীতি-নীতির প্রবর্তন করলেন। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও যথেচ্ছাচারিতা রক্ষণকল্পে এই সব বিধি-ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে রাখবার জন্য সমস্ত কিছু রীতি-নীতির সঙ্গে "সংশোধনী প্রস্তাবে"-র ব্যবস্থা হ'লো। এইভাবে ব্রাহ্মণত্ব তার পূর্ব-গৌরব হারিয়ে সমাজ-জীবনে গ্লানি ছড়াতে লাগ্‌লো। ব্রাহ্মণেতর বর্ণাশ্রয়ীরা পূর্ব-সংস্কার অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত বিধানকে জোর ক'রে অস্বীকার করতে পারলো না, আবার সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতেও পারলো না। ব্যভিচার-অনাচারে সমাজ-জীবন হ'য়ে উঠ্‌লো ভারাক্রান্ত। দেখা দিল সমস্যা।

বাঙালীর জীবন বল্‌তে মুখ্যতঃ সমাজ-জীবনই বোঝায়, বিশেষভাবে শরৎ-সাহিত্যে বাঙলার সমাজ-জীবনেরই চিত্র পাই। বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে সমাজোত্থিত সমস্যা জীবনের প্রবাহে তরঙ্গ তুলেছিল, তাই কাহিনী গড়ে ওঠার পক্ষে এগুলিই অবলম্বন হ'য়ে উঠ্‌লো। এই সমস্যা-সৃষ্টির মূলে ছিল ব্রাহ্মণ। শরৎ-সাহিত্যে তাই অধিকাংশ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত।

শরৎ-সাহিত্যে কাহিনীভাগে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের আর একটি কারণ শরৎচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণ। নিজ জীবনকে পরিবৃত ক'রে যে পরিবার তথা সমাজ তার বাস্তব চিত্র দেখ্‌বার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতার জারকরসে জাতীয়-জীবনের সমস্যাকে অভিষিক্ত ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে কাহিনীতে তিনি ব্রাহ্মণত্বের প্রাধান্য দেখিয়েছেন। অন্য বর্ণাশ্রয়ী ব্যক্তি পাপাচরণ করলে তার শাস্তিবিধান করবে "ব্রাহ্মণ্য-বিধান"! কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্যভিচারের শাস্তি দেবে কে? খোদার ওপর খোদকারি করবে কে? ব্রাহ্মণ যদি জমিদার হন তবে তো কথাই নেই!

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অবিমিশ্র মন্দের দ্বারাই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সমগ্র পরিচয় নয়। সেই প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী আধুনিককালেও বিরাজ করছেন। তাঁদের ঔদার্য, ত্যাগ, মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। একদিকে ব্রাহ্মণত্বের নামে ব্যভিচার, অন্যদিকে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ব-ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা। এই দু'ধারার চরিত্রেরই পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। যাঁরা সত্যই শ্রদ্ধেয়, প্রণম্য তাঁরা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়েছেন। শুধু তাঁরা কেন, সেই শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণের সমগ্র পরিবার গ্রামের শ্রদ্ধা পেয়েছে। জমিদার যদি ব্রাহ্মণ এবং পূর্ব-ঐতিহ্যানুসারী হন, গ্রামবাসী তাঁদের বিধানকে "দেব-দত্ত বিধান" হিসেবে মেনে নিয়েছে। সমাজ-পতি যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, তারা ভক্তি দেখিয়েছে ভয়ে। এই দু'ধারার চরিত্র দ্বারাই শরৎ-সাহিত্য সমৃদ্ধ। "কাশীনাথ" গল্প থেকে শুরু ক'রে যে চল্লিশটি গল্পের পর্যালোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে, "মামলার ফল" ইত্যাদি ধরণের দু'একটি গল্প বাদ দিলে বাকী সমস্ত গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের। তা ছাড়া কৌলীন্য-প্রথার জন্য সমস্যা যেন আরও জটিল হ'য়ে দেখা দিয়েছে, তারও নিদর্শন কয়েকটি গল্পে পাই। যেমন, অরক্ষণীয়া, অনুপমার প্রেম, কাশীনাথ প্রভৃতি। সুতরাং একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে শরৎ-সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-প্রধান কাহিনী রচনা '-ছক আকস্মিক নয়।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "...From my father I inherited nothing except, as I belive, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father...tried his hand at stories and novels, dramas and poems, ..but never could finish anything...I remember poring over those incomplete-ness over and over again in my childhood and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what

might have been their conclusion if finished. Frobably this led to my writing short stories when I was barely seventeen."—শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। নিছক কল্পনার প্রসার তাঁর সাহিত্যে পাই না।

তাঁর কল্পনার বিস্তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে। শরৎ-সাহিত্যে যতগুলি চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার প্রত্যেকটি কোন-না-কোন ভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে এসেছিল। শরৎচন্দ্র বার বার বলেছেন, তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন নানাভাবে। সেজন্য তাঁকে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, কেউ-বা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—অপযশের বোঝাকে স্বীকার ক'রেও জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র এবং সেই সম্পর্কিত প্রভাবের কথা চয়ন করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের জননী ভুবনমোহিনী ছিলেন অত্যন্ত উদারপ্রাণ নারী। কৃচ্ছ্রসাধনা (জীবনগত), ত্যাগ, কর্তব্য, নিষ্ঠা, স্নেহপ্রবণতা ইত্যাদি ভারতীয় নারীপ্রকৃতি সুলভ গুণাবলীর সমবায়ে তাঁর চরিত্র। তাঁর কর্মনৈপুণ্য সমগ্র পরিবারকে যেন শত দুঃখযন্ত্রণা থেকে রক্ষা ক'রে রাখতো। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা (এমনদিনও গেছে নিজের উপবাসকে গোপন করবার জন্য পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করেছেন!) ও কর্মনিপুণতা পিতা মতিলালকে যেন কোন দিনই "সাবালক" হ'তে দেয়নি। মতিলাল ছিলেন সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও নির্ভরশীল। ভুবনমোহিনীর জন্যই তাঁর এই উদাসীন প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল—সে কথা বলতে দ্বিধা নেই। জননী ভুবনমোহিনী ও পিতা মতিলালের চরিত্র বৈশিষ্ট্য এমন কি কার্যকলাপের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শরৎচন্দ্রের বহু গল্পে শোনা যায়। "কাশীনাথ" থেকে "অনুরাধা" পর্যন্ত গল্পগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই ধরণের চরিত্র সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। চরিত্রের উপাদানগুলি তিনি তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করেছিলেন; তারপর কল্পনার জারকরসে তাদের ফেলে হৃদয়ের বীক্ষণাগারে তার মধ্য থেকে

সর্বজনীন উপাদান আবিষ্কার ক'রে চরিত্রগুলি সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত জীবন্ত, এত প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁকে সবাই Realist বলে। তিনি তো ভেবেই পান না কি ক'রে তারা Realist আর Idealistএর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বলেছেন শরৎচন্দ্র—"আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্প পরিধি-বিশিষ্ট। হয়তো এ আমার ত্রুটি, হয়তো এই আমার সম্পদ; আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার সত্য অধিকার। হয়তো আপনাদের মনের কোণে এই কথাটি আছে, এর শক্তি কম, তা হোক্, কিন্তু এ কখনও অনেক জানার ভান ক'রে আপনাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।"—এই শরৎচন্দ্রের সত্য পরিচয়।

শরৎচন্দ্রের পিতার চরিত্রে কাব্য ও দর্শনের এক অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কবি ও দার্শনিক দু'জনেই জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতাকে এড়িয়ে বৃহত্তর জীবনানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছতাকে স্বীকার ক'রেও তাদের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত থাকবার হৃদয়বল শরৎচন্দ্রের জীবন-দর্শন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

শরৎচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতির ছিলেন। শিষ্টশান্ত বালকটির মতো নিছক পড়াশোনা নিয়েই মত্ত হ'য়ে থাকতেন না। অথচ পাঠে তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ছিল—একথা শরৎ-জীবনীকারেরা স্বীকার করেছেন। রাম ইত্যাদি চরিত্র অত দুরন্ত হ'য়েও পাঠে কোনওদিন অমনোযোগী হয়নি। শ্রীকান্ত (১ম পর্বে) মেজদার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাসের অনুরূপ ঘটনা শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটেছিল, অবশ্য পরবর্তী অংশে কল্পনার মিশ্রণ দেখা যায়।

আপনভোলা, সংসার সম্পর্কে উদাসীন, কাব্য-দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী পিতা মতিলাল অর্থকষ্টের জন্য চাকরীর সন্ধানে বের হন এবং নিজের সঙ্কোচের জন্য প্রতিক্ষেত্রেই ব্যর্থ হন—এ দৃশ্য আমাদের "বড়দিদি" গল্পের সুরেন্দ্রনাথের কথাই মনে করিয়ে দেয় না কি?

অসহায় জীবকুলের প্রতি শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম দরদ তাঁর সাহিত্যের কয়েকক্ষেত্রে ধ্রুবতারকার জ্যোতি বিকিরণ করছে। এই দরদ তাঁর জীবনের

প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল। প্রথম বয়সে অর্থাৎ পাঠ্যাবস্থায় একটি বেঁজি তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি-পর্বে এই বেঁজিটি তাঁর নীরব সাধনার একমাত্র সাক্ষী ছিল। নিজের প্রাপ্য খাদ্য থেকে ভাগ দেওয়া, বেঁজির প্রিয় খাদ্যের ব্যবস্থা শরৎচন্দ্র করতেন এবং বিশেষ যত্ন নিতেন এই জীবটির প্রতি। এ দরদী মন তাঁর সাহিত্যেও দেখি। জীবনের সায়াহ্নকালে প্রিয় কুকুর ভেলু শরৎচন্দ্রের নিত্য সহচর ছিল। তার মৃত্যু শরৎচন্দ্রকে গভীর আঘাত দিয়েছিল, এমন কি তাঁর শরীর পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় যাঁরা গেছেন, তাঁরাই ভেলুর সঙ্গে পরিচিত। ভেলু অনাদৃতগোষ্ঠীর একজন; কোনও বিলিতি-জাতের নয়। তাই বোধ করি তার ভব্যতার বালাই ছিল না। শত যত্ন ও তদারক ক'রেও তিনি কুকুরটিকে ভব্যতা শেখাতে কোনওদিন পারলেন না। অপঘাতে কুকুরটির মৃত্যু হয়। ভেলুর শূন্য স্থানে তিনি 'দ্বিতীয় পক্ষ' গ্রহণ করতে পর্যন্ত রাজী হননি।

শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন কেটেছে মামার বাড়ীতে—যে সময়ে মানসিক বিকাশের সূত্রপাত ঘটে। সেখানে একান্নবর্তী পরিবারের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কলহ-প্রীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তাঁর মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়েছে—তাদের ভালমন্দ রূপ নিয়ে। জীবনে ঘটনা অনেক কিছুই ঘটে, কিন্তু তাদের দেখা ও উপলব্ধি করা, সেই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং রসবোধ যুগপৎ কাজ না করলে যে কেউ শরৎচন্দ্র হ'তে পারতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র একজনই হন! ইন্দ্রনাথ, লালু, কেষ্ট, গুণীন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, রাজলক্ষ্মী, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, হেমাঙ্গিনী, শৈলজা, হেমনলিনী, মাধবী, ভুবনেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী—কোনও চরিত্রকেই বাদ দেওয়া যায় না। কল্পনা চরিত্রের প্রত্যক্ষ রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখেনি, পরিপূরকরূপেই প্রকাশ পেয়েছে।

একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধনকে অটুট রেখেছে জ্যেষ্ঠ যিনি, তাঁর ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা। নিজের চেয়েও পরিবারের সবায়ের সুখদুঃখকে যিনি প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনে। পরিবারের সুখদুঃখের মাপকাঠিতে যিনি

নিজেকে বিচার করেছেন। শরৎচন্দ্র নিজে বড় ভাই ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বড় ভাইকে ত্যাগ করতে হবে—সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে। বড় ভাই-য়ের ঔদার্য, বড় ভ্রাতৃ-জায়ার সহনীয়তা সংসারে শান্তি আন্‌তে পারে। এই উপলব্ধিপ্রসূত চরিত্র একদিকে যাদব, গোকুল, গিরীশ, ঘনশ্যাম, গুরুচরণ, অন্যদিকে সিদ্ধেশ্বরী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি। "উদ্বোধন পর্বে" দু'একটি গল্পে যে বিপরীত চিত্র পাই ("দেবদাস"), তার কারণ শরৎ-মানসের তখনও পরিণত স্বকীয়তা অর্জিত হয়নি।

উকিল-প্রীতি একযুগে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজে অত্যন্ত আদর্শ বস্তু হ'য়ে দেখা দেয়, সেই যুগোচিত প্রভাব শরৎচন্দ্রের বহু গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায়। "উদ্বোধন পর্বে"র তুলনায় "নব-জাগরণ পর্বে" এই মনোভাব অধিক সক্রিয়। শরৎচন্দ্রের বাল্য-পরিবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, উকিলের প্রাধান্য। স্ফুটোন্মুখ শরৎ-মানস এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উকিল হওয়াই বোধ-করি জীবনের চরম সার্থকতা। এই মনোভাবের বশবর্তী হওয়ার ফলে তাঁর গল্পগুলিতে উকিলের আধিক্য দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র নিজে নিতান্ত সুবোধ বালক ছিলেন না। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ গ্রামের এক ভীতির বস্তু ছিল। অবশ্য ভালমন্দ উভয় কা৷ঞ্জই এই দল অগ্রণী ছিল। জীবনীকারেরা শরৎচন্দ্রের বাল্য জীবন সম্পর্কিত প্রচুর তথ্যের উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের ডানপিটে মনোভাব, দলের নেতৃত্ব গ্রহণ, কোনও রোমাঞ্চকর কাজে উৎসাহ প্রভৃতি বিবিধ কার্যাবলীর চিত্র তাঁর সাহিত্যেও পাই। এই সব বালক বা শিশু চরিত্রগুলি কল্পনার জারক রসে পুষ্ট নয়। নিছক বাস্তব জীবন থেকে আহৃত। এই ধরণের চিত্র-চরিত্র তাঁর সাহিত্যের প্রাথমিক পর্ব থেকেই নজরে পড়ে। প্রাক্-যৌবন বালকের দুরন্তপনা বেশ জীবন্তভাবে শরৎ-সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। সুকুমার, শক্তিনাথ, দেবদাস, রাম, অমূল্য, নরেন, কেষ্ট, পাঁচুগোপাল, অতুল, কানাই, পটল, হরি, বিপিন, ক্ষুদে, মৃত্যুঞ্জয়, গয়ারাম, কাঙালী, লালু, শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি

চরিত্রগুলি এই বয়সের বালকের। তাদের বিচিত্র কার্যকলাপ, চরিত্র বিভিন্ন দিকের প্রকাশ ঘটিয়েছে। শুধু ডানপিটে চরিত্রই নয়, কেষ্ট, কাঙালীর মতো চরিত্রের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে, শক্তিনাথের মত শিল্পী, ইন্দ্র-লালু-মৃত্যুঞ্জয়ের মতো পরোপকারী বালক-চরিত্রও পাই। সমস্ত ক'টি চরিত্রের প্রাথমিক উপাদান শরৎচন্দ্রের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত।

'অনুপমার প্রেম', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'একাদশী বৈরাগী', 'বিলাসী', 'মামলার ফল', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'হরিলক্ষ্মী', 'পরেশ', 'অনুরাধা' ইত্যাদি গল্পে গ্রামীণ সমাজের যে সব চিত্র পাই, তা শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতাজাত। 'একাদশী বৈরাগী' থেকে শেষ পর্যায়ের সমস্ত গল্পেই গ্রাম্য-জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় শরৎচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। গ্রামীণ-জীবনের অসঙ্গতি-অনাচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, সংস্কার—বিভিন্নভাবে শরৎচন্দ্র বাঙলার গ্রামকে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। এই সব গল্পে যে সব চরিত্র ও পরিবেশের সাক্ষাৎ পাই, সেগুলি সমস্তই গ্রাম্য-জীবনের—যে গ্রাম শরৎচন্দ্রের নিজস্ব, যার জলহাওয়া মাটির আর্দ্র স্পর্শে তাঁর সাহিত্য অভিষিক্ত! এ গ্রাম বাঙলার গ্রাম, যাকে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, সাহিত্য মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের গ্রাম্য-চিত্র, বাঙলার 'ধনে-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা' গ্রামের চিত্র নয়। ক্ষয়িষ্ণু-জীবন বাঙালীর কলঙ্ক-লাঞ্ছিত ইতিহাস বুকে নিয়ে বাঙলার গ্রামাঞ্চল কথাশিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল। যাঁর আশৈশব কেটেছে গ্রামের জল-হাওয়া-মাটির চিরস্নিগ্ধ, চিরতপ্ত স্পর্শে, সেই গ্রাম্য পরিবেশ যখন শিল্পীর কবি-মানসে রূপ পেলো, কোনও প্রকার অতিরঞ্জন বা মুগ্ধতা তাঁকে প্রভাবিত করলো না। স্বচ্ছ অনুভূতির আলোতে ধরা পড়লো অতি সত্য, অতি সহজ, নিরাবরণ গ্রামীণ-স্বরূপ। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় যেখানে হাত মিলিয়ে বসে আছে, একই জীবন-খাতে যাদের জীবন-নীতি অনুসৃত, সেই মানুষগুলির আনন্দ-বেদনার

কথা লিখ্‌তে গিয়ে শরৎচন্দ্র 'কবি-কল্পনার বাষ্প'. পুঞ্জীভূত হ'তে দেননি তাঁর সত্য-সন্ধ চিত্তের সম্মুখে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-দর্শন অনেক সময়ে প্রকৃতি-দর্শন ব'লে বিভ্রম ঘটায়। সব-সুন্দর, সব-ভালো এবং সব-মধুর-দেশে এসেছি ভেবে পল্লীবন্দনা কবির পক্ষে যত সহজ, কথাশিল্পীর পক্ষে তত নয়। শহরবিরোধী চিত্ত পল্লীর সবুজ আলিঙ্গনে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তিলাভ ক'রে আনন্দ-ব্যাকুল হয়েছে—পল্লী তাই কবির কাছে মনোরম।

কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত-মুরারী শীল এবং কালকেতু-ফুল্লরা আজও পল্লীর জীবন-যাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ ক'রে আছে। সুতরাং একাধারে মধুরতা এবং ভীষণতা শরৎচন্দ্রের পল্লী-পরিবেশ রচনা ক'রে পাঠক মন জয় করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই পল্লীর সমস্যা-চিত্র পরিবেশন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র অনমনীয় দণ্ডদাতার মতো মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু একি? বিচারকের চোখে জল, মুখমণ্ডলে সমবেদনার ছাপ! অথচ বিচার তাঁর নিষ্ঠুর! "খুনের অপরাধে জজসাহেব যখন হতভাগ্যের প্রাণ-দণ্ড করেন, তখন তিনি বিচারক, কিন্তু অপরাধীর অন্তরে দুর্বলতা অনুভব ক'রে যখন তিনি দণ্ড লঘু করেন, তখন তিনি কবি।" শরৎচন্দ্রের পল্লী-প্রীতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নয়। আমৃত্যু পল্লীর আলো-ছায়া ঘেরা জীবন শরৎচন্দ্রের সর্ব পরিতৃপ্তির অন্যতম। এই জীবনকে ভালবেসেছেন ব'লেই যে, সে জীবনের দোষ-ত্রুটিতে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন—এ জাতীয় বুদ্ধি বা যুক্তিভ্রংশতা শরৎচন্দ্রের উপস্থিত হয়নি। আজকের দিনে প্রায়ই দেখা যায়, অনেকে পল্লী-প্রশস্তি বা পল্লীর দুর্বলতার কাহিনী লিখ্‌তে চেষ্টা করেন; এঁদের গ্রাম দেখা শহরে বসে। তাই এইসব রচনায় একদিকে যেমন অতিরঞ্জন, অন্যদিকে তেমনি সত্যের অপলাপ প্রশ্রয় পেয়েছে।

ভগবদ্‌-বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র যে মনে-প্রাণে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনুসন্ধান ক'রে জানা যায়, যুবক শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে বৈষ্ণবীয় প্রেম-সঙ্গীত রচনা ক'রে গান গেয়ে গেয়ে পথ চল্‌তেন। মাথায় ছিল তাঁর বাবরী চুল, দৃষ্টি ছিল উদাস, হাতে ছিল বেহালা, মন ছিল ভাবাতুর। গভীর নিশীথে কিসের নেশায় বুঝি বা কোন্ সৌন্দর্যে মগ্ন হ'য়ে

শরৎচন্দ্র সারারাত "ব্রীজে"-র ওপর বসে কাটিয়ে দিতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর পিতামহ ; সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে বিচরণশীল আত্মভোলা জীবনযাপন করেছেন পিতা মতিলাল। হয়তো এইসব বংশগত বিপরীত চিত্ততা শরৎচন্দ্রের জীবন-ধর্মের ভিত্তি-প্রস্তর গঠন করেছে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সমগ্র বিস্তৃতিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেছি। "উদ্বোধন পর্বে" কাহিনীর বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রেম। শরৎ-সাহিত্যে প্রেমের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বাংশে স্থান পেলেও প্রেমবোধের অনুগামী হ'য়ে দেখা দিয়েছে স্নেহ-মমতা-করুণা-আতিশয্য ইত্যাদি। তাঁর যৌবন পর্বের রচনায় প্রেম প্রাধান্য পাওয়ার কারণ নির্দেশ করা খুব কঠিন নয়। যৌবনোচিত অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নময় চিন্তাশীলতা শরৎচন্দ্রের মানস-লোকে প্রেম-চিত্র অঙ্কনে প্রেরণা দিয়েছে। তাই দেখা যায় কাশীনাথ-কমলা, শক্তিনাথ-অপর্ণা, বা-থিন মা-শোয়ে, দেবদাস-পার্বতী, যজ্ঞদত্ত-সুরমার অন্তরের পরিচয় জ্ঞাপনেই তিনি মগ্ন ছিলেন। "নব-জাগরণ পর্বে" পদার্পণ করবার পূর্বে দীর্ঘ অবকাশ শরৎচন্দ্রকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা দান করেছে। বাঙালী পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী নয়, একেবারে সামগ্রিক জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করবার ইচ্ছে তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। মধুর রসাশ্রয়ী চিত্ত-চাঞ্চল্য 'উদ্বোধন' করেছে শরৎ-কবি-মানসের ; বাৎসল্য রসাশ্রয়ী ভাব-স্থিতি 'জাগরিত' করেছে শরৎ-শিল্পী-মানসকে। "নব-জাগরণ পর্বে"-র পরিবার-চিত্র বাৎসল্য-প্রীতিতে দ্রবীভূত, কারণ অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভাবলোকে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চিত্রাঙ্কনে (oil painting) দক্ষ ছিলেন। লেখনী চালনার অবকাশ-মুহূর্তে তিনি তুলির আঁচড়ে রূপ-সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন। হয়তো বা-থিন, শক্তিনাথ চরিত্র-পরিকল্পনার পশ্চাতে অবচেতন মনে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব সক্রিয় ছিল।

"নব-জাগরণ-পর্বে" 'অনুরাধা' গল্পে বাৎসল্য-প্রীতি ও মধুর প্রেমের মণি-কাঞ্চনযোগ হয়েছে। কাহিনী-গ্রন্থনে অনেক ত্রুটি থাকলেও প্রেমের সর্বব্যাপিনী

শক্তির নিখুঁত বিকাশ এই গল্পের প্রাণ। "উদ্বোধন পর্বে" জীবনের খণ্ড প্রদর্শনী, "নব-জাগরণ পর্বে" জীবনের বর্ণবহুল প্রদর্শনী।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটা কথা সবাই মেনে নিয়েছেন যে তাঁর সাহিত্য জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার মূলে কোন্ সত্য নিহিত রস-পিপাসু পাঠক-মনে সে প্রশ্ন জাগবেই। জনপ্রিয় (Popular) সাহিত্য বলতে যা বুঝি, শরৎ-সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অথচ গতানুগতিক 'সুলভ মনোরঞ্জন'-মূলক প্রচলিত সাহিত্য শরৎ-সাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় যে সাহিত্য জনপ্রিয়, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি তার মূলে যে সব কারণ ক্রিয়াশীল, ভাষার চারুত্ব, প্রসাদগুণ ও নিরাভরণ শান্ত সৌন্দর্য তার মধ্যে অন্যতম। মধু সংলাপী শরৎচন্দ্রের ভাষায় এই মাধুর্যময় অনন্যতা পাঠকের মনপ্রাণ যে ভরিয়ে দেয় সে কথা নূতন ক'রে কি বলার আছে?

ভাষার অনন্যতা হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত মিষ্টত্ব। বলাই বাহুল্য, ভাষা সচরাচর মিষ্টি হ'তে পারে না, মিষ্টি হয় ভাব। ভাবের মিষ্টত্বের জন্য ভাবের বাহন ভাষাকেই মনে হয় বুঝি মিষ্টি। নিছক ভাষার দিক্ দিয়ে বিচার করলে অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণের বিচারে শরৎচন্দ্রের ভাষা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। ভাষায় 'গুরুচণ্ডালী' দোষ, যৌগিক ক্রিয়ার আধিক্য, অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয় ত্রুটি। ব্যাকরণগত এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের ভাষার মাধুর্য এত মন হরণ করে কেন? তার কারণ প্রধানতঃ দু'টি। প্রথমটি ইতিহাসগত, দ্বিতীয়টি ভাবগত।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের যে রূপ পাই, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির রচনায় তার পরিচয় নিহিত। বাঙলা গদ্যের সেই প্রস্তুতি-পর্বে বিদ্যাসাগর-ভূদেব প্রভৃতির রচনায় যে গদ্যের পরিচয় পাই, তা নিতান্তই সাহিত্যিক-গদ্য। সেই গদ্য মারফৎ সাহিত্য-সৃষ্টি চল্‌তো, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তা চল্‌তো না। সাহিত্যিক গদ্য রচনায় কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা দাবি করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব তার চেয়েও বেশী। বিদ্যাসাগরীয় যুগে কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল।

কথ্যভাষা সাহিত্যে নিতান্তই অচল ছিল। যদিও বা কথ্য ভাষা সাহিত্যে ঠাঁই পেলো, তা একেবারে নির্ভেজালরূপে—'আলালের ঘরে দুলালে'। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় মনীষা বলে প্রচলিত ভাষাকেই শুধু গ্রহণ করলেন না, তিনি এক নবশক্তিসম্পন্ন বাঙলা গদ্যের জন্ম দিলেন। নবীন বাঙলা গদ্য সৃষ্টি ক'রে তিনি বাঙালীকে নির্দেশ দিলেন সেই ভাষাকে গ্রহণ করবার। বাঙলা ভাষার সেই অমিত তেজে বাঙালী দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে বরণ ক'রে নিল। শুধু বরণই করলো না—বাঙালী নিজের ভাবজীবনের আবেগমিশ্রিত প্রকাশ ঘটালো বঙ্কিম-প্রবর্তিত গদ্যে। তাই একথা বলা বোধ করি অত্যুক্তি হবে না যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মুখে ভাষা দিলেন, মনে শুধু ভাব দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষার সৃষ্টি করলেন—যে ভাষা ব্যবহারিক জীবনের, কল্পনা রাজ্যের।

রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষাকে নব নব দিকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুল্লেন। কষিত ভূমিকেই সুদক্ষ নিপুণতায় ফলে ফুলে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুল্লেন। প্রয়োজনের ভাষা না থেকে যে বাঙলা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ভাবজীবনের ভাষায় পরিণত হ'লো, তা পূর্ণতর রূপ পেলো রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে। এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহারগত ও সাহিত্যগত ভাষার মধ্যে পার্থক্য দূর করতে পারেননি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহারিক জীবনে বাঙালী গ্রহণ করেছে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের ভাষাকে সাহিত্যের আসরে তিনি তুলে নেননি। এই কাজটি সুসম্পূর্ণ করলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র বাঙালীর ব্যবহারিক ভাষাকে ভিত্তি ক'রে সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করলেন—আপোষ-নিষ্পত্তির ফলে যে ভাষা জন্ম নিলো, তা বাঙালীর জীবনের ভাষা, আবেগের ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষা। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারগত আটপৌরে ভাষাকে সাহিত্যের আসরে উন্নীত ক'রে তিনি সেই ভাষাতেই তাদের প্রাণের কথা চিত্রিত করলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট ভাষা এত জনপ্রিয়, এত মধুর। এটি ইতিহাসগত কারণ।

আগেই বলেছি, ভাষা কখনও মিষ্ট হ'তে পারে না, মিষ্টি হয় ভাব।

ভাব প্রকাশ পায় গৃহগত এবং সমাজগত তথা ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির যে কোন অংশ থেকেই পাঠ করা আরম্ভ করতে পারি। কাহিনীতে এই যে পরিবেশ-সৃষ্টির ক্ষমতা, চিত্রগুলি এতই সুসম্পূর্ণ এবং তা গৃহগত ব'লেই মনপ্রাণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে। একটার পর একটা চিত্র সজ্জিত ক'রে চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ব'লেই শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির Context-এর দরকার হয় না—যে কোনও স্থান থেকে পড়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যেরই এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ "কাদম্বরী" প্রবন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তারই রূপায়ণ দেখেছি বললে কি অত্যুক্তি করা হবে ? শরৎ-চিত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে তাদের বর্ণনার গুণে। তাছাড়া ব্যক্তিগত সুখদুঃখজনিত গৃহগত চিত্র অঙ্কিত করে ব'লেও তা মর্মস্পর্শী। এক একটি চিত্র সুসম্পূর্ণ ব'লেই এত মধুর ! সেই মধুর গৃহগত ভাবভাবনা যে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেই ভাষার মিষ্টত্ব অস্বীকার করবে কে ? ভাবের মাধুর্য, বর্ণনার চাতুর্য, চরিত্র-চিত্রণের কুশলতা যে বাহনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—সেই ভাষাই মধু হ'য়ে উঠেছে শরৎ-লেখনীতে। চন্দ্রের স্নিগ্ধতার পশ্চাতে সূর্যের দীপ্তি ও শক্তিদান লক্ষ্য করে কি কেউ ? চন্দ্রের স্নিগ্ধতাতেই তাদের মনপ্রাণ মুগ্ধ অভিভূত। তাই শরৎচন্দ্রের ভাষাই মিষ্ট, আর এই মিষ্টত্ব তাঁর গল্পগুলিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে ; কাহিনীভাগ ইন্ধন জুগিয়েছে।

৬

এ-কথা বোধহয় না বললেও চলে, পরিবর্তন প্রয়াসে নূতনত্বের আমদানী 'আধুনিকতার' জন্ম দেয়। যুগপরম্পরা এই 'আধুনিকতা' এক একটি পরিবর্তনের মুখপাত্ররূপে সমাজ-রাষ্ট্র এবং সাহিত্যের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে। সুতরাং ইতিহাসের নথিপত্রে সেই বিশেষ যুগীয় আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণ করতে কারুরই বেগ পেতে হয় না। মধুসূদন-বঙ্কিমের আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনাধুনিক হ'য়ে পড়লেও, উনবিংশ শতকীয় আধুনিকতার সামগ্রিক স্বরূপ ধরা পড়েছিল

তাঁদের সাহিত্যে। বিংশ শতকের আধুনিকমার্গে বিচরণশীল সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরই শরৎচন্দ্রের নাম। দুই বৃহত্তর মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অনতিসঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর দণ্ডায়মান কথাশিল্পীর সাহিত্যিক বৈগুণ্যের আধুনিকতা যে যে লক্ষণগুলি নিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তার সঙ্গে 'কল্লোল-কালি-কলমের' কবি কথাশিল্পীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে অনুধাবনযোগ্য। যুদ্ধোত্তর এবং যুদ্ধপূর্ব যুগের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে মোহিতলাল অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের রচনা কাব্যের 'জলাভূমিতে' Intellectual সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়তে মেতে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র ঠিক এই সময়েই বাঙলা সাহিত্যের সংগঠনী প্রচেষ্টায় চিৎগত নয়, হৃদগত বৃত্তিগুলিকে সচল ক'রে তুলতে চাইলেন। সাম্প্রতিক জটিলতাকে সাম্প্রতিক মননের খাতে ফেলে একটি মনরোচক সমাধানে নিয়ে আসতে শরৎচন্দ্র বাধা পেয়েছেন। কারণ চিৎগত বাচনিকতায় অবদমনের সুযোগ প্রশস্ত, এই সুযোগ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা বা ইচ্ছে কিছুই ছিল না তাঁর।

মানসিক অবদমন যে মানবিক পঙ্গুত্ব ঘটায় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। হৃদগত আনুভূতিক সত্যকে বুদ্ধির বিচারে অপাংক্তেয় প্রমাণিত করা সহজ, কিন্তু এই 'Sentimentalism' যে বুদ্ধিকেও চালিত করে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিংশ শতকে বিকেন্দ্রীভূত, বিশ্লিষ্ট, স্খলনোন্মুখ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম অনুশীলনে পরিপূর্ণ বাঙালীর বিশীর্ণ হৃদয়বোধকে সচকিত ক'রে অতি পুরাতনের নূতন বিহারকে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বিস্তৃততর ক'রে তুললেন। বিপর্যস্ত, পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী বাঙালী চিত্তে বুদ্ধির 'টনিক' অপেক্ষা হৃদয়-রস বেশী দানা বেঁধেছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের কথা এ প্রসঙ্গে অনালোচনীয়। কবির উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ 'গোরা-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা-দুই বোন-চতুরঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থে চিৎমুখিতা প্রাধান্য লাভে ব্যগ্র হয়েছে, যদিও হৃদয়ের প্রাধান্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলেনি। চিৎমুখিতার সচেতন প্রয়াস শরৎ-পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। জীবনধর্মী সাহিত্যের নজির হিসেবে সাম্প্রতিক

লেখকগোষ্ঠী এবং তাঁদের সমর্থকেরা সাহিত্যে সমচেতনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। মানবিক সগোত্রতার এতবড় প্রমাণ অস্বীকার করা চলে না।

জীবনধর্মের দুটি দিক, একটি প্রাণের অপরটি মনের। দুয়ের সমন্বয়ে জীবন। প্রাণের প্রেরণায় মানুষের জৈব পরিতৃপ্তিসাধন, মনের সাধনায় সূক্ষ্মবৃত্তির অনুশীলন। মন এখানে হৃদয়াধারে নিমজ্জিত। মননের অভিযান তার পরে। শরৎ-সাহিত্যের জীবনধর্ম কতকগুলি ভাবপ্রবণ বৃত্তি-আশ্রয়ী রূপে যাঁরা বিচার করেন তাঁদের দৃষ্টি আংশিকতা দোষে দুষ্ট। কারণ ভাব-প্রবণ সত্তা প্রাণের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে বর্তমান। জীবনকে খণ্ডিত ক'রে নয়, পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ক'রে তাকে পরিদৃশ্যমান ক'রে তোলার ক্ষমতা একমাত্র শরৎচন্দ্রেরই ছিল। শরৎচন্দ্র সাম্প্রতিকতার প্রভাবমুক্ত নন, জীবন-সত্য পর্যালোচনা ক'রে কতকগুলি অতিসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন তাঁকেও হ'তে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কাছে সমস্যাই প্রধান নয়, প্রধান জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিগত জটিলতা।

বর্তমান সাহিত্যকে এককথায় সমস্যাধর্মী সাহিত্য বলা চলে। এ সমস্যা জীবনগত ততটা নয়, যতটা জীবন-প্রণালীভূত। একথা ঠিক জীবনের একটানা বাঁধা সুরে ছন্দপতন ঘটেছে—অর্থাৎ ধর্ম-সমাজ-শাসন-অনুশাসন নীতিজ্ঞান ইত্যাদিকে শিরোধার্য ক'রে আজকের মানুষ আর পথ চলতে পারছে না। মনোতন্ত্রে এবং বস্তুতন্ত্রে একইভাবে চলেছে অপঘাত-অভিঘাত-বিরোধ-প্রতিরোধের অসীম প্রচেষ্টা। সাহিত্যের প্রচ্ছদপটে তাই শুধু দ্বন্দ্ব-চিত্রের সমাবেশ। অভাব আজকের জীবনে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষেত্রে, সুতরাং এখানে পূর্ণতা আনতে পারে শুধু বস্তুগত সুখ। ভাবগত সুখে জৈব তৃপ্তি নেই, এতো স্বাভাবিক সত্য। কিন্তু বস্তুগত আংশিক পূর্ণতা নূতনতর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে। দ্বন্দ্বে কখনো দায়িত্ব গ্রহণের কর্তব্যবোধ থাকে না। বিবিধ প্রণালীবদ্ধ পথে কেবল নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা, তার ফলে মুক্তি অসহজলভ্য হ'য়ে ওঠে।

'রমা-রমেশের' দ্বন্দ্ব একদিন সহজেই মিটে গেল। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। উভয়ের দ্বন্দ্ব মতবাদের নয়—মনোভাবের। রমার পক্ষে কি সম্ভব

ছিল না রমেশের কর্মসঙ্গিনী হওয়া। বিধবা-বিবাহের বালাই তো একটা সাধারণ অজুহাত। নৈষ্ঠিক সমাজের চোখ রাঙানোর ভয়ে শরৎচন্দ্র রমাকে কাশী পাঠালেন—এ ধারণা অযৌক্তিক। রমার রক্তপ্রবাহে যে আভিজাত্যের কণিকা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হ'য়ে যায়নি, রমেশের উদার প্রজাহিতসাধনকে যে শ্রদ্ধা ক'রেও অনমনীয়, যতীনকে রমেশের আদর্শে গড়ে তুলতে যার একান্ত সাধ—সে কেন রমেশহীন সংসারে পালিয়ে রইল? এ-পালানোর মর্মকথা কি 'এস্‌কেপিজ্‌ম্'? রমার আত্মসমর্পণ এবং রমেশের প্রাপ্তির ভাবময় রূপটুকু 'পল্লীসমাজের প্রাণ'। এটুকু যদি না বোঝা গেল, তবে হৃদয়ানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নির্বিকার হ'তে হয়। রমা-রমেশ জীবনের দ্বন্দ্বে পরাভূত নয়, জয়ী। ত্যাগই তাদের মিলনের মনোভাবটিকে সার্থকতা দান করেছে।

'অরক্ষণীয়া' গল্পের পটভূমিকা অনূঢ়ার বিবাহ-ঘটিত সমস্যা। জ্ঞানদা কঠিন বিশুষ্ক বিচারে সমাজের যূপকাষ্ঠের সম্মুখীন হ'লো—দুর্গামণির আত্মাহুতির মধ্য দিয়েই সমাজ আবার ফিরিয়ে নিল জ্ঞানদাকে। হৃদয়-ধর্মের পূর্ণতর বিকাশে সমস্যা আত্মবিবরে কুণ্ডলীকৃত হ'লো। অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার এই পরিণতি আজকের দিনে ভিন্ন পথে যাত্রা করতো—বললে ভুল হবে না। শরৎচন্দ্র 'যত পথ তত মত' যুগের পদসঞ্চার শুনতে পেলেও, নিজে এক পথেই চলেছেন—তা হচ্ছে হৃদয়ের প্রশস্ত রাজপথ। মননের গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়েননি। 'মহেশ'-'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের দিক্-পরিবর্তন কারুর দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রেণী-বিরোধের অঙ্কুরোদ্‌গম নির্বিরোধে ঘটে গেছে শরৎচন্দ্রের আধুনিক চেতনায়। কিন্তু এখানেও হৃদয়ের একমুখিনতা প্রাধান্য পেয়েছে; মননের পরিকল্পনা এবং পরিমার্জনার অভাব। সমাজে ফাটল ধরেছে, জীবনে তারই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত ইঙ্গিত—হৃদয়বাদী কথাশিল্পীর তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে এই ভাঙনকে রোধ করবার। শরৎ-সাহিত্যের আবেদন সেই গঠন-প্রচেষ্টার সন্নিধানে যেখানে মানুষের প্রগতি সব কিছুকে ধূলিসাৎ ক'রে নয়, দৃঢ় ক'রে প্রাণবন্ত ক'রে প্রতিষ্ঠা পাবে। শিল্পীর ব্যাকুল বেদনাকে Sentimentality ব'লে উপহাস করা সহজ, কিন্তু সেই বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়েনি এমন

লোকের সংখ্যা কম। শরৎচন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হবে হয়তো তিনি জানতেন, কারণ জীবনের অনির্দেশ্য গতি-রহস্যে বিনষ্টির আভাস সূচিত হয়েছে; তাকে রোধ করবে কে? সেজন্যই কি তাঁকে বলতে শুনি—"শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধ'রে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ ক'রে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত-পীড়িত-উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ ক'রে তাদের এমন ক'রে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল? বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেছ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাই ত হয়েছে, তাই ত আজ দীন দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি ব'লে কাঁদতে থাকি তবে পথ পাবো কোথায়? সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক—মানুষের চেয়ে বড় নয়—আজ সে সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধূলো তো উড়বেই, বালি তো ঝরবেই, ইঁট পাথর খসে মানুষের মাথাতে তো পড়বেই, এইতো স্বাভাবিক।"

জাতীয় জীবনের দুর্বলতা যে ক্রমশঃ আন্তর্জাতীয় হ'য়ে দেখা দিতে চলেছে, যেখানে ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই, বর্তমানটাই প্রধান, সেই বর্তমানের বিচার-বিশ্লেষণ-সংস্কার সাম্প্রতিক সাহিত্যের উপজীব্য হ'তে পারে, শরৎ-সাহিত্যের নয়। সাম্প্রতিকতার মধ্যে মানুষ আত্মপরিচয় লাভ করে, কিন্তু আত্মদর্শন ঘটে না। আত্ম দর্শন সার্বজনিক সত্যের পটভূমিকায়—এ সত্য যদি সাহিত্যের সত্য হয় তবে শরৎ-সাহিত্যে তার অপলাপ হয়নি। জীবনকে তার শাশ্বত লক্ষণের মধ্যে যাচাই করতে গিয়ে সমস্যাকে ছাপিয়ে প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে শরৎচন্দ্রের কাছে। তারপর স্নেহ-মমতা-করুণা-দয়া-সহানুভূতি-অশ্রুপাত

এবং তার বিপরীত বোধ সমূহের সমাবেশে সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে জীবনের শোভাযাত্রা। দেহগত প্রেম, দেহবিবিক্ত প্রেম, সতীত্ব-সতীত্বের বিকার, প্রবুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি-আচারের মিথ্যা কৌলিন্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে চলেছেন শরৎচন্দ্র। নবকুমারের মতো পথ হারিয়ে তিনি কাপালিকের সান্নিধ্যে এসেছেন, সাহিত্যে তাঁর কপালকুণ্ডলা প্রাপ্তি ঘটেছে। বাঙালীকে শরৎচন্দ্র পথের নির্দেশ দিয়েছেন—যে পথ আকস্মিক প্রলয়ের পথ নয়, যে পথ প্রত্যাসন্ন সৃষ্টি-বেদনার।

শরৎচন্দ্র দুঃখের চিত্র অঙ্কন ক'রে থাকলেও নৈরাশ্যবাদ তাঁর সাহিত্যকে গ্রাস করতে পারেনি। আজকের দিনে আমরা দুঃখকেই একমাত্র প্রত্যক্ষীভূত সত্যরূপে জেনেছি ব'লে দুঃখে নিরাশ হই। সুতরাং সাহিত্যেও সেই হতাশার সুর। জাতীয় জীবনের দুর্বিপাকে জীবন অনেক সময়ে নীতি-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে। এই নীতির দীনতায় জীবনে দৈন্য-দুর্দশা দেখা দিলে তার যথাযথ সাহিত্যিক রূপায়ণকে বাহবা দেবার কিছু নেই।

আদিম বৃত্তি মানুষের অন্নময় কোষের প্রতি অণুপরমাণুতে নির্বাপিত থেকেও শক্তি সঞ্চার করছে। গুহাশ্রয়ী জীবনকে ত্যাগ ক'রে মানুষ যখন সভ্য হ'তে শুরু করলো, তখন থেকেই চেষ্টা চললো পাশববৃত্তিকে নষ্ট করার। সভ্যতার অভিযানে পাশবশক্তি আপাত পরাভূত হ'লেও, মহৎ বৃত্তির কাছে মাথা নত করলেও, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি কখনো। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান মানুষকে যান্ত্রিক প্রমাণিত করতে চেয়েছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তির মতো প্রেম-স্নেহ-মায়া-সহানুভূতি প্রয়োজনের তাগিদে চালিত হয়—বিজ্ঞান মানুষের আচরণের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণের পথ খুঁজলো। শরৎ-সাহিত্যে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। অচলা সুরেশকে অতিক্রম করতে পারলো না কেন? অচলার পরিণতিতে মহিম-সুরেশ-অচলার প্রকৃতিগত তত্ত্ব পরস্পরসাপেক্ষ। মহিম এবং সুরেশ অচলার মনের পর্দায় দুই বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় ক'রে চলেছিল। সুরেশ নিজের পাওনা দাবি জানিয়ে দখল করেছে, মহিম আশা রাখে প্রাপ্যকে সহজভাবে পাওয়ার। অচলা তাই পাওনা হ'য়েই রইল—নিজে

পেলো না কিছুই। অচলার অস্মিতাসূচক অভিব্যক্তি কম। সে যেন মহিম-সুরেশের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু নিজে সে উদ্দেশ্যহীন। শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি গল্প এবং উপন্যাসের নর-নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে এবং অভিব্যক্তিতে আচরণের কার্য-কারণ সম্পর্ক আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই আচরণবাদ সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লক্ষণীয়। সমস্যাদর্শী, নিরাশবাদী, স্থূলপন্থীদের কাছে তা জৈব প্রেরণা তথা মানবিক প্রেরণার একমাত্র সম্বল।

আগামী পর্বে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়বে ব'লে অনেকে আশঙ্কা ক'রে থাকেন। এ আশঙ্কা অনুচিত হ'লেও স্বাভাবিক; শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "চির-জীবী হবার আশা আমি করিনে,—কারণ সংসারে অনেক কিছুর মতো মানব মনের পরিবর্তন আছে; সুতরাং আজ যা বড়ো আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হ'য়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে দিন আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতের অবহেলায় ডুবে যায় আমি ক্ষোভ করবো না। শুধু মনে এই আশা রেখে যাবো অনেক কিছু বাদ দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে আমার থাকবে। সে আমার ক্ষয় পাবে না।" একমাত্র হৃদতন্ত্রভিত্তিক সাহিত্য ছাড়া এমন কতকগুলি প্রাণজ চেতনা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যাকে অস্বীকার করবার উপায় কারুর নেই। শরৎচন্দ্রের শিল্প-দৃষ্টিতে নর-নারীর যুগ্ম-সান্নিধ্যে জৈব চেতনার বিরাট পরাভব অপূর্বভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নারী পুরুষের দুর্বল চরিত্রসূত্রগুলিকে নিয়ে পতন-উত্থানের হেতু নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—মহৎ মানস ক্ষুদ্রতাকে টানে, বিনোদিনী বিহারীর আদর্শে মুগ্ধ, গোরা পরেশবাবুকে এড়াতে পারেনি। স্ব-কৃত পৃথিবীতে পরাজয় অনিবার্য, বিশ্বের সঙ্গে হাত না মেলালে মুক্তি নেই জীবনে। শরৎচন্দ্র দেখলেন—মনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে যে মানুষগুলি একে অন্যকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এলো, তৃপ্তি পেলো, মুহূর্তমাত্র তার স্থায়িত্ব। স্বচ্ছন্দে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হ'য়ে সরে গেল অনেক দূরে। আবার হতাশা-ক্রন্দন-অধিকার-আত্ম-

সমর্পণ। কারণ শরৎচন্দ্র জৈব মোহকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা-বিচ্যুত ভাবতে পারেন নি।

রাজলক্ষ্মী চিরকাল শ্রীকান্তকে পেয়ে হারালো, আবার হারিয়ে পেলো। সমাজ-বন্ধন, ত্যাগের শাসন, আদর্শের নজির তুলে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেম বিচার করবার প্রয়োজন নেই। উভয় প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জৈব-পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি আবার প্রাধান্যলাভও করেনি। এই পৃথিবীর বুকে মরণশীল চেতনার আমরণ বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রবল মিতালীকে শরৎচন্দ্র স্বাক্ষরিত করলেন তাঁর সাহিত্যে। মানুষের বেদনা-ব্যাকুল প্রাণোচ্ছ্বাস এবং বৈরাগ্য-বীতরাগের এমন প্রামাণিক বাণীচিত্র কোনদিন সাহিত্যের ইতিহাসে অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে না। মুছে যাবে কাহিনীর নবীনত্ব, যুগ-সৃষ্ট সমস্যার ক্ষণিকত্ব। শরৎ-কবিমানসে প্রতি রক্তবিন্দু নিয়ে গড়ে উঠেছে যে চরিত্রগুলি, তাদের সজীব বৈশিষ্ট্য হাসি-কান্নার মুক্তো ছড়িয়ে দেবে সাহিত্যা-স্বাদীর কাছে।

শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের প্রাণে-প্রাণে কথা বলেছেন—তাতো শুধু কান দিয়ে শোনা নয়, হৃদয় দিয়ে তার ছন্দ গোণা, অনুভূতি নিয়ে তার মর্ম বোঝা। বিদগ্ধ মনের সীমাহীন সৈকতে তার দাগ জলের দাগ নয়, রক্তের দাগ। মুছতে গেলে আরও উজ্জ্বল হয়—রঙ্ ধরে আরও নূতন ক'রে।

চ

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত গল্পগুলির রস-বিচার আলোচ্য গ্রন্থে আমরা করেছি। আলোচনা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ হয়েছে—এমন অহঙ্কার আমরা করি নে। সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় গল্পগুলির মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব-ই আমাদের বিচার্য। এ-দিক থেকে যদি কিছুমাত্র সাফল্য অর্জন ক'রে থাকি, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে জানবো। গল্পকার শরৎ-প্রতিভার যে অংশ আমরা ধরতে পারি নি, আমাদের গ্রন্থ পাঠে সেই অংশের সৌন্দর্য-বিচারে শক্তিমান কোন লেখক বা লেখিকা যদি প্রবৃত্ত হন, তবে শরৎ-সাহিত্য পর্যালোচনার আর একটি নূতন দিক অচিরাৎ উদ্‌ঘাটিত হবে। অলমতিবিস্তরেণ।

গল্পকার শরৎচন্দ্র

উদ্বোধন পর্ব*

(১)

সাহিত্য-স্মৃষ্টিতে সংজ্ঞা-নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই অহেতুক হ'য়ে পড়ে। সাহিত্য কবি-মনের ধ্যানস্থ মুহূর্তের প্রকাশ। তাই কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা-নির্দেশ পথে স্মৃষ্টির গতি-প্রকৃতি বিচার সবসময়ে স্মবিবেচিত নয়।

কবি এবং যোগী তাঁদের ধ্যানস্থ মুহূর্তে অসীমের স্পর্শ উপলব্ধি করেন; ক্ষণে ক্ষণে সচ্চিদানন্দের স্পর্শে আবিষ্ট হ'য়ে আনন্দাস্বাদ করেন। ঋষি শুধু উপলব্ধিই করেন। কিন্তু কবি সেই আনন্দটুকুকে জগৎ-সভায় পরিবেশন করেন—অসীম যা', তা' সীমার মধ্যে রূপ পায়। তাই সাহিত্যস্রষ্টা আনন্দবাদী।

সাহিত্য রচয়িতার ভাব-জীবনের সম্পদ; তাঁর একক ঐশ্চর্য। সাহিত্যকার তাঁর ভাবলোকে যখন সাধনার দ্বারা স্মৃষ্টি-প্রারম্ভের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে কতকগুলি ছোটখাট অনুভূতি, অবচেতন-মনের ক্ষুদ্র অথচ গভীর জীবন-তত্ত্ব রূপ নেয় সাহিত্যে। বস্তুভারহীন অনুভূতি তথ্য-নিরপেক্ষ হ'য়ে গীতিকাব্যের প্রাণসঞ্চার করে, অন্যদিকে তথ্য-সাপেক্ষ অথচ লঘুভার স্মললিত কাহিনীতে রসের সরল গাঢ়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে গল্প। সে

---

* শরৎচন্দ্র রচিত গল্পের সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ। তা'ছাড়া বর্তমানে লুপ্ত গল্পের সংখ্যাও আপাততঃ যা' সন্ধান করে পেয়েছি, তা' হচ্ছে দু'টি—'অভিমান' ও 'পাষাণ'। 'কাক-বাসা' (বা বাসা) ও 'ব্রহ্মদৈত্য' উপন্যাস দু'টিও বর্তমানে লুপ্ত।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির রচনা-কালের ধারা ঠিক করা অত্যন্ত দুরূহ, কারণ প্রকাশের তারিখের সঙ্গে রচনা-কালের কোনও সাদৃশ্য নেই। অনেক পূর্ব-স্মৃষ্ট রচনা বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে। তবুও আমরা যতদূর সম্ভব পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে একটা ধারা-বাহিক রচনা-কাল নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি এবং সেই ধারায় গল্পগুলির আলোচনা ক'রে, শরৎচন্দ্রের কবি-মানসের ক্রম-বিকশিত জাগরণ দেখাতে চেষ্টা করেছি।

শরৎচন্দ্র-রচিত প্রাথমিক রচনা যা' আমরা জেনেছি, তার মধ্যে "বাগান" নামাঙ্কিত

জন্যে গীতি-কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত সারূপ্য লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্প সমগ্র জীবনের চিত্র আঁকেনা। জীবনের বিশেষ এক মুহূর্ত হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তাই ছোটগল্পের শুরু যেমন আকস্মিক সমাপ্তি তেমনি অতর্কিত। মানব চরিত্রের বিশেষ একদিকের পুর্ণ রূপায়ন ছোটগল্পে দেখা যায়। ছোটগল্পে চরিত্র ঘটনার সঙ্গেই আবর্তিত হয়। কিন্তু উপন্যাসে প্রধান চরিত্র ঘটনা-উপঘটনা চরিত্র-উপচরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তিত হয়।

ছোটগল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়। তাই কাহিনীর জটিলতা, চরিত্রের ক্রমবিকাশ, জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সমাবেশ ঘটলে আকৃতিতে ছোট হ'লেও প্রকৃতিতে তা উপন্যাস। এই উপন্যাসধর্মী গল্প রচনা বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে ছোট গল্প হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল, কিন্তু আধুনিককালে সত্যকার ছোটগল্পের সৃষ্টি উপন্যাসধর্মী গল্পকে ছোট গল্পের সংজ্ঞা-বহির্ভূত করেছে।

পাশ্চাত্যের প্রভাবেই বাঙলা ছোটগল্পের জন্ম। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করলে দেখা যায় সেখানে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি শুধু গল্প হিসেবেই নয়, রচনার দিক দিয়েও অনবদ্য। বাঙলা ভাষার প্রথম ছোটগল্পের নাম "মধুমতী"—রচয়িতা শ্রী পুঃ (অনেকের মতে শ্রীপুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

শরৎচন্দ্রের মানস-পর্যালোচনার পুর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। অন্যান্য গ্রন্থকার সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে নীরব রইলাম।

খাতার পৃষ্ঠায় রচিত গল্পগুলি শরৎ-সাহিত্যের আদি যুগের। "বাগান" তিন খণ্ডে সমাপ্ত—প্রথম খণ্ডে—'কাশীনাথ', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম'; দ্বিতীয় খণ্ডে "কোরেল গ্রাম" (পরবর্তী কালে 'ছবি'), শিশু (পরবর্তীকালে 'বড়দিদি') ও "চন্দ্রনাথ"; তৃতীয় খণ্ডে 'হরিচরণ', 'দেবদাস' ও 'সুকুমারের বাল্যকথা' (পরবর্তীকালে "বাল্যস্মৃতি")। 'বাগান' খাতার এই গল্পগুলি যে পর্বে আলোচনা করেছি, তার নামকরণ করেছি—"উদ্বোধন পর্ব" অর্থাৎ শরৎ-মানস কি কি প্রবণতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ভব হলো।

উদ্বোধন পর্ব

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ উপন্যাসকার। বঙ্কিম-মানসের রহস্য উন্মোচনের পুর্বে আমাদের আলোচনা করা দরকার, অতুল প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সত্যকার ছোটগল্প রচনা সম্ভব হ'ল না কেন! বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নব নব দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন এবং বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করেছেন। তবুও ছোটগল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব উনিশ শতকের নব জাগরণের মুহূর্তে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধর্মে, রাষ্ট্রনীতিতে বাঙালী এই শতকে প্রতিভাধর মনীষীদের দ্বারা গৌরবান্বিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মধ্যমণি। তিনি এই যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতার প্রতি, ব্যাপ্তির প্রতি। যে যুগকে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, সে যুগ রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের সন্ধিস্থল—তারই পটভূমিকায় তাঁর কাহিনীগুলি রচিত। ফলে ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবন-রস, খণ্ডিত প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তের প্রকাশ তাঁর রচনায় পাই না। তাঁর মানস-পরিক্রমা এই বিরাট পটভূমিতে হওয়ায় তিনি উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকা, জীবনের জটিলতা, ঘটনার বহুলতা গ্রহণ করেছেন। ছোটগল্পে যে জীবনের খণ্ডাংশ রসরূপ গ্রহণ করে, তা রচনা করা হয়তো এইজন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বিশেষিত করি শুধু কথাশিল্পী বা সাহিত্য-সম্রাট হিসেবেই নয়, আমরা বলি "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র"। কবি এবং যোগী (ঋষি) অনন্তের স্পর্শ অনুভব করেন। যা কিছু বিরাট, যা কিছু মহান্, ধ্যানী-পুরুষের আকর্ষণ সেই দিকেই। যিনি যোগী (ঋষি) তিনি অনন্তকে অনুভব করেন বলেই যে ঋষি কবির পর্যায়ভুক্ত তিনি শুধু নিজে উপলব্ধি করেন না, তাকে প্রকাশও করেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, খণ্ড সমস্ত একাকার হ'য়ে যায় নিঃসীম অনন্তে। বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্য কবি, ঋষি বা ঋষি-কবি। উপনিষদের ঋষিরাও এই হিসেবে কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এজন্যই বিরাট উপন্যাস রচনা

সম্ভব হ'য়েছিল। ছোটগল্প লেখা কেন তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না, এটাও তার অন্যতম কারণ।

এবার বঙ্কিম-মানসের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানব-জীবন লীলায়িত। ভারতীয় আদর্শ অধ্যাত্মবাদ; নিবৃত্তির মধ্যে ভারত জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পাশ্চাত্যদেশ প্রবৃত্তিকে মুখ্যস্থান দিয়েছে। তাই জীবনেরই জয়গানে মুখরিত সে দেশ। সেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেহবাদ, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়-চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর মানসলোকে ছিল স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠা। এই বোধ তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকায় তিনি দুই বিপরীত ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য আন্‌তে চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে প্রবৃত্তির ইন্ধন-স্বরূপা। অমোঘ নিয়তির পাশ জড়িয়ে দিয়েছে নারীই পুরুষের পায়ে—শক্তিমান এ' বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নারীর কাছে দিতে হ'য়েছে জীবনের চরম মূল্য। অপর দিকে দুর্বল পুরুষের কাছে নারীর আবির্ভাব শাসনদণ্ড নিয়ে—এখানে অভিশপ্ত জীবনের পথ-নির্দেশ করেছে নারী পুরুষের পক্ষে। নিশ্চল, নির্বিকার, সরল অথচ কঠিন প্রকৃতির অপূর্বসুন্দর প্রতিবিম্ব কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ করেছে। যে নবকুমার সংযমে, দৃঢ়তায় মতিবিবির বন্ধনকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে, কপালকুণ্ডলার সান্নিধ্যে তার সমস্ত পৌরুষ নির্বাপিত। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাস বঙ্কিম-কবি-মানসের প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষেত্রভূমি। কুন্দ-সূর্যমুখী-হীরা-কমল নারী-প্রকৃতির চার বৈশিষ্ট্য। এখানে পুরুষকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং পুরুষ-সত্তার উত্থান-পতনের পরিমাপক ও পরিশোধকরূপে নারী-চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাস প্রবৃত্তিপাশে পুরুষ এবং নারীর চরম নিঃসহায়তার ইতিবৃত্ত। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম সামাজিক অনুশাসনে অস্বীকৃত। কিন্তু চন্দ্রশেখর তার অধ্যাত্ম-সাধনার ফল প্রবৃত্তির পাদমূলে অর্পণ করলো কেন? তার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছেন

প্রতাপের জীবনে প্রবৃত্তি ও পৌরুষের দ্বন্দ্ব থেকে। "রজনী" উপন্যাসে অমরনাথের জীবন-ব্যাপী স্বার্থত্যাগ ঘটেছে, অথচ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারটুকু তার নেই! গোবিন্দলাল-রোহিণীর পরিণতিতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকারের কথা লিপিবদ্ধ। এভাবে নারী ও পুরুষের প্রেম-প্রকৃতির অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পচেতনাকে অগ্রগতি দিয়েছে। অবশেষে অধ্যাত্ম-জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে নিষ্কাম ধর্মের মধ্যেই প্রবৃত্তির পরিশোধন সম্ভব ক'রে নেবার চেষ্টায় যথাক্রমে "আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম" এই উপন্যাস ত্রয়ীর আবির্ভাব। কিন্তু ভবানন্দের মতো সর্বত্যাগী পুরুষের জীবন নিষ্কৃতি পায়নি কল্যাণীর পাষাণী মনোবৃত্তির সংস্পর্শে। বিরাট শক্তির অধিকারী সীতারাম রাষ্ট্রচালনা করেছে, কিন্তু রূপমোহে শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে এসেছে চরম ট্র্যাজিডির মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত জীবনব্যাপী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয় প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা সূচিত করেছে সীতারামের পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিই বিশ্বের দরবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা প্রথম অর্জন করে। প্রতীচ্য-সাহিত্যের ছোটগল্পগুলি যে অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলো, সেই একক সুরমাধুর্য আকৃষ্ট করলো প্রাচ্যশিল্পীর মানসলোক। তাই প্রাচীন আঙ্গিকের হ'ল আধুনিক রূপায়ন। একজন আধুনিক ছোটগল্প লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প হ'ল—"নদী যে দৃষ্টিতে তীরকে দেখে গল্প-রচয়িতা হিসেবে মানুষের অসংখ্য আনন্দ-বেদনা জড়ানো সংসার ও জীবন সম্বন্ধে তাঁরও সেই দৃষ্টি।" রবীন্দ্রনাথের গল্পে একদিকে যেমন নিগূঢ় আত্মীয়তা, অন্যদিকে তেমনি গভীর ঔদাসীন্য। তাই তো বাস্তবের কাছে এসেও তাঁর গল্পে দেখা দিয়েছে অসীমের ব্যঞ্জনা। তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের পরিচিত জেনেও, তাদের সঙ্গে হৃদয়ের একাত্মতা অনুভব করেও তবুও যেন মিলতে পারা যায় না—মাঝে যেন কিসের ব্যবধান। এখানেই রবীন্দ্র-

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর ছোটগল্পের মাধুর্য। তীরের সঙ্গে নদীর সম্পর্কের মতই তা তুচ্ছকেও আলিঙ্গন করেছে; আবার বিরাটের মাঝেও হয়েছে লীন। তা ছাড়া 'গল্পগুচ্ছ' রচনার তারিখ হচ্ছে, 'সোনার তরীর যুগ'—যখন তিনি পদ্মাবক্ষে ভাসমান, যেখানে জীবনের বিচিত্র কোলাহল এসে তাঁকে করেছে চঞ্চল; তিনি এতদিনে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হ'লেন তাদের সঙ্গে; এলো ছোট গল্পের প্রেরণা, এলো সহজ প্রকাশের ব্যঞ্জনা—'সোনার তরী' রচনা। শ্যামল-প্রান্তরে শিশির ভেজা তৃণখণ্ডের ওপর যে সূর্যালোক পতিত হয়, তাতে একবিন্দু শিশির-কণায় সমস্ত আকাশ হয় প্রতিবিম্বিত। শুধু রবীন্দ্রনাথের কেন, ছোট গল্পেরই স্বরূপ হচ্ছে তাই।

বাঙালী-জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব, সুতরাং গল্প-উপন্যাস রচনা করতে গেলে কাহিনী-ভাগও একঘেঁয়ে হ'য়ে পড়ে—এ অভিযোগ সকলেই ক'রে থাকেন। আর অভিযোগ করবার উপযুক্ত কারণও যে নেই তা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনখণ্ড "গল্পগুচ্ছে" বিভিন্নভাবে কাহিনী সংকলন করে' গল্প রচনা করেছেন। বাঙালীর সাধারণ সুখ-দুঃখ ভরা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা কি ভাবে সমগ্রতা এবং বিস্তৃতিলাভ করেছে, খণ্ড মুহূর্তের জীবন-দর্শন কিভাবে বিশ্ব-দর্শনে পর্যবসিত হয়েছে, গল্পগুলি পর্যালোচনা করলেই ধরা পড়ে। এর প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি-কল্পনা কিংবা বলা যেতে পারে গীতি-প্রাণতা, যার ঐশী প্রেরণায় রবীন্দ্র-কাব্যজীবন মুখরিত, ছন্দায়িত, অসীম পরিশেষে নিমজ্জিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনায় লিরিক-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ কেবলমাত্র প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষকে কেন্দ্র করেই নয়, অতিপ্রাকৃত বিষয়ক রচনাতেও তা সমভাবে সক্রিয়। বাঙালী অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী, তাই গল্পেও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী স্বাভাবিকভাবে এসেছে। পাশ্চাত্য-সাহিত্য যুক্তিপ্রবণ, সেখানে পরিবেশ রচনা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বাঙালী অধ্যাত্মবাদী, সেজন্য এখানে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি অত আয়াস সাধ্য নয়।

এ ছাড়াও রবীন্দ্র-কবি-মানসে মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মবোধ তাঁর সাধনাপথের সমগ্র দিকগুলিকে কমবেশী নিয়ন্ত্রিত করেছে। ছোটগল্পগুলিও

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবি-প্রতিভার ফলশ্রুতি হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পাংশে রোমান্স রস-পরিকল্পনায় মানুষ-প্রকৃতির নিত্যসচল সঞ্চরমান পারস্পরিক অনুভূতি অভিনব উদ্দেশ্য চরিতার্থে তৃপ্ত। এই শ্রেণীর গল্পে একদিকে যেমন কবি-কল্পনার প্রসার, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব বিশ্লেষণের অনুস্যূতিও বর্তমান। তা'ছাড়া যে সৌন্দর্য-সৃষ্টির কথা কবির সৃষ্টি-প্রয়াসে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে, সেই সৌন্দর্যলোক গল্পগুলির প্রত্যেকটিতে যে যে বিভিন্নরসের উদ্ভাবনা ঘটাক না কেন, প্রকৃতি সব সময়ে প্রাণবন্ত হ'য়ে জীবন-ধর্মকে আরও রূপে-মাধুর্যে-বেদনায়-উচ্ছ্বাসে-স্নিগ্ধতায় নিয়ত লীলায়িত করেছে। তার পরিচয় গল্পগুলির আস্বাদে আমাদের কাছে অজ্ঞাত হয়ে থাকে না। জাগতিক সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-লোকের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রখচিত আকাশ, আভাস-ইঙ্গিত-আহ্বান-বিজড়িত-পরিবেশে সংযুক্ত হয়ে অতি-সাধারণ জীবনলীলায় একটা মহিমাবোধের আস্বাদ ঘটিয়েছে, কারণ জীবনের ছোট ছোট বিচিত্র স্পন্দন বিরাটত্বের পটভূমিকায় তখন প্রক্ষিপ্ত।

শরৎ-কবি-মানস

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেকেই ব'লে থাকেন, বড় সহজ পথের মানুষ তিনি। সাদা চোখে, স্বচ্ছ অনুভূতির মধ্য দিয়ে যা তিনি দেখেছেন, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তারই সাবলীল প্রকাশ। কোন বিশেষ মানস-ভঙ্গীর সমর্থনে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ ঘটেনি, যে জন্য তাঁর প্রতিভার স্বরূপটুকু উপলব্ধি করা খুব আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এ জাতীয় মন্তব্য শরৎচন্দ্রকে শুধু না-বোঝার ভুল নয়, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শরৎচন্দ্র হয়তো বাঙালী জীবনের বিচিত্র ছবিগুলিকে সাদা চোখেই দেখেছিলেন; কিন্তু তাঁর মানস-জীবনে সেই ছবিগুলি অনুভূতির রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে রূপে আমাদের কাছে ফুটে উঠলো, সেখানে ক্ষণিকতা, সাম্প্রতিকতা এমনকি আকস্মিকতাও চিরন্তনতারই সুরে ধরা পড়লো। একদিকে লেখকের তন্ময় ভাবদৃষ্টির স্বতঃপ্রসার, জীবন-ব্যাখ্যায় অনস্বীকার্য নীতি-তত্ত্বের আবিষ্কার, অন্যদিকে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড

হাতে নিয়ে বিচারক হবার মোহ—এই দ্বি-সত্তার ক্রমিক বিচরণ শ্রেষ্ঠ কবি-মানসের স্বাভাবিক লক্ষণ। "···কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা' সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলাও তারই একটা কাজ।" যা স্বভাবজ, তার সুন্দর-অসুন্দরের বালাই নেই। জীবনের সেই স্বভাবধর্মই কবি-দৃষ্টিতে সুন্দর-অসুন্দরে ছন্দায়িত। সুতরাং আগে স্ব-ভাবের অনুশীলন, পরে সেই স্ব-ভাবের বিচার। সাহিত্যে কবিমন দু'বল্‌গার রাশ টেনে চলে; নিরঙ্কুশ গতি নয়, দু'য়ের নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই প্রতিভার জাগরণ।

শরৎ-সাহিত্যের সহজ লক্ষণটুকু যাই হোক না কেন, দু'টি বিভিন্ন মানস-প্রবণতাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নিরন্তর দ্বন্দ্বের বলিষ্ঠ আভাস তাঁর সাহিত্যে প্রকাশমান। সমাজসেবার মনোভাব নিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত সমাজ-অনাদৃতাদের চরিত্রে তিনি ফোটাতে চেয়েছেন। এই বিশেষ মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের তন্ময় শিল্পদৃষ্টি আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে—এখানেই আমরা তাঁকে "দরদী" লেখক বলি। সাবিত্রী—অন্নদাদিদি—চন্দ্রমুখী—রাজলক্ষ্মীর জন্য শরৎচন্দ্রের লেখনী যখন সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করেছে, প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর নিরপেক্ষ ভাবানুভূতির স্তর থেকে তখন তিনি বিচ্যুত। তাঁর হৃদয় তখন বেদনায় মুহ্যমান। দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের কাছ থেকে যে সমাদর লাভ করেছেন, তা শুধু এই করুণ-রসের শিল্পী হিসেবেই। কিন্তু রসজ্ঞ পাঠকের কাছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে তাঁর দুর্নিরীক্ষ্য অন্তর্দৃষ্টির জন্য। অবচেতন মনে ক্রিয়াশীল এই মানস-প্রবণতাটি শরৎচন্দ্রকে উন্নীত করেছে স্রষ্টার আসনে, এখানে তাঁর ব্যাখ্যাতার আবরণ খসে পড়েছে। রাজলক্ষ্মীকে সেবা-সঙ্গিনী রূপে সঙ্গে নিতে বিদেশেও শ্রীকান্তের সঙ্কোচ! প্রমত্ত দেবদাসের ভেতর দেখি পতিতাদের প্রতি সজ্ঞানে বিতৃষ্ণা, অথচ চন্দ্রমুখী তার প্রাণদাত্রী! এখানে কোথায় বিচারের আবেদন, কোথায়ই বা পতিতার নিগ্রহে শরৎচন্দ্রের

করুণাশ্রু? স্রষ্টার ধ্যানলীন নিবিষ্টতায় শরৎচন্দ্রের তখন আত্ম-নিমজ্জন। সমাজের রাহু কেতুরদল "শারদচন্দ্রকে" আত্মসাৎ করতে পারেনি—এখানে তাঁর একক শক্তির অসীম জয়ঘোষণা। সামাজিক বিচারের মানদণ্ডে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির ভাল-মন্দ অভাব-অভিযোগের প্রকাশ নিতান্তই অমূলক; চরিত্রগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বজাত যে অন্তঃপ্রকাশ, তাদের চিত্তের যে সূক্ষ্ম অনুভূতির উন্মোচন, প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের এইখানেই জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নিজের এই সমাহিত সত্তাটি সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। সৃষ্টির আবিষ্ট মুহূর্তেই শুধু তাঁর মানসলোকের গোপন দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে।

শরৎ-সাহিত্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সমাজ ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে—একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে লেখকের ব্যাখ্যাতা মনটির দিকে। পল্লীসমাজের রমেশ পল্লীসংস্কারক, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান পুরুষ। বেণী ঘোষালের দৌরাত্ম্য তার কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। দুর্বল সে রমার কাছে। এখানে শুধু দুটি ব্যক্তিমন—অদম্য তাদের প্রয়াস, অসীম তাদের নিষ্ঠা, নিরবচ্ছিন্ন তাদের বেদনা। "মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকু যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।" এ'জাতীয় নিদর্শন শরৎসাহিত্যে একটি দুটি নয়। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প এবং উপন্যাসে জটিলায়িত সম্পর্কের মধ্যে যে আক্ষেপ, নৈরাশ্য এবং অতৃপ্তি চিরজাগ্রত সেখানে সমাজ-সত্তার পটভূমিকায় ব্যক্তি-সত্তারই প্রাধান্য। দ্বন্দ্ব তো ব্যক্তি-সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত। কাশীনাথ ও কমলা স্বামী-স্ত্রী। এখানে সমাজ-সত্তার কোনো বাধার প্রশ্ন উঠ্‌তেই পারে না। তবু তাদের দাম্পত্য-জীবনে কোথায় যেন বিরোধ, কোথায় যেন ক্ষোভ জমে রয়েছে। এখানে দেখি দুই ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। সুতরাং সমাজ-সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বই শরৎ-সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়—একথা সর্বাংশে সত্য নয়। শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত চরিত্রগুলির সাধারণীকরণ সম্ভব হয়েছে, চিরন্তন নর-নারীর প্রকৃতি-

বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনায়। একপক্ষ উদাসীন, অনাসক্ত, আত্মভোলা পুরুষ, অন্যপক্ষের হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ নিয়েও নানা ছলা-কলা, সৌন্দর্যের জাল বিস্তার, মোহসৃষ্টির চেষ্টা। এই দুই প্রকৃতির দ্বন্দ্বজাত যে জীবনরস, শরৎসাহিত্যের মূল রস হচ্ছে তাই।

শরৎচন্দ্রের দ্বিধা-বিভক্ত মানসের যুগ্মক্রিয়াভূমি বিশেষভাবে উপন্যাসগুলিতেই। স্বভাবধর্মের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ সমাজ অনুশাসনের বাধা অতিক্রম ক'রে কি ভাবে জীবনের প্রাণকেন্দ্রে মূলগামী প্রভাব এবং প্রতিপত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা-মানসের গতিবিধি এই তত্ত্ব আবিষ্কারেই ব্যাপৃত। সর্বশক্তির আধার, সর্বজয়ী প্রেমকে স্বীকার করেই শরৎচন্দ্র জেনেছেন তত্ত্বকথার আসলস্বরূপটিকে, উপন্যাসগুলি তারই অনুলেখন। সুতরাং লেখকের সমালোচনার দায়িত্ব যে নিতান্তই কতকগুলি সমাজচিত্রের বর্ণনায় নিঃশেষিত হয়েছে—একথা আমরা সকলেই স্বীকার করবো। কারণ চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে, দুঃখ-প্রকাশের যথাযথ পথ আমরা খুঁজে পাই না—শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের রক্ষণশীল বেদনাবোধের এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী যা'তে চিরকাল পাঠকের মনে সহানুভূতির 'শ্বেতকমল' প্রস্ফুটিত করে রাখতে পারে ব্যাখ্যাকার শরৎচন্দ্রের সেজন্যই অশেষ সচেতনতা। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য-রসে রসিক পাঠক-সমাজ তাঁর এই আপাত-মানসক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিচলিত হয়ে পড়লে, তাঁর সত্যকার স্বরূপ-উপলব্ধি করতে পারবেন না। শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতি ও ট্র্যাজিডির স্বরূপ বিচার করলেই "শরৎচন্দ্রে"র পূর্ণ পরিচয় সকলের কাছে উদ্ভাসিত হবে। স্রষ্টার "পূর্ণত্ব"টিকে যদি আমরা সমালোচকের ক্ষীণ 'কলঙ্ক' রেখাগুলি থেকে মুক্ত করতে পারি, চন্দ্রের সত্যকার রূপ-দর্শন তখনই ঘটবে।

নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতি ও ট্র্যাজিডির স্বরূপ বিশ্লেষণ

"...আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক এবং তাতে প্রেমেরই ছড়াছড়ি।

অর্থাৎ নানা দিক দিয়ে এই জিনিষটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সম্ভায় উঠেছে।"—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাঁরা এ'জা এই মনোভাব পোষণ করেন শরৎচন্দ্রের তাঁদের প্রতি সমর্থন নেই। উপরি-উদ্ধৃত উক্তি প্রদান প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র স্বপক্ষ সমর্থনে অনেক কথাই বলেছেন, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি করেছেন কটাক্ষপাত।

শরৎচন্দ্রের কবি-মানস পর্যালোচনা ক'রে আমরা যে দুটি মানস-প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছি, তা'র একটি হ'লো স্রষ্টা মনের স্থিরবদ্ধতা, অন্যটি বিশ্লেষক মনের বৈচিত্র্যময়তা। মনের দ্বিধা-বিভক্ত স্বরূপ দুটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সাহিত্যে একটি মাত্র উৎসভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে—"যেটা এদের (হিন্দুত্বের) চেয়ে পুরাতন, এদের (সমাজের) চেয়ে সনাতন—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম।" শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মূল উপজীব্য বিষয় "প্রেম"। পঞ্চরসে সমাদৃত বিশ্বজনীন প্রেম ব্যাপকতরভাবে তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিচিত্রিত। বাঙালীর সামাজিক পটভূমিকায় প্রেমের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। বোধহয় সেজন্যই শরৎচন্দ্রকে ব্যাখ্যাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে বৈচিত্র্যবিলাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাতা শরৎচন্দ্রের গুরুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের আলোচনাই তাঁর কবি-কৃতির সর্বাংশ অধিকার ক'র নেই। সেজন্যই 'সাহিত্যের মাত্রা'-চ্যুতি ঘটেছে ব'লে তাঁর ওপর দোষারোপের ছিটেফোঁটা এসে পড়ায়, মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে তিনি বলেছেন—"ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে?" যুক্তিহীন দোষের বোঝা তাঁর সাহিত্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিময় প্রেমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ওপর নির্ভর ক'রেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম নিষ্ঠাশীল। বুদ্ধির কলা-কৌশল, শিল্পের চাতুর্য, সাম্প্রতিক সমস্যার গ্রন্থি এবং নীতির তত্ত্ব তাঁর সাহিত্যে কবিগুরুর ভাষায়—"জায়গা পেয়েছে, জায়গা জুড়ে নেই।" তবুও তাঁর সমগ্র রচনাবলী অনুধাবন

ক'রে আমরা এ সত্যই প্রমাণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি যে, নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়েই শরৎ-সাহিত্য শাশ্বত সাহিত্যের মান উত্তীর্ণ হয়েছে। সামাজিক এবং পারিবারিক চিত্রের নিখুঁত রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অদ্বিতীয়; কিন্তু তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর মিলেছে প্রেমসত্তার বিচিত্রভঙ্গীতে। এখানে তিনি স্রষ্টা; সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের মধ্যে শরৎচন্দ্র এমন একটি অকৃত্রিম আদিমতা লক্ষ্য ক'রেছিলেন, বিখ্যাত মনোবিদ্ ফ্রয়েডের ভাষায় যা'র উদ্দেশ্য—"to establish ever greater unities and to preserve together thus—in short, to bind together." ঋষি টলষ্টয় বলেছেন,—"...that art is good which unites mankind." আর মানবতার একীকরণ সম্ভব একমাত্র "love instinct" দ্বারাই।

স্রষ্টার নিরপেক্ষ অনুভূতি নিয়ে শরৎচন্দ্র নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, হয়েছেন বিস্ময়াবিষ্ট। "সৃষ্টির কালটাই যৌবনকাল···প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি নিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে পড়ে তার উৎসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়।" শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা-মানসের সঙ্গী হয়েছিল চিরদিনই একটি 'প্রবীণতার পাকাবুদ্ধি।' যেজন্য ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা তাঁকে প্রতি ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই প্রথম থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর মানসলোকে যে বৈচিত্র্যময়তার আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়, সেই মানসলোকের অধিকর্তা সমালোচক শরৎচন্দ্র। এখানে সমাজ-সত্তার অভিশাপে ব্যক্তি-সত্তা ভস্মীভূত এবং ব্যক্তি-সত্তার বিদ্রোহী চেতনার প্রতিঘাতে সমাজ বিচলিত। শরৎচন্দ্র তাঁর মানস-প্রবণতার দ্বিচারণে সাহিত্যধর্মের গূঢ়, গভীর এবং বিস্ময়াবহ দিকটি সর্বজনসমক্ষে অনাবৃত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের শিল্পানুভূতিতে প্রেম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র চিরন্তন স্বরূপবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। ভারতীয় পুরাণ-সাহিত্যে শিব এবং দুর্গার

প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য প্রাচ্য-সাহিত্যের নরনারীর রূপ-পরিকল্পনায় প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অনার্য-প্রভাবযুক্ত শিব ভোলানাথ, গঞ্জিকাসেবী, নিষ্ক্রিয়। এই সন্ন্যাসীকে ঘরে বাঁধবার জন্য অন্নপূর্ণার চেষ্টার অবধি নেই। কামদেব পর্যন্ত ভস্মীভূত। জগৎ-তত্ত্বের নিষ্ক্রিয় ভোলানাথ পুরুষপ্রকৃতি এবং চঞ্চলা অন্নপূর্ণা প্রকৃতিরূপা নারী-প্রকৃতির স্বরূপটি শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরুষ চির-উদাসীন, নির্লিপ্ত—কঠোর নয় কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী স্নেহ-মমতা-করুণা-সেবা-প্রেম নিয়ে এই বন্ধনহীন পুরুষগুলিকে চিরকাল বন্ধনগ্রস্ত করেছে। আত্মক্ষয়ের মধ্য দিয়ে জয় করেছে পুরুষের মন। অসহায়, একান্ত নির্ভরশীল পুরুষকে নারী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। নিজের দানের মর্যাদা অপেক্ষা পুরুষের প্রাপ্তির গৌরবকে নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই যেখানে প্রেম-প্রকৃতি প্রবৃত্তির দাবদাহে পরিবর্তিত, শরৎচন্দ্রের রচনায় সেখানে প্রেম হৃদয়ের স্নিগ্ধতায় মাধুর্যময়। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের প্রবৃত্তি ভোগব্যাকুল হয়ে উঠলে, নারীর ত্যাগ-মহিমায় তা' শান্তরূপ ধারণ করেছে। এক হিসেবে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর সান্নিধ্যে আত্মসচেতনতা হারায়—তার সমগ্র সত্তা নারীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ; কারণ নারী প্রেম-স্বরূপা। স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে সে পুরুষের পদতলে আত্মোৎসর্গ করেছে। কিন্তু সে রক্ষণশীলা, সমাজ ভাঙতে পারে না। তাই পুরুষের সম্ভ্রমহানি ক'রে নিজের দায়িত্বে পুরুষের জীবন নষ্ট করতে চায় না। বহিরঙ্গ সমস্ত বাধা-নিয়ম ছাড়াও কেবলমাত্র প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর ক'রে যে দ্বন্দ্ব অহরহ নরনারীকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের আবর্তে বিক্ষুব্ধ করছে—সে সত্যের উপলব্ধি শরৎচন্দ্রের দ্রষ্টার স্বরূপকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

সাম্প্রতিক সমস্যার নজির দেখিয়ে যাঁরা শরৎ-সাহিত্যকে আগামীকালে স্থানচ্যুত করবার প্রয়াসী, তাঁদের জানা উচিত, প্রাত্যহিক জীবনে নরনারীর আপাত-মিলনের পশ্চাতে একটি চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হয়। লবণাক্ত অশ্রু-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দুটি জীবন প্রেমডোরে মিলতে পারে কই ? "দুহুঁ কোরে

দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" অথবা "জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু প্রেম!"—এই তো শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য। এই তত্ত্বটুকু যে জীবনতত্ত্বের মূলীভূত কত বড় পরিচয়, শরৎচন্দ্র তা' জানতেন। সেজন্যই তাঁর অপরিণত লেখনীপ্রসূত গল্প "কাশীনাথ" থেকে শেষ পর্যায়ের রচনা পর্যন্ত কখনও সুস্পষ্টভাবে, কখনও বা অস্পষ্টভাবে পুরুষ-নারীর জীবন-সংঘাতে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য ক্রিয়াশীল।

নারী-পুরুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল হয়েই শরৎসাহিত্যে ট্র্যাজিডির আবির্ভাব। ট্র্যাজিডির রসকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছে উভয় প্রকৃতির বিপরীতমুখিতায়। শরৎসাহিত্যে প্রেম-স্বরূপিনী নারীর প্রাধান্য তার অসীম দুঃখভোগ, অকৃত্রিম ভালবাসা ও অবারিত স্নেহ বর্ষণের জন্য। দ্বন্দ্বের অপঘাতে নারী তার হৃদয়ের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।—"যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।" শরৎচন্দ্র পুরুষ সমাজের অপবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি এই তাঁর সাহিত্যে ট্র্যাজিডির নায়ক পুরুষ নয়, নায়িকা নারী। পুরুষ তার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে জয়ধ্বজা উত্তোলন করেছে বটে, তবু সে দুর্বল; কারণ সর্বংসহা নারীর দৃঢ়তাই পুরুষের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করেছে। পরিণামে নারী স্তূপীকৃত লাঞ্ছনার ভারবাহী হয়ে জীবনে বেদনার সমুদ্র অতিক্রম ক'রে অমৃতের অধিকারিণী হয়েছে।

শরৎচন্দ্র এ'কথা কখনই বিস্মৃত হননি—"পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী।" হয়তো নারীর মহনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই পক্ষপাত-দোষে অভিযুক্ত হতে হয়েছে শরৎচন্দ্রকে। তাঁর দৃষ্টিতে নারী যে স্বরূপে প্রতিভাত, সেখানে জয়ী পুরুষকে তিনি জয়মাল্যে বরণ করেননি; জীবন-যুদ্ধে পরাভূতা নারীর বিবর্ণ, বিশীর্ণ কপোলে প্রতি অশ্রুবিন্দু

স্রষ্টার হৃদয়ের রক্তক্ষরণে অমলিন হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হতভাগ্য দেবদাস করুণার পাত্র, লেখক পাঠকের কাছে দেবদাসের জন্য দয়া প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রমুখী এবং পার্বতীর ট্র্যাজিডিতে "আহা!" বলে দুঃখ জানিয়ে ক্ষান্ত হওয়া যায় কি? নারীর জীবন-সাধনার আত্মক্ষয়কারী রূপের প্রকাশে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজ বিশুষ্ক চোখে বিস্ময়াহত হয়। "Pity"-র মুখাপেক্ষী হয়ে শরৎ-সাহিত্যে নারী আত্মপ্রকাশ করেনি। "Tragedy"-র মহিমা তাকে প্রকৃতিগত ভাবেই প্রাধান্য দান করেছে।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের অবচেতন মনে নরনারীর প্রেম-সম্পর্কের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে একটি পরীক্ষামূলক ধারায় প্রকাশ করবার চেষ্টা ছিল ব'লে মনে হয়। তিনি প্রথম যুগের রচনায় নরনারীর সম্পর্ককে যে পরিস্থিতিতে স্থাপন ক'রে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্থাপন করেছেন, তার পরবর্তী স্বরূপ বৈচিত্র্যময়। এখন প্রধান প্রশ্ন এই যে, শরৎচন্দ্র নিজেই ক্রমশঃ সামাজিক এবং মানসিক সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন ক'রেছেন, না, এ শুধু তাঁর স্রষ্টা-মনের বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয়? সমাজ-পোষ্য বাঙালী জীবনে নর-নারীর প্রেমে যে "পাপের চিহ্ন" বদ্ধমূল হয়ে সামাজিক চেতনায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যুগের রচনা 'কাশীনাথে' সেই সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেন নি; হয়তো তাঁর মন [illegible]তে সায় দেয়নি। তাই বিবাহিত জীবনেই প্রেম-বোধকে সর্ব-প্রথম সক্রিয় ক'রে তুলতে চেয়েছেন। কাশীনাথ এবং কমলা যথাক্রমে স্বামী-স্ত্রী হয়েও সমস্ত জীবনে মনে প্রাণে সামঞ্জস্য আনতে পারেনি। কিন্তু কেন? স্বামী-স্ত্রীর চিরাচরিত বন্ধন সেই অগ্নি সাক্ষী ক'রে মন্ত্র-পাঠ করবার সময়ই তো অক্ষয় হ'য়েছিল। শরৎচন্দ্রই প্রথম বোঝালেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঐ আখ্যাটুকুর মধ্যে নিহিত নেই, আছে অন্তর-সত্তায়। সেখানে প্রতি-নিয়ত পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলা চলেছে, তার প্রতি চোখ বুজে থাকলে সামাজিক দিকটাই প্রধান হয়ে উঠবে। সুতরাং শরৎচন্দ্র যদিও স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে 'কাশীনাথ' গল্পে

জীবনের অনিবার্য দুঃখময় অধ্যায়ের ইতিলিপি রচনা করেছেন, তবুও একথা বলা যায়, জীবন-সমস্যার প্রধান অংশটিতে তিনি আলোকপাত করেছেন আবার তার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনাকে প্রকাশিত করতে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। 'কাশীনাথ' রচনায় শরৎচন্দ্রের সংস্কার-বিমুক্তি তাঁর অস্পষ্ট চেতনায় হয়তো ঘটেছিল, কিন্তু সমাজ অসমর্থনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস বা সাহস তাঁর তখনও দেখা দেয়নি।

'কাশীনাথে'র কাহিনীকে এক হিসেবে শরৎ-সাহিত্যে ট্র্যাজিডির উদ্বোধন বলা যেতে পারে। একদিকে সামাজিক শক্তি, অপর দিকে অবৈধ প্রণয়ের অপ্রতিহত আকর্ষণ চরিত্রকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য না করেও একথা অস্বীকার করা চলে না স্বতন্ত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই জীবন-সমস্যার বন্ধনকে করেছে আরও জটিলতর। সুতরাং সধবা কমল, বিধবা রমা, গৃহত্যাগিনী সাবিত্রী, স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিতা অভয়া, স্বামী বর্তমানেও অপরের প্রতি আসক্তা অচলা, সমাজনীতি বিরোধী কমল যথাক্রমে—কখনও করেছে আত্মসমর্পণ, কখনও জানিয়েছে অস্বীকৃতি; কিন্তু সব ক্ষেত্রেই প্রধান হয়ে উঠেছে তাদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য। কাশীনাথ সেই উদাসীন পুরুষ, যার দারিদ্র্যে নৈরাশ্য নেই, ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু কমলা কিছুতেই পারেনা এই স্বামীটির মন বুঝতে। তাই তার যত অভিমান-আক্ষেপ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হ'য়ে যখন স্বামীকে আঘাত করলো তখনও ঔদাসীন্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং ক্ষমা কমলাকেই দুঃখ দিল দ্বিগুণ ভাবে।

'মন্দির' গল্পের শক্তিনাথ-অপর্ণার দ্বন্দ্ব এবং 'ছবি' গল্পের বা-থিন-মা-শোয়ের বিরোধ তাদের চরিত্র-সঞ্জাত বৈশিষ্ট্য-সৃষ্ট। শক্তিনাথের মৃত্যু অপর্ণার জীবনে মুক্তির সূচনা নয়, অনন্ত দুঃখের বন্ধনে সে জর্জরিত। মা-শোয়ের অহমিকা বা-থিনকে বিপর্যস্ত ক'রে মিলন-প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু মা-শোয়ের ক্ষণিক ট্র্যাজিডি পাঠকের মনকে করেছে বেদনাহত। দুঃখ দিয়ে দুঃখ পাবার নেশা নারী-চরিত্রের রহস্যময়তার একটি গভীর

প্রমাণ। সেজন্যই নিষ্ক্রিয় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে নারী-হৃদয়ের যে বিচিত্র ক্রিয়াশীলতা, কখনও তার ছন্দে ছন্দে ফুটেছে মালতী-যুথী-সেঁউতি, কখনও ধ্বনিত হয়েছে অসহায় নারীর আর্ত আবেদন। সুরেন্দ্রনাথের নির্লিপ্ত প্রকৃতি বড়দিদির মনকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। মাধবীলতা সুরেন্দ্রনাথের ভালমন্দ, সুখ-সুবিধার জন্য "বিশেষ" আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চন্দ্রনাথ এবং সরযূর জীবনে প্রকৃতিগত সেই অপরাজেয় দ্বন্দ্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। সরযূর মা নিকৃষ্ট রাখাল ভট্টাচার্যের জন্যে যে দুঃখ পেয়েছে, তার উত্তরাধিকারিণী সরযূর জীবনেও সেই অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল; চন্দ্রনাথের ঔদার্য "বিশুর মা"কে ক্ষমা করেছে মাত্র। দেবদাসের জীবন-কাহিনী বেদনা-পূর্ণ। চরিত্রে তার উচ্ছৃঙ্খল অনবধানতা। তার ভাগ্যাহত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চন্দ্রমুখী-পার্বতীর দুর্ভাগ্যের কথাই 'দেবদাস' গল্পে ট্র্যাজিডির প্রকৃত রসাস্বাদন ঘটিয়েছে। দেবদাস-পার্বতী দুজনেই পরস্পরের প্রেমে অভিষিক্ত। পার্বতীর স্বামী-পুত্র পরিবৃত বৈরাগ্য-সাধনা দেবদাসের জন্যই। এদিকে দেবদাসও 'পারু'কে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। প্রেম দেবদাস-পার্বতীর জীবনে ঐশ্বর্য ছড়াতে পারেনি সত্য, তবে বিচ্ছেদে (সে তো মৃত্যুরই নামান্তর) দিয়েছে মহিমা। কিন্তু চন্দ্রমুখী শুধু অনির্বাণ দাহ নিয়েই ফিরে গেছে, প্রেম তাকে করেছে বঞ্চিত। চন্দ্রমুখীর বিষাদে সমগ্র কাহিনী ভারানত।

'পল্লী-সমাজে' রমার পক্ষে বৈধব্য এবং রমেশের পক্ষে উচ্চকুলহীনতা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেখানে উভয়ের প্রণয় আত্মপ্রকাশে বিচলিত। রমেশ বলিষ্ঠ পুরুষ, রমাকে গ্রহণ করবার মত উদারতা তার হয়তো ছিল। কিন্তু সে কোনও প্রকার আবেগের উচ্ছ্বাসে অথবা ভালবাসার দাবি নিয়ে রমাকে বিব্রত করেনি, পরন্তু রমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রমেশ শিরোধার্য ক'রে নিয়েছে। রমা রমেশের এই সংযমকে শ্রদ্ধা করেছে, তার মন চায় রমেশের সেবা করতে। কিন্তু প্রিয়জনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে তার নারী-প্রকৃতি বাধা দিয়েছে। তাই রমা ছোট ভাই যতীনের

ভারটুকু দিয়ে রমেশের বাঁধনছেঁড়া জীবনে একটি গুরুতর বন্ধনের সূচনা করলো। অকৃতার্থ জীবনে রমার হয়তো এই সান্ত্বনা।

দর্পিতা ইন্দুমতীর নারী-দর্পচুর্ণ হয়েছে নির্লিপ্ত নরেনের কাছে। ইন্দুর ব্যবহারে আমরা নরেনের জন্য ব্যথিত হই এবং ইন্দুর নারীসত্তা-বিরোধী প্রকৃতির জন্য হই ক্ষুব্ধ। এ বিচার আপাত। শরৎচন্দ্রের শিল্প-বিজ্ঞানের আসল বৈশিষ্ট্য এখানেও ফলবতী হয়েছে। নরেন এবং ইন্দুমতীর দ্বন্দ্ব তাদের বিপরীত প্রকৃতির জন্য। নরেন দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে, পরাভূত হয়েছে ইন্দুমতী। ইন্দুমতীর দর্প তাকে ট্র্যাজিডির নায়িকা রূপে প্রমাণিত করেছে, তাই স্বামীর সঙ্গে মিলনের সুখ বিষাদের গ্লানিতে ম্রিয়মান।

প্রেমিকা এবং বধূরূপিনী সৌদামিনী 'স্বামী' গল্পে ট্র্যাজিডির বীজ বপন ক'রে তার ফল ভোগ ক'রেছে। নরেনের অসংযম এবং ঘনশ্যামের ঔদার্য সৌদামিনীর জীবনে অসহনীয় পরিস্থিতির সূচনা করেছিল। Agnostic মামার যোগ্য শিষ্যা সৌদামিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরাজয়-স্বীকারে নারী-জীবনের রহস্যাবৃত অধ্যায়ের আবরণ উন্মোচন।

'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী তার প্রেম-মহিমার জয়গান ক'রে জানালো, সতীশের সামাজিক সম্ভ্রম সে স্ত্রী হিসেবে দাবি জানিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। নারীর ত্যাগ-নিষ্ঠাই তার প্রেমের মর্যাদা দান করেছে। উপেন্দ্রের ভাবান্তরহীনতা কিরণময়ীর জীবনে এনেছে চরম দুঃখ। কিরণময়ী সাবিত্রী নয় সত্য, কিন্তু দিবাকরের চরিত্র-স্খলনের পরিণাম তাকে আতঙ্কিত করেছে এবং চির-জীবন সে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। উপেন্দ্রের সহানুভূতি এবং ভালবাসা (উদারতা) যেখানে সাবিত্রীর প্রতি নিঃশেষে বর্ষিত হয়েছে, কিরণময়ীর দুর্ভাগ্যে তার কণাটুকুও মেলেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নরনারীর প্রণয়ের স্বরূপ নির্ধারিত করেও শরৎচন্দ্র সামাজিক দৃষ্টিতে অবৈধকে বৈধরূপে প্রমাণ করবার দৃঢ়তা তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি বাঙলাদেশের নারী-সমাজে যে কঠোর হৃদয়-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন, সেখানে নারীর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে

ব্যথার ইতিহাস লিখতে গিয়েও, তিনি প্রায়ই হয়েছেন পথভ্রষ্ট। প্রকৃতই যেদিন শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন তখনই জাগ্রত হয়েছে।

'গৃহদাহ' ঘটেছে মহিমের গভীর নিস্তরঙ্গ চরিত্রের ফলে। অচলার প্রেম স্বামীর অটল চরিত্রে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরেছে। পুরুষের ব্যগ্রতা নিয়ে মহিম অচলাকে চঞ্চলা ক'রে তোলেনি; সুরেশ কিন্তু নারীকে আয়ত্ত করবার ক্ষমতা রাখে। তাই অচলা সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে, তার নারী-প্রকৃতি অশুভ আশঙ্কায় দৃক্‌পাত করেনি। অচলার অদৃশ্য নিয়তি তাকে পথ দেখিয়েছে। তার জীবনে ধ্যান-নিশ্চল স্বামীর প্রেম এবং ক্ষমায় কোনও বৈচিত্র্য নেই। নারী-জনোচিত হৃদয়াবেগ অচলাকে দুর্বল করেছে মহিম এবং সুরেশের কাছে। তার প্রেম সহজগতি নিয়ে অগ্রসর হয়নি। এখানে অচলা ক্ষত-বিক্ষত এবং লাঞ্ছিত জীবন অতিবাহিত করেছে।

ষোড়শী-জীবানন্দের 'দেনা-পাওনা' প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর দেনা-পাওনায় পর্যবসিত হয়েছে যখন লিভারের ব্যথায় জীবানন্দ ষোড়শীর কাছে একটু সেবা প্রার্থনা করেছে। জীবানন্দের ওই অসহায় দেহটাকে বাঁচিয়ে তুলতেই ষোড়শীর সন্ন্যাস-সংযমের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম ক'রে ষোড়শী ছুটে এসেছে জীবানন্দের কাছে।

অভয়া হিন্দু-ঘরের পতিপ্রাণা সাধ্বী—রেঙ্গুন-যাত্রা করেছে স্বামীর উদ্দেশ্যে। যাকে খুঁজতে তার এই অভিযান, তার সন্ধানও সে পেয়েছে, তবুও কেন রোহিণীবাবুর কাছে সে ফিরে এসেছে—কোন্ আকর্ষণে? স্বামীর অত্যাচার বাঙালী-বধূর কাছে কোনও কালে অসহনীয় নয়। অভয়ার কাছেও হয়তো ক্রমশঃ স্বামীর অত্যাচার সহনীয় হয়ে উঠতো। কিন্তু রোহিণীবাবুর একান্ত নির্ভরশীল মন, শিশু-সুলভ চরিত্রের আকর্ষণ অভয়াকে সমাজ-বিরোধী ক'রে তুলেছে। অভয়া রোহিণীবাবুকে নিয়ে নতুন সংসার পেতেছে।

এই অভয়াকে রাজলক্ষ্মী শ্রদ্ধা করে। অভয়া-নির্দেশিত পথ দিয়ে

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতো। কিন্তু অভয়ার জীবন-অনুস্মৃতি তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের জীবন-সমস্যা সমাজগত বা ব্যক্তিগত যুক্তিশৃঙ্খলার বাইরে। সামাজিক-বোধ অপেক্ষা সহজাত নারী-প্রকৃতি নিয়েই রাজলক্ষ্মী ভবঘুরে শ্রীকান্তকে একদিকে যেমন গৃহমুখী দেখতে চেয়েছে, আবার গৃহজীবনের দুর্বলতায় শ্রীকান্তের পৌরুষ স্খলিত হ'তে দেখে রাজলক্ষ্মী সঙ্কুচিত হয়েছে। তার প্রেম আত্মভোলা শ্রীকান্তের চতুর্দিক পরিবৃত ক'রে তাকেই অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ করেছে। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, রাজলক্ষ্মীর প্রেম শ্রীকান্তকে যতবার বন্ধনগ্রস্ত করতে চেয়েছে—শ্রীকান্ত যেন আরও হয়ে উঠেছে ভবঘুরে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণকে ভুলতে পারেনা—তার নিঃসহায় জীবনে রাজলক্ষ্মীর সেবা-যত্ন-আকুল আগ্রহবোধ যে কতখানি স্থান অধিকার করেছে তা শ্রীকান্ত জানে। চির-বৈরাগী শ্রীকান্তের নির্বিকার চরিত্র কমললতাকেও এভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। এমনিভাবে সমগ্র 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে আমরা দেখেছি রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মিলনে বাধা এসেছে তাদের নিজেদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে। সমাজের ভয় রাজলক্ষ্মী অতিক্রম করেছে, কারণ সে জানে তার প্রেমের মহনীয় শক্তির স্বরূপকে। অভয়ার মতো সমাজের বিরুদ্ধে রুক্ষ উক্তি হয়তো সে করেনি, আচার-নিয়ম-নিষ্ঠায় সে সমাজকে মেনেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়-কথা, শ্রীকান্তের নির্লিপ্ত প্রকৃতি এবং রাজলক্ষ্মীর অনন্যসাধারণ নারী-প্রকৃতি তাদের জীবনে ট্র্যাজিডিকে রূপ দিয়েছে।

'শেষ প্রশ্নে' কমলের তীব্র তীক্ষ্নতার কাছে ক্রমশঃ শিবনাথ, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন পরাভূত। আশুবাবু, রাজেন এবং অজিত—এই তিনটি পুরুষকে কমল তার যুক্তিজালের একটি পাশে সরিয়ে রেখেছে। আশু-বাবুর প্রতি কমলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আছে, অজিতের অসহায় জীবনে কমল দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু রাজেনের বিকারহীন, বন্ধনহীন জীবনে, অভিযোগহীন পৌরুষকে কমল যেন বুঝে উঠতে পারে না। কমলের সমস্ত অঙ্গে রাজেনের অবজ্ঞা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।
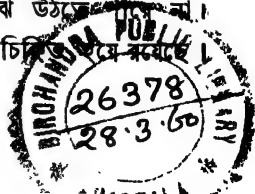
আশুবাবুর নির্লিপ্ত-উদার জীবনে নীলিমার গোপন-সঞ্চিত প্রেম একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল।

শরৎচন্দ্রের কবি-মানস সংস্কারমুক্ত হয়েছে বলেই 'কমল' চরিত্রের আবির্ভাব—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা শরৎচন্দ্রের কবিধর্মের প্রতি অবিচার করেছেন। স্রষ্টার গতিলোক স্থির-বদ্ধ, তাঁর দৃষ্টি ঐক্য-নিবিষ্ট। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রাণতার ধর্মও তাই। সাহিত্য-মঞ্চের অন্তরালে শরৎচন্দ্র পরিচালকের আসনে প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত একই ভাবে বিরাজমান। নরনারীর প্রকৃতি বিচার ক'রে তাঁর দার্শনিকতার স্বরূপে আমরা স্রষ্টার মৌলিকত্ব এবং অচলত্ব প্রমাণে সাহসী হয়েছি। সাহিত্য-মঞ্চের পরিচালক তাঁর আপন প্রবণতা দিয়ে গল্পগুলির চরিত্রের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হ'য়েছে, তাই দর্শকের দৃষ্টিতে গল্পগুলির বৈচিত্র্যময়তা ধরা পড়েছে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সমালোচক-মনের দর্পণটি ক্রমে এমনই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, প্রতিভার প্রতিবিম্বনে সাতরঙা রামধনুর মতো কমলা-রমা-সাবিত্রী-অচলা-অভয়া-রাজলক্ষ্মী-কমল শরৎ-সাহিত্যাকাশে ক্রমোজ্জ্বল।

(২)

কাশীনাথ

"কাশীনাথ" গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে পুর্বোল্লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা অপরিহার্য ; কারণ শরৎ-মানস ও শরৎ-সাহিত্যের ট্র্যাজিডির স্বরূপ, যা পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট ও পরিণত আকার ধারণ করেছে, তারই সূচনা "কাশীনাথ" গ্রন্থের দু'একটি গল্পে স্বচ্ছ আকারে দেখা দিয়েছে।

"কাশীনাথে"র আখ্যান-ভাগ শরৎচন্দ্র রচনা করেছিলেন দেবানন্দপুর গ্রামে পাঠ্যাবস্থায়। কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি (যখন

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র) সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু এই সময়কার রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি সবই প্রায় অপরিণত লেখনীর চিহ্ন বহন করে; কারণ ত্রুটিশূন্য সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে পরিণত বয়স এবং অভিজ্ঞতা তখনও শরৎচন্দ্র লাভ করেননি। তাই ভাগলপুরে যখন তিনি সাহিত্য-জীবনে স্ব-প্রতিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষায় "বায়োলজি-জুয়োলজি" ('Biology & Zoology') প্রভৃতি নানা গ্রন্থপাঠে মগ্ন হন এবং সাহিত্য-রচনার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হন, তখন "কাশীনাথ" জাতীয় গল্পের সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবুও বর্তমান স্বরূপে "কাশীনাথে"র আঙ্গিক-গঠন ত্রুটিপুর্ণ। সুতরাং এই গল্পের আঙ্গিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হ'য়ে আমরা সংক্ষেপে দু'একটি কথা উল্লেখ করবো।

আঙ্গিক-বিচার

"কাশীনাথে"র আঙ্গিক-লক্ষণ পর্যালোচনা ক'রে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে গল্পটি উপন্যাসধর্মী; অথচ সত্যকার উপন্যাসও "কাশীনাথ" নয়। কাশীনাথের প্লট-সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দু'জন সমবয়স্ক বন্ধু বিশেষ অবহিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের পাঠশালার পণ্ডিতের পুত্র ও সহপাঠী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামানুসারে "কাশীনাথে"র নায়কের নামকরণ করা হয়। নামকরণ-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র এবং তাঁর উপরোক্ত বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে মতামত আদান-প্রদান হ'য়েছিল এবং বন্ধুদ্বয় একথাও জানতেন যে শরৎচন্দ্র "কাশীনাথ" গল্পটি উপন্যাস আকারে লিখ্‌তে শুরু করেছেন। "কাশীনাথে"র সমসাময়িক কয়েকটি রচনা, যেমন "অভিমান", "কাকবাসা", "ব্রহ্মদৈত্য" (এই তিনটি রচনাই বর্তমানে লুপ্ত)—সব কটিই উপন্যাস-আকারে লিখিত। "উদ্বোধন পর্বে"র বেশীর ভাগ রচনাগুলিই কোনও সঠিক সাহিত্য-সংজ্ঞায় নির্ধারিত হ'তে পারেনি। এই ত্রুটি "বাগান-পর্বে"র সমস্ত লেখাতেই সমভাবে বর্তমান।

"কাশীনাথ" সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ ক'রে চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তা' থেকেও প্রমাণিত হয়, এই গল্পের

আঙ্গিক-শৈথিল্যে তাঁর কুণ্ঠার অবধি ছিলনা—ঃ…আমার "কাশীনাথ"-টা অতি ছেলেবেলাকার লেখা, যে সময়ে ওটা তোমারও (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য) ভাল লাগ্‌ত…আমারও ভাল লেগেছিল, লিখেও ছিলাম।" এই উক্তির বিপরীত সুর শোনা যায়—"…লোকে হয়তো মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথে'র অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়…"।

"কাশীনাথ" শরৎচন্দ্রের নিতান্ত অপরিণত সাহিত্য-মানস প্রসূত হ'লেও, কাহিনী মনোনয়নের বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার পরিচয় দান করে। কাশীনাথ-কমলার ব্যক্তিগত প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য এবং তার বিচিত্র প্রকাশের পটভূমিকা বাঙালী-জীবনের 'ঘর-জামাই' রাখার সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। দরিদ্র কুলীন জামাতাকে বাঙালী-ঘরে শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হ'তে দেখা যেতো। কাশীনাথের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জামাতারা এই অবস্থায় কখনও সুখী হ'তে পারেনি; তাই দেখা দিয়েছে সমস্যা। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই সমস্যা ছাড়াও "কাশীনাথে" আর একটি প্রধান উপাদান গ্রহণ ক'রেছেন—তা' হচ্ছে নরনারীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হ'য়েছে পুরুষের চির-ঔদাসীন্য এবং নারীর অভিমান-প্রসূত দুর্জয় আক্রোশের সংযোগে। সুতরাং এদিক্ দিয়ে "কাশীনাথ" উপন্যাসের পরিধি গ্রহণ ক'রে ঘটনা এবং চরিত্রের বিস্তৃত পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো।

শরৎচন্দ্র কাহিনীর প্রারম্ভ থেকেই একটা বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হ'য়েছেন। দশ পরিচ্ছেদ ব্যাপী কাশীনাথ-কমলা এবং বিন্দুর পরিচয় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মন্থরগতিতে দান ক'রেছেন—যা' উপন্যাসের পক্ষেই সম্ভব। মূল কাহিনীটিকে চরিত্র এবং ঘটনার সক্রিয় দিক্-পরিবর্তনে সচল ক'রে তোলা হয়নি। বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার উপস্থাপনে কাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে। কাশীনাথ-কমলার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচিতি নিয়েই গল্প মুখ্যত আবর্তিত। তাই এখানে উপন্যাসগত প্রত্যক্ষ বিবর্তন উপলব্ধি করা যায় না; কারণ কাশীনাথ-কমলা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব-ঘটিত বহিঃপ্রকাশের বিভিন্ন সূত্র ধ'রেই যা কিছু

ঘটনার উদ্ভব। পারিপার্শ্বিক অন্য কোনও ঘটনা কাহিনীকে অগ্রগতি দান করতে স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়নি। বিন্দু এবং তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর বিস্তৃততর পরিচয় মূল কাহিনীতে অনিবার্যরূপে দেখা দেয়নি। এই পার্শ্ববর্তী স্বামী-স্ত্রীর চিত্রটি উপন্যাস রচনাকল্পে মনোনীত হ'লেও শরৎচন্দ্র আঙ্গিক সংগঠনে মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চল্‌তে পারেননি। বিন্দুর স্বামীর অসুস্থতার জন্য কাশীনাথ যে জমিদারীর টাকা গ্রহণ ক'রেছিল এবং তা' নিয়ে কমলা কাশীনাথকে সরকার দিয়ে অপমানিত ক'রেছিল—এটুকু জানানোই বোধ করি বিন্দু-সম্পর্কিত কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। ছোটগল্পের পক্ষে এজাতীয় সহজতর ঘটনার অবতারণা ক'রে কাহিনীকে চূড়ান্ত পরিণতিতে (Climax) নিয়ে আসা চল্‌তে পারে। যদিও অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতেই এ-সব ক্ষেত্রে গল্পকারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হয়। কিন্তু কাহিনীতে ঔপন্যাসিক জটিলতাদান করবার পক্ষে বিন্দু-কাহিনীর কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। তা'ছাড়া সমগ্র কাহিনীভাগে একমাত্র কাশীনাথ-কমলার জটিল মানসিক সংঘাত ছাড়া ঘটনার জটিলতা কোথাও লক্ষ্য করা যায় না।

কাশীনাথ-কমলা সংশ্লিষ্ট কাহিনীতে ছোটগল্পের একমুখীনতা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম পরিচ্ছেদে নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত করার মধ্যে দিয়ে কমলা কাশীনাথকে আঘাত দেবার সুযোগ পেয়েছে বটে, কিন্তু কাশীনাথের নির্লিপ্ততার জন্য কোনও ঘটনা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়নি। নবম পরিচ্ছেদে কাশীনাথের অতর্কিত আঘাত-প্রাপ্তিতে কাহিনী প্রকৃতপক্ষে Climax-এ পৌঁছেচে এবং দশম পরিচ্ছেদে কমলার আত্মসমর্পণেই সমাপ্তির ইঙ্গিত সূচিত হ'য়েছে। কাশীনাথের আঘাত-প্রাপ্তির কারণ শেষ পর্যন্ত লেখক কাশীনাথের মৌনতার মধ্যে দিয়েই পাঠকের অজ্ঞাতে রাখতে চেয়েছেন। এ জাতীয় রহস্যময় পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত।'

"কাশীনাথ" গল্পের চরিত্রই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ঘটনার নিয়ন্ত্রণে চরিত্র চালিত হয়নি। কাহিনীর নায়ক কাশীনাথ পূর্বাপর অপরিবর্তিতরূপে

বিরাজমান। গল্পের উপসংহারে কমলার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। উপন্যাসগত জটিলতর জীবনরস "কাশীনাথে"র প্রাণ-সত্তাকে সঞ্জীবিত ক'রে থাকলেও, তার নিখুঁত প্রকাশ এখানে ঘটেনি। প্লটটি যেভাবে এখানে পরিস্ফুট হয়েছে, বর্ণনাভঙ্গীর সংযত প্রকাশে এবং ইঙ্গিতময়তার যথাযোগ্য প্রয়োগে "কাশীনাথ" ছোটগল্পের সার্থকতা নিয়ে দেখা দিতে পারতো। কিন্তু তার পরিবর্তে "কাশীনাথ" সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের সংস্করণরূপে দেখা দিয়ে সামঞ্জস্য হারিয়েছে।

কাশীনাথ-কমলার প্রেম-প্রকৃতি বিচার

'কাশীনাথ' গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে। শরৎচন্দ্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। তিনি ছিলেন সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত, ভবঘুরে প্রকৃতির। 'কাশীনাথ' চরিত্র এই ছাঁচে গঠিত। কাশীনাথ চরিত্র শ্রীকান্ত শ্রেণীর চরিত্রেরই পুর্বরূপ। এই ধারার চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে অধিক এবং প্রাধান্য পেয়েছে কাহিনীতে। কাশীনাথের প্রকৃতি উদাসীন, নির্লিপ্ত; তাই শত বিক্ষোভের মধ্যে, চঞ্চলতার মধ্যেও সে অচল, অটল। এই প্রকৃতির জন্য সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পর্যন্ত অন্তরে মিলিত হ'তে পারেনি। কমলা ধনীর দুলালী, কাশীনাথ দরিদ্র কুলীন ঘরের সন্তান। বাল্যকাল তার কেটেছে নানাস্থানে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে। কিন্তু লেখাপড়ায় সে কখনও অবহেলা করেনি। তাই প্রিয়বাবুর জামাই হবার সৌভাগ্য সে লাভ করেছে। এখানে চারদিকের সামাজিক শাসনের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে মাঝে মাঝে সেই উদারমুক্ত জীবনের ডাক আসতো। তাকে ক'রে তুলতো আকুল! স্ত্রী কমলা তার কাছে প্রত্যাশা করতো প্রণয়-সম্ভাষণ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম-জনিত কর্তব্য পালন। কিন্তু কাশীনাথ একেবারে আত্মমগ্ন পুরুষ।

এইজন্য সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, স্ত্রীর প্রতি তার নেই কোনও আগ্রহবোধ বা অনুরাগ। কিন্তু একটু গভীরভাবে কাশীনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

অনুধাবন করলে দেখা যাবে, কমলার প্রতি কাশীনাথের প্রেম অন্তর্মুখী; সে প্রেমে নেই কোনও বহিশ্চাঞ্চল্য। গভীর সমুদ্রের মত তার প্রকৃতির বাইরে প্রশস্তি, কিন্তু অন্তরে রয়েছে বেগ; তাই আবেগের কোনও অবসর সেখানে নেই। যদি কাশীনাথ কমলাকে অত গভীরভাবে ভাল না বাস্তো, তবে তার মত উদাসীন, নির্লোভ পুরুষ-প্রকৃতি অনায়াসে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে চলে যেতে পারতো। কিন্তু কাশীনাথের নির্লিপ্ত প্রেম অত গভীর, অন্তর্মুখী ব'লেই কমলার শত ক্ষোভ-ক্রোধ-গঞ্জনা-বিদ্রূপ সমস্ত কিছুকেই সে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কমলা স্বামীকে কাছে পেতে চাইতো, কিন্তু স্বামীর প্রশান্ত গম্ভীর নিশ্চলতার রহস্যকে সে বুঝে উঠতে পারতো না। তাই স্ত্রী হ'য়েও তাদের মিলন গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌লোনা কোনদিনও। শরৎচন্দ্র ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলছেন—"কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে···কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। দখল করা দূরে থাকুক, তাহার বোধ হয় কাছে যাইতেও পারে নাই।" এইভাবে কমলার মনের যে ভিন্নমুখী ভাবের দ্বন্দ্ব বর্ণনা করা হ'য়েছে, 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে পরবর্তীকালে সেটাই পরিণতরূপ পেয়েছে রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির স্বরূপের কোনও পরিবর্তনই হয়নি।

কমলার সামাজিক বাধা কিছু নেই, কিন্তু তাদের মিলনের পথে বাধা দিয়েছে কাশীনাথের চির-বৈরাগী পুরুষ-প্রকৃতি। কমলার দ্বন্দ্ব, সে কোনদিন ওই আত্মভোলা পুরুষটিকে বাঁধ্‌তে পারলো না। সেজন্য যে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তনাদ কমলার জীবনে প্রকাশ পেয়েছে, শরৎচন্দ্র সে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, কমলার জীবনে দুঃখের একমাত্র কারণ কাশীনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের চরিত্র-সৃষ্টির মূলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব লক্ষণীয়।

শেষে দেখা যায়, কমলা স্বামীর ঔদাসীন্যের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, কাশীনাথের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে। কাশীনাথ কিন্তু নিশ্চল, সুমেরু-

শিখরের মত ; তাকে স্থানচ্যুত করবার ক্ষমতা কমলার নেই। তাই কমলা প্রিয়বাবুর কাছ থেকে নিজের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে। তার গূঢ়তম উদ্দেশ্য, এইভাবে সে কাশীনাথের মন জয় করবে। কিন্তু কাশীনাথের মন এতেও অচল—"জোর করে' বনের বাঘ বশ করতে পারা যায়, কিন্তু জোর করে' একটা ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না।" কমলা কাশীনাথকে বিরক্ত করেছে, পড়ার মধ্যে বাধা দিয়েছে, আবার ক্ষমা চেয়ে কেঁদেছে। শেষে নির্মম ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়েছে, কিন্তু তাতেও কাশীনাথকে আকৃষ্ট করতে পারেনি বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কষাঘাতে তাকে সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছে, তাকে ম্যানেজারের সাহায্যে আহত করেছে। কিন্তু কোনভাবেই কাশীনাথ ও কমলা মিলিত হ'তে পারেনি ; তাদের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বিরোধের বীজ নিহিত রয়ে গেছে। নানাস্থানে তার উল্লেখ পাই। কাশীনাথ নিজে পর্যন্ত এই মিলনের বাধা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠেছে ; তার মধ্যে হয়তো গরীব বলে আত্মদৈন্য রয়ে গেছে। সে বলেছে, "আমাদের এ বিয়ে না হ'লেই ভাল হত।" কমলার প্রশ্নের উত্তরে কাশীনাথ নিজের নির্লিপ্ততার ইঙ্গিত দিয়েছে দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে। কাশীনাথের চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে নানান স্থানে—"আর কাশীনাথ? সে সৃষ্টিছাড়া লোক ;" নিজের থাকা খাওয়া সম্পর্কে পর্যন্ত সে উদাসী. . কমলার প্রেম বিকশিত হচ্ছিল, কিন্তু তা প্রাথমিক অবস্থাতেই বাধা পেয়েছে। এরপর প্রিয়বাবুর কাছে কমলা নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছে, সেখানে কমলার খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। শেষে কমলা বলেছে, "বাবা, আমরা যেন কেউ কারো নয়।" কাশীনাথ-চরিত্র শুধু উদাসীন নয়, উদার—তার পরিচয় কাহিনীর নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। কমলা যেন বুঝে উঠ্‌তে পারেনা—"দিনের মধ্যে শতবার সে আপনাকে প্রশ্ন করে, ইনি কেমনতর মানুষ? শতবার বিফল প্রশ্ন শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহে, বুঝিতে পারিনা! সহস্র পরিশ্রমে সহস্র চেষ্টায় কমলা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এই দুই-হাত-পা-সমন্বিত মানুষটা কিসে নির্মিত।...

স্বামী…আহার করে, নিদ্রা যায়, জমিদারীর কাজ-কর্ম, সংসারের কাজ-কর্ম সমস্তই করে, সমস্ত বিষয়ে যত্নশীল, অথচ সমস্ত বিষয়েই উদাসীন।" কাশীনাথ সাক্ষী দিয়েছে ব্রাহ্মণটির পক্ষে, কমলার বিপক্ষে। এতে মনে হয় যেন সে সত্যের জন্য একাজ করেছে, কিন্তু আরও গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, এই সাক্ষ্যদানের দ্বারা সে কমলার ঔদাসীন্যের প্রতিশোধ নিয়েছে। শেষে তা' প্রকাশ্য আকার ধারণ করেছে।

উপসংহার

বিন্দু চরিত্রের সার্থকতা কাশীনাথ ও কমলার দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তোলার জন্য। যদি কমলা কাশীনাথের অন্য নারীর প্রতি আসক্তিজনিত কোন সন্দেহ করতো এবং শেষে তার ভুল ভেঙ্গে যেতো, তা' হ'লে দ্বন্দ্বটি আরও তীব্র হ'য়ে উঠ্‌তো। বিন্দু চরিত্রের সার্থকতা তা হ'লে আরও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্‌তো। ম্যানেজার নিয়োগের মধ্যেও যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে—কমলার প্রত্যক্ষ ঔদাসীন্যের সুবিধা ও কাশীনাথের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ।

কয়েকটি ক্ষেত্রে সংলাপ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং উপমাপ্রয়োগ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। 'বাগান' খাতাটি শরৎচন্দ্রের জীবনের যে পর্বে লিখিত, তাতে অন্যান্য রচনার তুলনায় 'কাশীনাথ' যথেষ্ট উন্নত। পরবর্তীকালে তিনি যেমন 'বড়দিদি' বা 'ছবি' প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ পরিবর্তনই শুধু করেননি, রচনার মধ্যেও পরিবর্তন করেছেন, তেমনি 'দেবদাস' বা 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে পরিণত লেখনীর চিহ্ন এবং শরৎ-মানসের পরিচয় যথেষ্ট স্পষ্ট। তাই মনে হয় মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বর্তমান 'কাশীনাথ' গ্রন্থের পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট। এই অনুমানের পক্ষে আরও যুক্তি এই যে, "বাগান" খাতার প্রথম খণ্ডে 'বোঝা' ও 'অনুপমার প্রেম'; তৃতীয় খণ্ডে 'হরিচরণ' ও 'বাল্যস্মৃতি' যথেষ্ট অপরিণত। ঠিক তারই সঙ্গে একই পর্যায়ে 'কাশীনাথ' বা 'দেবদাস'-কে ফেলা যায়না। তাই "কাশীনাথ" রচনার সময়ে যে রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, শরৎ-সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে "কাশীনাথ"কে যথেষ্ট

পরিবর্তন করতে হয়তো হয়েছিল; যার ফলস্বরূপ "কাশীনাথ" গ্রন্থে পরিণত অপরিণত লেখনীর মিশ্রিত চিহ্ন দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের চিত্রিত নরনারীর প্রেমপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য "কাশীনাথ" গ্রন্থেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। অন্তরের মিল না হ'লে বাহ্যিক সামাজিক অনুষ্ঠানই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটাতে পারে না—এই জীবনজিজ্ঞাসা তিনি তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র "সীতারাম" উপন্যাসে যে সমস্যা তুলেছিলেন শ্রী ও সীতারামের প্রেম-প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে'—এখানে শরৎচন্দ্র যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে যাত্রা শেষ করেছেন, শরৎচন্দ্রের যাত্রা শুরু হ'য়েছে ঠিক সেখান থেকেই।

বোঝা

'বোঝা' গল্পটি 'যমুনা' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক-পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম রচনার সমস্ত কিছু অসঙ্গতি নিয়েই "বোঝা" আমাদের কাছে সুপরিচিত। গল্পটিকে যদিও 'বাগান' খাতার প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়, তবুও 'কাশীনাথ' গল্পের তুলনায় 'বোঝা' অত্যন্ত অপরিণত এবং শরৎচন্দ্রের 'উদ্বোধন পর্বে'র রচনাগুলির মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তার প্রমাণ পাই, 'বোঝা' প্রকাশিত হবার পর তাঁর সঙ্গে যে সব পত্রাবলী আদান প্রদান হ'য়েছিল তার মধ্যে—"বোঝা···ছেলেবেলার হাত পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়।" ট্র্যাজিডি রচনার প্রতি শরৎচন্দ্রের আজীবন প্রবণতার পরিচয় এই রচনাটির মধ্যেও পাই।

'বোঝা' নামকরণটি যথেষ্ট ইঙ্গিতপুর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে তিনজন নারী এসেছিল। কিন্তু তাদের আগমন তিনরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে সত্যেন্দ্রের কাছে। সরলার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের যে সুখী দাম্পত্যজীবন যাপিত হচ্ছিল, অকস্মাৎ সেখানে যবনিকা পড়লো। সরলাকে কেন্দ্র করে' সত্যেন্দ্রের

প্রথম প্রেমের উদ্দামতা, প্রকাশ পেয়েছে। সেই উচ্ছলতার ছেদ টেনে যখন নলিনী দেখা দিল সত্যেন্দ্রের জীবনে, সত্যেন্দ্র মনে করলো—"…তাহার মাথায় একটা বোঝা চাপিল।" পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে শরৎ-সাহিত্যে উদ্বোধন পর্বের বেশীর ভাগ গল্পগুলির নামকরণ নির্দিষ্ট হয়েছে। সত্যেন্দ্র-নলিনীকে কেন্দ্র করেই কাহিনীভাগে মূলতঃ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। অবস্থা-বিপাকে নলিনী-সত্যেন্দ্র্যের মধ্যে ভুল বোঝার পালা চলেছিল। সত্যেন্দ্র নলিনীর সত্যকার প্রেমরূপকে বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের রহস্যকে সাধারণে পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি। জ্ঞানদা বলেছে—"…ওসব বোঝা যায় না।" এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে সত্যেন্দ্রের জীবনে দুঃখ গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। সত্যেন্দ্রের কাছে প্রাণটা তখন বোঝা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্রের 'দুঃখময়' জীবন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"·· সত্যেন্দ্রের শ্রান্ত জীবনের প্রত্যেকদিন এক একটা দুঃসহ বোঝা লইয়া আসে। সমস্তদিন ছট্‌ফট্ করিয়াও যেন সে বোঝা আর নামাইতে পারে না।" এইভাবে 'বোঝা' নামকরণের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রের জীবনের নানা অবস্থা বেশ ইঙ্গিতপুর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আঙ্গিক

'বোঝা' গল্পের আঙ্গিক অত্যন্ত শিথিল। কাহিনীর সূত্রপাত সম্পূর্ণ ভাবে উপন্যাসধর্মী। অবশ্য ঘটনাগতভাবে কাহিনীর গতি এত দ্রুত যে চরিত্রের পরিবর্তন নিছক বহিরঙ্গিক মাত্র। ন'টি পরিচ্ছেদে সমগ্র কাহিনীভাগ নির্দিষ্ট। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লেখকের ইঙ্গিত সূচক মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বোঝা' লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে আঙ্গিক-বিশুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না বলেই মনে হয়। একটানা কতকগুলি ঘটনার অবতারণা ক'রে একটি জটিল জীবন-সমস্যার সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অথচ জীবনের রহস্য বিশ্লেষণের সূত্রগুলি তখনও তাঁর কাছে অস্পষ্ট, সেই জন্য ঘটনাবৈচিত্র্যে

আকস্মিকতা আনতে চেষ্টা করেছেন। তার ফলে 'বোঝা' গল্পে একদিকে যেমন ছোটগল্পের ঘনীভূত রস সঞ্চারিত হয়নি, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসের বিচিত্র রসধারার সংমিশ্রণ ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পে তিনটি অনন্যনিরপেক্ষ কাহিনীর সমাবেশ হয়েছে। দৈবাহত সরলা-সত্যেন্দ্রনাথ, নলিনী-সত্যেন্দ্রনাথ, বিধু-সত্যেন্দ্রনাথ। একই নায়ককে কেন্দ্র ক'রে তিনটি কাহিনীতে যোগসূত্র টানা হয়েছে। কাহিনী তিনটিকে অনন্যনিরপেক্ষ বলা হচ্ছে এইজন্য যে, একটি কাহিনী থেকে অন্য কাহিনীতে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বাপর যোগসূত্রটুকু নূতন ঘটনার সমাবেশে হারিয়ে যায়। সরলার মৃত্যু সত্যেন্দ্রনাথের অপরিপক্ক জীবনে যে ট্র্যাজিডির সূচনা করেছে, তার রেশটুকু নলিনী-সত্যেনের দ্বন্দ্ববহুল মানসিক ট্র্যাজিডিতে সম্পূর্ণভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নলিনীকে কেন্দ্র করেই পাঠকের অনুভূতি আবর্তিত হতে থাকে, সরলার স্মৃতিটুকু সত্যেনের মতো পাঠকের চেতনা থেকেও নিঃসন্দেহেই অন্তর্হিত হয়েছে। সুতরাং সরলা-সংক্রান্ত ঘটনাকে বিস্তৃততর ভাবে পরিবেশন করার দরকার ছিল না; সত্যেনের পূর্বজীবনের মূল্যবান অধ্যায় হিসেবে একটি পরিচ্ছেদেই তা জ্ঞাপন করা যেতো। এদিক দিয়ে সত্যেনের সান্নিধ্যে বিধুর আবির্ভাব অনেকটা স্বাভাবিক। সমগ্র গল্পটিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে ভাগ না ক'রে নলিনী-সম্পর্কিত কাহিনীকে প্রধানভাবে গ্রহণ ক'রে শরৎচন্দ্র 'বোঝা'কে একটি সুন্দর গল্পে রূপায়িত ক'রতে পারতেন। যাহোক গল্পটি অনবধানতার জন্য অনেক আগেই তাঁর "হাত-ছাড়া" হয়ে যাওয়ায়, নবীন লেখকের প্রাথমিক হাতে-খড়ির প্রতিলিপি আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় রচনার দোষত্রুটির বিচার চলতে পারে; কিন্তু অসংস্কৃত গল্পগুলিতেই শরৎ-প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম এবং নবীন সাহিত্যিকের মনোভূমিতে জীবনের বিচিত্রতর আন্দোলনের সূক্ষ্ম আভাস অনুরঞ্জিত হয়ে আছে। 'বোঝা' পাঠকের রসানুভূতিতে ভার-স্বরূপ, এজন্য লেখকের নবীনত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করা যেতে পারে;

কিন্তু তাঁর ভাবী সম্ভাবনাকে অনুসন্ধান করতে গেলে 'বোঝা' আর ভারস্বরূপ মনে হবে না। সুতরাং প্রতিভার উন্মেষেই রচনার আঙ্গিক-প্রসঙ্গ নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়।

কাহিনী-পরিচিতি

এনট্রান্স ক্লাশের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও দশ বছরের সরলার শুভ পরিণয় মা-বাবার 'একান্ত সাধ' পূরণের জন্যই। ছোট্ট সাথীটিকে পেয়ে সত্যেনের যত সুখ, তার অনুপস্থিতিতেও সে তত অসুখী। পীড়িতা সরলার সান্নিধ্যে সত্যেনের অজস্র অশ্রুপাত 'পুরুষমানুষের' পক্ষে ছেলেমানুষী হলেও সত্যেনের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ সরলা-সত্যেনের পারস্পরিক আকর্ষণটুকু সর্বতোভাবে মধুররসাশ্রিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-সম্বন্ধ বাল্য-সুলভ সখ্যে কিছু পরিমাণে স্থানচ্যুত। সরলার বিচ্ছেদে সত্যেন যে দুঃখ পেয়েছে, যে কোন প্রিয়জনের বিয়োগেই সে এ ভাবে দুঃখভারে ম্রিয়মান হয়ে পড়তো—অন্তত উভয়ের সম্পর্ক বিচারে এ ধারণাই আমরা পোষণ করি। সমগ্র গল্পের প্রথমাংশের এই ট্র্যাজিক পরিবেশটি নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-বৃত্তটি এখান থেকেই বক্রগতি লাভ করেছে। বর্তমান কাহিনীর নায়কের প্রথম পরিণয় এবং পত্নী-বিয়োগ যত নিরুত্তাপ হয়ে দেখা দিক না কেন, সন্তাপ-ভোগ করতে হয়েছিল তাকে পরবর্তীকালে। দ্বিতীয়বার নলিনীকে গ্রহণ ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ মৃত্যু-বিচ্ছেদের চেয়েও কঠিন এবং অপ্রতিরোধনীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যা নিখুঁতভাবেই দু'টি নর-নারীর অচরিতার্থ জীবন-সমস্যা। "সত্যেন্দ্রের জননী" সত্যিই বড় 'বুদ্ধিমতী'। পত্নী-বিয়োগ-কাতর পুত্রকে তিনি নলিনীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন "সে স্বামীর কষ্ট বুঝিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসেনা, এ কথা সে তাঁহার মুখে শুনিল; তথাপি তাহার অভিমান হইল না।" প্রায় দু' বছর পরে দেখা গেল নলিনী জয়ী হ'য়েছে। পাঠ্য-জীবন অতিক্রম ক'রে সত্যেন্দ্র

কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত—শুধু তাই নয়, নলিনীকে সে ভালবাসে, তার পক্ষে নলিনীর অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। এ প্রসঙ্গে নবীন-শিল্পী শরৎচন্দ্র কেবল-মাত্র গল্প পরিবেশনের ভূমিকা ত্যাগ ক'রে মানব-চরিত্র-রহস্যের প্রতি মন্তব্য প্রদান করেছেন—"মনুষ্য চরিত্রই এমনি। তুমি অশান্তিতে আছ শান্তি খুঁজিয়া বেড়াও—আমি শান্তি ভোগ করিতেছি, তবু কোথা হইতে যেন অশান্তিকে টানিয়া বাহির করি।" —এই মন্তব্য আঙ্গিক বিচারে ত্রুটিযুক্ত হ'লেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-মানসে জীবনের শাশ্বত সমস্যাগুলি যে একটি বিশেষ দার্শনিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্র নলিনীর সান্নিধ্যে বেশ সুখী, কিন্তু "মানুষের স্বভাব কোথায় যাইবে? এত ভালবাসা, যত্ন ও শান্তির মধ্যেও তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অশান্তি জাগিয়া উঠে।" এই স্বভাব-ভিত্তিক চরিত্র-বৈচিত্র্যের রূপ-সজ্জায় শরৎ-সাহিত্য জনপ্রিয়।

সত্যেনের স্বভাবের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত নয়, সম্পূর্ণ সর্বজনীন। কিশোর সত্যেন্দ্র সরলাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। সরলাকে হারানোর ব্যথা তার পক্ষে অসহ্য। নলিনী সরলার অভাব পূর্ণ ক'রে সত্যেনের স্বভাব-ধর্মের দিক-পরিবর্তন করেছে। তা'ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা সত্যেন নলিনীকে পত্নী-রূপে পেয়েছে পূর্ণ যুবক বয়সে। কিশোরের ভাবালুতা প্রেমের গভীরত্ব সম্পাদন করতে পারে না, এ ক্ষেত্রে প্রেম-বোধ সরল সহজ কিন্তু স্পর্শকাতর। এই পর্যায় অতিক্রম ক'রেই সত্যেন-নলিনীর নব-প্রণয়। অথচ এখানেই স্বভাবের প্রকৃত জাগরণ। সত্যেন সরলার স্মৃতি ভুলতে পারেনি বলেই নলিনীর কোন কিছু ত্রুটিতেই ম্রিয়মান হ'য়েছে—এ স্বভাবের কথা নয় এবং সম্ভবও নয়। লেখকের রচনার দৌর্বল্যে সরলার কথা যতবারই কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, নলিনী-সত্যেনের অভিমানজনিত বিচ্ছেদের ঘটনা তাদের পরিণত বয়সের স্বভাব-জাত। সেজন্যই "সরলার ভালবাসার নিকট নলিনীর ভালবাসা, সাগরের নিকট গোষ্পদের জল, ধারণা করিবার জন্য মনের

মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি” সত্যেনকে করতে হয়েছিল। নলিনীর প্রতি সত্যেনের অভিমান পুরুষোচিত। কোন প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্যকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই সে নলিনীর সঙ্গত্যাগ করেছে। তবে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সত্যেন এবং নলিনীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেই ঘটনাটি সাধারণভাবে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। যে দুর্জয় অভিমানে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবন চিরদিনের জন্য ক্ষতপূর্ণ হয়েছিল, যে অহঙ্কৃত অভিমানে ভ্রমর-গোবিন্দলালের আত্ম-বিসর্জন, সেই অভিমানই সত্যেন-নলিনীর জীবনে অভিশাপ বহন করে এনেছে। এ সব ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে যথাক্রমে কুন্দনন্দিনী, রোহিণী এবং সরলার অস্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষভাবে নর-নারীর স্বভাব-নীতি।

নলিনী স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীলা, কর্তব্য-পরায়ণা, মমতাময়ী; কিন্তু স্বামীর অভিমানের প্রাকার ভেঙ্গে ফেলতে যে আত্ম-সমর্পণের দরকার তা’ তার ছিল না। নলিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে পতিগত-প্রাণতা সত্ত্বেও স্ব-বৈশিষ্ট্য হারায়নি। সে নিজেই অভিমানের রুদ্ধ কারাগার সৃষ্টি ক’রে নিজের দুঃখ ডেকে এনেছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন—“কেহই নিজের দোষ দেখিল না। সেই অর্ধ-মিলিত হৃদয় দুইটি আবার চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া রহিল।” অর্ধ-মিলিত হৃদয় কেন? সত্যেন এবং নলিনীর মধ্যবর্তিনী বাধাটুকু কি সরলা? আমাদের মনে হয় সত্যেনের জীবনে মৃত সরলার স্মৃতি নলিনীর প্রতি আকর্ষণ জন্মাবার পর প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু নববধূ নলিনী “স্বামীর পূর্ব ভালবাসা”র উচ্ছ্বাসে অন্তরে অন্তরে সঙ্কুচিতা হতে থাকে। স্বামীর প্রেমে সম্পূর্ণ অধিকার যখন তার নেই তখন নিজেকে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করাও তার পক্ষে কষ্টকর। নিজের অক্ষমতার জন্য পিতৃগৃহে এসে “দারুণ অভিমানে নলিনী শুকাইতে লাগিল।” অন্য দিকে সত্যেনের অভিমান-ক্লিষ্ট হৃদয় হয়েছে প্রতিশোধ-প্রয়াসী। হয়তো অর্ধমিলিত হৃদয়ের পক্ষেই বিচ্ছেদের সূত্রটি নিত্যযুক্ত, কারণ পূর্ণমিলনান্তে

দ্বন্দ্বের কোন অবকাশই থাকে না। মানব-সমাজে হৃদয়ের অর্ধ-মিলনটুকুই দুর্লভ। তাই সুদুর্লভ অর্ধ-সমাপ্ত মিলনে আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়ার লীলা বিজড়িত। মৃন্ময় পৃথিবীতে চিন্ময় প্রেমের এমনিই প্রকাশ। অর্ধ ব'লেই পূর্ণত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সত্যেন-নলিনীর মতো ভাগ্যবিড়ম্বিত নর-নারীর দ্বন্দ্ব-লাঞ্ছিত জীবন-যাত্রা। "সত্যেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ দিই না, তাহারও দিই না। দুইজনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্ম-গ্লানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাও বুঝিতে পারিতাম না, তোমরাও পারিতে না। বুঝিতে পারিনা—কি আকাঙ্ক্ষায় কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে!" শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর জীবন প্রেম-প্রকৃতিকে ভিত্তি ক'রে ট্র্যাজিডির বিষয়ীভূত হয়েছে, এজাতীয় 'সাধ' পূরণার্থের জন্য। সুতরাং ভুল বা দোষের আবরণ দিয়ে বিচ্ছেদের কারণ নির্ণয় করতে যাওয়া অনুচিত। ঘটনাগত বিরোধ-বৈষম্যকে বাদ দিয়ে যদি নীরবে সত্যেন-নলিনীর হৃদয়ানুভূতিকে অনুধাবন করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে নর-নারীর চিরন্তন প্রকৃতি-রহস্যের জাল বিস্তৃত রয়েছে।

তারপর তৃতীয় বিবাহ, সত্যেন এবং নলিনী দু'জনে পক্ষেই আত্মনিগ্রহের কারণ। নলিনীর নিষ্ঠা এবং ত্যাগ শেষ পর্যন্ত তাকে মহিমায় ভূষিত করেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে পেয়ে গেছে তার প্রাপ্য মর্যাদা। আর সত্যেন প্রতিশোধ নিয়েছে নিজের ওপরে—"সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ, শাস্তি পাইবে ভয় হয় কি?" সত্যেনের পক্ষে আত্ম-অনুশোচনা আমাদের কাছে বিদ্রূপাত্মক মনে হ'লেও স্বাভাবিক। কারণ সত্যেন জীবনে স্বল্পকালের জন্য হ'লেও পত্নীপ্রেমে সৌভাগ্যবান। গ্রহণ করেছে সে অনেক কিন্তু প্রতিদানে নিজেকেও যে অনেক ধৈর্যশীল, সংযমী, সহানুভূতিশীল হতে হয়, তা তার জানার বাইরে। কারণ সে পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান। ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় অর্থ-সম্মান-স্ত্রী সবই সে ন্যায্য মতই পেয়েছিল, কিন্তু স্বভাবের অনুশীলন তার ঘটেনি। সত্যেনের

চরিত্র কাশীনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, দেবদাস গোত্রীয় নয়। সমস্যা তার জীবনে দেখা দিয়েছিল নিতান্ত গতানুগতিক ভাবেই। উদার দৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান সে করতে পারেনি অথচ জীবনের প্রতি উদাসীনও সে নয়।

বিধু হয়তো ভাগ্যবতী। সরলা ও নলিনীর প্রেমে পরীক্ষিত সত্যেন বিধুকে বরণ করেছে। গ্রহণের দায়িত্ব তার জন্মেছে। শরৎচন্দ্রই বলেছেন সত্যেনের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের মনে হয় এ পরিবর্তন তার জীবনে সার্থকতম। নলিনীর প্রতি বেদনাবোধ তার চরিত্রকে তখনই পুরস্কৃত করেছে, যখন—"কিছুতেই ভুলিতে পারে না তাহার সাধের নলিনী পাবনায় চরিত্রহীনা হইয়াছিল, তাই সে তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছে।"—এই বোধ প্রকারান্তরে নলিনীকেই সম্মানিত করা।

সত্যেনের জননী শরৎচন্দ্রের 'জননী-বাদে'র সর্বপুর্ব এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পরবর্তীকালে দেখা যায় এই 'জননী-বাদ' গল্প এবং উপন্যাসকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

'বোঝা' গল্পে শরৎচন্দ্রের ভাবী সাহিত্য-শিল্পকারের রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলন কি ভাবে এবং কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করে সম্ভব হয়েছে তা বিচার করতে গিয়ে গল্পটির সূক্ষ্ম সমালোচনা করা গেল। ত্রুটির দিক দিয়ে বিচার করলে লাভের ঘরে ফাঁক থাকবে—অবশ্য ভাষা, সংলাপ, মন্তব্য, উক্তি, কাহিনী-সংগঠনের দিক দিয়ে। তা ছাড়া 'বোঝা' গল্পের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখকের কৈফিয়ৎটুকু মনে রাখতে হবে। সেজন্য যতদূর সম্ভব বিরোধোক্তি না ক'রে আমরা অসঙ্গতি, অসম্ভাব্যতা ইত্যাদির মধ্যে থেকে গল্পের মূল সুরটি ধরতে চেষ্টা করেছি।

অনুপমার প্রেম

"অনুপমার প্রেম" রচনাটি শরৎচন্দ্রের 'বাগান' খাতার অন্তর্গত প্রথম খণ্ডের রচনা। মুদ্রিত আকারে রচনাটির প্রকাশকাল ১৩২০ সালের চৈত্র সংখ্যা "সাহিত্য" পত্রিকায়। অনুপমার একাদশবর্ষীয় অকালপক্কতায়

(অতিরিক্ত উপন্যাসপাঠের ফলে) যে প্রেম-বোধের জাগরণ হ'য়েছে, সে প্রেমের মধ্যে উপলব্ধির চেয়ে উচ্ছ্বাস অধিক। শরৎচন্দ্র এই মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন। কাহিনীর সূত্রপাত অনুপমার তথাকথিত প্রেমবোধকে কেন্দ্র করে' এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তী ঘটনারাজির আগমন। পরিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীতধরণের পরিণতি অনুপমার জীবনে। ললিতমোহনের প্রেমে অনুপমা অভিষিক্ত! যদি অনুপমার এই আবেগময়তা না থাকতো, হয়তো জীবন তার ভিন্নমুখী হ'তো। সমগ্র কাহিনীভাগ বিচার করলে নামকরণ অসার্থক মনে হ'তে পারে, কিন্তু অনুপমার প্রেমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সেদিক দিয়ে "অনুপমার প্রেম" নামকরণ সার্থক।

শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলির আঙ্গিক-গঠন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল, একথা স্বীকার করতেই হবে। সমগ্র কাহিনীভাগ ছ'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—'বিরহ', 'ভালবাসার ফল', 'বিবাহ', 'বৈধব্য', 'চন্দ্রবাবুর সংসার', 'শেষ দিন'।

অতিরিক্ত উপন্যাস-পাঠের ফলে অপরিণত বয়সে যে চিত্তবিকার জন্মে, তারই ফলে প্রেমের মধ্যে দেখা দেয় আবেগময়তা বা উচ্ছ্বাস-প্রবণতা। একে তিনি কোনও দিনই প্রাধান্য দেননি। তাই অনুপমার প্রেমকে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টি পর্যালোচনা করলে, প্রেমের এই উচ্ছ্বাসময়তার চিত্রাঙ্কন পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন,—"সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে।" নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল শরৎচন্দ্র অনুপমার প্রেমকে ব্যঙ্গ ক'রে থেমে যাননি। তিনি অনুপমার মধ্যে সত্যকার নারীত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অকালপক্কতার ফলে অনুপমার যে বিরহবোধের প্রকাশ, তা অতিনাটকীয় রূপে শরৎচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। যখন সে বিরহের আধিক্যে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সফলকাম হ'তে পারলো না—"পূর্বে সে বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত তনু হইয়া দিনে শতবার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত প্রাণটা রাখা না রাখা নায়কনায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলনা। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।"

স্বগ্রামবাসী সুরেশ মজুমদারকে অনুপমা মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছে। শেষে নির্ধারিত বিয়ে ভেঙ্গে গিয়ে সুরেশের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ললিতমোহনের পুর্ণ-পরিচিতি আমরা জানতে পেরেছি। অনুপমার দাদা চন্দ্রবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ললিতমোহনের জেল হয়েছে অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাহিনী ভিন্নমুখী হ'য়ে উঠেছে। ঘঠনা-বিপর্যয়ে বাগ্দত্তা অনুপমার বিয়ে হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রী রামদুলাল দত্তের সঙ্গে। এখান থেকেই শরৎচন্দ্রের লেখনী ব্যঙ্গানুসরণ ত্যাগ করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে অনুপমার বৈধব্য এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে চন্দ্রবাবুর সংসারে অনুপমার দুঃখবরণ, ক্রমে মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় ক্রোধের প্রকাশ; অবশেষে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা। শেষ পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্রের কবিপ্রাণ অনুপমার ব্যথায় করুণ-রস-পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। দুশ্চরিত্র, মাতাল নামে পরিচিত ললিতমোহন জেল থেকে ফিরে এসে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হয়েছে। তার অকৃত্রিম প্রণয়ে অনুপমা অভিষিক্ত। দুঃখের দাবদাহে অনুপমার উচ্ছ্বাসপ্রবণতা গেছে লুপ্ত হ'য়ে। সত্যকার প্রেমের আস্বাদ পেয়ে ললিতের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়েছে, ললিত অনুপমাকে আশ্বাস দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে—"মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মতো তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখ এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না। ...আমার সঙ্গে চলো।"

—এর ফলে অনুপমার অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। শেষে ললিতমোহনকে সে প্রশ্ন করেছে—"কেন আমাকে বাঁচালে ?" এই সম্বোধনে অনুপমা ললিতের সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্য স্থাপন করেছে। শরৎচন্দ্রের কবিমানসের সত্যকার প্রকাশ ঘটেছে এখানেই। যদিও তিনি পরিষ্কারভাবে এই পর্বে কিছু প্রকাশ করতে তখনও সাহসী হননি (বিধবার প্রেম ও পুনর্বিবাহ!), তবুও অনুপমা এবং ললিতের কথাবার্তা, আকার-ইঙ্গিতে মনে হয় উভয়ের জীবন একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। বিধবা অনুপমাকে গ্রহণ করবার সাহস এবং দৃঢ়তা একমাত্র ললিতের মতো পুরুষেরই আছে। পরবর্তীকালে এ ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, "বিলাসী" গল্পে মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রে।

ললিতমোহনের সঙ্গে অনুপমার মিলন হয়েছিল কিনা এই পর্বে শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানাবার সাহস অর্জন করেননি। বাঙালী সমাজে বিধবার যে মর্মব্যথা শরৎচন্দ্রকে চঞ্চল করেছিল, অনুপমার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটেছে—"বাঙালীর মেয়ে বিধবা হইলে কচিবুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়।" কিংবা—"অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না, বুঝিতে হয়; বাঙালীর ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। অন্যে না বুঝিতেই পারে।" এখানে অনুপমাকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনী আবর্তিত হলেও এবং চন্দ্রবাবু ও তার স্ত্রীর কুটিলতা অনুপমার কাহিনীকে অগ্রগতি দিলেও এখানকার যে দ্বন্দ্ব তা বহিরঙ্গমূলক। তা ছাড়া ছোটগল্পের যে অন্যতম গুণ একমুখীনতা, তা এখানে ব্যাহত হ'য়েছে। কাহিনী শুরু হয়েছে যেভাবে, সমাপ্তি একেবারে তার বিপরীত ধরণে। উপন্যাসের ক্রমপরিণতি এভাবে হতে পারে, ছোটগল্পের মোটেই নয়। বিধবার পুনর্বিবাহ বা বাগ্‌দত্তার বিয়ে না হ'লে একঘরে হবার ভয়—বাঙালী জীবনের সমস্যা সত্য, কিন্তু জমিদারের এ শ্রেণীর "একঘরে" হবার ভয়, অন্ততঃ সে যুগে, খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়না। বরং অন্যকারণ দিলে তা আরও স্বাভাবিক হ'তো।

গল্পের সূত্রপাতে যে বিবৃতি পাই, তা কৃত্রিম এবং সচেতন মনের বিলাস;

শরৎচন্দ্রের সত্যকার কবিমানসের প্রকাশ ঘটেছে, সুরেশের সঙ্গে অনুপমার বিয়ের ব্যর্থতার পর থেকে। ললিতের জন্য অনুপমার অনুকম্পাবোধ, অনুপমার চন্দ্রবাবুর সংসারে নীরব সহিষ্ণুতা, একদিন তার সহ্যের সীমা অতিক্রম ইত্যাদি ঘটনারাজির মধ্যে দিয়ে লেখক অনুপমার ব্যথাতুর হৃদয় চিত্রিত করেছেন। সেখানে তিনি স্রষ্টা, সামাজিক ভালমন্দের বিচার কর্তা নন! এই দু'টি মানস পরবর্তীকালে উপন্যাসগুলির মধ্যে আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম দর্শনেই "অনুপমাকে বাস্তবিকই (ললিত) অতিশয় অধিকরকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এ রকম ভালবাসায় লাভ নেই। সে জানে তো সে মাতাল, অপদার্থ, মূর্খ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে। ...তবে...কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয় সেও বুঝি ভালবাসে। আমাকে কেন বাসিবে না?" প্রণয়ের ব্যর্থতা নিয়ে ললিত আপাতত বিদায় নিলেও তার একনিষ্ঠতার প্রতিদান সে পেয়েছে। অনুপমা এবং ললিত দু'জনেই দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেমের পরিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুপমা আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে ললিতকে স্মরণ করলো। কারণ "সে (ললিত) ভালবাসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল," অনুপমা তখন তাকে করেছিল প্রত্যাখ্যান। কিন্তু আজ ললিত "ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দেশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে।" ললিতের মত আপাত-নিকৃষ্ট চরিত্রের মহনীয়তার দিক একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই অনুপমার হৃদয় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ পরিচয় খুব স্পষ্টভাবে শরৎচন্দ্র না প্রকাশ করলেও আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

চন্দ্রবাবু শরৎ-সাহিত্যে 'পাষণ্ড' (Villain) চরিত্রের অগ্রদূত। "চন্দ্রবাবুর হিংসাপরায়ণ অন্তঃকরণ...যতপ্রকার অধমশ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রবাবু তাহাদের সর্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একতিল দয়া-মায়া নাই, চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্যন্ত নাই।

যদিও রচনাটি নিতান্ত অপরিণত লেখনীর, তবুও কয়েকটি সংলাপ বেশ

উচ্চাঙ্গের হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী মাঝে মাঝে বেশ সরস এবং কবিত্বপুর্ণ; বর্ণনা যেমন মনস্তত্ত্ব-সম্মত, তেমনি রসায়িত। যেমন—অনুপমা আত্মহত্যার পুর্বে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্যে হ'য়েছিল মুগ্ধ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "শেষদিন" অংশের বর্ণনা অত্যন্ত কবিত্বপুর্ণ এবং সার্থক।

"বাল্যস্মৃতি", "দেবদাস" এবং "হরিচরণ"—'বাগান'-খাতার তৃতীয় খণ্ডে একত্রে লিপিবদ্ধ হ'য়েছিল। তিনটি গল্পই শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিদর্শন হ'লেও "দেবদাস" গল্পটি 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' গল্পের পর্যায়ভুক্ত নয়। ছোটগল্পে পূর্ণ জীবনের পর্যালোচনা থাকে না সত্য তবু জীবনের বিশেষ রহস্যপুর্ণ কয়েকটি রূপ লেখকের সংযম-শিল্পের ফলে ছোটগল্পের আঙ্গিকে ধরা পড়ে। 'দেবদাস' এদিক দিয়ে সমস্যাসঙ্কুল জীবনেরই পরিচায়ক। তাই কিছু পরে 'দেবদাস' নিয়ে আলোচনা করবো।

"বাল্যস্মৃতি" রচনাটিতে শরৎচন্দ্রের সার্থক শিল্পবোধ প্রকাশ পায়নি। স্মৃতি-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে গল্পরস পরিবেশন করা হ'য়েছে, ঘটনার বা চরিত্রের সূক্ষ্ম বিকাশ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তখনও পর্যন্ত সচেতন হ'তে পারেননি। তাই "বাল্যস্মৃতি" রচনাটি ছোটগল্পের গঠন-প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেও গল্পাংশ অবিকশিত এবং বৈচিত্র্যহীন।

মেস-বাড়ীতে যাওয়ার পুর্বে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমাকে নিয়ে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত শিথিল এবং বৈচিত্র্যহীন। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার আদর-পুষ্ট বালক সুকুমারের দুর্দান্ত চরিত্র গদাধর ঠাকুরের সান্নিধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই দরিদ্র মিতাচারী বালকটির প্রতি সুকুমারের সহানুভূতি গল্পটির প্রধান উপজীব্য; কারণ বক্তা সুকুমার নিজের স্মৃতি-মন্থন করতে বসেছেন। জীবনে তার এমন একটি অধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল, যার ফলে তার শিশু-মনের ওপর একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। মানব জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে, বিশেষ ক'রে কোমল এবং করুণ ইতিহাসকে মর্যাদাদান করতে শরৎ-সাহিত্য চির-উন্মুখ।

মেস-বাড়ীতে সেজদাদা, গদাধর, রামার বর্ণনা এবং গদাধরের প্রতি স্নেহাধিক্যবশত অকারণ উচ্ছলতা গল্পরসের সৃষ্টি না ক'রে একান্ত উচ্ছ্বাসে পরিণত হ'য়েছে। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেনি। সুকুমার বা গদাধরের কার্যকলাপের যে সকল বৈশিষ্ট্য গল্প-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় ছিল, শরৎচন্দ্র বোধ হয় তাঁর অপরিণত রচনারীতির অপটুত্বের জন্যই সেগুলিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেন নি। গদাধরের প্রতি স্নেহাধিক্যবশত অকারণ উচ্ছলতা যেমন সুকুমারের চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন-সাধনে বাধাদান করেছে, তেমনি গদাধরের চরিত্রকে করেছে অবিকশিত। মাঝে মাঝে কতকগুলি ছোট ছোট ঘটনা, যেমন—চুরির অপরাধে, সেজদাদার প্রিয় টেবিল ল্যাম্পটি ভাঙার মিথ্যে অপবাদে গদাধরের লাঞ্ছনা ও জরিমানা এবং শেষ পর্যন্ত দরিদ্র গদাধরের দেড় টাকা ডাকযোগে পাঠান ইত্যাদির দ্বারা সুলভ Sentiment-কে জাগিয়ে তোলা হয়েছে—কিন্তু গল্পপাঠের পরে হৃদয়ের অজ্ঞাত স্তরে যে অনুরণন পাঠকের মনকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত করে' তোলে, তার সাড়া এখানে সুস্পষ্ট নয়। এই রচনা থেকে শুধু শরৎচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ-সাহিত্যের প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, তিনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সাহিত্যে নায়ককে আরও সাধারণ স্তরে নামাতে চেষ্টা করেছেন। তাই দেখি, প্রথম দিকের রচনায় ভৃত্য রাঁধুনী প্রভৃতি চরিত্র গল্পের প্রধান অংশ অধিকার করেছে। "বাল্যস্মৃতি" গল্পের প্রথম দিকে সুকুমারের মানসিক অবস্থা আমাদের রবীন্দ্রনাথের ফটিক ('ছুটি') চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

"হরিচরণ" গল্পটি যে অত্যন্ত অপটু লেখনী-প্রসূত তা সহজেই বোঝা যায়। শরৎচন্দ্র নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। তবে বাঙালীর স্পর্শকাতর মনকে ব্যথাক্লিষ্ট ক'রে তোলার যে আঙ্গিক তিনি পরবর্তীকালে নিপুণ এবং অনিবার্যভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তার ক্ষীণ ইঙ্গিত এই ছোটগল্পটির মধ্যে পাওয়া যায়। হরিচরণের নীরব, অকুণ্ঠিত সেবাপরায়ণতা, দুর্গাদাস

বাবুর অকারণ ধৈর্যচ্যুতি, এজাতীয় ভুলের জন্য হরিচরণের মতো বহু অসহায় এবং ধৈর্যশীলের প্রতি মনিব-সম্প্রদায় অজ্ঞাতে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেন—তারই করুণ-কাহিনী এ গল্পের রস-সঞ্চারে মনোনীত হ'য়েছিল। মনিব-ভৃত্য সম্পর্কটি সমাজে এমনই যে, ভৃত্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়াও সম্ভ্রমহানির ভয় সূচিত করে। শরৎচন্দ্রের একান্ত সহানুভূতিশীল মন চিরকালই অনাদৃতের প্রতি নিবদ্ধ। তাই হরিচরণকে কেন্দ্র করে' সর্বজনীনভাবে সেবক-সমাজের গোপনতত্ত্ব প্রকাশ করতে তিনি আগ্রহান্বিত হ'য়েছেন। এ জাতীয় রচনায় শরৎ-প্রতিভার দূরাগত পদধ্বনি শোনা গেলেও, আঙ্গিকের দিক দিয়ে এখানে যথেষ্ট শৈথিল্য। তা'ছাড়া হরিচরণের চিত্র ও চরিত্রটি গতানুগতিক; কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও ভৃত্যের নীরব সহনশীলতা এবং আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"হরিচরণ" গল্পটির ভাষা 'গুরুচণ্ডালীদোষে' দুষ্ট। যেমন—"উপরি উক্ত কথা কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও Philosophy নিয়ে deal করা উদ্দেশ্য নহে।" এধরণের দোষ বহু জায়গায় দেখা যায়। অলংকরণ অসঙ্গতভাবে হাস্যকর। যেমন—"ধড়াস্ করিয়া বুকখানা একহাত বসিয়া গেল।"

"বাল্যস্মৃতি", "হরিচরণ" প্রভৃতি গল্পের পাত্রেরা অ[illegible]শ্র ভাল। তাই ভাল-মন্দের কোন দ্বন্দ্ব এখানে নেই। সুতরাং সহজেই এই সব রচনা সমস্যাহীন জীবনের উপরিস্থ অনাবৃত আলোড়নটুকু জানাতেই ব্যস্ত। তা' ছাড়া এই দু'টি গল্পে পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।

আলো ও ছায়া

ছায়ার মায়া আলোরই বিকাশে। আলোর নিত্যসহচরী ছায়া—উভয়ের মধ্যে সহচারিত্বের ভাবলীলা। বিরোধ নেই দু'য়ের মধ্যে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য আছে। উভয়ের উৎসভূমি সেই একই অসীমলোক, বিলীন হয় তারা সেই অসীমেরই

নিশ্চিহ্নতায়। ভুবন-প্রাঙ্গণে আলোর আলিম্পনা ছায়ারই বৈচিত্র্যে। শরৎচন্দ্রের "আলো ও ছায়া" হয়তো এই সূত্রে প্রতীকধর্মী। কিন্তু কাহিনীর নামকরণ-হিসেবে "আলো" ও "ছায়া" যথাক্রমে দু'টি নরনারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বিচার-সাপেক্ষ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। গল্পটির পাত্রপাত্রী যজ্ঞদত্ত ও সুরমার আলাপন ও সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে লেখক নিজেই ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাঠকগোষ্ঠীকে একথা বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন যে, "আলো ও ছায়া"-র সহধর্মিত্ব যজ্ঞদত্ত ও সুরমার জীবনালেখ্যে সংক্রামিত। কাহিনী প্রণয়নে ঐ ধরণের কৈফিয়ৎ জ্ঞাপন লেখকের দায়িত্ব-মুক্তির সহায়ক বটে, কিন্তু তাতে আখ্যান-মাধুর্য নষ্ট হয়। তবে গল্প-রচয়িতা নবীন, লেখনী এখনও তাঁর সাবলীল নয়।

"আলো ও ছায়া" গল্প বিরচনে কাহিনী-শিল্পী শরৎচন্দ্রের দায়িত্ব-স্খালনের প্রবল প্রয়াসটুকু স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে। যজ্ঞদত্ত ও সুরমার কাহিনী অনন্যসাধারণ। নায়ক যজ্ঞদত্তের হৃদয়-সচেতনতা সমাজ-সচেতনতার অনেক উর্ধ্বে। সে সুরমাকে আশ্রয় দিয়েছে অন্তরে। যজ্ঞদত্তের আত্মার 'আলো' ছিল প্রদীপ্ত, সুরমা তাই তার 'ছায়া'-সঙ্গিনী—একেবারে অভিন্ন সত্তা। কিন্তু গল্পের নামকরণ-প্রসঙ্গে আক্ষরিক তাৎপর্য যাই বিবেচিত হোক "আলো ও ছায়া"র অভিন্নত্ব নিয়ে নয়, দ্বন্দ্ব নিয়েই গল্পটির যথার্থ সম্প্রসারণ। যজ্ঞদত্ত-সুরমার সমাজ-অসমর্থিত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে, নবীন শিল্পী শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-মানস যত প্রচেষ্টাই করুক, প্রেমের অচিন্তনীয় রহস্যের "টানা-পোড়েনে" সহজ সম্পর্কের সরণি তাদের ট্র্যাজিক্ রসে পিচ্ছিল হ'য়ে উঠেছিল।

'বাগান' পর্বের গল্পগুলির আঙ্গিক ত্রুটিপূর্ণ; শুধু তাই নয়, ভাষা-সংলাপ-বর্ণনা-উপমা-প্রয়োগ প্রভৃতির দিক দিয়েও শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক প্রচেষ্টার অপটুতা লক্ষ্য করা যায়। তবুও অস্ফুট আভাসে শরৎচন্দ্রের মানস-ভঙ্গীটি সব গল্পগুলির মধ্যেই কম বেশী প্রকাশ পেয়েছে। "আলো ও ছায়া" গল্পটিতেও অপরিণত লেখনীর আড়ষ্ট ভাব সুস্পষ্ট। গল্পের সূত্রপাত অত্যন্ত শিথিল এবং ভাষার মধ্যে 'গুরুচণ্ডালী' দোষের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যেমন—"তা'হ'লে এ

কাহিনী পড়িয়া ফেল।” সংলাপের মধ্যেও এই দোষ দেখা যায়। প্রথম পৃষ্ঠার সংলাপ সাধু ভাষায়, বাকী সংলাপ চলতি ভাষায় লিখিত। উপমা-প্রয়োগ কৃত্রিম এবং চেষ্টা-প্রসূত; স্রষ্টামনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। মাঝে মাঝে বাণী আছে, বক্তৃতা আছে, তাতে সৃষ্টি-ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে ক্ষুণ্ণ। তবুও কাহিনীর দিক্ দিয়ে “আলো ও ছায়া” “বোঝা” অপেক্ষা উন্নত। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত যেন “পথ নির্দেশ” গল্পের হেম ও গুণিনের পূর্বাভাস। তা ছাড়া যজ্ঞদত্তের রাঁধুনী-মেয়েকে বিবাহ এবং সমাজ-রীতির প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ আমাদের “চন্দ্রনাথ” গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিধবাকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালী সমাজের সমস্যা চিরকালের। চিরকালের এই সমস্যাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে বাঙালীর চিরাচরিত ধারণায় প্রথম আঘাত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক “অতি আচারে”র ফলে (ঠিক অনাচার বলা যায় না!), বিশেষ ক'রে আমাদের এই বাঙলাদেশে অনূঢ়া ও পতিহীনাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তীক্ষ্ণধী শাস্ত্রকারগণ তখন নিত্য-নূতন বিধিনিষেধের গণ্ডীতে এই সব দুর্ভাগিনীদের একটি শ্রেণীগত আখ্যায় ভূষিত করতে তৎপর হ'য়ে ওঠেন। যারা 'বিধবা', নারী-প্রকৃতির সহজ বিকাশ তাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। বিধবা-পদ-বাচ্যাদের দুর্গতির সমর্থনে অথবা অসমর্থনেই হোক (বিচিত্র মতবাদের ভিত্তিতে) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার প্রথম প্রাণবান চিত্রলিপির প্রকাশ। এই ধারাটির বিচিত্র অনুবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে। কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, বিনোদিনী, রমা, সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতি বৈধব্য-পীড়িতাদের জীবনালেখ্য-পরিচিতির শাশ্বত সত্যটুকু এই, নারীর প্রেমধর্ম তার সর্ব-লাঞ্ছিত জীবনেও অপ্রতিহত-ভাবে সমুজ্জ্বল। এই প্রেম অবস্থা-বিশেষে হয়তো মোহগ্রস্ত, কিন্তু মঙ্গল ও ত্যাগের পথ এখানে রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি। জীবনে যেখানে অকৃতার্থ-প্রেমের অভিযান, সেখানেই সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অভিশাপ। বিধবার প্রেম শত বাধায়

বিপর্যস্ত ; সমস্যাভারে তার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন আন্দোলিত। দ্বন্দ্ব এবং অভিশাপের ফলভোগিনী নারীর ব্যক্তি-চেতনার কখনো বিদ্রোহ, কখনও নতি-স্বীকার। বঙ্কিম-উপন্যাসে বিধবার পরিণাম যেভাবেই দেখা দিক না কেন, তাদের প্রীতিস্নিগ্ধ রূপের প্রতি তাঁর শিল্পীমানস অজ্ঞাতে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছে।

শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে বিধবা-সমস্যার বিভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারী-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ নিয়ে তারা আবির্ভূত। কিন্তু সমাজ তাদের সে মূল্য স্বীকার করে না ; অথচ "সর্বব্যাপী" যে প্রেম তার গতিই বা রোধ করবে কে ? শরৎচন্দ্র আমাদের আর একটি নূতন কথা জানালেন যে সমাজ শুধু বাইরের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করেছে। নারী নিজেই তার অন্তরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে বসে আছে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য তার একান্ত প্রার্থিত ; কিন্তু ভয় হয়, পাছে তার বিশুদ্ধি ও গাঢ়তা নষ্ট হয়। নারী-প্রকৃতির এ পরিচয় শুধু বিধবার প্রসঙ্গে কেন, নারী-জাতির স্বভাব-ধর্মে এর অনুশীলন ঘটেছে।

'আলো ও ছায়া' গল্পের নায়িকা সুরমা বিধবা, অনাথা এবং যজ্ঞদত্তের আশ্রিতা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একমাত্র আশ্রিতা-আশ্রয়দাতা সম্পর্ক নয়। যজ্ঞদত্তের একমাত্র অবলম্বন এবং সুখদুঃখের সহচরী সুরমা। সুরমার কতৃত্বপরায়ণতার কাছে সে সানন্দে আত্মসমর্পণ করেছে। এখানে শরৎচন্দ্র পাঠকের সন্দেহকে অতিক্রম করতে গিয়ে বলেছেন—"নিশ্চয়ই তুমি চোখ রাঙ্গাইবে, তবে কি অবৈধ প্রণয় ? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা।" তবে তাদের নিরুপদ্রব জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল কেন ? মানব-জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘটন দৈবাধীন নয়, ব্যক্তি-প্রকৃতির অধীন। সুরমা ভেবেছে সে যজ্ঞদত্তের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করতে চলেছে, দাম্পত্য-জীবনের সুখলাভে যজ্ঞদত্ত হয়েছে বঞ্চিত। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সে যজ্ঞদত্তকে বারে বারে উত্যক্ত করেছে। নিজের প্রসঙ্গে তার একমাত্র কৈফিয়ৎ—"ছিঃ বিধবার কি বিয়ে হয় ?" সুরমা জানে, যজ্ঞদত্তের ওপর তার নিরবচ্ছিন্ন অধিকারে তনুনের

আধিপত্য স্বীকার করা নিতান্তই অসহনীয়। মুখে সে বলে—"আমি কি তেমনি অধম যে হিংসে করব?...আমি রাজা রাজাই থাক্‌বো, শুধু একটি মন্ত্রী বাহাল কর্‌ব..."। সুরমার স্ব-প্রাধান্য রক্ষার একান্ত প্রয়াস লক্ষণীয়। তার স্বার্থগন্ধী এই মনোভাবে উদারতার পরিচয় কম। মনে হয় সমাজ-নিন্দার ভয়েই সে গৃহে "একটি মাটির পুতুল" প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 'বিশ্বের কলঙ্ক' থেকে যজ্ঞদত্তকে মুক্ত করবার এই প্রচেষ্টায় সুরমা যজ্ঞদত্তের চোখে মহীয়সী।

শরৎচন্দ্র এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে পুরুষ ও নারী-প্রকৃতির বিপরীতমুখিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। "দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সহিবে।"—সুরমার এই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যজ্ঞদত্তের বিবাহের সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়েছে। যজ্ঞদত্ত যে অবশেষে সত্যিই একটি অপাংক্তেয় নিঃসহায়া মেয়েকে বধূরূপে বরণ করবে—একথা ভেবে সুরমার বিস্ময় ও দুঃখের অন্ত নেই। কিন্তু কেন? সে নিজেই তো যজ্ঞদত্তের বিবাহের একমাত্র উদ্যোক্তী। কর্তব্যবোধ ও সমাজ-নিষ্ঠার তাগিদে সুরমা যজ্ঞদত্তের বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বটে, কল্পনার অতিরঞ্জন, বাস্তবে নিষ্ঠুর সত্য হ'য়ে দেখা দিতেই তার বিহ্বলতা উপস্থিত হয়েছে—"ছেলেমানুষটির মত মাথা হেলাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল—"তবে বলেছিলাম —!" যজ্ঞদত্তের আকস্মিক পাত্রীপছন্দ এবং বিবাহে সম্মতিতে সুরমা অভিনন্দনের ভাষা খুঁজে পায়নি। নারী-চিত্তের এই দোলাচল বৃত্তি থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আমরা দেখেছি, সুরমা অকস্মাৎ সঙ্কোচে, দুঃখে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে। যে জন্য তার ঔদার্য এবং নিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ জাগা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। নারী-প্রকৃতির স্বরূপ অনুসন্ধানেই সুরমার মনের দ্বিধাসঙ্কুল অবস্থার কথা শরৎচন্দ্র আমাদের আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে যজ্ঞদত্ত বিবাহে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সহনশীলা ধরিত্রীর মত সুরমা দৃঢ়ভাবে তার নিশ্চিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, যজ্ঞদত্তের সঙ্কল্প ভঙ্গ করতে সে দ্বিধামুক্ত। নিজের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের কথা ভেবে যজ্ঞদত্তের কাছে

আত্ম-মহিমা ক্ষুণ্ণ করেনি।

এদিকে যজ্ঞদত্ত একেবারে নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিকার মানুষ। সুরমার প্রতি তার স্নেহ-মমতা-ভালবাসার কোনও কার্পণ্য নেই। তাই স্বচ্ছন্দ-বিহারী মনে দ্বিধা-সঙ্কোচেরও বালাই নেই। চিন্তা এবং কর্মে তার প্রকাশ সমতালে তাকে মুক্তগতি দান করেছে। সুরমার সাহচর্যে যজ্ঞদত্ত কখনও একাকিত্ব অনুভব করেনি। শেষ পর্যন্ত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে সুপ্রকট হয়েছে সুরমার সাথী-নির্বাচনের জন্যই। সমাজ-সৃষ্ট নিন্দা-প্রশংসার মর্যাদা তার কাছে নিতান্ত নগণ্য, তা না হ'লে সুরমার চিরজীবনের দায়িত্ব সে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারতো না। তাই যারা তাকে "বয়াটে ছেলে" ব'লে জেনেছে বা সমালোচনা করেছে, তারা তার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পায়নি। যজ্ঞদত্তের মত চরিত্রবান ও উদার যুবক সংসারে দু'একটিই মেলে, যারা নৈতিক ভীরুতাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ ক'রে জীবন-নীতির শাশ্বত সত্যকেই স্বীকার করতে ভালবাসে। যজ্ঞদত্ত যে মমত্ববোধে সুরমাকে তার বিরাট পৌরুষের অন্তরালে স্থান দিয়েছে, প্রতুলকুমারীর ক্ষেত্রে সেই সহানুভূতিই বহুলাংশে কার্যকরী হয়েছে। "সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে (যজ্ঞদত্ত) দেখিতে পাইয়াছিল…"। সুতরাং পাত্রী পছন্দ করা এবং সেই সঙ্গে বিবাহের দিন ঠিক করা, কোন কাজেই যজ্ঞদত্তের অযথা বিলম্ব ঘটেনি। সে জানে তার বিবাহে সুরমা খুশী—এর চেয়ে বেশী জান্‌বার বা ভাববার তার প্রয়োজন নেই। আবার যখন "দু'দিন পরে…অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুরো এ বিয়ে দিও না, দিদি।" যজ্ঞদত্তের মনে প্রথম সংশয় এবং দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয় সুরমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে। তবুও সে কোনও সূত্র খুঁজে পায় না, যার সাহায্যে সে সুরমার মনোভাব এবং তার বিবাহের মধ্যে একটা সহজ মীমাংসা স্থাপন করতে পারে। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে নারী-প্রকৃতির পার্থক্য। যেখানে যজ্ঞদত্তের দৃষ্টি 'ঝাপসা' হ'য়ে আসে, সেখানেই সুরমার অনুভূতি আরও দ্বন্দ্বপ্রবণ হ'য়ে তীক্ষ্ণতা লাভ করে। যজ্ঞদত্ত 'বিবাহ'-'নববধূ'-'গৃহজীবন'-কে

যত সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে, সুরমা ততই নিজেকে জটিলতর ক'রে দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করতে চেয়েছে। এমনি ভাবেই সুরমার ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের স্পর্শে যজ্ঞদত্তের মন হয়েছে চঞ্চল।

সুরমা ও যজ্ঞদত্তের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে বিবাহের প্রস্তাবনা এবং সুসম্পন্ন হ'য়ে যাবার পর। এর পরবর্তী ইতিহাস কাহিনীগতভাবে যত দ্রুত পরিণামশীল, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা-কল্পে ততই তা মনোজ্ঞ। বিবাহকালীন সময়টা যজ্ঞদত্ত ও সুরমার কেমন যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। সুরমার পক্ষ থেকে নূতনতর ব্যবহারের পরিচয়ে যজ্ঞদত্তের "কেবলি মনে হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।" তার স্বভাব-সিদ্ধ সক্রিয়তা নিয়ে তখনই সুরমার মানসিক ভার লঘু করতে সচেষ্ট হয়েছে। সে স্বচ্ছন্দে প্রতুলকুমারীকে তাদের দু'জনের মাঝখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে একেবারে বর্ধমানে (পিসীর বাড়ী)। এজন্য কৈফিয়ৎ দিতেও তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সুরমার প্রাণপণ আত্মদমন কাহিনীকে গতিহীন করেছে এবং যজ্ঞদত্তের বিপুল কর্মপ্রবণতার কাহিনী পৌঁচেছে চরম পরিণতি অভিমুখে।

যজ্ঞদত্ত যত সহজে তাদের নবাবিষ্কৃত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে, ততই সমস্যা হ'য়ে উঠেছে জটিলতর। এই জটিলতা ছিন্ন ক'[illegible] আত্মপ্রকাশ করেছে নববধূ প্রতুলের প্রকৃতি-রহস্য। এই ভীরু, অসহায় মেয়েটিকে দয়ার্দ্রচিত্তে গ্রহণ ক'রে যজ্ঞদত্ত দুঃখীর দুঃখ দূর করেছে, সুরমা করেছে খেলা। পাঁচজনের কাছেও সে একান্তই নগণ্য। কিন্তু "দুই-চারি দিনেই পিসীমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সবাই গর্ভে ধরেনা।" ভাগ্যের অনির্দেশ্য পরিচালনায় নববধূ ফিরে এসেছে স্ব-গৃহে, যদিও অতি সঙ্কোচের সঙ্গে। প্রতুলকুমারীর চরিত্রে "অরক্ষণীয়া" গল্পের জ্ঞানদার আভাস সূচিত হয়েছে। এজাতীয়া মেয়েদের পৃথিবীতে দাবি জানাবার সাহস নেই, অধিকার-স্থাপনার ক্ষমতা নেই। এদের মনের খবর কেউ রাখে না, সুখ-দুঃখের মধ্যেও এদের কোনও ভাবান্তর কারুর চোখে পড়ে না। এমনই সহিষ্ণু, স্বল্পভাষী, কর্মঠ,

সেবাপরায়ণা ও কৃতজ্ঞ হ'য়ে এরা নিজের সত্তাকে বিসর্জন দেয়। এই অতি-সরল মেয়েটি সুরমা-যজ্ঞদত্তের মাঝখানে তুলে দিয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তারা কিছুতেই সহজভাবে আগের মত মেলামেশা করতে পারে না। একটি অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের উপসংহারে পৌঁছে যেন অনুশোচনার গ্লানি থেকে এরা মুক্ত হ'তে চায়। গল্পের মধ্যে প্রতুলের প্রত্যক্ষ প্রাধান্য খুবই কম। তার স্বতঃসিদ্ধ আত্মগোপন করার মধ্যে দিয়ে সে আরও গভীরভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

পিসিমার মৃত্যুর পর যজ্ঞদত্ত নূতন ক'রে সুরমা এবং নববধূকে নিয়ে গৃহে সমস্যার অবতারণা করলো। সুরমা এবং প্রতুলের মধ্যে সখিত্ব জন্মেছে স্বাভাবিক ভাবেই, সেখানে কোনও প্রকার নীচতা বা ঈর্ষার বীজ উভয়ে মনে মনে পোষণ করেনি। এর আর একটি প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে যজ্ঞদত্তের সহধর্মিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা একদিকে যেমন নববধূ কোনদিনই করেনি, অন্যদিকে সুরমা যজ্ঞদত্তের স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্যে নিজেকেই দোষী মনে করেছে।

অবশেষে একদিন সুরমা ও যজ্ঞদত্তের মধ্যে আকস্মিক বচসার সূত্রপাত হলো। তার ফলে একদিকে অনন্যোপায় যজ্ঞদত্তের অনিচ্ছাকৃত "প্রতারণার" স্বরূপ প্রকাশ, অন্যদিকে সুরমার প্রচণ্ড আত্মগ্লানির বিস্ফোরণ। "অনেকখানি সত্য তাহার (প্রতুলকুমারী) মাথার ভিতর সূর্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল; তাহারও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, চক্ষের বাহিরে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছিল···"—নববধূর এইভাবে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ। স্বামী ও তার একান্ত স্নেহভাজনের প্রতি প্রতুলকুমারীর কোনও বিদ্বেষ জাগেনি, কোনও অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেনি। অতি-অনাদৃতভাবে সে একদিন যজ্ঞদত্তের বিবাহিতা পত্নীরূপে এই গৃহে এসেছিল। কিন্তু অনন্তের বাসরঘরের উদ্দেশ্যে যখন সে যাত্রা করলো, যজ্ঞদত্তকে ক্ষমা চাইবারও সুযোগ দিয়ে গেলনা এবং সুরমাকে দিয়ে গেল কঠিন শাস্তি—"সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।"

যজ্ঞদত্ত ও সুরমার জীবনে সুরু হলো প্রায়শ্চিত্ত। নিদারুণ দাহ সহ্য করবার জন্য সুরমা পড়ে রইল গৃহকোণে, আর যজ্ঞদত্ত হলো বিরাগী। তার এই বৈরাগ্য কি জীবনের প্রতি না ঔদাসীন্য শুধু সুরমার প্রতি? বিবাহ থেকে আরম্ভ ক'রে নববধূর সঙ্গে তার ব্যবহার কোনটাই তার ইচ্ছাকৃত নয়, অথচ সুরমার মনের শান্তি বিধানার্থে সে মিথ্যার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল। সুরমার প্রচণ্ড অভিমান তাকে অনেক সময়ে মাত্রাজ্ঞানচ্যুত করেছে। "দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া আসিতেছে।" আলো ম্রিয়মান, তাই ছায়াও বিলীয়মান।

মন্দির

"মন্দির" গল্পটিকে বহু সাহিত্যবিশারদ শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু গল্পটি যে শরৎচন্দ্রের প্রথম সৃষ্টির নিদর্শন নয়, তা "বাগান" খাতার প্রামাণ্য পরিচয় থেকেই জানা গিয়েছে। "মন্দির" গল্পটি "কুন্তলীন পুরস্কার"-প্রাপ্ত শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা; যদিও গল্পটি তিনি নিজ নামে প্রকাশ করেননি। এ থেকে আমরা এই ধারণায় উপনীত হ'তে পারি যে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ-উপরোধের জন্যই তিনি তাঁর প্রথম রেঙ্গুন যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে এই গল্পটি রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রথমবার ব্রহ্মদেশে যাত্রার কাল এবং "মন্দির" গল্পের মুদ্রণকাল ১৯০৩ সাল। ঐ সময় থেকেই শরৎচন্দ্র "গল্প-রচনা অ-কেজো কাজ মনে" ক'রে "সাহিত্য-সাধনা থেকে অবসর গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তারপর "আঠার বছর" অতিক্রান্ত হয়েছে। ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র পুনরায় তাঁর হিতৈষীদের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, "মন্দির" রচনাটি দিয়েই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের "উদ্বোধন পর্বে" সমাপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে।

"মন্দির" গল্পের রচনা-শিল্পের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমেই শরৎচন্দ্রের দিক্ থেকে কৈফিয়ৎটুকু দিয়ে রাখা ভাল; কারণ আমরা জানি তাঁর ১৯০৩ সালের পুর্ববর্তী রচনাগুলির জন্ত কুণ্ঠার অবধি ছিল না। ২৬-২৭ বছর বয়সের রচনা "মন্দির" গল্পের আঙ্গিক কতকাংশে ত্রুটিবহুল সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত এবং মুদ্রিত হয়েছিল বলেই পুনরায় সংস্কার-সাধনের সুযোগ শরৎচন্দ্র পাননি। পুরস্কার-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন গল্পটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-মানসটি "উদ্বোধন পর্বে"র যে যে গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ প্রবণতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, "মন্দির" গল্পটি তার মধ্যে অন্যতম। গল্পটির প্লট-নির্বাচন যথেষ্ট অভিনব এবং চরিত্র-বিন্যাসও শরৎচন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ শিল্পধর্মের অনুগামী। ত্রুটি-বিচ্যুতি যা দেখা দিয়েছে তা বেশীরভাগই আঙ্গিক-পারিপাট্যের অভাবে। এই গল্পটিতে শরৎচন্দ্র যে কায়স্থ জমিদারের ঐশ্বর্য এবং সুদৃশ্য দেবালয়ের বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর স্ব-গ্রামের মুন্সী-জমিদারদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্যে তিনি এই জমিদার-পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন এবং সময় সময় তাঁদের কুল-পুরোহিতের কাজও খুসী মনে সম্পন্ন করতেন।

"মন্দির" গল্পের মূল বিষয়বস্তু একটি নয়, দু'টি কাহিনীর সমন্বয়-জাত। দু'টি কাহিনীতে বিচ্ছিন্নভাবে একটি কিশোরীর জীবনের দু'টি অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। অপর্ণা-অমরনাথ এবং অপর্ণা-শক্তিনাথ সম্পর্কিত কাহিনী এই গল্পের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে বিবৃত হয়েছে। এর ফলে ছোটগল্পের নির্দিষ্ট গতির যেমন দিক্-বিভ্রম ঘটেছে, তেমনি ছোটগল্পের রীতি বিরুদ্ধ কাহিনী-সংগঠনও লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী দু'টির সম-বিস্তৃতির দিক্ দিয়ে পর্যালোচনা ক'রে মনে হয়, শরৎচন্দ্র "দেলখোসে"র চমৎকারিত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্তই জীবনের দু'টি বিপরীতমুখী চিত্র অঙ্কিত করেছেন। ছোটগল্পে একটি কাহিনীই সাধারণত জীবনের একটি বিশেষ আকস্মিক মুহূর্তের বাহন হয়ে দীপ্তিমান হয়—পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত অবতারণা

ঘটে অনিবার্যভাবে। 'মন্দির' গল্পের কাহিনী-চিত্রণের মধ্যে দিয়ে নায়িকা অপর্ণাকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে হয়, কারণ তাকেই আমরা পুর্বাপর গল্পের মধ্যে উপস্থিত দেখেছি। কিন্তু কাহিনীর আরম্ভ' শক্তিনাথের পরিচিতি দিয়ে; অথচ শক্তিনাথের প্রয়োজন গল্পের শেষার্ধে কাহিনীতে প্রথম অনুভূত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মানসিক-ধর্ম গল্পের প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্থাপন ক'রে থাকলেও শিল্পনির্দেশে তা ছোটগল্পের আঙ্গিক-সম্মত নয়, উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত।

গল্পের অবয়বটি লেখক তেরটি পরিচ্ছেদের অনুশাসনে গ্রন্থন করেছেন। তবে পরিচ্ছেদগুলির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য নয়। অর্পণা-শক্তিনাথের প্রথম সান্নিধ্য-স্থল দশম পরিচ্ছেদ, যেখানে শক্তিনাথ অর্পণার মদনমোহনের পরিচর্যায় নিযুক্ত। এই বিশেষ পরিচ্ছেদটির পুর্ববর্তী নয়টি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শক্তিনাথের চারিত্রিক প্রবণতার কথা, তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-প্রণালী ব্যাখ্যার দ্বারা পরিস্ফুট করা হয়েছে। তারপর সাতটি পরিচ্ছেদে শক্তিনাথের আর কোন উল্লেখ নেই। ছোট গল্পের আঙ্গিক শিল্পায়নে এজাতীয় বিকেন্দ্রিকরণ এবং দু'তিনটি কাহিনীর সমান প্রাধান্য ত্রুটিপুর্ণ এবং সংজ্ঞা-বহির্ভূত।

অর্পণার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয়ের বিস্তৃত বিবরণ এবং আপনার বৈধব্য বরণের সঙ্গে অর্পণা-শক্তিনাথ সম্পর্কিত ঘটনার কোনও অনিবার্য যোগ নেই। মদনমোহনের মন্দির অর্পণার বিবাহিত জীবনেও তার সমস্ত মনকে প্রভাবান্বিত ক'রে রেখেছিল। তার ফলে অর্পণার সাংসারিক ঔদাসীন্য ও স্বামীর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত দ্বন্দ্বের চিত্রটি বেশ বিস্তৃতভাবে "মন্দির" গল্পের প্রথমাংশ অধিকার করেছে। অমরনাথের জীবনে অর্পণাকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে ট্র্যাজিডি এবং অমরনাথের মৃত্যুতে তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। অর্পণার হৃদয় এখানে নিস্পন্দ। "মন্দির" গল্পের উপসংহারে যেভাবে কাহিনীর সমাপ্তি, সেখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য ক'রে দুটি অপরিণত এবং অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরীর জীবন-মঞ্চে ক্ষুদ্র অথচ গভীর ট্র্যাজিডির রস সঞ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে

"মন্দির" গল্পের সুরভিত উপচার অর্পণা এবং শক্তিনাথকে কেন্দ্র ক'রেই গল্পের মুখ্য রস-সঞ্চারে প্রবৃত্ত। অর্পণা ও শক্তিনাথের পরস্পরের প্রতি অজ্ঞাত আকর্ষণ মানব-জীবনের এক সমাধানহীন বেদনাপূর্ণ ছন্দের প্রতিলিপি।

অমরনাথের মৃত্যুতে হতবাক্ অর্পণা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে। শক্তিনাথের মৃত্যুতে অর্পণা অভিভূত—ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সুপ্ত অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশে শক্তিনাথের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের কাছে অর্পণা আত্মসমর্পণ করেছে। অর্পণা বেঁচে রইলো চির-বিচ্ছেদের দুঃখ যাপনের জন্য। সে নারী-ধর্মকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রেম-স্বরূপা নারী ভাল না বেসে পারে না। তাই তার মনোজগতের সত্যকার জাগরণে তার অন্তরসত্তা না-পাওয়ার বেদনায় দগ্ধ হয়েছে। সে বিধবা, জমিদার কন্যা—এ মর্যাদা ভুলতে পারছে কই? তা ছাড়া শক্তিনাথের প্রতি আকর্ষণকে সে প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেনি।

শক্তিনাথের মৃত্যু, অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে। তার উদাসীন-জীবনের শৃঙ্খল অপর্ণাই। সে-ই শক্তিনাথের জীবনে এনেছে ট্র্যাজিডি; নিজ-মনের জাগরণে অপর্ণা আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো, শিশি দু'টো খুঁজে বের করলো ফুলের গাদা থেকে। প্রত্যাখ্যাত শক্তিনাথ তারই জন্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ঠাকুরের কাছে তাই সে প্রথমবার এবং শেষবারের মতো শক্তিনাথের দান উৎসর্গ করলো; কারণ শক্তিনাথকে সে পাবে কোথায়? তাকে তো হৃদয়ের গোপন-ব্যথা জানান হলো না! অপর্ণার এই বোধ প্রেম থেকেই জাত। এই ট্র্যাজিডির স্বরূপ পরবর্তীকালে আরও অন্তর্মুখী ও পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অপর্ণা-শক্তিনাথের কাহিনীই এই গল্পের মুখ্য বিষয়বস্তু, যেজন্য শরৎচন্দ্র অমরনাথের মৃত্যুতে অপর্ণাকে সহজভাবেই ফিরিয়ে এনেছেন মদনমোহনের আশ্রয়ে। নারী-সুলভ কোনও ব্যাকুলতার অবকাশই এখানে ঘটেনি। পাঠক কিন্তু এখানে কৈফিয়ৎ দাবি না করেই মেনে নেয়, অপর্ণা তার স্বামীকে কোনদিনই ভালবাসেনি। ছোটগল্পের পাঠককে এটুকু জেনেই

তৃপ্ত থাক্‌তে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র অমরনাথের সান্নিধ্যে অপর্ণাকে নিয়ে এত বিস্তৃত ঘটনার অবতারণা করেছেন যে তৃতীয় থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাঠককে সুদীর্ঘকাল অপর্ণার বিবাহিত জীবনের কাহিনী শুন্‌তে হয়েছে। গল্পের গতি যে কোন্ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, তার সঠিক নির্দেশ পাওয়া এই গল্পে সম্ভব নয়। লেখক ধীরে ধীরে পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেও তা সার্থক হয়নি। এ জন্যই আমাদের প্রতি পদে মনে হয়েছে অপর্ণা-অমরনাথের বিবরণ এত বিস্তৃতভাবে না দেখিয়ে শুধু ট্র্যাজিডির সূত্রটুকু জানিয়ে দিলেই চলতো। আমাদের কাছে দুটি চিত্র পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অনুভূত হয়েছে। আঙ্গিকের অসঙ্গতি গল্পরস-সৃজনে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বিবাহের পূর্বে অপর্ণার সঙ্গে শক্তিনাথের কোন পরিচয় ছিলনা। মদনমোহনের আকর্ষণই তখন অপর্ণার জীবনে একমাত্র সত্য। তাই স্বামী অমরনাথের সাগ্রহ ভালবাসা অথবা অভিমানপ্রসূত ঔদাসীন্য কিছুতেই অপর্ণার চিত্ত বিচলিত হয়নি। একটি চির-বৈরাগিণীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে সে তার কৈশোর থেকেই কাহিনীতে পরিচিত। অপর্ণার নির্লিপ্ততা একসময়ে অমরনাথের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে নারী-প্রকৃতির এই কাঠিন্য আমরা কখনই প্রাধান্য পেতে দেখিনি। তা ছাড়া এই অপর্ণাকেই তো শক্তিনাথের জন্য দেখেছি পরবর্তী অধ্যায়ে বিচলিত হতে। স্বামীর মৃত্যু তাকে যেন মুক্তি দিয়েছে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে। আশৈশব একমাত্র ধ্যানের বস্তু মদনমোহন রক্তমাংসের অনুভূতিশীল মানুষ অপেক্ষাও অপর্ণার কাছে অনেক বেশী প্রাণবান। কল্পনায় অপর্ণা মাটির ঠাকুরের সজীবত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। কৈশোরেই প্রাজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে নিজ বৈধব্যের অনুশোচনা থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কাহিনীতে অপর্ণার জীবনের এ অধ্যায়টি এত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না ক'রে কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করলে শক্তিনাথ-অপর্ণা সম্পর্কিত ঘটনার গুরুত্ব একটু স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হ'তো। অপর্ণার বৈধব্য-পূর্ব জীবনের সঙ্গে যখন পরবর্তী জীবনের ঘটনাগত সম্পর্ক নেই, তখন একটি ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

একদিকে যেমন অমরনাথের প্রেমকে অপর্ণা উপেক্ষা করেছে, অন্যদিকে শক্তিনাথকেও দিয়েছে কঠিন আঘাত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতেও তার জীবনে অনুশোচনা কোনও গভীর আন্দোলন সূচিত করেনি; অথচ শক্তিনাথের ভালবাসার দান তার পরমারাধ্য ঠাকুরের কাছে অর্পণ ক'রে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। কাশীনাথের মতো শক্তিনাথও যেন প্রকৃতির শিশু, উদাসীন-নির্লিপ্ত। সে শিল্পী। তাই বোধ হয় অপর্ণারও আগ্রহের অন্ত নেই, শক্তিনাথকে চিরদিনের জন্য বন্ধন-গ্রস্ত ক'রতে। কিন্তু অপর্ণার আপাত-সংযমে অন্তরের এই আকুলতা কোনদিনই তার ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি।

শক্তিনাথের প্রকৃতি যেমন অপর্ণাকে কাছে টেনেছে, অমরনাথের সদা-ব্যাকুল পত্নী-প্রেম অপর্ণাকে তেমনি স্বামীর সঙ্গে মিল্‌তে দেয়নি। শক্তিনাথ চরিত্রটি "বড়দিদি" গল্পের সুরেন্দ্রনাথ-গোত্রীয়। মাধবীর মত অপর্ণাও দিয়েছিল শক্তিনাথকে তাড়িয়ে। এখানে শক্তিনাথের হলো মৃত্যু, "বড়দিদি"-র সুরেন্দ্রনাথ পড়্‌লো গাড়ী-চাপা। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় অনাথ, অসহায়ের প্রতি প্রবল সহানুভূতি। সেখানেই তাঁর নারী-চরিত্রগুলি সমস্ত হৃদয় নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। সেইসব পুরুষ চরিত্রই জয় করেছে নারীর হৃদয়। এখানেও দেখি যে নারী স্বামীকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে, তার নারীপ্রকৃতিকে জাগিয়েছে শক্তিনাথ। তবে এক্ষেত্রে অমরনাথ নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য লেখকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পেয়েছে।

শক্তিনাথের দিক্ থেকে যেটুকু আকর্ষণের পরিচয় পাই, তা সামান্য। তার বউদি যখন তাকে "দেলখোস্" দিলো, সে পুলকিত হ'য়ে উঠলো অপর্ণাকে দেবার আনন্দে। তার এ আকর্ষণ অবচেতন মনের। সে জান্‌তে চায়না এর পরিণতি, বোঝেনা গভীরতা। তার কাছে অপর্ণার প্রতি এ আকর্ষণের কোনও সংজ্ঞা-নির্ধারিতবোধ নেই।

পুরুষ-প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিরন্তন লীলা-বৈচিত্র্য "মন্দির" গল্পে অপর্ণা-শক্তিনাথ এবং অমরনাথের চরিত্রকে ভিত্তি ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে ছোটগল্পের আঙ্গিকে তা হয়েছে ব্যর্থ। এখানকার

প্রকাশভঙ্গী পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত হ'লেও, ভাষার মধ্যে 'গুরুচণ্ডালীদোষ' দেখা যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এখানেও নায়করূপে পরিকল্পিত হয়েছে। উপমা-প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সমগ্র রচনাটিতে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের সূত্রপাতে অপর্ণার শ্বশুরবাড়ী গমনের সংবাদে তার মানসিক অবস্থা বর্ণনার উপমা-প্রয়োগ লক্ষণীয়। অসংলগ্নতা, সামঞ্জস্যহীনতা অপরিণত গ্রন্থন-শিল্পের অপটুত্বে উপন্যাস-ধর্মী প্লটটি আত্ম-সঙ্কোচন করে' ছোটগল্পের মাধ্যমে পুরস্কার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র।

(৩)

ছবি

"কোরেল গ্রাম" অথবা "ছবি" নামের সার্থকতা

"কোরেল" বা "কোরেল গ্রাম" গল্পটি শরৎচন্দ্রের "বাগান" খাতার দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। এই রচনাটি ১৮৯৩ সালের ২৯শে আগষ্ট থেকে ১৯০০ সালের ৩রা আগষ্ট মাসের মধ্যে রচিত। কিন্তু নাতিদীর্ঘ এই রচনাটির আবির্ভাবকাল এত সুদীর্ঘ সময় নিয়ে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে স্বভাবতই আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতূহল দেখা দিতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই সুদীর্ঘ সময়ে শরৎচন্দ্রের অপরিণত লেখনীর সব ক'টি রচনাই আত্মপ্রকাশ করেছিলো। "কোরেল" রচনাটির কাহিনী-নির্বাচন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেই হয়তো 'বড়দিদি' 'চন্দ্রনাথ' "কোরেলে"-র পরবর্তী রচনা হ'য়েও আগে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া "কোরেল" রচনাটি নাকি এক সময়ে হারিয়েও যায়।

শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সমসাময়িক ব্যক্তিদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে অর্থাৎ সাহিত্য-সাধনার উদ্বোধন পর্বে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজী উপন্যাস পাঠ করতেন। সুতরাং এই সময়কার

রচনায় ইংরেজী উপন্যাসের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিদেশী গল্পের প্রভাব শরৎচন্দ্রের কোনও রচনাতেই পরিলক্ষিত হয় না। "কোরেল" রচনাকালে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ "বিলিতি পাত্র-পাত্রী" নিয়ে অথচ "অরিজিন্যাল" ভাবেই কোরেলের কাহিনী পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। "বিলিতি" বল্‌তে আমরা সাধারণত পাশ্চাত্য দেশকে বুঝে থাকি। কিন্তু "কোরেলে"র পরবর্তী নামকরণ যদি "ছবি" হ'য়ে থাকে, তবে "ছবি"-র পটভূমিকা ব্রহ্মদেশ এবং কাহিনীর পাত্রপাত্রীরাও সেই দেশীয়। একথাও ঠিক সাহিত্য সাধনা-কালে শরৎচন্দ্রের বিচরণ স্থান ছিল ব্রহ্মদেশ এবং বঙ্গদেশ। "কোরেলে"-র কাহিনীভাগ বিলিতি গল্পের ছায়াপ্রসূত, পটভূমিকা ব্রহ্মদেশীয় অথচ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর অন্তঃপ্রকৃতি বা প্রবণতা ভারতীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "কোরেল" রচনাকে "ছবি" রূপে পাঠক-সমাজে প্রকাশ করার আগে শরৎচন্দ্র যে সুদীর্ঘ সময় নীরব ছিলেন, তার প্রয়োজন ছিল। "অভিমান" (হেনরী উডের "ইষ্টলিনে"র ছায়া-বলম্বনে রচিত) নামে উপন্যাস এবং মারি কেরেলীর "মাইটি এটম্" গল্পের অনুসরণে লিখিত "পাষাণ" গল্পটি (শরৎচন্দ্রের মতে) হারিয়ে যায়। আমাদের মনে হয়, এই দু'টি রচনায় বিদেশী প্রভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। "কোরেল গ্রাম" গল্পটিও এইভাবেই শরৎচন্দ্রের রচনার তালিকাচ্যুত হ'য়েছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু বড়দিদি-চন্দ্রনাথ-দেবদাস এমন কি বহু অপরিণত রচনা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হবার পর "কোরেল"-ও "ছবি" রূপে শরৎ-সাহিত্যের তালিকাভুক্ত হ'য়ে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ কোন-এক প্রখ্যাত সাহিত্য-সেবীর স্মৃতি-মন্থনে দেখা যায়, 'কোরেলের'-র কাহিনী-ভাগ "ছবি"-র সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করেছে,—"কোরেলের বিষয়বস্তু ঘোড়-দৌড়, ভালবাসা, রেষারেষী এই সব নিয়ে লেখা। মনস্তত্বের অপরূপ বিশ্লেষণ।" "ছবি" এই বিশেষ তথ্যান্বিত রূপ নিয়েই পরিস্ফুট।

কেবলমাত্র পূর্বোক্ত সাহিত্য-সেবীর কাছে গল্পটি "কোরেল" অবস্থায় "উচুদরের বিলিতি লেখকের" লেখনী প্রসূত বলে' মনে হওয়ায়, সেদিক দিয়েই আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়। কিন্তু বা-থিন ও মা-শোয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, উভয়ের প্রেম-দ্বন্দ্ব-অভিমান-প্রগাঢ় অনুভূতি কোনও অংশেই বাঙালীর জাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়। শরৎচন্দ্র "বিলিতি" তথ্যকে "বিদেশীয়" পরিবেশে স্থানান্তরিত করেছিলেন এজন্য যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়-সান্নিধ্যে যে বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করেননি, তাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী গল্প-উপন্যাসের বস্তুরূপে প্রকাশ করবার সাহসকে ধৃষ্টতা বলেই মনে করতেন। সুতরাং "অভিমান", "পাষাণ" যখন লুপ্তই হলো, তখন "কোরেল"-কে বিলিতি প্রভাবে দীক্ষিত ক'রে লাভ কি? "ছবি" তাই ব্রহ্মদেশের গল্প হ'য়ে দেখা দিল; যে দেশের জীবন-ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তা'ছাড়া পরিণত বয়সে গল্প-উপন্যাস রচনাকালে এবং প্রকাশকালে শরৎচন্দ্র অন্য দেশীয় সাহিত্যিক প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিলেন।

আঙ্গিক পরিকল্পনা

ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মত হচ্ছে—"গল্প অন্তত ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা স্পষ্ট করা চাই।" এদিক দিয়ে "ছবি" বাগান-পর্বের সম্পূর্ণ নিখুঁত না হ'লেও উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। 'ছবি' দশটি পরিচ্ছেদ-বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প। কাহিনী একই ইমেদিন গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত এবং বা-থিন ও মা-শোয়ের জীবনের প্রেম-পর্যায়ের অংশটুকুতেই কাহিনী সীমাবদ্ধ।

"ছবি" গল্পের মূল বিষয়বস্তু বা-থিন ও মা-শোয়ের গভীর প্রেম এবং তার প্রকাশ; সাময়িক অভিমানের তীব্রতায় বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছেদান্তে পুনর্মিলন। সুতরাং গল্পাংশে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই, কোন জটিলতর সমস্যা দ্বারাও কাহিনী অগ্রগমনে বাধাপ্রাপ্ত নয়। অত্যন্ত সাধারণভাবে

নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির ভিত্তিকে নির্ভর করেই গল্পভাগ সন্নিবিষ্ট। তবুও "ছবি" গল্পের বিশেষত্ব যথেষ্ট মূল্যবান এবং শরৎ-মানসের উদ্বোধন পর্বে এই গল্পের স্থান প্রথম শ্রেণীর বলেই আমরা ঘোষণা করতে পারি। বা-থিন ও মা-শোয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ-রচনায় পরিকল্পিত পাত্র-পাত্রীর স্বরূপ ধরা পড়েছে।

"ছবি" গল্পে প্রথমেই ত্রুটী লক্ষ্য করা যায় প্রারম্ভ বিচার ক'রে। গল্পের বিশেষ করে ছোটগল্পের আরম্ভ হবে আকস্মিক অর্থাৎ অতীতের সার-সংকলন বা বর্তমানের সম্ভাবনার স্পষ্টতর ইঙ্গিত নিয়ে কাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে না। আমাদের মনে হয়, "ছবি" ছোট গল্পের আঙ্গিকে সার্থক হয়ে দেখা দিতে পারতো, যদি প্রথম পরিচ্ছেদটি মূল কাহিনী থেকে বাদ দেওয়া হ'তো; কারণ এই প্রথম পরিচ্ছেদে বা-থিন এবং মা-শোয়ের পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দিয়ে বা-থিন ও মা-শোয়ের বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর চলমানতায় ও অবস্থা-পরিবেশে চরিত্র স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠলে কাহিনী ছোট গল্পের মর্যাদা যথার্থভাবে রক্ষা করতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে "ছবি" গল্পের শুরু হলে কোনও ক্ষতি হোতো ব'লে মনে হয় না। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অপেক্ষা, স্মরণ করিয়ে নেওয়ার মধ্যেই বোধহয় লেখকের কলা-কৌশল সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রথম পরিচ্ছেদটি ছাড়া "ছবি" গল্পের প্রবহমানতায় আর কোন শৈথিল্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনী যথোচিতভাবে ঘটনার আবর্তে- সীমাবদ্ধ হয়েও পথ মুক্ত ক'রে পরিণাম-প্রয়াসী হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঘোড়-দৌড় উপলক্ষে যে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, তাতে বা-থিন ও মা-শোয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন বহির্ঘটনার প্রভাবেই দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিচার সর্বাংশে ভ্রান্তিমূলক। অগ্নির দাহিকা শক্তি সকল অবস্থাতেই বর্তমান বটে কিন্তু তা ইন্ধন-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে। সেজন্যই মা-শোয়ের গলায় কোনও বিজয়ী ঘোড়-সওয়ারের জয়মাল্য বা-থিনের উদাসীন প্রকৃতিতে যে আন্দোলন

জাগিয়েছে, আবার বা-থিনের চেষ্টাসিদ্ধ ঔদাসীন্য মা-শোয়েকে তেমনি ভাবেই অভিমানে আচ্ছন্ন এবং কর্তব্যচ্যুত করেছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাহিনী উভয়ের নিরুদ্ধ আবেগকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অযাচিত ভুলের ভিত্তিতে উন্মুক্ত করে দিয়ে জীবন-পথকে জটিল ক'রে তুলেছে। এই পথ শুধুই ভুল, মিথ্যা সন্দেহ, অকারণ আত্ম-নির্যাতন, অভিমান, অহঙ্কার ইত্যাদিতে সমাকীর্ণ। মা-শোয়ে কাহিনীভাগে অধিক সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে এবং তার ফলে বা-থিনকে নীরব হ'য়ে থাকা সম্ভব হয়নি। মা-শোয়ের দর্পিত প্রেম এবং বা-থিনের শান্ত সমাহিত আসক্তি কাহিনীর পরিণামে একটি মিলনমূলক অভিব্যক্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে। কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে পরিণতি বেশ একটু আকস্মিক বলেই মনে হয়; কারণ যে উগ্রতা মা-শোয়ের চরিত্রে দেখা দিয়েছিল, সেই উগ্র রুক্ষতা বা-থিনের রোগক্লিষ্ট ললাটের স্পর্শে "শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা"য় পর্যবসিত হলো। নারী চরিত্রের এই পরিবর্তন, এই কঠোর-কোমল পরিচয় অভূতপূর্ব না হ'লেও চির-পরিচয়ের মধ্যে নব-পরিচয়ের স্বাদ পরিবেশন করে। শরৎ-সাহিত্যের মানদণ্ডে নারীর হৃদয়-মাধুর্যের উন্মুক্তিতে "ছবি" গল্পের উপসংহারটুকু পাঠকের আনন্দাশ্রু সিঞ্চনে রসপুষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

বা-থিন ও মা-শোয়ের প্রেম-প্রকৃতি

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির যে স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, "ছবি" গল্পের নায়ক-নায়িকার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিচার ক'রে দেখ্‌লে সেই একই রূপের নব-রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। উদাসীন পুরুষ আপাত বিক্ষোভ-হীনতার মানসিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে গভীর অন্তর্মুখী প্রেমবোধে বিহ্বল। নারী উচ্ছ্বসিত প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে পুরুষকে বাঁধতে চায় একান্ত আপন ক'রে। এমনিভাবেই নারী স্থাপন করে পুরুষের ওপর চিরঅধিকার। পুরুষের অব্যক্ত প্রেম নারীকে করে ক্ষুব্ধ, তাই প্রচণ্ড অভিমানে সে আঘাত করে পুরুষকে। কিন্তু সেই আঘাত দ্বিগুণতর হ'য়ে ক্ষত-বিক্ষত করে

নারীকেই। বা-থিন ও মা-শোয়ের পারস্পরিক হৃদয়-দ্বন্দ্ব এভাবেই রূপ পেয়েছে।

মা-শোয়ের পিতা ইমেদিন গ্রামের ধনী জমিদার। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বা-থিনের পিতা বা-কোর কাছে আপন গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন—"…ইচ্ছা ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব।" সুতরাং মা-শোয়ে এবং বা-থিন অভিভাবকদের দ্বারা মনোনয়নের মধ্যে দিয়েই "শিশুকাল হইতে…এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে,…মারপিট করিয়াছে,—আর ভালবাসিয়াছে।" দুজনেই যখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তখনও মা-শোয়ে এবং বা-থিনের অন্তরঙ্গতা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি; বরং বা-কোর মৃত্যুতে বা-থিনের গভীর শোক নিরসনকল্পে মা-শোয়ের উক্তি—"বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।"—আরও নিবিড়ভাবে উভয়ের সম্বন্ধকে দৃঢ় করেছে বলে মনে হয়।

বা-থিন শিল্পী। অপূর্ব রূপবান পুরুষ। মা-শোয়ের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে "নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাদের মতই সুন্দর"। কিন্তু বা-থিন নিরাসক্ত, নির্লোভ পুরুষ। মা-শোয়ের মত ধনী, রূপসী, অভিভাবকহীন প্রণয়িনীর নির্বিচার আত্মসমর্পণেও সে বিচলিত নয়। বা-থিন চরিত্রে উদার প্রত্যাখ্যান-স্পৃহাও নেই, সাগ্রহ আকুলতাও নেই; আছে শুধু অতলস্পর্শী নিস্তরঙ্গ প্রেম। যার ফলে মা-শোয়ের উচ্ছলিত প্রেম বারে বারে প্রতিহত হয়েছে বা-থিনের নীরব কাঠিন্যের কাছে। বা-থিন কাশীনাথ শ্রেণীর পুরুষ। সে সুরেন্দ্রনাথের মতো অন্যমনস্ক, সংসার-অনভিজ্ঞ শিশু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট নয়, আবার দেবদাসের মতো খেয়ালী, অপরিণামদর্শী, ভাগ্যের ক্রীড়নকও নয়। বা-থিনের ঔদাসীন্য কাশীনাথের মতো পুরুষোচিত —আত্মভোলা, নির্লিপ্ত, বৈরাগী পুরুষ সে নয়। তার চরিত্র, ব্যবহার সবকিছুই এত গভীর প্রসারে পরিব্যাপ্ত যে মা-শোয়ে সেই গভীরতায় অবগাহন করেও বা-থিনকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি—"…কিছুতেই অপর

পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধ-দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না।" অভিমানের প্রাচীর তুলে মা-শোয়ে আপন অন্তরেই বন্দিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

মা-শোয়ের চরিত্র "কাশীনাথ" গল্পের কমলা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। সে চায় বা-থিন তাকে স্পষ্ট ভাবে ভাষায় ব্যবহারে প্রেমের পরিচয় দিক্। কিন্তু বা-থিনের নীরব উদাসীনতায় মা-শোয়ে তাকে ভুল বোঝে। ঘোড়-দৌড়-উৎসবে যাওয়ার পুর্ব-মুহূর্তে বা-থিনের "কর্তব্যের দৃঢ়তা"য় মা-শোয়ে ব্যথিত হয়েছে—"···আমি না আসিলে·· তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জান বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে।"

বা-থিনের আত্ম-সম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর। সে অমানুষিক পরিশ্রম দ্বারা তার শিল্প-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছে। মা-শোয়ের কাছে সে পিতৃঋণে ঋণ-গ্রস্ত। প্রেমের দাবি নিয়ে বা-থিন সেই ঋণের ভার অনায়াসে লাঘব করতে পারতো, কিন্তু মা-শোয়ের ঐশ্বর্যের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেনি। সে তার শিল্পৈশ্বর্য নিয়ে মা-শোয়ের কাছে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়। মা শোয়ের প্রেম বা থিনকে বরণ করবে বিজয়ীরূপে, অনুগৃহীতরূপে নয়। ঘোড়-দৌড়মাঠে বিজয়ী পো-থিন মা-শোয়েকে "আরক্ত দেহে, কম্পিত মুখে, ক্লেদ-সিক্তহস্তে" জয়মাল্য দিয়েছিল—অন্যদিকে বা-থিন অক্লান্ত সাধনা দ্বারা পিতৃঋণ মুক্ত হ'য়ে মা-শোয়েকেই লাভ করতে চেয়েছে। বা-থিনের সাধনায় আড়ম্বর নেই, আতিশয্য নেই ; বরং মা-শোয়ের কটূক্তিতে, অভিমানপুর্ণ ব্যবহারে তার অধঃপতনের সম্ভাবনায় বা-থিন বিপর্যস্ত হয়েছে। সে ক্রমশঃ আরও নির্লিপ্ত হ'য়ে উঠেছে মা-শোয়ে সম্পর্কে। মা শোয়ের জীবন পো-থিনের সংস্পর্শে যে অন্যমুখে যাত্রা করেছে, বা-থিন তা উপলব্ধি করেছে এবং আরও যেন আত্মস্থ হ'য়ে সে শিল্প-সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছে। পো-থিন মা-শোয়ের কণ্ঠে জয়মাল্য দান ক'রে সকলের কাছে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বা-থিন কি মা-শোয়ের কৃপা-পাত্র হ'য়ে থাকবে ? তাই সে

যখন আত্মনিমজ্জন করেছে, মা-শোয়ের মনে হয়েছে—"ওই কর্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।" মা-শোয়ের অন্তর্দাহ দ্বিগুণতর আকার ধারণ করেছে বা-থিন যখন তার পোষাকে মদের গন্ধ দূর করবার জন্য চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়েছে। তার আগেই মা-শোয়ের গৃহে উৎসব-হাসি-গল্প-নৃত্য-গীত, পো-থিনের স্তুতিবাক্য সবই মা-শোয়ের কাছে অর্থহীন হ'য়ে দেখা দিয়েছিল—"তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে,...আজিকার এত বড় মাতামাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয়ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।" মা-শোয়ের প্রকৃতিতে নারী-জনোচিত ধৈর্য অপেক্ষা অভিমানের উদ্দামতা, দর্প প্রধান হ'য়ে উঠেছে। গম্ভীর সংযতচিত্ত বা-থিনকে আঘাত দিতে গিয়ে মা-শোয়ের প্রেম তার ঔদাসীন্যে হয়েছে অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মা-শোয়ে বা-থিনকে ক'রে তুল্‌তে চেয়েছে ঈর্ষান্বিত, তার জন্মতিথির উৎসবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু "সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া...তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত,...সেও ঈর্ষার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের...আয়োজন, ইহার বার্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?" কিন্তু জীবনের এই কঠিন দ্বন্দ্বে মা-শোয়ে এবং বা-থিন কেউ জয়ী নয়। বাইরের ঘটনা-বিক্ষেপ উভয়ের প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমশঃ তীব্রতা দান করেছে বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে দু'টি হৃদয় "দিবানিশি...মুখোমুখি বসিয়া আছে; প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না; কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।" বা-থিন মা-শোয়ের প্রেম-প্রকৃতিতে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেম-প্রকৃতির সুস্পষ্ট আভাস সূচিত হয়।

বা-থিনের সুকঠিন দৃঢ়তা মা-শোয়ের প্রতি তার প্রেমকে যে আরও তাপদীপ্ত ক'রে তুলেছিল, তা তার বৌদ্ধ-জাতকের প্রতিকৃতির পরিবর্তে মা-শোয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনেই প্রমাণিত হয়েছে। যে প্রতিকৃতির বিক্রয়

মূল্যে বা-থিন পিতৃঋণ মুক্ত হতে চেয়েছে, মা-শোয়েকে দুঃখ দিয়েছে, সেই প্রতিকৃতি কখন অজ্ঞাতসারে তার অনির্বাণ প্রেমের সাক্ষ্য বহন ক'রে সমুদ্ভাসিত হয়েছে। বা-থিনের জীবনে শিল্প-সাধনা প্রেমের মন্ত্রে হয়েছে নিয়ন্ত্রিত—তাই তার কাছে মা শোয়ের 'ছবি' অদৃষ্টের পরিহাস হয়ে দেখা দিলেও সর্বজয়ী প্রেমের বাণী নিয়ে এই প্রতিকৃতি পো-থিনের জয়মাল্যকে করেছে ম্লান। বা-থিন পরাজয়ের গ্লানিতে ম্রিয়মান না হয়ে আনন্দ-বেদনায় বিহ্বল হয়ে জেনেছে—"এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশ ছলনা করিয়াছে,—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা শোয়ে।" শিল্প-সৌন্দর্যের সাধনায় প্রেমসৌন্দর্য বা-থিনকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখিয়েছে, তা ঋণ-মুক্তি অপেক্ষা অনেক মহিমময়।

এদিকে মা-শোয়ে আহত ফণিনীর মতো বিষোদ্গারে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই প্রতিশোধ গ্রহণ তাকে যত নিষ্করুণা, হৃদয়হীনারূপে উপস্থাপিত করুক না কেন—ঋণশোধের জন্য বা-থিনের উদ্দেশ্যে তার সক্রিয়তা নারীর প্রেম-প্রকৃতিরই একটি গোপন আশা-সঞ্চারী কৌশলের আত্মপ্রকাশ। পো-থিনকে কেন্দ্র ক'রে মা-শোয়ের নারী-প্রকৃতি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে শুধু বা-থিনকে অপমানিত করতে নয়, বা-থিনের পাষাণ-সদৃশ গাম্ভীর্যের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করাবার জন্য। আশান্বিত পো-থিনকে বিস্ময়ের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রে কাহিনী অকস্মাৎ পথ-পরিবর্তন করেছে।

বা-থিন সর্বস্বান্ত হ'য়ে মা-শোয়ের কাছে উপনীত হয়েছে—তার ঋণ পরিশোধ করতে। তার এই ঋণ-শোধ শুধুমাত্র অর্থের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়—মা-শোয়েও তা জানে—"···টাকা সে চাহে না,···কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল।" পুরুষের আজন্ম ঋণ থেকে যায় নারীর কাছে। সে ঋণ প্রেমের, সে ঋণ পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তার জীবনের নানাদিকে লক্ষ্য রাখার। উদাসীন পুরুষকে নারী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আবৃত ক'রে তাকে ঋণমুক্ত করে।

বা-থিন মা-শোয়ের প্রেম-প্রকৃতিতে নরনারীর চিরন্তন লীলা-বৈচিত্র্য অভিনব ঘটনা-বৈশিষ্ট্যে নূতনত্ব সম্পাদন করেছে। শরৎচন্দ্র বিদেশী কাহিনীর প্রচ্ছদপটের অন্তরালে তাঁর নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি দর্শনের স্বরূপটুকু তুলে ধরেছেন।

নারীর অভিমান স্বাভাবিক বটে, কিন্তু অপরকে ধূলিমণ্ডিত ক'রে নয়। ভ্রমরের অভিমান গোবিন্দলালকে অধঃপতনের দিকে চালিত করেছিল, কিন্তু সংযমী করেনি। বা-থিনের জীবনেও অশান্তি এনেছে মা-শোয়ের অভিমান-প্রাবল্য। কিন্তু যে মুহূর্তে মা-শোয়ে বা-থিনের সর্বস্বান্ত হবার কথা জেনেছে, জেনেছে তার দেশত্যাগের ইচ্ছার কথা, ক্ষণকালের মধ্যেই সে তার সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে বা-থিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নরনারীর একের অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতায় ঋণ কি কখনও পরিশোধ হয়? যুগ যুগান্ত ধরে পুরুষের ঋণের বোঝা চলে বেড়ে, আর নারী কেবল আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে মা-শোয়ের মতই বল্‌তে থাকে—"আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না। এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।" অগত্যা বা-থিনের মতো চিরন্তন পুরুষ-প্রকৃতিও তার ঔদাসীন্যের আবরণটাকে ভালভাবে টেনে নিয়ে নির্বিকার হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নারীর চরিত্র-রহস্যে পুরুষ বিমুগ্ধ, বিস্মিত, কিন্তু নিরুপায়। রহস্যলোকের গোপন তত্ত্বটুকুই তার কাছে থাকে অনাবিষ্কৃত হ'য়ে।

উপসংহার

"ছবি" গল্প হিসেবে শরৎচন্দ্রের অপরিণত লেখনীর রচনা হ'য়েও এযুগের অন্যান্য গল্প অপেক্ষা সার্থক হয়েই দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রবণ মনটিকে এখানে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এখানে শরৎচন্দ্রকে সচেতন হ'য়ে সমাজ-ব্যাখাতা বা সমালোচকের ভূমিকায় সমাজের পাপ-পুণ্যের হিসেব দিতে হয়নি। তাই "ছবি" গল্পের বর্ণনা-ভঙ্গী, সংলাপ এবং রচনাকৌশল সবই স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। উক্তি-প্রত্যুক্তির দীর্ঘজালে কাহিনীর দ্রুত গমনকে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়নি। শরৎচন্দ্র তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী

নিয়ে যে বেশ সাবলীলভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তা তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বাঙ্গ-নির্দেশক অংশগুলি উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত করে। এই প্রসঙ্গে যে-কোনও অংশের বর্ণনাভঙ্গীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংলাপের ভাষা এখানে সাধুভাষায় রচিত। "ছবি" গল্পে কথ্য ভাষার মিশ্রণ সাধু ভাষায় খুব কমই ঘটেছে, যা অন্যান্য রচনায় অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গল্পরস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছে। "ছবি" গল্পের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রের শিল্প-দক্ষতার একটি বিশেষ লক্ষণ এখানে ক্রিয়াশীল। বিদেশী নায়ক-নায়িকার মুখে বাঙালিয়ানায় কথোপকথনের রীতিটুকু না দিয়ে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই সার্থক রূপদক্ষ হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর ভাবপ্রবণ মনে এই সতর্ক প্রয়াস কষ্ট-প্রসূত হ'লে মিশ্রণ দোষ পরিলক্ষিত হ'তো। "...আচ্ছা এই মন লইয়াই থাক, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানের জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।"—ইত্যাদি সংলাপ বাঙলা ভাষার কথ্যরীতির, বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের ভাষা-বৈশিষ্ট্যটুকুর অনুগামী নয়।

(৪)

বড়দিদি

নামকরণের সার্থকতা

শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' গল্পের প্রথম নামকরণ করেছিলেন 'শিশু'। কিন্তু 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে 'শিশু' গল্পটি 'বড়দিদি' নাম নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। প্রথমবার 'শিশু' কিন্তু পরবর্তীকালে 'বড়দিদি' নামকরণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুরেন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথের মতো চরিত্রটি তাঁর প্রথম যুগের সৃষ্টি-ক্ষম মানসকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কারণ তখনও পর্যন্ত নারী-প্রাধান্যের

এককত্ব দ্বারা তাঁর সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়নি। অপরিণত রচনা-পর্যায় অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ-মানসের পূর্ণ জাগরণ ঘটে এবং সুরেন্দ্রের স্থানটি ক্রমশঃ মাধবী আত্মসাৎ করবার সুযোগ পায়। সুরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে বড়দিদির যে স্বরূপ অঙ্কিত ছিল, শরৎচন্দ্র বোধ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'বড়দিদি' নামকরণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছে পিতামাতার অস্তিত্ব অজ্ঞাত নয়—"কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারো সহিত পরিচয় হয় নাই...মানুষটিকে সে চিনেনা, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চিনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্বস্ব।" সুতরাং 'বড়দিদি' নামের মাহাত্ম্য মাধবীর পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। মাধবীকে নারী-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনের প্রকাশ ঘটেছে।

আঙ্গিক বিচার

'বড়দিদি'র কাহিনী-ভাগ দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; কিন্তু তার মধ্যে মাত্র একটি (প্রথম) পরিচ্ছেদে সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য ব'লে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব ঘটনা রাজি এসেছে সবই মাধবী সুরেন্দ্রের কাহিনীকে গতিশীল ক'রে তোলবার জন্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রেই কাহিনীটি সচল এবং স্বাভাবিক। একান্তভাবে পর নির্ভরশীল সুরেন্দ্রনাথ একদিন গৃহত্যাগ করলো বন্ধুর পরামর্শে। এক নিরুদ্বেগ জীবন ত্যাগ ক'রে সে আর এক নিরুদ্বেগ পরিস্থিতিতে এসে পড়লো ব্রজরাজবাবুর গৃহ শিক্ষক রূপে। কারণ "এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনের কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল বা পরে ভাবিতে হইবে।" ব্রজরাজবাবুর সংসারে 'বড়দিদি' রূপিণী একটি জীবন্ত সত্তার সযত্ন স্পর্শ সুরেন্দ্রনাথ প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে। এই অসতর্ক অন্যমনস্ক লোকটির প্রতিও মাধবীর সতর্ক সাবধানতার অন্ত নেই—"মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয় এ লোকটি নিতান্ত বালকেরই

মত সরল।” কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর সহানুভূতিপুর্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ক্রমশঃ যে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় বাল্যসখী মনোরমার কাছে পত্র লেখার মধ্যে দিয়ে—“এমন অকেজো অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই।…আমি ত বোধ হয় এমন লোককে চোখের আড়াল করিতে পারিতাম না।” সুরেন্দ্রনাথ-সম্পর্কে মাধবীর উত্তরোত্তর কৌতূহল-বৃদ্ধি, কাশী-গমন ইত্যাদি ছোট ছোট ঘটনা-জালে কাহিনী-ভাগ একই স্থানে আবর্তিত হয়েছে এ পর্যন্ত। এর পর মাধবীর কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন, মাধবীর উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথের অপরিণামদর্শী উক্তির ফলে মাধবীর আত্ম-সঙ্কোচ, দাসী মহলে আন্দোলন, মাধবীর যত্ন ও স্নেহ-স্পর্শ থেকে সুরেন্দ্রনাথের ক্রমশঃ বঞ্চিত হওয়া, অবশেষে তার অনির্দেশ্য পথে যাত্রার মধ্যে দিয়ে কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী চাপা পড়ার পরই যদি ‘বড়দিদি’র কাহিনী ভাগ পরিসমাপ্তি লাভ করতো, তবে ‘বড়দিদি’কে সার্থক ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যেতো। কিন্তু পঞ্চম পরিচ্ছেদের পরও যখন কাহিনীটি ক্রমবর্ধমান হয়ে আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তখন শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক বিবৃতি-প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ‘বড়দিদি’র শ্রেণীগত সংজ্ঞা নির্দেশ করা উচিত।

যে ইঙ্গিতময়তা গল্প জাতীয় রচনার মূল সহায়, সে দিক থেকে শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্র-মাধবীর মনোজগতের বিচিত্র ভাবনাকে বেশ সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতপুর্ণ-ভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম এই তিন পরিচ্ছেদ-ব্যাপী গল্পাংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাস-শিল্পের অনুশীলন করেছেন। অথচ এই সুদীর্ঘ বর্ণনা সুসংহতরূপে একটি পরিচ্ছেদেই তিনি সীমাবদ্ধ করতে পারতেন, কারণ ঘটনাগত দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নবম পরিচ্ছেদ থেকে। প্রকৃত পক্ষে নবম এবং দশম পরিচ্ছেদেই ‘বড়দিদি’ রচনার আকস্মিক পরিণতিতে ছোট গল্পের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। তবুও ‘বড়দিদি’কে ছোট গল্প আখ্যা দিতে পারিনা এই জন্য যে কাহিনীর মধ্যাংশে তিনটি পরিচ্ছেদ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হ’য়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

সুরেন্দ্রনাথের ব্রজরাজবাবুর গৃহ পরিত্যাগের পর মনোরমার সাক্ষাতে মাধবীর অন্তরের গোপন অংশের সন্ধান দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক্ হ'য়ে উঠেছেন। মনোরমা ও তার স্বামীর পত্রালাপে মাধবীর মনের খবরকেই শরৎচন্দ্র উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তার ফলে উপন্যাস ধর্মের মন্থরতা প্রাধান্য পেয়েছে। স্ত্রীজাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-পর্যালোচনা, 'মাধবীলতা'র সঙ্গে নারীর প্রেম-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা, মাধবীর সমাজ-অসমর্থিত চিত্তবৃত্তির প্রতি "মাধবী পোড়ারমুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে।"—ইত্যাদি উক্তি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উপন্যাসকার শরৎচন্দ্রের বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচায়ক। সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে সুরেন্দ্রনাথের জমিদারী-প্রাপ্তি, বিবাহ, সুরেন্দ্র ও তার স্ত্রী শান্তির কথোপকথন, ম্যানেজার মথুরবাবুর জমিদার ও জমিদারী নিয়ন্ত্রণ, স্বামী সম্বন্ধে শান্তির সতর্কতা, মাধবীর ভাগ্য-বিপর্যয় প্রভৃতি চিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্র গল্প অপেক্ষা উপন্যাসের গতিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন। কিন্তু একটি গল্পাংশকে ক্রমাগত বিস্তৃতি দানের ফলে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দেবার আশঙ্কায় শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি'র নবম পরিচ্ছেদে সচেতন হয়ে উঠলেন। গল্প রচনার যে মনোভাব নিয়ে তিনি 'বড়দিদি' শুরু করেছিলেন, সেই মনোভাবের পুনর্জাগরণে কাহিনী-ভাগ অতর্কিত পরিণাম-প্রয়াসী হ'য়ে উঠলো। তার ফলে মাধবীর সম্পত্তি-নীলামের দায়, সুরেন্দ্রনাথের অন্তরের দায় হ'য়ে দেখা দিলে যে বিষাদপূর্ণ পরিণতির ইঙ্গিত সূচিত হ'লো তাতে সুরেন্দ্রনাথের হ'লো জীবনান্ত; আর অব্যাখ্যাত বেদনা ও অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা নিয়েই পাঠককে ফিরে আসতে হ'লো—মাধবী দুঃখ পেতেই কি বেঁচে থাকবে?

দেখা যাচ্ছে অবিমিশ্রভাবে ছোট গল্প বা উপন্যাস 'বড়দিদি'কে বলা যায় না, তবুও কাহিনীর আরম্ভ এবং সমাপ্তিতে যখন ছোট গল্পের লক্ষণ প্রাধান্য পেয়েছে সেদিক দিয়ে আমরা 'বড়দিদি'কে গল্পই বলতে পারি। অথচ প্রকৃত উপন্যাসের সম্ভাবনা যে কাহিনী-ভাগে ছিল না, তা নয়। সুরেন্দ্রনাথের

অসুস্থতার জন্য কলকাতা যাওয়া স্থির হ'লে, মাধবী-সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের জীবনে মাধবী-শান্তির একত্র বিচরণ 'বড়দিদি'র কাহিনীকে কোন্‌দিকে চালিত করতো কে জানে? এখানে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সংযমী হ'য়ে এই সুযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

সুরেন্দ্র-মাধবীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর যে প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিধৃত হ'য়ে আছে, তার পরিচয় এই 'বাগান' পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যেও ধরা পড়েছে। 'বাগান' খাতার দ্বিতীয় খণ্ডে 'বড়দিদি' (শিশু) গল্পের সৃষ্টি। সুরেন্দ্র এবং মাধবীই এই গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রী। সুরেন্দ্রনাথ যে জাতের পুরুষ, তার ব্যক্তিত্বকে চির-প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্য মাধবীর মতো প্রাণাবেগের প্রয়োজন। উদাসীন আত্মনির্ভরহীন সুরেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে শিশু; স্নেহ-মমতায় নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপনে তার পুরুষোচিত অভিমান স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয়নি। কিন্তু বিধাতা সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যে জটিল গ্রন্থিটি দিয়ে রেখেছিলেন, সেই গ্রন্থির পাকে আবদ্ধ হ'য়ে সুরেন্দ্রনাথ একদিন প্রমীলার শিক্ষক-রূপে মাধবীর জীবন-মঞ্চে আবির্ভূত হ'লো। অন্যমনস্কতার মধ্যেও ব্রজরাজবাবুর গৃহে কয়েকদিন বাস করবার পরেই সে বুঝেছিল যে, একটি অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তার খামখেয়ালী জীবন চালিত হচ্ছে। বিমাতার স্নেহ-পুট পরিত্যাগ ক'রে যে অভাববোধ সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে দেখা দিয়েছিল, মাধবীর সতর্ক যত্নশীলতা ও স্নেহময় পরিবেষ্টনের মধ্যে সেই অভাব ক্রমশঃ দূর হ'য়ে গেল, সুরেন্দ্রনাথ তার নূতন আশ্রয়ের সর্বজনীন 'বড়দিদি'টির প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়লো—"লোকে যেমন ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি লিখিয়া রাখে, দুঃখে-কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে"—সুরেন্দ্রনাথের আসক্তি ঐ 'বড়দিদি' প্রতীকের প্রতি। এই প্রতীককে কেন্দ্র ক'রেই একটি মহান ধারণা সুরেন্দ্রনাথের চেতনাকে আবিষ্ট ক'রে রাখে। "মেঘের কাজ জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ স্নেহ-যত্ন করা!"—এই ধারণা

নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত। বড়দিদি সকলকে স্নেহ-যত্ন করেন, সকলের অভীষ্ট সিদ্ধি করেন, কিন্তু "মেঘের মত বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন!" এ জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্রের এবং পাঠকের কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নয়। কারণ দুঃখ পেলেই বড়দিদির কথা বার বার উচ্চারণ ক'রে সে তৃপ্তি পায়, তা ছাড়া কোন ঔৎসুক্যই মাধবীর প্রতি তার নেই।

নিজের ভাল-মন্দ-সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে নির্বিকার যে সুরেন্দ্রনাথ, তার জীবনে বড়দিদির প্রভাব কত গভীরতর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তার পরিচয় সুরেন্দ্রনাথের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরই অনুভব করা যায়। "রূপ-যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই। এসব সে ভাবিত না।" সুরেন্দ্রের নির্ভর-কাতর, স্নেহ-লিপ্সু মন মাধবীর পরোক্ষ সান্নিধ্যে অসীম তৃপ্তি লাভ করেছিল। এর অধিক কোনও কামনা তার নেই। 'আজও তাই সুরেন্দ্রের অন্তর রুদ্ধ আবেগে সেই পরমকাম্য নির্ভর-স্থলটুকুই খুঁজেছে, যে তার কল্পনাময়ী "বড়দিদি"। তার অবচেতন মানসলোকে নারীর প্রতি আকর্ষণ যে রূপেই প্রতিভাত হোক না কেন, সমগ্র কাহিনীতে মাধবীর প্রতি সুরেন্দ্রের অপ্রাকৃত অনুভূতিটুকুই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে।

মাধবীকে কেন্দ্র ক'রে সুরেন্দ্রের আত্ম-সাক্ষাৎকার 'বড়দিদি' গল্পের একটি সূক্ষ্ম গ্রন্থন-সূত্র। শুধু তাই নয়, আগের মানুষটিই যেন বদলে গেছে "পূর্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁত খুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া বলেন, 'সুরো আজকাল বদ্‌লে গেছে।' সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কিছু পরিবর্তন হ'য়ে থাকলেও বিবাহিত জীবনে শান্তি এবং জমিদারী ব্যাপারে মথুরবাবুর কাছে সুরেন্দ্রের অসহায় নির্লিপ্ত পর-নির্ভরশীল ভাবটি সমভাবে বর্তমান। শুধু বড়দিদির প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ যেন কিছু বিচলিত হ'য়ে পড়তো। তাই যখনই রোগ, অশান্তি, অব্যবস্থায় সে চঞ্চল হ'য়ে উঠতো, তার কাছে, বড়দিদির প্রয়োজনীয়তা তখনই বড় বেশী অনুভূত হ'তো। শান্তির কাছে সুরেন্দ্রনাথ একথা প্রায়ই বলেছে—"তিনি এলে দেখতে পাবে আমার কোন কষ্ট থাকবে না।"

সুরেন্দ্রনাথের বড়দিদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষার দিন অনিবার্য হ'যে উঠলো, জমিদারী সংক্রান্ত অন্যায়ের মধ্যে দিয়ে। তার অর্ধ-নির্বাপিত প্রাণাবেগকে বড়দিদির আকর্ষণ কি বিস্ময়জনক-ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে, তার যথার্থ প্রকাশ সূচিত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথের দু'একটি সংক্ষিপ্ত কথার সমষ্টিতে। বিধবা, গৃহহীনা মাধবী সুরেন্দ্রনাথের বড়দিদি কিনা, এ বিষয়ে শান্তি সন্দেহ করলে সুরেন্দ্র বলেছে—"বড়দিদি নামের একটু সম্মান কর্‌বনা?...তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার?" বড়দিদি সুরেন্দ্রনাথের হৃদশতদল-বাসিনী অন্নপূর্ণা, তাই বড়দিদিকে অন্নরিক্তা ক'রে তার পদতলে লুটিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষায় সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে আত্মভোলা সুরেন্দ্রনাথ স্থান পেয়েছে মাধবীর পদতলে নয়, অন্তরে।

মৃত্যু শয্যায় মাধবীর স্বামী যোগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে, তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও।" নিষ্ক্রিয় সংযমের কৃত্রিম জীবন-যাপনের নির্দেশ এখানে নেই। কর্ম-প্রীতি থেকেই মাধবীর অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে শান্তি দেখা দেবে, যোগেন্দ্রনাথের এ বিশ্বাস হিন্দুধর্ম-প্রসূত কর্মবা- ২ কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। মাধবীর অকালবৈধব্য সে জন্যই তাকে কর্মভিত্তিক অনুভূতি দান করেছে। সাধনা-প্রণোদিত কর্মশীলতার দ্বারা সে সংসারে অসহায়, প্রবৃত্তি-তাড়িত মানুষগুলিকে ঠিক পথে চালিত করেছে। একে আত্মনিগ্রহ ব'লে ব্যাখ্যা দেওয়া চলতে পারে, তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে হিন্দু-বিধবার কর্মনিষ্ঠা তার নারী-ধর্মের একমাত্র পরাকাষ্ঠা ব'লেই বিবেচিত হয়। যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানেই দুঃখ—মাধবীর জীবন কাহিনীতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাধবী স্বামী যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করে স্নেহশীলা 'বড়দিদি'-রূপে পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সব ত্যাগ

করলেও নারীর স্বভাব-ধর্ম যে প্রেম তাকে ত্যাগ করতে পারেনি। মাধবীর নারী-সত্তা অহরহ যে ভালবাসার কুসুম ফুটিয়েছে, সেই কুসুম গুচ্ছ গুচ্ছ বিলিয়েছে তার গ্রহীতাদের মধ্যে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আগমনে মাধবী কখন তার কুসুমের মালাটি এই অসহায় নির্লিপ্ত পুরুষটির উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছে, তার সন্ধান শরৎচন্দ্রের নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। অসহায় পুরুষের প্রতি, বিশেষ ক'রে যে পুরুষ অন্য-নির্ভরশীল, নারীর সমস্ত সহানুভূতি সংহত হয় সেখানেই। মাধবীর জীবনে নারী-ধর্ম যে কেবল দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-পরায়ণতায় পর্যবসিত নয়, সেই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র মাধবী চরিত্রের ক্রমবিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিধবা মাধবীর প্রেম-সঞ্চার সামাজিক অনুশাসনে গর্হিত, কিন্তু অপ্রতিহত অজ্ঞাত এই প্রেমবোধ মাধবীর আচরণে ও কথায় ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। মাধবীর আকর্ষণ যে ক্রমশঃ সহানুভূতি বা করুণা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে অন্যপথে যাত্রা করেছে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় মাধবী যেদিন কাশী যাওয়া মনস্থ করলো—"মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এখন সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই; তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্মণ্য সংসার-অনভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল।" আমাদের মনে হয় শুধু কৃতজ্ঞতা জানবার আকাঙ্ক্ষা মাধবীর মনে প্রবল ছিলনা। তার অন্তরে সেই নারী-প্রকৃতিটি চঞ্চল হয়েছিল, যে পুরুষের প্রয়োজনীয়তায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে 'আত্মপ্রসাদ' লাভ করে। তাই সে ছাড়া যে সুরেন্দ্রনাথ অচল—এ কথাটি জানতেই মাধবীর যত আগ্রহ।

বৈধব্যের বৈরাগ্য পালনে ও অসীম ধৈর্যধারণে মাধবী অভ্যস্ত ছিল। সখী মনোরমার কৌতুকবোধকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত ক'রে মাধবী জীবনে প্রথম "ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলেমানুষের মত কাঁদিল।" মাধবী মনোরমাকে সব কথা বলেছে, কিন্তু কি কথা বলেছে শরৎচন্দ্র তা প্রকাশ করেননি। শুধু এই কথাটিতে মাধবীর সুরেন্দ্রনাথের

প্রতি গভীর অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় আছে—"তিনি যদি না বাঁচতেন, তা হ'লে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম।" অথচ হাসপাতালে আহত সুরেন্দ্রনাথের শয্যার পাশে না যাওয়ার মধ্য দিয়ে মাধবী কতদূর সংযমশীলতার পরিচয় দিয়েছে। বিধবার পক্ষে পরপুরুষের চিন্তায় আত্মনিয়োগ, সমাজ-বিরোধী ও অসংযমের পরিচায়ক। তাই হয়তো মাধবী যেদিন জেনেছিল সুরেন্দ্রনাথ আপন আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেদিন মাধবী তার প্রেম-ব্যাকুল হৃদয়ের স্বতঃ প্রসারিত আশঙ্কা-উদ্বেগ সুরেন্দ্রনাথের দিক থেকে দৃঢ়ভাবে সংযত ক'রে নিয়েছিল। মাধবী চরিত্রে বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব শরৎ-সাহিত্যে নারী-প্রকৃতির দূরাগত সুস্পষ্ট আভাস সূচিত করেছে।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। মাধবীর জীবনে স্বপ্নের মতো একটা চরম বিপর্যয় ঘটে গেল। সে তার ক্রোড়ে সুরেন্দ্রনাথেরই অন্তিমশয্যা রচনা করেছে। কিন্তু 'বিশ্বের আরাম' খুঁজে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ, যে-মাধবীর কোলে নিশ্চিন্তে মাথা রেখে শয়ন করেছিল, সে তখন যোগেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী নয়, সুরেন্দ্রনাথের 'বড়দিদি'। মাধবী তার সমগ্র নারীধর্ম নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের কাছে ফুটে উঠেছে, বলেছে "আমি মাধবী!"—আমার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, আমি ভালবাসিতে জানি, অতএব ভালবাসিবই।'—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারীর প্রেম-মহিমার জয় জয়কার এখানেই।

'বড়দিদি' রচনার সমাপ্তিতে একটি ছত্র ছিল—"পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মাধবীকে একটু স্থান দিও ভগবান!"—এই লাইনটি অবশ্য পরে শরৎচন্দ্র বাদ দিয়েছেন। "বাগান" পর্যায়ের রচনায় এ জাতীয় আবেগপূর্ণ উপসংহার অবলম্বন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপসংহারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি ইঙ্গিতপূর্ণ তথ্য 'বড়দিদি' গল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে উপরিউক্ত শরৎচন্দ্রের পরিত্যাজ্য ছত্রটিতে আত্মগোপন ক'রে আছে। মাধবী মুমূর্ষু স্বামীর অশ্রুজল মুছিয়ে পরজন্মে স্বামীর পদতলেই স্থান পেতে চেয়েছিল, কিন্তু কাহিনী-সমাপ্তিতে পাঠক ও লেখক যুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়েছে, পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ে যেন মাধবী স্থান পায়। তার ফলে এইকথাই

মনে হয় না কি, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি-নিষ্ঠা সবই মানুষের জীবনে বহিরাবরণ মাত্র। নর-নারীর অন্তর পরিব্যাপ্ত ক'রে যে আদিম প্রবণতা বিরাজমান, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ থাকায় ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে তিনি যত কথা বলুন না কেন, নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে প্রেমকেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ও কাশীনাথ

'বাগান' খাতায় প্রথম খণ্ডের 'কাশীনাথ' গল্পের কাশীনাথ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'বড়দিদি' গল্পের সুরেন্দ্রনাথ আপাত-দৃষ্টিতে একই প্রকৃতিবিশিষ্ট ব'লে মনে হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বস্তু ছিল তার অন্যমনস্কতা এবং আত্মনির্ভরশূন্যতা—এ জন্য সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে পুরুষোচিত গুণ অপেক্ষা শিশুর সারল্য বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। কাশীনাথ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, চির-উদাসীন পুরুষের প্রতিচ্ছবি। কোন নির্ভরতা না পেলে সে সুরেন্দ্রনাথের মতো কাতর ও অসহায় হ'য়ে পড়ে না। পুরুষের ঔদার্য-দৃঢ়তা আত্মমর্যাদা নিয়ে কাশীনাথ পরমুখাপেক্ষী নয়, ভাগ্য তাকে পরান্ন-প্রত্যাশী করেছে। সুরেন্দ্রনাথের নির্ভরপরায়ণতা মাধবীকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু ঔদাসীন্য করেছে বিস্মিত। কাশীনাথের চাঞ্চল্যহীন মনোভাব স্ত্রী কমলার পক্ষে অন্তর্দাহের সূচনা করেছে। পাণ্ডিত্য উভয়েরই আছে যথেষ্ট, কিন্তু সে পরিমাণে সুরেন্দ্রনাথের কার্যকরী সচেতনতা একেবারেই নেই, যে জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মনোবলও সে হারিয়েছে। কাশীনাথ নির্লিপ্ত পুরুষ হ'য়েও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে নির্বিকার নয়।

এবারে কাহিনীটিতে শরৎচন্দ্রের শিল্পায়ন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। 'বড়দিদি' শরৎচন্দ্রের অপরিণত লেখনীর রচনা বলেই হয়তো সর্বাঙ্গীনভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি। স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের পূর্ণ সক্রিয়তা অপেক্ষা সমালোচক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব 'বড়দিদি' গল্পে বিশেষভাবে অনুভব করি। বড়দিদি সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের মনোভাব বিশ্লেষণ, মনোরমা ও তার

স্বামীর পত্রালাপের মধ্যে মাধবীর চরিত্র-পর্যালোচনা, শান্তির স্বামী-ভক্তিতে উচ্ছ্বাস-প্রবণতা দেখাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নিপুণ শিল্পকার হ'য়ে উঠতে পারেননি; অথচ পাত্র-পাত্রীর মুখে ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ দান ক'রে এই 'বড়দিদি' গল্পেই তিনি স্রষ্টার নিরপেক্ষ আসন গ্রহণ করেছেন। দু'একটি ছোট্টকথা— "তুমিই বড়দিদি!" "আমি মাধবী।" "আঃ। তাই।" "বড়দিদি, যে কষ্ট!"— সুরেন্দ্রনাথ ও মাধবীর আবেগময় বিস্ময় এবং অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ করেছে। চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচকের মতো মতবাদ জ্ঞাপন করেছেন—এ জাতীয় প্রবণতা সৃষ্টি-ধর্মের লক্ষণ নয়। যেমন দেখা যায় মাধবীর বড় ভাই শিবচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে মাধবীর অন্তরের ঔদার্য বর্ণনা করায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে চরিত্রের বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে।

তা ছাড়া ঘটনায় অনিবার্য যোগসূত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে দু'এক স্থানে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর সাক্ষাতের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতো, যদি মাধবীর দাদা শিবচন্দ্র বা বউদির কুটিল প্রকৃতি এবং রুক্ষ ব্যবহারের জন্য সে তার দাদার সংসার ত্যাগ করতো। অবশ্য আত্মাভিমানিনী মাধবী বুঝেছিল দাদার সংসারে যেন কিসের একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বিরাজিত। তাই একদা সর্বময়ী-কর্ত্রী এ শ্রেণীর পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি ব'লেই শিবচন্দ্রের সংসার ত্যাগ করেছে। কিন্তু কাহিনীর এই পর্ব আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

'বাগান' পর্যায়ের রচনা হিসেবে 'বড়দিদি'র সংলাপ অনেক সমুন্নত এবং উপমা-প্রয়োগে পূর্বাপেক্ষা শরৎচন্দ্রের শিল্প-সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। ভাষা-প্রয়োগে গুরুচণ্ডালী-দোষ, একই শব্দের অতিপ্রয়োগ 'বড়দিদি' গল্পে সমভাবে বর্তমান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে বহু ত্রুটি এখানে দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে নূতনতর প্লট ও আঙ্গিকের বাহন হ'য়ে 'বড়দিদি' রচনা শরৎ-সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেছে। শুধুমাত্র গল্প-রস পরিবেশন অপেক্ষা পাঠক-চিত্তে স্থায়ী অনুরণন তুলে এই রচনাটি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রবণ চেতনার প্রতি মর্যাদা সম্পাদন করেছে।

(৫)

চন্দ্রনাথ

আঙ্গিক বিচার

"চন্দ্রনাথ" গ্রন্থটিকে শরৎচন্দ্র 'গল্প' নামে অভিহিত করেছেন—"চন্দ্রনাথ" গল্পটি আমার বাল্য রচনা।" চন্দ্রনাথের আদিরূপ যাতে প্রকাশিত না হয়, তার জন্যে শরৎচন্দ্রের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; তার প্রমাণ পাই, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন সময়ের পত্রাবলী থেকে। তিনি বার বার বলেছেন, গল্পটিকে পরিবর্তিত ক'রে প্রকাশ করবার জন্য; এমন কি নতুনভাবে লিখে দিতেও তিনি রাজী ছিলেন। পরবর্তীকালে রচনাটির মধ্যে পরিণত লেখনীর চিহ্ন মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।

'চন্দ্রনাথ' গল্প সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেন, "চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। এখন···এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত।···এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে কোনরূপ Immorality-র সংস্রব নাই।" এই উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে "চন্দ্রনাথ" প্রাথমিক অবস্থায় গল্প ছিল, শরৎচন্দ্র তাকে বড় ক'রে উপন্যাসের আকার দিতে গিয়ে গল্প ও উপন্যাসের মাঝামাঝি একটি মিশ্রিতরূপ দান করেছেন।

এবারে বিস্তৃতভাবে আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সমগ্র কাহিনীটি কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নায়ক-নায়িকা চন্দ্রনাথ ও সরযূর সাক্ষাৎকারের পূর্বে যে চন্দ্রনাথ-পরিচিতি লেখক বর্ণনা করেছেন, তা অত্যন্ত দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত। মনে হয় যেন কয়েকটি পরিচ্ছেদকে জোর ক'রে দু'পাতার মধ্যে পরিমিত রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। মণিশঙ্করের সঙ্গে বিবাদ কাহিনীকে গতি দিয়েছে সত্য, কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ বাদে অকস্মাৎ চন্দ্রনাথের প্রতি মণিশঙ্করের ঔৎসুক্যের কোনও সঙ্গতকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাহিনী সূত্রপাতে "কি একটা কথা লইয়া" যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল, চন্দ্রনাথ

ক্ষমা চাইতেও যার মীমাংসা হলো না—পরবর্তী কয়েক পরিচ্ছেদে এমন কোনও ঘটনার ইঙ্গিত পাইনা, যার দ্বারা মণিশঙ্করের মন চন্দ্রনাথ-মুখী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

এরপর চন্দ্রনাথের কাশীতে আগমন যেন মূল কাহিনীতে আকস্মিকভাবে অবতরণ। সেখানে সরযূ-মাতা সুলোচনার অত্যধিক যত্ন ও আতিথ্যে চন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও শেষে দশ বছরের সরযূর রূপে অভিভূত হ'য়ে বিবাহের প্রস্তাব কতদূর মনোবিজ্ঞান সম্মত, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। এরপরে সরযূকে বিবাহ ক'রে চন্দ্রনাথের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখী পরিবেশ আনয়নের ব্যর্থ চেষ্টা, সরযূর সদাশঙ্কিতভাব, যার মিলনেও সুখ নেই—ইত্যাদি ঘটনারাজির বর্ণনা আমরা ৫ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাই। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনীর গতি ভিন্নাভিমুখী হয়েছে। এই সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদে সুলোচনার জীবন-রহস্য প্রকাশ পেয়েছে এবং পরবর্তী ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী দ্রুত এগিয়ে গেছে একটা সমাপ্তির দিকে। এই কয় পরিচ্ছেদের ঘটনাবলীর মধ্যে পাই কৈলাস খুড়োর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য, চন্দ্রনাথ কর্তৃক সুলোচনা-রহস্য জ্ঞাত হওয়া, সর্বত্র এই রহস্য-প্রকাশ, সরযূকে বিষ খাওয়ার প্রস্তাব, সন্তানবতী হওয়ার অজুহাতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শেষে চন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ ক'রে সরযূর প্রস্থান। কাহিনী এখানে অনায়াসেই শেষ করা যেতো এবং গল্পের একমুখীন্ গতি নিয়ে "চন্দ্রনাথ" একটি সার্থক গল্প হ'য়ে উঠ্‌তো।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের কবিপ্রাণ সরযূর এই শান্তিবাচন উচ্চারণ ক'রে তৃপ্ত হ'তে পারেনি। তাই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একাদশ পরিচ্ছেদ থেকে। ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনীর গতি যেরকম দ্রুত লয়ে এগিয়ে গেছে, পরবর্তী দশটি পরিচ্ছেদে সেই গতি মন্থর হ'য়ে এসেছে। এ যেন ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিমানে গমন ক'রে অকস্মাৎ পদব্রজে যাত্রা!

১১শ পরিচ্ছেদে রাখালের জেল হওয়ার পর সুলোচনা-রাখাল কাহিনীর যবনিকাপতন। ১২শ পরিচ্ছেদে কৈলাস খুড়ো অত্যধিক প্রাধান্য পেয়েছেন এবং সরযূকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই কাহিনীর সম্মুখভাগে কৈলাস-

খুড়োকে আমরা দেখ্‌তে পাই। এর পরের কাহিনী চন্দ্রনাথের মানসিক স্থৈর্যের অভাব ও নির্লিপ্ততা, সরযূর পুত্র বিশুর জন্ম ও কাহিনীর গতি-পরিবর্তন। এর ফলে আমরা সরযূর জীবনের সমস্যাকে অকস্মাৎ যেন ভুলে যাই। এর পরবর্তী দুই পরিচ্ছেদ (১৫শ ও ১৬শ) কাহিনী চন্দ্রনাথ-সরযূকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এবং উভয়ের মিলনও এই পরিচ্ছেদে ঘটেছে। ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ পরিচ্ছেদও সরযূ-চন্দ্রনাথকে নিয়েই আবর্তিত কিন্তু তাদের মিলনে ও সুখী পরিবেশের মধ্যে সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান অনিবার্য হ'য়ে দেখা দেয়নি। একথা বলা যেতে পারে, সমস্ত গ্রামবাসী নিজেদের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছে এবং সরযূকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাঙালী সমাজ-জীবনে এই পরিণতি কতদুর স্বাভাবিক—এ প্রশ্ন পাঠক-মনে জাগ্‌বেই।

শরৎ-মানসের প্রবণতা যে ট্র্যাজিডির দিকে তার প্রমাণ, এই গ্রন্থের মিলনমূলক পরিণতির দিক্ পরিবর্তন। এরই ফলে দেখি, সরযূ-চন্দ্রনাথের মিলনে শরৎ-মানস যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ করলেন না; তাই শেষ পরিচ্ছেদে (২০শ) কৈলাস খুড়োর বিষাদময় পরিণতি ঘটিয়ে পাঠকের অশ্রুসজল দৃষ্টি কল্পনা ক'রে শরৎচন্দ্র যেন তৃপ্ত হলেন। কিন্তু আঙ্গিকের দিক দিয়ে এই পরিচ্ছেদটি অহেতুক।

আঙ্গিক বিচারে আর একটা দিক্ দেখা উচিত—চন্দ্রনাথ বা সরযূ চরিত্র বিবর্তিত হয়েছে কিনা! সত্যকার উপন্যাসে প্রধান চরিত্র শুধু আবর্তিত হয়না, তার বিবর্তন সহজেই নজরে পড়ে। আমাদের মনে হয়, চন্দ্রনাথ ও সরযূ চরিত্র স্থির। তাদের চরিত্র আবর্তিত হয়েছে একই স্থানে; তাতে চরিত্রের বিস্তার ঘটেছে বটে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। চন্দ্রনাথকে প্রথমে যে রূপে পাই সেই উদার-ধীর সংসার সম্পর্কে উদাসীন, কাহিনীর শেষেও সেই রূপেই দেখি। সরযূকে বিয়ে করা, তার সঙ্গে প্রণয়, তাকে ত্যাগ করা, অনুশোচনা, পুনরায় সরযূকে গ্রহণ করা ইত্যাদি ঘটনারাজির মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা কাহিনীগত যতটা, চরিত্রগত ততটা নয়। সরযূ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। প্রথম সাক্ষাতে সরযূকে দেখি স্বল্পভাষিণী, নম্র, শান্ত,

কাহিনী শেষেও দেখি তাই। এর মাঝের কাহিনী সরযূ ধনীগৃহে গৃহিণী হয়েছে, তার রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, সে চন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কৈলাসের গৃহে আশ্রয় পেয়েছে, শেষে চন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এত লাঞ্ছনার মধ্যে, বিপদের মধ্যেও তার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু একই স্থানে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। এটি উপন্যাস-বিরোধী লক্ষণ। তাই দেখি, নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিচার করলেও "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থের উপন্যাস-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

চন্দ্রনাথ-সরযুর প্রেম-প্রকৃতি

সরযুর প্রতি চন্দ্রনাথের আকর্ষণ খানিকটা আকস্মিক। কাশীতে সুলোচনার স্নিগ্ধ পবিত্র সৌন্দর্যে চন্দ্রনাথের মনে মাতৃ-স্মৃতি জেগেছে। তার ওপর আবার স্নেহ-যত্ন পেয়ে যেন খানিকটা কৃতজ্ঞতার বশে সরযুকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছে। এই বিবাহের পশ্চাতে নিছক প্রেম-প্রকৃতি কার্যকরী নয়। বিবাহের পর সরযুর প্রতি তার যে প্রণয়বোধ জেগেছে, তার মধ্যেও নরনারীর প্রেমের মধ্যে যে বিস্ময়বোধ, তার সম্পূর্ণ অভাব।

চন্দ্রনাথের প্রতি সরযুর যে প্রেম, তার পশ্চাতে কৃতজ্ঞতাবোধ যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই সরযুর জেগেছে শ্রদ্ধা। যদি চন্দ্রনাথ-সরযুর প্রেম-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি জানাতে হয়, এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য কাশীনাথের প্রতি কমলা অথবা সুরেন্দ্রের প্রতি মাধবীর যে প্রেম, তার থেকে ভিন্নজাতের। কমলার প্রেম শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত নয়, সে চায় প্রতিদান। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'লে সে হয় ক্ষুব্ধ; তার গর্বিত মন প্রতিদান-প্রত্যাশিনী। সুরেন্দ্রের প্রতি মাধবীর যে প্রেমবোধ, তাকেও ঠিক এই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু চন্দ্রনাথের প্রতি সরযুর যে প্রেম, তা শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত। সরযু ভুলেও কোনদিন চন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রতিদান আশা করেনি। সে বলে, "তুমি আমার

প্রতিপালক, আমি শুধু তোমার আশ্রিতা। তুমি দাতা, আমি ভিখারিণী।" ঠানদিদি যখন প্রশ্ন করেছে চন্দ্রনাথ তাকে কতখানি ভালবাসে, সরযূ বলেছে চন্দ্রনাথ তাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছে। সে নিজেকে কৃপাপাত্রী ভেবেছে, স্ত্রীর দাবি নিয়ে তার প্রকৃতি চন্দ্রনাথের প্রেম-মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গৌরবান্বিত বোধ করেনি। শরৎচন্দ্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—"তাহার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না,...হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় না।...কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার সন্ধান পাইল না।...সরযূর ভিতরেও সে ভালবাসা দেখিতে পাইল না।" এ শ্রেণীর প্রেম-প্রকৃতি আমাদের দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর প্রেমের সাদৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। আত্মদৈন্যের ফলে প্রেম সেখানে প্রতিদান-প্রয়াসী নয়।

সুতরাং চন্দ্রনাথ-সরযূর মিলনের পথে যে বাধা, তা সরযূর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য, চন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়। শরৎ-সাহিত্যে ট্র্যাজিডির যে প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়, তা পুরুষ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রে ক্রিয়াশীল, কিন্তু এখানে একটা বিপরীত দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাই। সরযূ যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলতে পারছে না, এর মূলে যে কারণই থাক না কেন, সরযূর শঙ্কিত স্বভাব যে মুখ্যত দায়ী, তা অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া সরযূর প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছে ব'লে চন্দ্রনাথ নিজে গর্ববোধ করতো—"...হয়তো বা এতদিনে কোন দুর্ভাগ্য দুশ্চরিত্রের হাতে পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিত, না হয়, দাসীবৃত্তি করিতে গিয়া শত অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিত;" অথবা—"...দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব তৃপ্তি বালিকা সরযূকে বিবাহ করিবার সময় একদিন আত্মপ্রসাদের ছদ্মবেশে চন্দ্রনাথের নিভৃত-অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শত চেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না"—ইত্যাদি উক্তি তার সাক্ষ্য বহন করে।

চন্দ্রনাথ কাশীনাথ-সুরেন্দ্রনাথ শ্রেণীর নির্লিপ্ত পুরুষ নয়, আবার দেবদাসের মত ছন্নছাড়া, উদাসীন প্রকৃতির নয়। এই দু'য়ের মাঝামাঝি প্রকৃতি

চন্দ্রনাথের মধ্যে সক্রিয়। চন্দ্রনাথ জমিদারীর অর্থ সম্পর্কে উদাসীন, বিষয়ী মন বলতে যা বোঝায় তা তার একেবারে নেই। এদিকে সে যে ভেবেচিন্তে বিচক্ষণের মতো কাজ করতে পারে, তা নয়। সেই ধৈর্যের সম্পূর্ণ অভাব তার চরিত্রে। তার প্রকৃতি প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে পড়েনি। তাই সে সরযূকে বিষ খাওয়ার প্রস্তাব করেছে, তাকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ভবিষ্যতে এর পরিণতি কি হ'তে পারে, সে কথা ভাবতে সে রাজী নয়। কিন্তু যখন সত্যসত্যই সরযূর অভাববোধ চন্দ্রনাথ অনুভব করেছে, তখন সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে, নিজের জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ ক'রে সে সরযূকে ফিরিয়ে এনেছে। এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিবাহের প্রস্তাবের পর পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের ব্যবহারের পরবর্তী অনুশোচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য "চন্দ্রনাথে" যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্বল; কারণ চন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কোন্ রহস্যের ইঙ্গিতে তার অনুকূল হ'য়ে উঠলো, যার জন্য সরযূকে পুনরায় গ্রহণ ক'রে তাকে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'লো না। এ বিষয়ে লেখক কোন যুক্তি দেখাতে পেরেছেন ব'লে বোধ হয় না। সরযূকে ত্যাগ করার পেছনে যেমন চন্দ্রনাথের সমাজসত্তা প্রাধান্য পেয়েছে, আবার সরযূকে গ্রহণ করার মধ্যে চন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা সক্রিয়। কিন্তু এই দুই সত্তার মূলে রয়েছে চন্দ্রনাথ-সরযূর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রনাথের উদার মন, উদাসীন ব্যবহার সুরেন্দ্রনাথের মতো অন্যমনস্কতার পর্যায়ে পৌছোয়নি বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির মূলে যে পুরুষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল।

সরযূ চন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াকে যেমন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে, তেমনি পুনরায় চন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত হ'য়েও আত্মহারা হ'য়ে পড়েনি,—"সরযূ এমন ভাবটি প্রকাশ করিল, যেন স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজিও আসিয়াছেন, হয় ত একটু বিলম্ব হইয়াছে, একটু বেলা হইয়াছে।" মায়ের ভুলের জন্য নির্দোষ মেয়ে কিভাবে বিড়ম্বিত হয়, চন্দ্রনাথ-

সরযুর প্রেম-প্রকৃতির অন্তরালে এই কারণও যথেষ্ট কার্যকরী। কিন্তু লেখক সরযু-চরিত্রাঙ্কনে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। সরযূর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আরও তীব্রভাবে আকর্ষণ করবার জন্য লেখক তাকে স্বভাব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছেন। তাই নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা দেখা যায়, সেই রস চন্দ্রনাথ-সরযূর প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে নেই। কিন্তু ট্র্যাজিডির স্বরূপ এখানে পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়, যখন দেখি চন্দ্রনাথ সরযূকে কাছে চেয়েও পাচ্ছে না সম্পূর্ণভাবে মিলতে। চন্দ্রনাথের প্রেম সরযূকে কেন্দ্র ক'রে উচ্ছুসিত হ'য়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু যে বিস্ময়জনক অনুভূতি প্রেমকে ঘনীভূত ক'রে তোলে তার অভাব এখানে সহজেই নজরে পড়ে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চন্দ্রনাথ-সরযুর প্রেম-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলছেন, "...দাসীর আচরণের সহিত স্ত্রীর আচরণটি সর্বতোভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। ...দাম্পত্যের সুনিবিড় পরিপূর্ণ সুখ কিছুতেই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে, এত যত্ন-আদরেও উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই সরিতে চাহিল না।" এই প্রকৃতিই শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে ট্র্যাজিডির মূল স্বরূপ।

চন্দ্রনাথ সরযূকে বাক্‌পটু দেখতে চায়। সরযূর মিতভাষ চন্দ্রনাথের প্রেমের উদ্দামতাকে শান্ত করতে পারে না। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সরযূর প্রতি হয়তো বিমুখ হ'য়ে উঠেছে, যার ফলে অত সহজেই সে সরযূকে ত্যাগ করতে পেরেছে। কিন্তু পরে বিশুর আগমন তাদের মিলন-বন্ধনকে দৃঢ় করেছে এবং তাদের প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে অভিনবত্ব আনয়ন করেছে। বিশুর জন্যই হয়তো চন্দ্রনাথ সরযূকে পুনরায় গ্রহণ ক'রে ফিরিয়ে এনেছে, কারণ সরযুর মাতৃত্বের সংবাদ চন্দ্রনাথের অজানা নেই। সুতরাং সরযূকে গ্রহণ করার পেছনে কতখানি চন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতি দায়ী এবং কতখানিই বা বিশুর আগমন দায়ী—তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে চন্দ্রনাথ বলছে, "আমি বিশুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।" আবার

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শারদ পূজার ষষ্ঠীর দিন যখন সে ঠান্‌দিদির মুখে শুন্‌লো, সরযূ আর একলা নয়, তাই টাকা পাঠান দরকার, তখন "ষষ্ঠীরদিন" স্মরণ ক'রে চন্দ্রনাথ বিদেশে যাওয়া স্থগিত রাখলো।

সরযূর পরিমিতভাষণ আমাদের কুন্দনন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। নগেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস কুন্দের নীরব প্রেমে তৃপ্ত থাক্‌তে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু কুন্দ-নগেন্দ্রের মধ্যে কোনও নবাগতের আগমন হয়নি এবং সূর্যমুখী বর্তমান ছিল। তাই উভয় প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাক্‌লেও পরিণতি অনিবার্য রূপেই ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। শরৎ-সাহিত্যে সাধারণত নারীর দিক্ থেকে প্রেমের জাগরণ ঘটেছে ব'লে প্রেম-প্রকৃতি 'রূপমোহে'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বিপরীত প্রকৃতির পরিচয় পাই ; তাই চন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে যেন 'রূপমোহে'র ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যায়। এর কারণ অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেম-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

কৈলাস খুড়ো ও বিশু-চরিত্রের সার্থকতা

চন্দ্রনাথ-সরযূর প্রেম-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক্ না কেন, "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থের অভিনবত্ব এই যে, শরৎচন্দ্রের এই যুগের রচনায় যেখানে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চিত্রিত হয়েছে সে ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে নবাগতের আগমন হয়নি, যে শিশু প্রেম-প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে পারে। কিন্তু এখানে দেখি বিশুর জন্ম সরযূ-চন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতির দিক্ পরিবর্তিত করেছে এবং তাদের মানসিক প্রবণতাকেও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করেছে ; হয়তো বিশুর জন্যই চন্দ্রনাথের মন সরযূর প্রতি আরও নিষ্ঠাশীল হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে বিশু-চরিত্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে যথেষ্ট।

তা ছাড়া বাৎসল্য রস-সৃষ্টির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে বিশু-চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে আর একটি বিশেষ দিকের অগ্রদূত, যে দিক্‌টি পরবর্তীকালে ছোটগল্পের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীকে দীর্ঘ করার

একাদশ পরিচ্ছেদে সরযূর গৃহত্যাগের পর মণিশঙ্করের বিনিদ্র রজনীযাপন এবং রাখাল ভট্টাচার্যকে কৌশলে জেলে পাঠান ইত্যাদি ঘটনারাজি মণিশঙ্করের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু পূর্বাপর সামঞ্জস্যবোধ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। যে মণিশঙ্কর একদিন সামান্য কারণে পৃথক্ হ'য়ে গিয়েছিল, সেই মণিশঙ্কর যখন সরযূকে বিদায় দিয়ে বলে "জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি"—তখন প্রশ্ন জাগে এ কি মণিশঙ্কর-চরিত্রের ক্রমবিকাশ? এই পরিচ্ছেদে (১৫ নং) মণিশঙ্করের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রার্থনা, সমাজ সম্পর্কে উত্তেজক বক্তৃতা আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগায়, বোধ করি সরযূকে যাতে চন্দ্রনাথ সহজে গৃহে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে, সেইজন্য শরৎচন্দ্র এইভাবে চরিত্রগুলির পরিবর্তনের দ্বারা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত দুর্বল। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে সরযূকে নিয়ে চন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘ দেড় পৃষ্ঠা ধ'রে মণিশঙ্করের সমাজ সম্পর্কে নীতিগর্ভ বক্তৃতা চন্দ্রনাথের বিস্ময় উৎপাদন করলেও, পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে।

ব্রজকিশোর বিষয়ীবুদ্ধি অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত। চন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় পেয়ে সে নিজেকে আশ্রিত ভেবেছে, আত্মীয় ভাবেনি। তাই চন্দ্রনাথের মঙ্গলকামনা ভিন্ন সে অন্য চিন্তা করতে পারেনি। স্ত্রী হরকালী তাকে উত্তেজিত করেছে, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্রের ঔদার্যের আর একদিকের পরিচয় ব্রজকিশোর-চরিত্র বহন করে।

হরকালী-চরিত্রটি শরৎ-সাহিত্যে এক বিশেষ শ্রেণীর নারী-চরিত্রের পূর্বাভাস সূচিত করে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গল্পেই একজন কুটিল কলহপ্রিয়া নারী-চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। হরকালী এই ধারার আগামীবার্তা শুনিয়েছে। দেবদাসের বউদি এই শ্রেণীর চরিত্র হলেও কাহিনীতে অত প্রাধান্য পায়নি। হরকালী স্বার্থপর, কুটিল এবং নারীসুলভ সুকুমার হৃদয়বৃত্তির চিহ্নমাত্র তার চরিত্রে নেই। সরযূ-সংক্রান্ত সংবাদ অবগত হ'য়ে তার যে আকুলি বিকুলি, তার মূলে স্বার্থবোধ যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। চন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রাকালে তার দুঃখ চন্দ্রনাথের বিপদ আশঙ্কা ক'রে নয়,

ব্রজকিশোর কেন সম্পত্তি লিখিয়ে নিল না তারই জন্য। চন্দ্রনাথের প্রতি তার যে দরদ প্রকাশ, তা নিজের স্বার্থবোধকে বজায় রাখবার জন্য। কিন্তু হরকালী সমাজ, ধর্ম সম্পর্কে সজাগ। চন্দ্রনাথ কর্তৃক সরযুকে পুনরায় গ্রহণ করাকে সে ভাল চোখে দেখেনি, তাই চন্দ্রনাথের গৃহ ত্যাগ করেছে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে একশ সত্তোর টাকা মাসোহারা নিতে তার সমাজবোধ সজাগ হয়নি।

সরযুর মা সুলোচনা বিধবা এবং সুন্দরী। নারীসুলভ স্নেহপ্রেম দিয়ে সে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। চন্দ্রনাথের মাতৃহীনতার শূন্যস্থানে সে মাতৃ স্নেহ-রস সঞ্চার করেছে। চন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে সে ভগবানকে ডেকে ক্ষমা চেয়েছে এবং সরযূর মঙ্গলার্থে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সে আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেয়নি। তাই সে চন্দ্রনাথের গৃহে কোনক্রমেই আশ্রয় নিতে রাজী হয়নি। যখন নিজের যৌবনের লজ্জাজনক কীর্তি প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, সুলোচনা সেই মুহূর্তেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। সাময়িক স্খলনের জন্য সে নিজের জীবনকে অভিশপ্ত মনে করেছে। এরপর আর কোথাও কাহিনীর মধ্যে তাকে আমরা পাইনা। শরৎ-সাহিত্যের শুধু "উদ্বোধন পর্বে" কেন, পরবর্তী রচনার মধ্যেও সুলোচনাই একমাত্র চরিত্র, যে সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও ভালবেসে গৃহত্যাগ করেছে। মাতৃত্ববোধের জাগরণে প্রেমের গতি যে একটি বিশেষ অভিমুখী হ'য়ে ওঠে, এ বিশ্বাস শরৎ-মানস তখনও উপলব্ধি করেনি। তা ছাড়া সুলোচনা শুধু জননী নয়, সে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, মাতৃ স্নেহ-রসে চন্দ্রনাথের হৃদয় সে পূর্ণ করেছে। এ তার বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, সত্যকার স্নেহবিগলিত হৃদয়ের প্রকাশ। তৎসত্ত্বেও সুলোচনা সমাজ-স্খলিতা। নারী-চরিত্রের এই অগভীর উপলব্ধি থেকেও "চন্দ্রনাথ"কে অপরিণত লেখনীপ্রসূত ব'লে অনুমান করা যেতে পারে।

হরিদয়াল ঘোষাল চন্দ্রনাথের পরিবারের পাণ্ডা। সে কাশীতে আগতদের আশ্রয় দেয় এবং সেই থেকে রোজগার ক'রেই তার সংসার চলে। সুলোচনাকে সে আশ্রয় দিয়েছে নিরাশ্রিতা জেনে এবং স্নেহ-যত্নের ত্রুটি

করেনি। সুলোচনা-রহস্য প্রকাশ পাবার পূর্ব পর্যন্ত তার চরিত্রের দৃঢ়তায় আমরা মুগ্ধ হই। সুলোচনার পরিচয় জেনেও সে তার সন্ধান করেছে তন্নতন্ন ক'রে। সরযুকে সে গৃহে আশ্রয় দেয়নি সত্য, কিন্তু তা রাগে এবং অভিমানে। কৈলাস খুড়োকে সে ভক্তি করতো এবং সরযূকে আশ্রয় দেওয়াতে প্রথমে সে যতই রাগ করুক্, শেষে তার ক্রোধের আর কোনও পরিচয়ই পাই না। তবে চরিত্রটির মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি।

রাখাল ভট্টাচার্য শ্রেণীর চরিত্র সমাজের বুকে বিচরণ করে, প্রেমের অভিনয় ক'রে সরলা নারীহৃদয় জয় করে, শেষে সর্বনাশের পথে নামিয়ে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রের পরিচয় এ যুগের রচনায় মথুরবাবুর মধ্যে খানিকটা পরিস্ফুট হ'লেও পরবর্তীকালে গোলক চাটুজ্জে শ্রেণীর চরিত্রে পরিণতি লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের মতে, নারী কখনও মন্দ হ'তে পারে না। অবস্থা বিপাকে তাকে মন্দ পথ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার সত্যকার হৃদয় জান্‌তে পারলে মুগ্ধ হ'তে হয়।

ঠান্‌দিদি চরিত্রটি যেন হরকালী-চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং সরযূ-চন্দ্রনাথের মিলনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে ঠান্‌দিদি চরিত্রের সার্থকতা খানিকটা আছে। তা ছাড়া নারী-প্রকৃতি সম্পর্কে পঞ্চম পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন, তার সার্থক প্রতিরূপ ঠান্‌দিদির মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ঠান্‌দিদি চন্দ্রনাথ ও সরযুর অব্যক্ত অনেক কথাকে ব্যক্ত করেছে, তাদের পরস্পরের মনোভাব জানাতে পাঠককে সহায়তা করেছে। সরলা, সহানুভূতিশীলা নারী-প্রকৃতির এক বিশেষ দিক্ ঠানদিদির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির প্রকাশ

এইবার আমরা শরৎ-মানসের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করবো। 'চন্দ্রনাথ' বাল্যরচনা ব'লে শরৎ-মানসের প্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেলেও তার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ এই গ্রন্থে ঘটেনি। এখানে শরৎচন্দ্রের সমালোচক মনটি অধিক

প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। সমাজ সম্পর্কে মতামত, তার ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে অহেতুক কটু মন্তব্য রচনার প্রসাদগুণ অনেকস্থলে ক্ষুণ্ণ করেছে। তা ছাড়া জীবন সম্পর্কে নানা তত্ত্বকথা প্রচার স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের প্রকাশকে ব্যাহত করেছে।

সুলোচনা-চরিত্রে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে মাতৃত্ববোধের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। সুলোচনা অবস্থার চাপে রাঁধুনীবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই যে অর্থনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত শরৎ-সাহিত্যে দেখি, তা প্রাক্ শরৎ-সাহিত্যে সহজে নজরে পড়ে না। চন্দ্রনাথ প্রচলিত সমাজ-রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সরযূকে বিয়ে করেছে। কিন্তু শরৎ-মানস এখনও সংস্কারমুক্ত হয়নি, তাই দেখি সরযূ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূতা; এমন কি সুলোচনা যার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে, সেই "প্রেমাস্পদ" পর্যন্ত ব্রাহ্মণ এবং যার গৃহে আশ্রিতা, সেও ব্রাহ্মণ। চন্দ্রনাথ ও সরযূর চরিত্রে যেন "আলো ও ছায়া" গল্পের যজ্ঞদত্ত ও তার স্ত্রীর প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। তবে "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থের সমস্যা আরও জটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্রের উপদেষ্টামনের পরিচয় পাই। এখানে শরৎচন্দ্র স্রষ্টা নন। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে কৈলাস খুড়োর কথাবার্তা এমনই স্বতঃস্ফূর্ত, এমনই স্বাভাবিক, তা যে সচেতন মনের প্রকাশ নয়, সহজেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে সৃষ্টির আবেশ মুহূর্তে মানবমনের অসীম রহস্যলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি, এই পরিচ্ছেদে নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোভাবের যে পরিচয়, তা এমন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেটা বক্তৃতা হ'য়ে ওঠেনি, সমাজ দ্রষ্টার পরিচয় বহন করেনি। সেখানে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গরস-সৃষ্টিতে পরবর্তীকালে যে সিদ্ধহস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সরযূর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশের চিত্র বর্ণনা, সরযূর রহস্য কিভাবে প্রতিবেশিনীদের মধ্যে আলোচিত হচ্ছিল, তাঁরই চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গরস-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় নিহিত আছে। এই সব ক্ষেত্রে কয়েকস্থানে শরৎচন্দ্র অহেতুক রূঢ় মন্তব্য করেছেন, যেটা তাঁর যৌবনোচিত অস্থির চিত্তের প্রকাশমাত্র।

সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সচেতন মনের বিকাশ ঘটেছে, "...সমাজই বা কে? সে ত আমি নিজে। ...যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি।" এসব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র স্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারেননি। এখানে তিনি মানবজীবনের দুঃখ-সুখের মাপকাঠিতে ভালমন্দ বিচার ক'রে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সমালোচনা করেছেন; কিন্তু যেখানে নরনারীর হৃদয়-রহস্যে অবগাহন ক'রে তার মর্মমূল উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রকৃত স্রষ্টা। কৈলাস খুড়ো চরিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা মনের পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

সংলাপ-উপমা-ভাষা

এই গ্রন্থের কাহিনী-সজ্জা আঙ্গিক পরিবেশনের দিক্ দিয়ে যতই দুর্বল হোক্ না কেন, সংলাপ রচনায় একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সরযূ বা তার মা সুলোচনা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেনি, তাদের নীরবতাই অনেক কিছু বক্তব্য ব্যক্ত করেছে এবং তারা পাঠকের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এর মূলগত কারণ তাদের সংলাপের পরিমিতিবোধ। চন্দ্রনাথের সংলাপ কয়েকক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের হ'লেও ভাবপ্রকাশের অনুগত পরিমিত সংলাপ ব্যবহৃত হ'লেও, সরযূ-রহস্য প্রকাশের পর নবম পরিচ্ছেদে সরযূ-চন্দ্রনাথের কথাবার্তা একান্তভাবে অতি নাটকীয় হ'য়ে পড়েছে, যার দ্বারা কাহিনীর রস তরলায়িত হয়েছে। কৈলাস খুড়ো, বিশু, হরকালী, ঠানদিদি প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথাবার্তা স্ব স্ব চরিত্রানুযায়ী অপূর্ব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে মণিশঙ্করের সংলাপে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার মিশ্রণ অধিক। তাই মণিশঙ্করের কথাবার্তায় স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে তা বক্তৃতায় পরিণত হয়েছে। সরযূর একটি উক্তি—"কাশীর গঙ্গা তো শুকায় নাই, সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও যায় না।" আমাদের দেবদাসের প্রতি পার্বতীর একটি উক্তি স্মরণ করায়—"দেবদা! নদীতে কত জল! এতেও কি আমার কলঙ্ক ঢাকা পড়বে না?"

সংলাপ নাটকের একটি প্রধান অংশ এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের ওপর নাটকের উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে। "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থের বহু স্থলে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের মধ্যে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি শক্তিশালী লেখনীর স্বাক্ষর বহন করে। সরযূকে বিবাহ করার প্রস্তাবের পূর্বে চন্দ্রনাথ যখন সুলোচনার কুলশীল জান্‌তে চাইলো, তখন অন্তরালে সুলোচনার অন্তর্যামীর নিকট কাতর প্রার্থনা এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া পাঠকের কৌতূহলকে আরও জাগ্রত ক'রে তোলে। আবার তৃতীয় পরিচ্ছেদে সরযূ অকারণে কেন ভয় পায়, চন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তরে সরযূ মনে মনে বলে, "...আর আমি? সে তুমি আজও জান না।..." যথেষ্ট নাটকীয় Suspense নিয়ে রচিত কিংবা চন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় যখন বল্‌লো, হয়তো তাদের বিয়ে কুল নিয়ে বা বংশ নিয়ে ভেঙে যেতো, সরযূ একথা শুনে শিউরে উঠেছিল। এই ব্যাপারও আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করে; এ শ্রেণীর নাটকীয় গুণ "চন্দ্রনাথ" কাহিনীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য সৃষ্টি করা অপেক্ষা বক্তব্যকে আরও আবেদনশীল ক'রে তোলাই শরৎচন্দ্রের অলঙ্করণের উদ্দেশ্য। এখানে কয়েকক্ষেত্রে অলঙ্করণ অসঙ্গত হ'য়ে পড়েছে বটে, তবে কয়েকক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের ফলে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। যেমন—"...গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা..." এই উপমা প্রয়োগের সাহায্যে সেকালে ও একালের তুলনা করা যথেষ্ট কষ্ট কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু শেষের দিকে—"এ বিশ্বের দাবা খেলায়, কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে।" —এ শ্রেণীর অলঙ্করণ স্বতঃস্ফূর্ত, তাই স্বাভাবিক, কিংবা—"যাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িতেছে, সে আর খানকত ইট-কাঠ বাঁচাইবার জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না।" বা—"অতি বড় দুর্ভাগারা যেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে খুঁজিয়া পায়না, সরযুর ভিতরেও সে তেমান ভালবাসা দেখিতে পাইল না।"—ইত্যাদি অলঙ্করণ সার্থক এবং সুন্দর।

কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত শিথিল, গতানুগতিক এবং অস্বাভাবিক হ'লেও কতকগুলি বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সরস, বাস্তব এবং উজ্জ্বল। এইসব ক্ষেত্রের বর্ণনাগুলি ছবির মতো আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। যেমন চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিশুর কার্যাবলীর বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। ষোড়শ পরিচ্ছেদের বর্ণনা কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি এবং চন্দ্রনাথের কাশী আগমনের পশ্চাতে যে তীব্র মানসিক অবস্থা স্পষ্ট হয়েছিল, তার কোনও প্রকাশ ঘটেনি।

ভাষার দিক্ দিয়ে বিচার করলে এই যুগের সব রচনার মত "চন্দ্রনাথে"র মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে 'গুরুচণ্ডালীদোষ' নজরে পড়ে। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। যেমন "পাঁচ টাকার হিসাবে কিছু পাঠাইলেই হবে।" তা ছাড়া একই শব্দের অহেতুক পুনরাবৃত্তি—যেমন "বড়", "কত" ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের ত্রুটি যেমন আছে, রচনাটির প্রসাদগুণও তেমনি আছে। তবে একটি প্রধান দোষ সহজেই নজরে পড়ে, তা হচ্ছে বয়সের হিসাব। সরযূর দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল (পৃঃ ৪) ; তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরু—"তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সরযূ বড় হইয়াছে।" চতুর্থ পরিচ্ছেদে শেষ পংক্তিদ্বয় থেকে প্রমাণ পাই, ছ' বছর কেটে গেছে, এবং সরযূর বয়স সতেরো। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি দেখি—"পনেরো ষোল বৎসর পূর্বে সুলোচনা তিন বছরের একটি মেয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে…।" তাকে আশ্রয় দিয়েছে হরিদয়াল তিন বছর হ'লো (পৃঃ ৫)। এদিকে সরযূ বলছে, "আমার যখন তিন বৎসর বয়স তখন বাবা মারা যান,…আমার যখন পাঁচ বছর বয়স,…আমাকে নিয়ে মা…" একটু পরে সরযূ বলছে, "সাত আটদিন আমরা ভিক্ষে ক'রে কোনরূপে থাকি।" দ্বাদশ পরিচ্ছেদে—"…এই তাহার (সরয) ষোল বছর বয়স…"—এইসব বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে সরযূর বয়স সম্পর্কে অসামঞ্জস্য সহজেই নজরে পড়ে।

(৬)

দেবদাস

"দেবদাস" 'বাগান' খাতার তৃতীয় খণ্ডের রচনা। 'বাগান' পর্বের রচনাগুলি অনুধাবন ক'রে জানা যায়, শরৎচন্দ্র 'বাগান' খাতায় অধিকাংশই ছোট গল্পের আঙ্গিকে রচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলি আঙ্গিকের দিক দিয়ে হয়তো নিখুঁত নয় তবুও 'বাগান' পর্যায়ের রচনাগুলিকে আমরা ছোটগল্পের অংশীভূত করেছি। 'দেবদাস'কে কিন্তু ছোট গল্পরূপে এককথায় সংজ্ঞাবাচক ক'রে তুলতে বেশ দ্বিধায় পড়তে হয়। কারণ 'দেবদাস' উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। সেজন্যই 'দেবদাসে'র আঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে আমরা 'দেবদাসে'র ছোটগল্প এবং উপন্যাস-লক্ষণের আপেক্ষিক বিচারে প্রবৃত্তি হয়েছি।

আঙ্গিক বিচার

'দেবদাস' রচনাটি যোলটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেবদাস-পার্বতীর জীবনলীলায় কাহিনী আবর্তিত। নবম পরিচ্ছেদ থেকে দেবদাসের জীবন বক্রগতি লাভ করেছে। অবশিষ্ট আটটি পরিচ্ছেদে কাহিনী দ্রুতবেগে ঘটনা-বাহুল্যের মধ্য দিয়ে পরিণতি অভিমুখী হয়েছে। ঘটনার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এই অনতিবিস্তৃত অংশটির প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু চুণিলালের সঙ্গে দেবদাসের ঘনিষ্ঠতা এবং দেবদাসের সঙ্গে চন্দ্রমুখীর সাক্ষাৎ ও তার প্রতিক্রিয়া। 'দেবদাস' যে আঙ্গিক নিয়ে বর্তমানে আবির্ভূত, সেই আঙ্গিকে উপন্যাসের লক্ষণই অধিক পরিস্ফুট। কিন্তু আমাদের মনে হয় 'দেবদাস'কে ছোট গল্পের আঙ্গিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলা যায় এবং শরৎচন্দ্রও হয়তো 'দেবদাস'কে ছোট গল্পরূপেই এক সময় সৃষ্টি করেছিলেন। 'দেবদাস' রচনাটিকে 'বাগান' খাতার তৃতীয়খণ্ডে 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' রচনার সঙ্গে উপস্থাপিত দেখা যায়। শুধু তাই নয়, 'দেবদাস'* যে শরৎচন্দ্রের অপরিণত বয়সের রচনা, তার প্রমাণ শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি থেকেই পাওয়া যায়। " 'শুভদা'—প্রথম

যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ ‘বড়দিদি,’ ‘চন্দ্রনাথ,’ ‘দেবদাস’ প্রভৃতির পরে।” ‘শুভদা’-উপন্যাস শরৎচন্দ্রের বাইশ বৎসর বয়সের রচনা। সুতরাং ‘দেবদাসে’র প্রকাশকালে রচনাকালের যে সময়-নির্দেশ পাওয়া যায় অর্থাৎ ১৯০০ সালের, তাতে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ‘দেবদাস’ রচনাটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপেই দেখা দেয়। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর কোন একটি পত্রে ‘দেবদাসে’র পুনর্লিখন সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। “ ‘দেবদাস’… পাঠিয়ে দিয়ো, আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব।” শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় তিনি তাঁর অপরিণত হাতের রচনা যথাযথ ছাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতেন। ‘চন্দ্রনাথ’ ও ‘কাশীনাথ’ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বহু চিঠিতে অসন্তোষই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ‘দেবদাস’টি সহজেই পুনর্লিখনের জন্ম হস্তগত করতে পেরেছিলেন ব’লে ‘দেবদাসে’র ব্যাপার নিয়ে শরৎচন্দ্রকে আর ব্যতিব্যস্ত হ’তে হয়নি। ‘হরিচরণ’ ও ‘বাল্যস্মৃতি’ রচনার সমসাময়িক ‘দেবদাস’ রচনায় শরৎচন্দ্র যে পুনরায় কলম ধরেছিলেন তা আঙ্গিক বিচারেই ধরা পড়বে।

‘দেবদাস’ রচনার প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেবদাস এবং পার্বতীর একসঙ্গে পাঠশালা গমন, দেবদাসের বালকসুলভ দুর্দান্ত চরিত্রের বিকাশ এবং বাল্যসঙ্গিনী পার্বতীর প্রতি অত্যাচার এবং স্নেহের বিবিধ প্রকাশে পরিপূর্ণ। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেবদাস ও পার্বতীর জীবন জটিল পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত হ’তে থাকে। দেবদাস বিদ্যার্জন করতে যায় কলকাতায়, পার্বতীর সঙ্গীহীন জীবন দুর্বহ হ’য়ে ওঠে। কিন্তু উভয়েই কৈশোর অতিক্রম ক’রে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এদিকে দেবদাস-পার্বতীর বিবাহ ব্যাপারে কুলমর্যাদার প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ দেবদাসের পিতা জানালেন অমত। পার্বতীর পিতাও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক’রে ফেলতে ত্রুটি করলেন না। দেবদাস-পার্বতীর জীবনে দেখা দিল নিরাশার বেদনা। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত থেকে

রক্ষা পাবার আশায় পার্বতী শেষ আবেদন জানালো দেবদাসের পুরুষোচিত প্রেমের কাছে। দেবদাসের চরিত্রবল দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো, পার্বতী দেবদাসের অকস্মাৎ কলকাতায় প্রত্যাবর্তনে মর্মান্তিকভাবে আহত হলো— "...কঠোর মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।" দেবদাস পার্বতীর পুর্ব-প্রস্তাব অনুসারে যখন তাকে গ্রহণ করতে উদ্‌গ্রীব হ'লো, সে তখন পার্বতীর কাছে হ'লো প্রত্যাখ্যাত। একদিকে পার্বতীর দর্পিত, আহত, অভিমান-ক্ষুব্ধ ভালবাসা, অন্যদিকে দেবদাসের অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিহ্বলতা—এই অবস্থার মধ্য দিয়েই পার্বতী ভুবন চৌধুরীর গৃহে বধূরূপে হ'লো প্রতিষ্ঠিত। অষ্টম পরিচ্ছেদের এই অংশেই শরৎচন্দ্র ছোট গল্প হিসেবে 'দেবদাস' রচনায় সমাপ্তির রেখা টেনে দিতে পারতেন। কারণ দেবদাস-পার্বতীর জন্য পাঠক-মনের উৎকণ্ঠাটুকু তীব্রভাবে বর্তমান। কিন্তু পাঠক-মনের এই উৎকণ্ঠার নিরসন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র 'দেবদাস' রচনার আঙ্গিক ক'রে তুলেছেন উপন্যাস-ধর্মী।

'বাগান' খাতায় 'দেবদাসে'র স্বরূপ কি ছিল আমাদের জানা নেই বটে, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই রচনা বর্তমানের মতো বিস্তৃত এবং জটিল জীবন পর্যালোচনায় বিধৃত ছিল না। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, 'বাগান' পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে কাহিনী হিসেবে 'দেবদাস' অভিনব এবং বৈশিষ্ট্যপুর্ণ (চন্দ্রনাথ ছাড়া)। তা ছাড়াও এই প্লট শরৎচন্দ্রের অপরিণত কবি-মানসে রূপ পরিগ্রহ করবার পক্ষে যুক্তি আছে যথেষ্ট। কিন্তু নবম পরিচ্ছেদের পরবর্তী দেবদাস-চন্দ্রমুখী কাহিনীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বভাবতই মন প্রশ্নসঙ্কুল হ'য়ে ওঠে। এই কাহিনীর বিস্তৃত অবতারণা 'দেবদাস' রচনার পুনর্লিখন কালে প্রযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। দেবদাস-চন্দ্রমুখী কাহিনীতে ভাষা, সংলাপ এবং বর্ণনাভঙ্গী নিখুঁত শিল্পের পরিচয় বহন করে না বটে, তথাপি শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক রচনার ভাবপ্রবণতার প্রাচুর্য এই অংশে ভাব-গভীর এবং জটিল অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই আমাদের মনে হয় 'দেবদাস' রচনাটি প্রকাশকালে শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রজ্ঞা সহযোগে জীবনানুসন্ধানের

ফল-স্বরূপ দেবদাস-চন্দ্রমুখী কাহিনী মূল প্লটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তটিকে ভিত্তি ক'রে 'দেবদাস' রচনাটিকে অষ্টম পরিচ্ছেদেই একটি পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প ভেবে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া 'দেবদাসে'র সম-সাময়িক রচনা 'বাল্যস্মৃতি' এবং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত বাল্যকাহিনীর বিস্তৃত অনুশীলন-রূপে 'দেবদাস' রচনার পূর্বার্ধ ছোট গল্পের আঙ্গিকে সীমায়িত হতে পারে। 'বাল্যস্মৃতি'র সুকুমার-চরিত্রের সঙ্গে দেবদাস-চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বাল্যকালে নিতান্ত পড়ুয়া শান্ত ছেলে ছিলেন না। সুকুমার এবং দেবদাস উভয়েই গুরুজনের শাসনে দমিত না হ'য়ে সর্বপ্রকার যথেচ্ছচারিতায় আত্মনিয়োগ করেছে। দু'জনেরই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হ'য়ে অবশেষে গুরুজনেরা সহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং 'বাল্যস্মৃতি'র সুকুমার নূতনতর কাহিনী-পরিকল্পনায় দেবদাস-রূপে যে রূপান্তরিত হয়নি, এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। তবে এখানে পার্বতীর আবির্ভাব সম্পূর্ণ নতুনভাবে পাঠকের মনকে আন্দোলিত করেছে। দেবদাস ও পার্বতীর শিশুসুলভ চাপল্যের মধ্য দিয়ে পরস্পরের অজ্ঞাত আকর্ষণ যে ভাবে "প্রেম-রূপ" ধারণ করেছে, তা 'বাগান'-পর্যায়ে সম্পূর্ণ অভিনব। বাল্য-প্রণয়ের এই চিত্রে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনালেখ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রামাণিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের শৈশব কেটেছে কখনো মাতুলালয়ে, কখনো হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। গ্রামে তাঁর পাঠশালার সঙ্গিনী ছিল 'রাজলক্ষ্মী' নাম্নী একটি মেয়ে। শরৎচন্দ্রের মতো দুঃসাহসী, 'ডানপিটে' ছেলের প্রধান উৎসাহ-দাত্রী এবং সহচরী ছিল এই মেয়েটি। ঝোপের আড়ালে বসে মাছধরা থেকে আরম্ভ ক'রে, ছিপের বাঁশ সংগ্রহ করা, পরের বাগানে ফল চুরি ক'রে খাওয়া সর্ব-ব্যাপারে এই মেয়েটি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে থাকতো এবং সুবিধামতো মিথ্যা কথার আশ্রয়ে শরৎচন্দ্রকে অনিবার্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতো। পার্বতী দেবদাসের হাতে প্রহৃত হ'য়েও সত্যকথা গোপন করেছে পণ্ডিত মশাইয়ের নামে দোষারোপ ক'রে—এই ঘটনা শরৎচন্দ্র ও তাঁর বাল্যসঙ্গিনী

'রাজলক্ষ্মী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবদাস-পার্বতীর বাল্যের নিরবচ্ছিন্ন বেপরোয়া স্বাধীন জীবনের কাহিনীভাগে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র স্রষ্টার আসনে আরোহণ ক'রে সেই ব্যক্তিগত কাহিনীকেই সাহিত্যের সর্বজনীন সত্যে উন্নীত করেছেন।

তা ছাড়া, তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য-প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কিছু ছিলই। সেদিক দিয়েও বাল্যপ্রণয়ের অভিশাপ দেবদাস-পার্বতীর জীবনকে দুঃখের নিগড়ে বেঁধে দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারতো। দেবদাস-পার্বতীর মিলন না হওয়ায় তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি ভাবে তীব্রতর রূপে অভিশপ্ত হ'য়ে উঠলো, তা জানাতে গিয়েই শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক মন্থরতায় 'দেবদাস' রচনায় ছোট গল্পের মান অতিক্রম করেছেন। পরবর্তীকালে "পল্লীসমাজ" উপন্যাসে আবার বাল্যপ্রণয়কে ভিত্তি ক'রেই শরৎচন্দ্রের জীবন-দর্শনের অন্য দিক পরিস্ফুট হয়েছে।

'দেবদাস' রচনার অপরার্ধের আঙ্গিক পর্যালোচনায় শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"আমি ত কোন প্লট ভেবে লিখতে বসি না। একটা কোন চোখে দেখা সত্য ঘটনা অথবা একটা ঘর-সংসারের চিত্র নিয়ে শুরু ক'রে দিই—তারপর কলম চলতে থাকে। কলম আমাকে যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে চলে যাই। তাতে যা হোক একটা কাঠামো দাঁড়ায়।" সুতরাং গল্প-উপন্যাস রচনাকালে শরৎচন্দ্রের যে বিশেষ সর্তকদৃষ্টি আঙ্গিক-পরিকল্পনায় ছিল না তা বোঝা যাচ্ছে। 'দেবদাস' রচনার পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধের শিল্পায়ন-বৈষম্যই আঙ্গিক-বিচারে নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করেছে। নবম পরিচ্ছেদ থেকে একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে দেবদাসের মৃত্যু পর্যন্ত দেবদাস-চন্দ্রমুখী কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। দেবদাসের উচ্ছৃঙ্খল-উদাসীন চরিত্রের জন্য ক্রমশঃ ভীষণ রোগাক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যু-সান্নিধ্যে পৌঁছোবার পূর্বে সে চন্দ্রমুখীর প্রেম-দ্বারা হয়েছে অভিষিক্ত। পার্বতীর আবির্ভাব মাঝে মাঝে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ঘটেছে। শেষ পরিচ্ছেদে পার্বতীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে দেবদাসের মৃত্যু হয়েছে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে। এখানে একদিকে

যেমন দেবদাস-পার্বতীর বাল্যপ্রণয়ের মহিমা এবং গভীরতা সূচিত হয়েছে, অন্যদিকে সমাজ-স্খলিতা চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে প্রাণপণে ভালবেসেও অধিকারটুকুই স্থাপন করতে পারেনি, সে কথাও স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। দেবদাস-পার্বতী সমাজ-অসমর্থিত বিবাহে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারেনি। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কার ও নিষ্ঠা দ্বারা 'দেবদাস' 'বাগান' পর্বের অন্যান্য রচনার সমপর্যায়ভুক্ত। শরৎচন্দ্র তাঁর অপরিণত, অপরিপক্ক সাহিত্য-সাধনায় সমাজকে মেনেই চলেছেন—শুধু বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, সমাজের প্রীতিহীনতার প্রতি মৌখিক প্রতিবাদের সুর তুলেছেন; কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। বিবাহিতা পার্বতী ও উচ্ছৃঙ্খল দেবদাসকে নিয়ে কাহিনী যদি ক্রমশঃ এগিয়ে যেতো তবে একদিকে যেমন সামাজিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, অন্যদিকে কাহিনী-ভাগও ক্রমশঃ বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়তো। সুতরাং দেবদাসের মতো অপরিণামদর্শী, উদাসীনকে ভালবাসার দ্বারা বারে বারে বাঁচাতে গিয়ে চন্দ্রমুখী আখ্যানভাগের অপরার্ধে প্রধানরূপে প্রতীয়মান। কিন্তু চন্দ্রমুখী সাধারণ গৃহস্থ মেয়ে নয় কেন? 'দেবদাস' রচনায় চন্দ্রমুখী-কাহিনী যে পরবর্তী সময়ে যুক্ত এবং শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যের পরিচায়ক তা চন্দ্রমুখী "বিশেস পরিবেশের" মেয়ে ব'লেই আমরা প্রমাণ করতে উৎসাহী হয়েছি। একসময় শরৎচন্দ্র বাঙ্লা দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সমাজ-স্খলিতার নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের এই কষ্টকর জীবন-গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেন। সুতরাং এই অভিজ্ঞতাকে নির্ভর ক'রেই চন্দ্রমুখী-চরিত্রকে দেবদাসের জীবনে শরৎচন্দ্র মঙ্গলময়ী ক'রে তুলেছিলেন। চন্দ্রমুখী চরিত্র-সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা-প্রসূত ব'লেই মনে হয়।

নবম পরিচ্ছেদ থেকে ষোড়শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আখ্যানভাগ প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিক শিল্পায়নে ক্রমবিবর্তিত। দেবদাসের চুণিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ, চন্দ্রমুখীর সান্নিধ্যে দেবদাসের নূতন অভিজ্ঞতা লাভ, তার মদ্য-গ্রহণ, মদ্য-পানে মাত্রাধিক্য হওয়াতে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তার গৃহেই বাস করা ইত্যাদি

ঘটনা এবং পার্বতীর শ্বশুরালয়ের বর্ণনা পাঠককে বিচিত্র রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবদাসের পিতার মৃত্যু এই অংশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ দেবদাসের সঙ্গে পার্বতীর পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই। এর ফলে একদিকে চন্দ্রমুখী-দেবদাস কাহিনীতে বেগ সঞ্চারের চেষ্টা দেখা যায়, অন্যদিকে পার্বতীর উপস্থিতিতে উপন্যাসগত আঙ্গিকের পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। এমনিভাবে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেবদাস-চন্দ্রমুখীর পুনর্দর্শন, চতুর্দশ পরিচ্ছেদে পার্বতীর গৃহস্থালীর বিস্তৃত পরিচয় দান এবং দেবদাসের জন্য পার্বতীর উৎকণ্ঠা পরপর ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি পরিচ্ছেদ কেবলমাত্র দেবদাস-পার্বতী অথবা দেবদাস-চন্দ্রমুখীর সুদীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে চন্দ্রমুখীর সহর ত্যাগ ক'রে গ্রামে বাস, রুগ্ন দেবদাসকে খোঁজবার জন্য পুনরায় সহরে আগমন, কাহিনীর অগ্রগতি-দানে যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এরপর বায়ু পরিবর্তনের সূত্র ধরে দেবদাসের পুনরায় চরিত্র স্খলন ও স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মধ্য দিয়ে কাহিনীভাগ পরিণতি অভিমুখী হ'য়ে উঠেছে। চন্দ্রমুখীর কাছ থেকে দেবদাসের চিরবিচ্ছেদ ছাড়া কাহিনীতে দেবদাসের মৃত্যু অনিবার্য হ[illegible] উঠতো না। কারণ চন্দ্রমুখী 'ভালবাসার ব্যবসা' ক'রে নয়, সমর্পণ ক'রে দেবদাসের ক্ষত-বিক্ষত লিভারটাকে কিছুতেই অকর্মণ্য হ'তে দিচ্ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে পার্বতীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে দেবদাস মরণ-পণ ক'রে ছুটে এসেছে, কিন্তু পার্বতীর সেবা পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। পাঠকের প্রতি শরৎচন্দ্র দেবদাসের মতো হতভাগ্যের জন্য অশ্রুবিন্দু মোচন করতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, এই শেষ পরিচ্ছেদটিকে করুণ রসে চূড়ান্তভাবে আর্দ্র ক'রে তুলতে শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছেন। বাঙালী-পাঠক হৃদয়ের ভাবপ্রবণ অনুভূতির প্রত্যেক স্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত ক'রে শেষ পর্যন্ত তিনি এক অকৃতার্থ জীবনের প্রশস্তি গান গেয়েছেন। এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপসংহারের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। 'বড়দিদি',

'চন্দ্রনাথ' এবং 'দেবদাস' অর্থাৎ 'বাগান' পর্বে যে রচনাগুলি উপন্যাসের বিস্তৃতি এবং চারিত্রিক ক্রমবিবর্তনে সংশ্লিষ্ট, পরিণতিতে সব ক'টি রচনাই করুণ-রস ধারায় সিঞ্চিত। বাঙ্‌লা সাহিত্যের মানদণ্ডে কাহিনী ও চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণাম এখানেই অনুবিদ্ধ। সামগ্রিকভাবে 'দেবদাস' রচনার ট্র্যাজিক রসসৃষ্টি পার্বতীর বিবাহ-পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। দেবদাসের সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর দুঃখে আমরা বিগলিত হই, কিন্তু চন্দ্রমুখীর কথা তখন মনের কোণে একবার দেখা দেয় কি? দেবদাস-পার্বতীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনায় আমরা অভিভূত হই, চন্দ্রমুখীর স্বার্থহীন ত্যাগ-মহিমা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেগ করে। এই বিস্ময় রসই ট্র্যাজিডির অন্যতম পরিপোষক। দেবদাস-পার্বতী পাঠককে অশ্রুভারাক্রান্ত করেছে, কিন্তু চন্দ্রমুখী পাঠকের রুদ্ধ আবেগকে বিস্ময়ে পরিমণ্ডিত ক'রে আত্ম-মহিমায় প্রতিষ্ঠ হ'য়ে কাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছে। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি শরৎচন্দ্র ট্র্যাজিডির মহিমাটুকু চন্দ্রমুখীকে দান করেছেন।

দেবদাস-পার্বতীর প্রেম-প্রকৃতি

'দেবদাস' উপন্যাসের নায়ক দেবদাসকে আমরা জেনেছি শৈশবের পাঠ্য অবস্থা থেকেই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ণ জীবন আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, সুতরাং দেবদাসের চারিত্রিক বিবর্তন ঘটনাগত প্রভাবে যে সম্পন্ন হয়েছে, তা'ও খুব প্রত্যক্ষভাবেই পরিস্ফুট। সেজন্যই দেবদাসকে ঠিক কাশীনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্রের সমজাতীয় বলা যায় না। শেষোক্ত তিনটি চরিত্রের আবির্ভাব পরিণত বয়সের ভিত্তিতে। তাই তাদের চারিত্রিক বিকাশ এবং পরিণতির সর্বাঙ্গীন স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তবুও শরৎ-সাহিত্যের পুরুষ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যটুকু অপেক্ষাকৃত কম হলেও দেবদাসের চরিত্রে ঘনীভূত হয়েছে। শুধু তাই নয় শরৎচন্দ্র দেবদাসকে কেন্দ্র ক'রে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতি বিশ্লেষণে কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করেছেন। দেবদাসের জীবনকে ঘিরে যে দুটি নারী বৃহৎ দুটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, তার

অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-সন্ধানে শরৎচন্দ্রের ঐ সৃষ্টি-মাধুর্যের পরিচয় আমাদের কাছে সহজ হ'য়ে উঠবে।

অস্থিরমতিত্ব, অপরিণামদর্শিতা, ইচ্ছাশক্তির তীব্র আবেগে উদ্দেশ্যকে মুহূর্তে কাজে পরিণত করা, দেবদাস-চরিত্রে শিশুকাল থেকেই অঙ্কুরিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছে। অপরিণামদর্শিতার ফলেই উত্তর-জীবনে সে হ'য়ে পড়েছে উদাসীন প্রকৃতির। চরিত্রের এই ঔদাসীন্য দেবদাসের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে আসক্তিহীনতা বা নির্লিপ্ততার পরিচায়ক নয়। ব্যবহারিক মন সজাগ না হ'লে মানুষ যেমন সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন হ'য়ে পড়ে, নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অসতর্ক হয়, দেবদাসের ঔদাসীন্য সে জাতীয়। সে নির্ভীক, স্বাধীন, উদ্দাম অথচ চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন এবং সেজন্যই আত্মসচেতনহীন। আত্মসচেতন-হীনতার জন্য দেবদাস শিশুকালে যেমন অক্লেশে নির্যাতন সহ্য করেছে, তেমনি পরিণত বয়সেও আত্মমর্যাদার প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। সে তার উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা অপরের মনে দিয়েছে দুঃখ, নিজেকে টেনে নিয়ে গেছে ধ্বংসের দিকে, যাপন করেছে অসম্মানিত জীবন।

দেবদাসের জীবনে পার্বতীর আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পার্বতী তার একান্ত অনুগত বাল্যসঙ্গিনী রূপে কাহিনীর প্রারম্ভ থেকেই দেখা দিয়েছে। দেবদাসের মতো সেও প্রকৃতগত অশান্ত এবং স্বাধীন মনোভাব-সম্পন্ন। পার্বতী তার নানাবিধ খেয়ালকে সমর্থন এবং সহায়তা করেছে এমন কি দেবদাসের দুর্দান্ত চঞ্চল প্রকৃতির সর্বপ্রকার অত্যাচার নিজেও অনেক সময় বহন করেছে। এমনিভাবে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মাঝে মাঝে পার্বতীকে অকারণে লাঞ্ছনা দিয়ে দেবদাস স্বগৃহে প্রচুর শাস্তি ভোগ করেছে, কিন্তু সেজন্য পার্বতীর কাছে সে জবাবদিহি চায়নি। দেবদাসের অবচেতন মনে "পারু"র জন্য স্নেহের বীজ কোন্ অবসরে প্রোথিত হয়েছিল তা দেবদাস নিজেই জানে না। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ এত গভীর হ'য়ে উঠেছিল যে, উভয়ের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে একে অন্যকে করেছে প্রতিবিম্বিত।

শৈশব অতিক্রম্ ক'রে দেবদাস-পার্বতী কৈশোরে পদার্পণ করেছে,—লজ্জা-সঙ্কোচ, অর্ধ-উচ্চারিত কথা ও আবেদনের মধ্য দিয়ে উভয়েই পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে যেন কিছু দূরে সরে গেছে। "দেবদাস···ডাকিল, "পারু!"··· পার্বতী চমকিত হইয়া উঠিল,···"কি হচ্ছে পারু?" সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই—তাই পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর দেবদাসের লজ্জা করিতে লাগিল—কহিল, "যাই, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। শরীরটা ভাল নয়।" দুর্দান্ত দুটি শিশু-প্রকৃতি কৈশোরের কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এই সঙ্কোচ-দ্বিধাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে চলেছে। একি উভয়ের প্রেমবোধেরই পূর্বাভাস? লজ্জা-সঙ্কোচের মধ্য দিয়ে দুজনের ভেতরে যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রথম দুঃখ পেয়েছে পার্বতী। কিন্তু পার্বতীর এই দুঃখবোধ ঠিক প্রেমঘটিত কিনা তার স্পষ্টতর আভাস কাহিনী ভাগে নেই। দেবদাসের বিদেশবাসের ফলে তাদের শিশুসুলভ চাপল্যের অবকাশ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। আমাদের মনে হয়, পার্বতী সেই শৈশবের মধুর দিনগুলির সঙ্গে বর্তমানের অসামঞ্জস্যে হয়েছে ব্যথিত। দেব-দাদার সঙ্গে নিশ্চিন্ত-নির্বাধ জীবন-যাপন আর ঘটে ওঠা সম্ভব নয় ব'লে রুদ্ধ আবেগ বক্ষে পোষণ ক'রে পার্বতী বিচলিত হয়েছে। দেবদাস এবং পার্বতীর মধ্যে যে একটা নিগূঢ় মনের সংযোগ রয়ে গেছে, তা জানে উভয়েই। শৈশবোচিত পারস্পরিক আকর্ষণে যে আবিলতাহীন, স্বার্থবুদ্ধিলুপ্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়, পার্বতী-দেবদাসের মধ্যেও সে জাতীয় অনুভূতি বিশেষ গভীরভাবেই স্থান পেয়েছে। একে ঠিক সংজ্ঞা-নির্ধারিত 'প্রেম' বলা যায় না।

সহরে যাবার পর থেকে দেবদাসের চরিত্রের পরিবর্তন বেশ সুপ্রকট-ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—পার্বতীর পরিবর্তে "সমাজের কথা, রাজনীতি-চর্চা, সভাসমিতি—ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা" দেবদাসের মনকে ক্রমশঃ অধিকতর আকৃষ্ট করায়—"পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল।" —নারী-প্রকৃতি এমনি বটে। শরৎচন্দ্র এই কিশোর-কিশোরী দুটিকে অবলম্বন ক'রে নর-নারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক রূপায়িত করেছেন। পুরুষ

সমাজের উপরিভাগের জীব, বিভিন্ন অবস্থার আবতে আবর্তিত হয়ে স্বচ্ছন্দে সে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়। কেউবা জীবন-প্রবাহের আবর্তে অতলতলে যায় ডুবে, কেউবা প্রবহমানতায় বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়। অতীতের মোহে পুরুষ আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে না। আর নারী কিছুতেই পারে না তার অতীতের স্মৃতিকে ভুলতে। অতীতের প্রতি নিষ্ঠা রেখে নারীই সর্বাংশে সমাজ-নিষ্ঠ হ'য়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে সে অত্যন্ত রক্ষণশীলা। বাঙালীর জাতীয়জীবনে নর-নারীর এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে অনুবিদ্ধ। পুরুষ নূতন যুগের আবির্ভাবে যুগকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু নারী তার গৃহজীবনে বর্তমানকে স্বীকার ক'রেও অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই বর্তমানকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় চিত্তদীর্ণ দীর্ঘশ্বাসে নারী-সমাজের আকাশ বাতাস-পরিবৃত। পার্বতীও হারিয়ে ফেলেছিলো তার অতীতের তিক্ত-মধুর স্মৃতিকে, সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসকে। কারণ দেবদাসের —"বাল্যস্মৃতি জড়িত দুই একটা সুখের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না তাহা নয়,—কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে সকল আর বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।" দেবদাসের এই অতীত বিস্মৃতিই পার্বতীর সকল দুঃখের কারণ হ'য়ে উঠেছে।

সময়ের দ্রুত প্রবাহে পার্বতী যৌবন-প্রাপ্তা এবং আত্ম-সচেতনতা তার দেবদাসের চেয়ে আগেই দেখা দিয়েছে। এই সময় পারিবারিক কুল-মর্যাদার পরাকাষ্ঠা নির্ধারিত করতে গিয়ে দুটি হৃদয়কে নিষ্ঠুরভাবে স্বস্থানচ্যুত হ'তে হয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিধানের নিয়ন্ত্রণে ঘটনাগত প্রভাব পার্বতী-দেবদাসের হৃদয়ের অপরিস্ফুট ভাবকে প্রকাশ করেছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-কুশলী পরিচয় এখানেই প্রমাণিত হয়। আশৈশব পার্বতী দেবদাসের পাশে থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে। তার ফলে দেব-দাদার ওপর পার্বতীর বেশ আধিপত্য জন্মেছে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু এই অধিকারের সূত্র ধরে তার অন্তরের দাবি যে কখন বড় রকমের দাবিতে পর্যবসিত হয়েছে, তা পার্বতী নিজেই জানতে পারেনি। তাই—"আজ এই হারানোর কথা উঠিতেই, তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা

ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।" বিবাহের বন্ধন ছাড়া তাদের সেই বাল্য এবং কৈশোরের সম্বন্ধ একমুহূর্তে অস্বীকৃত হ'য়ে যাবে "এই সংবাদটা···পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।" দেবদাসের কাছে এই বিবাহ না হবার সংবাদ খুব তীব্রতর আকারে ফুটে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র কাহিনীভাগে অন্ততঃ এমন কোন আভাস দেননি। দেবদাসের মতো চরিত্রের পুরুষ অবস্থার দাস—ভাগ্যের ক্রীড়নক। এজন্য তাদের চরিত্রের সামঞ্জস্য সহজেই স্খলিত হয়—এখানেই তাদের যত ঔদাসীন্য। দেবদাস যতই মনে করুক না কেন—"সেই পার্বতী এই পার্বতী হইয়াছে"।—তা গভীর অনুভূতি-সঞ্জাত নয়। শিশুকালের একনিষ্ঠা ও দেব-দাদা-অন্ত প্রাণ নিয়ে এখনও পার্বতী দেবদাসের ঘরের আলোক-দীপ্ত জানালার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যে অভিমানী পার্বতী দেবদাসের নিষ্ঠুর প্রহার সহ্য করেছে, সেই পার্বতী এখনও "সে যে ক্লেশ সহ্য করিতেছে, ঘুণাক্ষরে একথা কেহ না বুঝিতে পারে, পার্বতীর ইহা কায়-মনচেষ্টা।···সহানুভূতি সহ্য হইবে না—" পার্বতী দর্পিতা এবং গর্বিতা। শৈশবের অশান্ত এবং দুর্দমনীয়তা তাকে এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে দীক্ষিত করেছে।

নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক উক্তিতে পার্বতী সখী মনোরমাকে জানিয়েছে তার স্বামী হবার যোগ্যতা আছে একমাত্র দেবদাসের। কিন্তু এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠাপূর্ণ উক্তির সাহস সে পেলো কোথায়? সমাজ বাধা দিয়েছে, দেবদাস তো দূরে সরেই আছে। তার কাছে কিন্তু দেব-দাদার এই দূরে সরে থাকা বাড়ী আর বাঁশবাগানের দূরত্বটুকুর মতোই অকিঞ্চিৎকর। পার্বতীর প্রাণে শৈশবের সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রূপটি আবার জেগে উঠেছে। একদিন যেমন দেব-দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সে পাঠশালার পড়া থেকে মুক্তি পেয়েছিলো, আজ এই জীবন-খেলায় সে তার নারীধর্ম পণ ক'রে সমাজের অনুশাসন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে—ত্রাণকর্তা তার দেবদাস। মনোরমা পার্বতীর এই অসঙ্কোচ ব্রীড়াশূন্য নারী-প্রকৃতির পরিচয় জেনে হয়েছে বিস্ময়ান্বিত। মনোরমার এ বিস্ময় সমাজ-গোষ্ঠীর একক মনোভাব-প্রসূত।

শরৎ-সাহিত্যে পার্বতীই অদ্বিতীয়া যে সামাজিক-পারিবারিক দায়িত্ব অপেক্ষা, তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বেশী দায়িত্বশীল। দেবদাসের প্রতি তার অটুট বিশ্বাস—"তিনি আমার স্বামী না হলে, আমার সমস্ত লজ্জা সরমের অতীত না হ'লে, আমি এমন ক'রে মরতে বসতুম না।" দেবদাসের সঙ্গে মিলনের পরিপন্থী যে কোন বাধাই পার্বতী দেবদাসের সহায়তায় অতিক্রম করবার আশা রাখে। তাই সে গভীর রাত্রিতে দেবদাসেব সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, সেজন্য সে প্রস্তুত ছিল না। দেবদাসের চারিত্রিক পরিচয় অসহায় পার্বতীকে বিহ্বল ক'রে তুলেছে। চিরদিনের খাম-খেয়ালী-সংসার-অনভিজ্ঞ-অগভীর দেবদাস পার্বতী সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তায় বিক্ষুব্ধ নয়। অদূরদর্শী দেবদাস পার্বতীর সঙ্গে তার বিবাহের অসম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করেছে—কিন্তু এ ব্যাপার তার কাছে গভীর অনুভূতি গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠেনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে সে গ্রাম ত্যাগ ক'রে পার্বতীকে যে চিঠি লিখেছে, তাতেই দেবদাসের অন্তর্প্রকৃতির পরিচয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—"তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই। আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশবোধ করিতেছি না।" কিন্তু এর পরেই দেবদাসের হৃদয়ের গোপন স্বরটি আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে কোন্ অনবহিতক্ষণে পার্বতীর প্রতি একটি স্নেহ-মমতা-প্রেমমণ্ডিত অনুভূতি স্থান পেয়েছিলো, সে সম্পর্কে কোন সচেতনতা তার ছিল না। তাই যখন সে সচেতন হ'লো তখন পার্বতীকে নিয়ে তার "অক্ষয় স্বর্গবাস" আর ঘটে উঠলো না। "শুধু লোক দেখানো কুল-মর্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালের উপর নির্ভর" ক'রে দেবদাসের জীবনে যে ভুল দেখা দিল তার ফসল কুড়িয়েই তাকে চলতে হ'লো। দুটি নারীর প্রেমে সে অভিষিক্ত হ'লো বটে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পার্বতীর সক্রিয় অনুভূতিই দেবদাসের সুপ্ত প্রেমবোধকে জাগ্রত করেছে।

আত্মাভিমানি পার্বতীর দিক থেকেও কিন্তু প্রেমের রূপটি একটু প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের মধ্যে যে সূক্ষ্মতর চিত্ত-দৌর্বল্য-অভিমান-অসহ্য

আবেগ থাকে—এসব কিছুতেই পার্বতীকে বিচলিত হ'তে দেখা যায়নি। কলঙ্ক-ভয়-বিদ্রূপকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে সে যে দেবদাসের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে, তা আজন্ম সুখ-দুঃখের সাথী দেব-দাদার কাছ থেকে তার দূরে থাকা অসম্ভব ভেবেই। এ যেন সেই মুক্ত প্রাণের আবেগে দেব-দাদার হাত ধরে আবদার করা! বাল্যহৃদয়ের সেই সরল-সহজ আকর্ষণ থেকে দুজনে পাছে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, এই আশঙ্কাই পার্বতীর প্রেমবোধের মূল কথা। কোমলে-কঠোরে দুটি প্রকৃতি-পালিত হৃদয় কেমন অসহায়ভাবে সমাজের নিগড়ে আত্মসমর্পণ করেছে! পুকুরঘাটে পার্বতীর আহত অভিমান এবং ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে দেবদাসের স্নেহের প্রলেপ পার্বতী-চরিত্রের বিশেষত্বই সূচিত করেছে। দেবদাসের ছিপের আঘাত আজও সে মিথ্যা কথায় গোপন করেছে—আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হয়েছে। এখানেই যেন পার্বতীর আকাঙ্ক্ষা সফল, জয়ের আনন্দে সে উৎফুল্ল। দেবদাসের হৃদয়ে পার্বতীর স্থান এখনও পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ, অতীতের নিগূঢ় সম্পর্ক তাদের কোনদিনই মুছে যাবে না—এ আশ্বাস দেবদাসের কাছ থেকে সে জেনেছে। "...তুই কি আমার পর পারু?"—অত্যন্ত আপন। তাই অধঃপতিত দেবদাসকে রক্ষা করতে সে স্বামী-গৃহ থেকে বিনা দ্বিধায় ছুটে এসেছে। ভালবাসার কথা ব'লে উচ্ছ্বাস তোলেনি। পার্বতীর ভালবাসা নারীসুলভ শুধু কোমল অংশগুলি দিয়ে সৃষ্ট নয়—তাই সে বলতে পেরেছে—"নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?" আত্ম-সক্রিয়তার দ্বারা সে তার প্রয়োজনীয়তা দেবদাসের জীবনে উপস্থাপিত করতে চায় এবং এখানেই প্রকৃতপক্ষে পার্বতীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। পার্বতীর চরিত্রে "পুরুষোচিত" ঔদাসীন্য বর্তমান। স্বামী-গৃহে সে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেছে, সাধারণ নারীজনোচিত ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষা তার কোনদিনই ছিল না। তাই অবাধে দান ক'রে এবং অতিথিসৎকার ক'রে পার্বতীর দিন কেটেছে।

দেবদাস-চন্দ্রমুখীর প্রেম-প্রকৃতি

দেবদাসের চন্দ্রমুখীর প্রতি অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধাই চন্দ্রমুখীকে তার প্রতি প্রেমাবিষ্ট করেছে। চন্দ্রমুখীর বিগতজীবন কেটেছে প্রেমের অভিনয় ক'রে,

কিন্তু এবার সে সত্যিই এমন একটি ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছে, যে তাকে ঘৃণা করে প্রকাশ্যভাবে। দেবদাসের ঘৃণাকে কেন্দ্র ক'রেই চন্দ্রমুখীর নবজন্ম লাভ—"ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো কথায় ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের…আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল! ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।" তাই শেষ পর্যন্ত দেবদাস যখন চন্দ্রমুখীকে অপমান ক'রে টাকা দিয়ে চলে এল, তখনও সে রাগের পরিবর্তে বিস্ময়ই প্রকাশ করেছে। তার ব্রীড়াশূন্য জীবনে এই প্রথম "তীব্রসঙ্কোচ" দেখা দিল। "অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করিবার অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।" প্রথম দর্শনেই দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর কেমন একটা মমত্ববোধ এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাবের উদয় হয়েছিলো। কিন্তু চন্দ্রমুখী তো জানে সে সমাজ-স্খলিতা, জীবন-ব্যবসায়ে লাভের কৃত্রিম ভাগটাই গ্রহণ করতে পারে, আসল মূলধনে তার অধিকার কোথায়?

"দেবদাসকে অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুণিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে।" কিন্তু দেবদাসের অতিরিক্ত মদ্যপানে চন্দ্রমুখীর ঘটেছে ধৈর্যচ্যুতি। কারণ "দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে।" দেবদাস চন্দ্রমুখীর কাতর মিনতিকে উপেক্ষা করেছে, ক্ষত-বিক্ষত করেছে কঠোর উক্তিতে তবুও চন্দ্রমুখী অচঞ্চল। চন্দ্রমুখীর মধ্যে সহনশীলা নারী-প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করেছে। আর দেবদাস মদের আধিক্যে তার স্বল্পবাক চরিত্রের ঠিক বিপরীত স্বরূপ প্রকাশ করেছে। বর্তমানের লজ্জাজনক, সমাজনিন্দিত অবস্থাকে কথার অসীমবিস্তারে আড়াল ক'রে রাখবার জন্য সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। তাই কখনো চন্দ্রমুখীর মতো সমাজ-স্খলিতাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে, কখনো বা নিজের প্রতি বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত চন্দ্রমুখীর প্রতি তার কোন প্রকার আসক্তি জন্মায়নি।

পতিতাদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেন, "লোকে বলে, আমি পতিতাদের

সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে; কিন্তু ঘৃণা করতে মন চায় না। বলি, তারাও মানুষ, তাদের মধ্যেও ত্যাগ, মহত্ব আছে।...আমি তো দেখেছি পতিতাদের মধ্যে কত মহৎ চরিত্র; আবার পরম সতীকেও মিথ্যা সাক্ষী দিতে দেখেছি।" চন্দ্রমুখী চরিত্র-পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্রের এই প্রবণতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চন্দ্রমুখীর জীবনে দেবদাসের আবির্ভাব একটা আমূল পরিবর্তন সূচনা করেছে। সে সহর ত্যাগ ক'রে গ্রাম্য-অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে উন্মুখ হয়েছে। কিন্তু যাবার আগে একবার সে দেবদাসের দর্শন কামনা করে, অথচ "...একথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল।" চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালবেসেছে প্রতিদান-প্রত্যাশিনী হ'য়ে নয়। কারণ তার মতো সমাজ-স্খলিতার পক্ষে কোন রূপবান্ ভদ্রসন্তানকে ভালবাসা বা ভালবাসার অধিকার স্থাপন করা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। চন্দ্রমুখী এদিক দিয়ে "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থের সরযুর সমগোত্রীয়া। কিন্তু সরযু নিজে সমাজ-স্খলিতা নয়। চন্দ্রমুখী অন্তরে যতই শঙ্কিত-ভালবাসা দেবদাসের উদ্দেশ্যে পোষণ করুক না কেন, দেবদাসের অধঃপতিত জীবনে চন্দ্রমুখীর সক্রিয়তা তাকে প্রেম-গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে। "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ভালবেসে চন্দ্রমুখীর মতো কৃতার্থ নয়, অধিকার স্থাপন ক'রে পুরস্কৃত। সমাজের সমর্থন তাদের মিলনে কতখানি আশাপ্রদ তার অপেক্ষা না রেখেও রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যে তার প্রেম অর্পণ করেছে। কিন্তু সে-জাতীয় চারিত্রিক দৃঢ়তায় চন্দ্রমুখী পরিচালিত হয়নি। "শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি, যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ-অশান্তি আনতে চায় না।"—এ সত্য চন্দ্রমুখী উপলব্ধি করেছিলো ব'লেই, নির্বিকার থাকতে পেরেছে—অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েও তার হৃদয় উদ্বেল হয়নি।

চন্দ্রমুখীর সংস্পর্শে এসে দেবদাসের চরিত্রের কম পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সে কথায় এবং ব্যবহারে আপাতভাবে যতই আঘাত করুক না কেন, রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে "শুধু স্মরণ হইল, কাহার একটা আন্তরিক সেবা।" সম্পূর্ণ মত্ত এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায় চন্দ্রমুখী যেদিন দেবদাসকে ঘরে তুলে এনেছে

দেবদাস ভালভাবে তাকে চিন্‌তে পারেনি। "কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিলো আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এত যত্ন কার?" দেবদাসের নিজের উক্তি থেকেই প্রমাণ পাই সে চন্দ্রমুখীকে 'আগের মত ঘৃণা করে না বরং ভালবাসে'। চন্দ্রমুখীর নিঃস্বার্থ প্রেম এবং সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হ'য়ে দেবদাস পার্বতীর চঞ্চল-অভিমানী প্রকৃতির কথা ভাবতে থাকে এবং উভয়ের চরিত্রের অসীম পার্থক্যে চন্দ্রমুখীর প্রতিই তার মন আরও আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দেবদাস চন্দ্রমুখীর প্রশস্তি-বাচনে যতই মুখর হ'য়ে উঠুক না কেন, অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমেও তার ইহ-জীবনের সঙ্গিনী-রূপে চন্দ্রমুখীকে গ্রহণ করতে পারেনি। পরজীবনের দোহাই তুলে চন্দ্রমুখীকে সে সান্ত্বনা দিয়েছে। আমাদের মনে হয় দেবদাসের সামাজিক বুদ্ধিতে শরৎচন্দ্র বাঙালী সমাজের পুরুষ-সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেছেন। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় পুরুষ ক্রমাগত অলস জীবন-যাপনের ফলে, তার বহিঃশক্তিকে করেছে অন্তর্মুখী। তার ফলে পুরুষ-প্রকৃতি উদার না হ'য়ে, হয়েছে সঙ্কীর্ণ। তাই নারীর সমাজ-স্খলনে পুরুষের আদর্শবাদের ভিত্তি ওঠে কেঁপে। সুতরাং চন্দ্রমুখীর মতো কোন সমাজ-স্খলিতাকে সামাজিক ভূমিকায় নামতে দেখে দেবদাসের উক্তিতে বাঙালী পুরুষই প্রতিবাদ জানায়—"ছিঃ তা হয় না। আর যাই করি এতবড় নির্লজ্জ হ'তে পারব না।" দেবদাস এবং চন্দ্রমুখী দুজনেই জানে—"তাহার (চন্দ্রমুখী) সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনও সম্মান পাইবে না।" তবুও চন্দ্রমুখীর গভীর প্রেমের কাছে দেবদাস আত্মসমর্পণ করেছে। লাহোরে দেবদাস পুনরায় মদ্যপান করতে আরম্ভ করলে, তার স্বাস্থ্য আর অটুট থাকে না—তখন তার "চন্দ্রমুখীকে মনে পড়ে, সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। মনে হয়, তার কত বুদ্ধি! সে কত শান্ত, ধীর; আর তার কত স্নেহ!" পার্বতীর কাছে দেবদাস তার অপরিণত অশান্ত জীবনে সাহচর্য পেয়েছিল, কিন্তু পার্বতীর প্রতি তার পূর্ব আকর্ষণ পরিণত বয়সে সমভাবে বিরাজমান থাকেনি। কারণ চন্দ্রমুখীর নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের

আড়ালে পার্বতীর অস্তিত্ব যেন ক্রমশঃ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সমাজ কোন মর্যাদাই হয়তো চন্দ্রমুখীকে দেবে না, কিন্তু যে ছন্নছাড়া অসহায় দেবদাসকে সে ভালবেসেছিলো, তার কাছে চন্দ্রমুখীর স্থান পার্বতীকেও অতিক্রম করেছে। "…একখানি স্নেহ কোমল মুখ আজ জীবনের শেষক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল,—সে মুখ চন্দ্রমুখীর। যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছে, আজ তাহাকেই জননীর পাশে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।" চন্দ্রমুখীর ট্র্যাজিক জীবনের সান্ত্বনা এখানেই। শুধু তাই নয়, কাহিনীগত রস বোধহয় শরৎচন্দ্র তাঁর মনোধর্ম অনুযায়ী ঠিক অংশটিতেই উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের মনে হয়, দেবদাসের মতো পুরুষকে চন্দ্রমুখীর মতো ধীরস্থির চরিত্রই মুগ্ধ করতে পারে, কারণ অভাববোধ থেকেই স্বভাববোধের (প্রেমের) জাগরণ ঘটে। তাই উভয়ের নাতিদীর্ঘ সান্নিধ্য সমস্ত কাহিনীটিকে পরিবৃত ক'রে একটা তৃপ্তিকর আবেশের সৃষ্টি করেছে। এমন কি অস্থির মনোভাবসম্পন্ন দেবদাসের অন্তরের একটি বিপরীতমুখী সত্তার পরিচয় পাঠক অনুভব করেছে। চন্দ্রমুখীর প্রেম দেবদাসকে শুধু মুগ্ধ করেনি, করেছে দীক্ষিত। তাই মৃত্যুর পুর্ব-মুহূর্তে পার্বতীর শেষ ইচ্ছা পুর্ণ করবার মধ্য দিয়ে দেবদাসের কর্তব্য-বোধের পরিচয়, চন্দ্রমুখীরই প্রেম-মহিমার নিদর্শন সূচিত করেছে। 'দেবদাস'কে পরিণামে অত্যন্ত করুণরসার্দ্র ক'রে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস-চরিত্রের এমন একটা দিক ফুটে উঠেছে, যা তার পুর্ব-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়েছে।

চুণিলাল

চুণিলাল দেবদাসের জীবনে একটি দুগ্রহরূপে আবির্ভূত হয়েছে ব'লে প্রথম দৃষ্টিপাতে আমাদের মনে হয়। কলকাতার মেসবাড়ীতে চুণিলালের মতো ব্যক্তির সংস্পর্শে দেবদাস এসেছিল এবং চুণিলালও তাকে অনায়াসে অধঃপতনের পথে এগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। দেবদাসের মতো ধনী ও

ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের যুবক চুণিলালজাতীয় লোকের কবলে প্রায়ই আত্ম-বিসর্জন করে, তারই একটি প্রত্যক্ষ চিত্র পাওয়া যায় 'দেবদাস' গ্রন্থের কাহিনী ভাগে। চুণিলাল শিক্ষিত, বিপথগামী যুবক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্থানীয়। এই সব চরিত্রের ব্যক্তিরা শুধু নিজের জীবনকেই ঘৃণ্য ক'রে তোলে না, অভিভাবকহীন অসহায় যুবকের ভবিষ্যৎজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে তোলে। দেবদাস হয়তো তার প্রতিষ্ঠাহীন জীবন নিয়ে এক সময় ধ্বংসোন্মুখ হ'য়ে উঠতো, কিন্তু চুণিলালের সহায়তায় তার জীবন যেন সাবলীলভাবে বক্রগতি লাভ করলো।

দেবদাসের জীবনে চুণিলাল কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন দুষ্টগ্রহরূপেই প্রতীয়মান নয়। কারণ প্রথমতঃ সে রাখাল ভট্টাচার্য (চন্দ্রনাথ) অথবা মথুরবাবু (বড়দিদি) পর্যায়ের নিকৃষ্ট জীব নয়, দ্বিতীয়তঃ দেবদাসের পরিণামের জন্য চুণিলালকে দায়ী করলেও তার প্রতি মন তিক্ত হ'যে ওঠে না। দেবদাসের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ে যে নির্লজ্জ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে চুণিলাল-চরিত্রের মানবীয় আবেদনটুকু পাঠকের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। পার্বতীর বিবাহ-রাত্রির পরদিন অনাহার-অনিদ্রায় কাতর দেবদাস যেদিন এসে মেসবাড়ীতে প্রবেশ করলো, সেদিন চুণিলালই তাকে সযত্নে অভ্যর্থনা করেছে এবং দেবদাসের অবস্থা দেখে চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছে।

চুণিলালের ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো কোন গভীর ক্ষত ছিল। সেই ক্ষত-চিহ্নের ওপর প্রলেপ দিতে গিয়ে চুণিলাল সমাজবিগর্হিত পথ বেছে নিয়েছে—নারী যে পথ গ্রহণ করতে হয় বাধ্য, পুরুষ স্বচ্ছন্দে সে পথ দিয়ে চলে যায়, কোন ক্ষতিই সমাজ অনুভব করে না। চুণিলালের চরিত্র যত হীনই হোক না কেন, দেবদাসের অমঙ্গল চিন্তা সে করেনি, তার প্রতি কেমন একটা যেন মমতা চুণিলালের জন্মেছিলো। দেবদাস চুণিলালের গন্তব্যস্থানে যেতে চাইলে, সে আন্তরিকভাবেই নিষেধ ক'রে বলেছে—"তা নিতে পারি। কিন্তু তুমি যেয়োনা।" চুণিলাল অবিমিশ্র পাপিষ্ঠ হ'লে দেবদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল বা ব্যথাক্লিষ্ট হ'য়ে উঠতো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দরী চন্দ্রমুখীর ব্যাকুল কাতরতায় অভিভূত হ'য়ে দেবদাসের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েও তার

চিরশত্রুর (?) মতো কাজ ক'রে কাহিনী থেকে চুণিলাল বিদায় নিয়েছে ; কারণ দেবদাসকে সুরাসক্ত ক'রে চুণিলাল চন্দ্রমুখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলো। সুরা দেবদাসের জীবনে অঙ্কিত করেছে অভিশাপ, নারী তার স্নেহ-মমতা-সান্ত্বনা নিয়ে তাকে করেছে রক্ষা। কিন্তু চুণিলাল নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল ব'লেই জীবনে সামঞ্জস্য হারায়নি। অশুভ পথ তার কাছেও শুভ নয় বটে, কিন্তু সে ভাগ্যের ক্রীড়নক নয়। জীবনাবর্তে চুণিলাল আবর্তিত হয়েছে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। অবশ্য চুণিলালের বেঁচে থাকায় সমাজের কোন কল্যাণ সাধনই হবেনা—অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা বরণ ক'রেই পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে।

ধর্মদাস

ধর্মদাস চরিত্র 'হরিচরণ' গল্পের হরিচরণেরই নবতর এবং স্পষ্টতর রূপায়ন বলা চলে। দেবদাসের শৈশব থেকেই এই ধর্মদাস ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করেছে এবং সেবা-যত্ন-মমতায় রক্ষা ক'রে এসেছে। অবিবাহিত, সংসার অনভিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে এবং অসহায় নারীর পক্ষে এমন একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণ ভৃত্য-লাভ যে ভগবানের কতখানি আশীর্বাদের ফল-স্বরূপ শরৎচন্দ্র তা জানতেন মনে-প্রাণে। তাই তাঁর কয়েকটি রচনাতে ভৃত্য প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের রতন ও 'চরিত্রহীন' গ্রন্থের বেহারীকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ককে একটা মমতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন ক'রে কাহিনী-ভাগে দাস্যরসের উৎকর্ষ সাধন করা শরৎচন্দ্রের শিল্প-নির্দেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

দেবদাসের জীবনের শেষ অধ্যায়ে যখন পার্বতী-চন্দ্রমুখী-মা-ভাই সকলেই অবর্তমান তখনও ধর্মদাস তাকে পরিত্যাগ করেনি। রোগক্লিষ্ট মরণোন্মুখ দেবদাসের স্বদেশে মৃত্যু বোধ হয় ধর্মদাস না থাকলে ঘটে উঠতো না। "এ সংসারে তাহার (দেবদাসের) সবাই আছে, অথচ কেহই নাই।...তাহার সবাই আছে, কিন্তু সে আর কাহারও নাই।" কিন্তু ধর্মদাসের একমাত্র

দেবদাসই ছিল। তাই সে নিজ দেশ-গৃহ-আত্মীয়স্বজন ত্যাগ ক'রে দেবদাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রভু-পুত্রের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে দিয়ে ধর্মদাস শেষ পর্যন্ত আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছে।

পার্বতীর স্বামী-গৃহ

পার্বতীর স্বামী ভুবন চৌধুরী সদাশিব ব্যক্তি। পার্বতীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠকেরও করুণা এবং সহানুভূতির পাত্র হ'য়ে উঠেছেন। পার্বতীকে বধূরূপে ঘরে এনে তিনি সংসারে শান্তি বিধান করতে চেয়েছিলেন এবং সমর্থও হয়েছিলেন। কিন্তু বালিকা বধূটির কথা ভেবে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পার্বতীর এ জীবন আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের 'লবঙ্গলতা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লবঙ্গলতা কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়েই সংসারে সুখী হ'তে চেয়েছিলো, পার্বতী সে জাতীয় আশা মনে পোষণ করেনি। যন্ত্র চালিতের মতো পার্বতী কর্তব্য ক'রে গেছে, পুত্র-কন্যাকে সুখী করেছে। জীবনের এ পর্যায়ে পার্বতী যেন তপস্যারতা, তার হৃদয়বৃত্তি সংসারের ভাল-মন্দ কিছুতেই বিচলিত হয়নি। এমন কি দেবদাসের জন্য কোন নির্জন অবসরেও তার চিত্ত-বিহ্বলতার পরিচয় কাহিনী-ভাগে আমরা পাই না। কেবলমাত্র দেবদাসের অধঃপতনের সংবাদেই সে মাঝে মাঝে তার নির্লিপ্ত অনুভূতির আবরণ ছিন্ন ক'রে সক্রিয় হয়েছে।

মহেন্দ্র ও তার ছোট ভাই এবং যশোদা সকলেই আদর্শায়িত চরিত্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কেবলমাত্র ব্যবহারিক বুদ্ধি-সম্পন্না মহেন্দ্রের স্ত্রী এই পরিবারে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে কিছু পরিমাণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। যাকে কেন্দ্র ক'রে ভুবন চৌধুরীর অসুখী পরিবার আনন্দে-শান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, সেই পার্বতীর জীবনই চিরদিনের মতো ম্লান এবং নির্বিকার হ'য়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের মানস-লোক

'দেবদাস' রচনায় শরৎচন্দ্রের মানসিক রূপটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। এই কাহিনীর রচনা-কাল যখনই হোক না কেন, বর্তমান স্বরূপে

সচেতন হ'য়ে মন্তব্য প্রকাশ করতেন না ; কারণ এ ধরণের অসঙ্গতি অনেক রচনাতেই দেখা যায়। আরও কয়েকটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে—যেমন, দেবদাস তের বছর বয়সে পাঠশালায় পড়ে, কিন্তু তারপরেই সতেরো বছর বয়সে কলেজে পড়েছে।

'দেবদাস'-রচনার সংলাপ সুমিষ্ট, আবেদনশীল এবং মর্মস্পর্শী। শুধু তাই নয় কাহিনীভাগের পাত্র-পাত্রীর মুখে যথাযথ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভাষায় মিশ্রণ দোষ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। তার ফলে কথোপকথনের মাধুর্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। তবে 'বড়দিদি', 'ছবি' এবং 'চন্দ্রনাথ' অপেক্ষা ভাষাগঠনে চল্‌তি শব্দের প্রয়োগ বেশী লক্ষ্য করা যায়। দেবদাস-পার্বতী-ভুবন চৌধুরীর উক্তিতে ইঙ্গিতময়তা বর্তমান। চন্দ্রমুখী ধীর স্থির স্বভাবা হলেও প্রচুর পরিমাণে কথার জাল বুনেছে। চুণিলাল-ধর্মদাসের সংলাপ স্বাভাবিক। বর্ণনাভঙ্গী, বিশেষ ক'রে চরিত্র বর্ণনা বহু ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। উপমা-প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপুর্ণ এবং সাবলীল হ'য়ে ওঠেনি। তবুও গল্পরসের অভিনবত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব "দেবদাস" রচনাটিকে শরৎচন্দ্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 'রচনার পর্যায়ভুক্ত করেছে। বাঙালী 'সেন্টিমেণ্ট'কে চরমভাবে আলোড়িত ক'রে "দেবদাস" সর্বকালেই বাঙালী পাঠককে অশ্রুসজল ক'রে তুলতে অদ্বিতীয়। এখানে আমাদের যুক্তি-বিচার-সমালোচনা মূক হ'য়ে পড়ে এবং শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর নিগূঢ় শক্তিটির প্রতি মাথা স্বভাবতই নত হ'য়ে আসে।

(৭)

শরৎ-মানসের উদ্বোধন-পর্বের উপসংহার

"বাগান"-পর্যায়ের রচনাগুলির আলোচনা এখানেই শেষ হ'লো। এই অধ্যায়কে "উদ্বোধন পর্ব" নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই নামকরণ করার পেছনে আমাদের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কৈফিয়ৎ উপস্থাপিত করছি।

"বাগান" খাতা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-মানসের সূচীপত্র। এই পর্বের রচনাগুলিতে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রবণতা অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমশঃ বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। উত্তর জীবনে শরৎচন্দ্র বাঙ্‌লা উপন্যাস-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকার হ'য়ে উঠেছিলেন, তার বিচিত্র দিকগুলির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে "বাগান" পর্বের গল্পগুলিতে। শরৎ-মানসের স্বরূপ এবং ক্রমবিকাশ জানতে হ'লে এই পর্বের বিভিন্ন গল্পের আলোচনা অপরিহার্য। "বাগান" খাতার রচনাগুলিকেই শরৎচন্দ্রের আদি রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ এর পুর্বে তাঁর কোনও রচনা ছিল কিনা, আমাদের জানা নেই। এই পর্বের রচনাগুলি লেখবার সময়ে শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল, ষোল-সতেরো থেকে চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে।

"বাগান" খাতার তিনখণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডের 'কাশীনাথ', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম' প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' এবং 'কাশীনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মন্দির', 'আলো ও ছায়া' আলোচনা করেছি। এর কারণ এই রচনাগুলি 'কাশীনাথ' গ্রন্থের মধ্যে একত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু 'দেবদাস' তৃতীয় খণ্ডের রচনা ব'লে স্বাভাবিকভাবেই সবশেষে আলোচনা করেছি। 'মন্দির' ১৩০৯ সনে 'কুন্তলীন পুরস্কার-প্রাপ্ত' রচনা—রচনাকাল এই সময়েরই কাছাকাছি। 'আলো ও ছায়া'-র রচনাকাল জানা যায়নি; তবে প্রকাশকাল ১৩২০ সাল। তবুও এই রচনা দু'টিকে আদিপর্বে আলোচনা করলাম "কাশীনাথ" গ্রন্থের আলোচনাটি সম্পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য। তা ছাড়া এই দু'টি গল্পের সঙ্গে "কাশীনাথ" গ্রন্থের অন্যান্য রচনাগুলির একটা অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য রয়েছে—তা গল্পের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই জানা যাবে।

"বাগান" খাতার দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত "ছবি", "বড়দিদি" ও "চন্দ্রনাথ" এবং তৃতীয় খণ্ডের "দেবদাস" রচনাগুলিকেও এই উদ্বোধন পর্বে আলোচনা করেছি। দেবদাস, চন্দ্রনাথ ও বড়দিদিকে যেমন নিঃসংশয় চিত্তে উপন্যাস হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না, আবার ছোট গল্প রূপেও

স্বীকার করা যায় না। সেজন্যে এই রচনাগুলি এই গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া আদিপর্বের রচনা হিসেবে এগুলির মধ্যে শরৎ-মানসের প্রাথমিক রূপটি ধরা পড়েছে। সেদিক দিয়েও এই রচনাগুলিকে আলোচনা করার সার্থকতা আছে।

'উদ্বোধন পর্বে'র উদ্দেশ্য শরৎ-মানসের বিভিন্ন প্রবণতাগুলিকে আলোচনা করা। সেজন্য একদিকে যেমন "বাগান" খাতার রচনাগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে ট্র্যাজিডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপন্যাসগুলির উদাহরণ এনে আমাদের বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করবার চেষ্টা হয়েছে। সেজন্য উপন্যাসগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

শরৎচন্দ্রের রচনাকালের সঙ্গে প্রকাশকালের পার্থক্য গুরুতর। তাই ইচ্ছা থাকলেও শরৎ-মানসের উদ্বোধন নির্ণয় করতে গিয়ে সর্বত্র ধারা বাহিকতা রক্ষা করতে পারিনি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে ২২ বছর বয়সের রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'উদ্বোধন পর্বে' 'শুভদা' গ্রন্থটির আলোচনা করলাম না কেন? এর কারণ "শুভদা" শরৎচন্দ্রের 'বাগান পর্বে'-র পরবর্তী রচনা, অবশ্য একথা স্বীকার্য যে 'শুভদা" উদ্বোধন পর্বের শেষ রচনা এবং উপন্যাস। কিন্তু আদিপর্বের রচনাগুলির মধ্যে ('বাগান' খাতার রচনাবলী) শরৎ মানসের সম্ভাবনার দিকগুলি পাওয়া গেছে। তাই আদি-পর্বের দ্বিতীয় রচনা ব'লে "শুভদা" আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম।

শরৎচন্দ্র "বাগান" নামকরণের মধ্যেই যথেষ্ট কবিসুলভ মনের পরিচয় দিয়েছেন। বাগানের বিচিত্র ফলফুলের সম্ভারে আমরা মুগ্ধ হই। সেখানে যেমন ফোটে গন্ধরাজ, জাগে রজনীগন্ধা, শোভে গোলাপ, তেমনি সন্ধান মেলে অনাদৃত, অবজ্ঞাত পুষ্পেরও সুরভিত বিকাশ। "বাগান" খাতার গল্পগুলির মধ্যে যেমন দেখি উদাসীন কাশীনাথ-সুরেন্দ্রনাথ-শক্তিনাথ-বা-খিন, তেমনি সাক্ষাৎ পাই মথুর-চুণিলাল-রাখাল ভট্টাচার্য। সেখানে দেখি মা-শোভা, পার্বতী, কমলার মতো দর্পিতা, মাধবী-চন্দ্রমুখীর মতো স্নেহময়ী,

কৈলাস খুড়োর মতো শিব-চরিত্র, তেমনি দেখি হরকালী, দেবদাসের বউদি'র মত কুটিলা। সেখানে সাক্ষাৎ পাই দেবদাসের মতো ছন্নছাড়া, সরযূর মতো মিতভাষিণী, ধর্মদাসের মতো স্নেহপ্রবণ চরিত্রের সমাবেশ। এই ভাবে জীবনের বিচিত্র দিক এবং নরনারীর বিভিন্ন প্রকৃতির অপূর্ব সমাবেশ হ'য়ে "বাগান" নামকরণকে সার্থক ক'রে তুলেছে।

পরিশিষ্ট—ক

(৮)

ক্ষুদ্রের গৌরব

"রম্য রচনা" নামে চালু যে সব রচনা আজকাল পাঠক-সমাজে চলিত হয়েছে, সেটা নাকি আধুনিক আবিষ্কার—এ ধরণের একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু কথাটার প্রতিবাদ করা দরকার। "রম্য রচনা" বল্‌তে আমরা বুঝি এমন এক শ্রেণীর রচনা যেখানে প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর ভাব নেই, গল্পেরও লঘু চাল নেই। গল্প ও প্রবন্ধের মিশ্রণজাত এক শ্রেণীর রচনা যেখানে চিদ্‌বৃত্তি অপেক্ষা হৃদ্‌বৃত্তিই প্রধান। বুদ্ধির দ্বারা, মনীষার দ্বারা তাকে বুঝতে হয় না, হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করতে হয়, আস্বাদ করতে হয়। এর বিষয়বস্তু নগণ্য, সারাংশ সামান্য, সেদিক দিয়ে তা নেহাৎই তুচ্ছ। কিন্তু তা পাঠ ক'রে মনে যে রসের সঞ্চার হয়, তা একদিকে কাব্যপাঠের আনন্দ দেয়, অন্যদিকে গল্পপাঠের অনুভূতি আনে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, "ইহার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।" একেই আধুনিকেরা নাম দিয়েছেন "রম্য রচনা"। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এই শ্রেণীর রচনা এ-কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি টুকরো রচনাকে 'রম্য রচনা' বলা যেতে পারে। যেমন "কমলাকান্তের দপ্তরে" 'একা'-ধরণের

রচনাবলী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ বস্তুটি অকস্মাৎ বিদেশীর অনুকরণে আবির্ভূত হয়নি। বিদেশীর অনুসরণে বহু পূর্বেই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ এ ধরণের রচনা লেখবার সার্থক চেষ্টা করেছিলেন। "পঞ্চভূত" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' সভা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা নিছক রম্যরচনারই প্রকৃতি সম্বন্ধে। "আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচভূতে মিলিয়া এ পর্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ, কিন্তু ...শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও...আনন্দ ও আরোগ্যলাভ করিয়াছি।...গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।" "রম্য রচনা" পাঠ ক'রে এক ছটাক শস্য পাই না কিন্তু আনন্দ পাই, একথা স্বীকার করতেই হবে।

রম্যরচনার সংজ্ঞা খুঁজতে বা উদাহ দিতে গিয়ে যাঁরা বার বার বিদেশী গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে থাকেন, এই সব উদাহরণ-উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে, তাঁদের পাণ্ডিত্যে সংশয় প্রকাশ করিনা, ধৃষ্টতা দেখে ক্ষুব্ধ হই। যাক, আমার আলোচনা শরৎচন্দ্র নিয়ে।

শরৎচন্দ্রের রম্যরচনার কোনও গ্রন্থ না থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান প্রবন্ধ নামে খ্যাত কতকগুলি রচনা বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্যকার রম্যরচনা হ'য়ে উঠেছে। আজকে শরৎচন্দ্রের একটি রচনা নিয়ে আলোচনা করবো—যেটা অনাদৃত হ'য়ে পড়ে থাকলেও আর থাকা উচিত নয়।

১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে ভাগলপুর সাহিত্য-সভার হস্তলিখিত পত্রিকা "ছায়া"-র জন্য এই রচনাটি লিখিত হয়। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ২৫ বছর। তখন তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভা অবিকশিত এবং অজ্ঞাত। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে শরৎচন্দ্রের এই শ্রেণীর সার্থক রচনা সত্যই তাঁর প্রতিভার অক্ষয়তা সূচিত করে। রচনাটি 'যমুনা'য় ১৩২০ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির নাম—"ক্ষুদ্রের গৌরব"।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে,
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির-বিন্দু॥"

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বস্তুর প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখি তিনি সামাজিক দৃষ্টিতে অনাদৃত, অবহেলিত, হেয় মানুষ ও জীবকুলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে যদি বলি প্রকৃতি-প্রেমিক, শরৎচন্দ্রকে বলবো মানব-প্রেমিক। পরবর্তীকালে শরৎ-সাহিত্যে সমাজ-লাঞ্ছিতদের প্রতি ও অসহায় জীবকুলের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাবের বহু পূর্বে তারই দূরাগত পদধ্বনি শোনা যায় 'ক্ষুদ্রের গৌরবে'।

'ক্ষুদ্রের গৌরবে'-র কাহিনীভাগ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। সামাজিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত হেয়, গঞ্জিকাসেবী সদানন্দ ও রোহিণীকুমার। অকস্মাৎ একদিন বিশ্বনিয়ন্তার কোন্ অনির্দেশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সদানন্দের মগ্ন-চৈতন্যের জাগরণ ঘটে। কয়েকটি শব্দ-সমষ্টি নিয়ে গঠিত একটি পংক্তি শ্রবণে অকস্মাৎ সদানন্দের বাসনালোকের উদ্বোধন হয় এবং সামাজিক সীমায়িত জীবন থেকে তার মনের গতি ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে ওঠে। জাগতিক দৃষ্টিতে যাকে আমরা নগণ্য ব'লে মনে করেছি, সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তির বাসনালোকের জাগরণ তার গৌরবই সূচিত করেছে, তাকে করেছে মহান্। সদানন্দের ভাব-জগতের এই পরিবর্তন 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামকরণের সার্থকতা সূচিত করে।

একটিমাত্র পংক্তি—"যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধাবিনোদিনী বিনে সেই বিনে সেই—।" এই পংক্তির ভাব ও ভাষা (নাম)-কে কেন্দ্র ক'রে মানুষের সংস্কারলোকে যুগ যুগ ধ'রে যে বিরহানুভূতি সঞ্চিত হয়েছে, মৃদু আঘাতে তা ফেনায়িত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র বলেন—"ক্ষুদ্র কবির ইহাই গৌরব, ক্ষুদ্র কবিতার ইহাই মহত্ত্ব।"

সামাজিক মানুষের মনের অবচেতন স্তরের যখন জাগরণ ঘটে, সেই সময়ই প্রকাশিত হয় আনন্দলোক। তাই সদানন্দের (সদা+আনন্দ) সামাজিক জীবনে হয়তো এই অধঃপতিত জীবনযাত্রা ছিল, কিন্তু তার অবচেতন মনের জাগরণে সমস্ত নীচতা হীনতা দূরীভূত হ'য়ে সেই চিরন্তন বাসনালোকের প্রকাশ ঘটলো। নামকরণের দিক্ দিয়ে যেমন, তেমনি ছোট একটি পংক্তির প্রচণ্ড শক্তিমত্তার জন্য "ক্ষুদ্রের গৌরব" নামকরণ সত্য সত্যই সার্থক। আণবিক শক্তির প্রচণ্ডতা জড়বস্তুর জীবনে কি বিপুল অথচ তা কতই না ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র ব'লে তো তা তুচ্ছ নয়; সেখানেই তার গৌরব।

মানুষ চিরবিরহী। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সর্বদাই মানুষ একাকিত্ব অনুভব করেছে; তাই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও তার বিরহবোধ যায়নি। যুগে যুগে মানুষ পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করেছে, প্রেমের অনুভূতি, আকর্ষণবোধ জেগেছে, কিন্তু প্রতিবারই সে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছে। এই নিঃস্বতাকে সে ভুলতে চেয়েছে প্রীতির (প্রেম) দ্বারা, কারণ এই প্রীতিবোধই সর্বব্যাপিনী, প্রীতিই পরমপুরুষ। এই প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে নানাজনের কাছে নানারূপে (প্রেম ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য)। শ্রীরাধা বিরহরূপের মূর্তিমতী বিগ্রহ, যে প্রেমে সে পরমপুরুষকে কামনা করেছে। প্রেমের পূর্ণতা বিরহে। প্রেমের মধ্যে বাসনা-কামনার যে অংশ, বিরহের দাবদাহে তা পরিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যুগে যুগে কবি-শিল্পীরা সেই বিরহের গান গেয়েছেন—এই বোধই মিলনে সুখ আনছে, তৃপ্তি আনতে পারেনি। চণ্ডীদাস বলেন—"দুহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" [illegible] প্রাচীন বিরহ, অসীম পুরুষের সঙ্গে সসীমের [illegible]

বিরহ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার বিরহ। এই শাশ্বতবোধের ওপর যখন ঘা আঘাত পড়ে, তখন তা তরঙ্গায়িত হ'য়ে বাসনালোক থেকে বহির্লোকে প্রকাশ পায়। তাই শ্রীরাধার বিরহবার্তা শুনেই সদানন্দের বাসনালোকের স্ফুরণ হয়, সে চিরবিরহীর মতই অশ্রুসজল হ'য়ে ওঠে। স্মৃতি তার জাগ্রত হয়, এ যুগের নয়, বর্তমান সময়ের নয়। যুগে যুগে মানুষ যে বেদনাবোধের দ্বারা ব্যথাতুর, সেই স্মৃতিলোকের জাগরণে তার মন কেঁদে ওঠে। তার মন চায় সবাইকে ভালবাস্তে, প্রীতির দ্বারাই সে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পাবে। তার যে বেদনা, যে দুঃখ তার কারণ এতোদিন সে ভালবাস্তে পারেনি ব'লেই, প্রীতি বিতরণ করতে পারেনি ব'লেই। এ অবস্থায় সামাজিক সদানন্দ গৌণ, গঞ্জিকাসেবী সদানন্দ উপলক্ষ, তখন প্রকাশ পায় সদানন্দের অন্তর-সত্তা। এই চিরসত্যটির একদিকের প্রকাশ ঘটেছে রূপকের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার প্রেম-পরিকল্পনায়।

বাঙালীর জাতীয় চেতনার সঙ্গে মিশে আছে বৈষ্ণব সাহিত্যের এই প্রেম-বিরহবোধ। তাই সদানন্দ কেঁদেছে শ্রীরাধার বিরহে। "শরৎ-শশী"র বেদনায় কারো বাসনালোক জাগ্রত হয় না, চিরস্মৃতির উদ্বোধন ঘটে না, সেজন্যই "শরৎ-শশী"র দুঃখে কেউ অশ্রুপাত করে না। কিন্তু যমুনা, শ্রীরাধা তার বিরহ সমস্ত কিছু জড়িয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেই অনুভূতি চিরদিনের বাঙালীর বোধ, তাই তো সে কাঁদে—"...রাধার দুঃখ সে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাই কাঁদিয়াছে ও ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষুদ্র একটি চরণ তাহার সমস্ত হৃদয় মন্থন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে।" তা ছাড়া "শরৎ-শশী" প্রত্যক্ষলোকের তাই সীমায়িত, রাধার ব্যথা অপ্রত্যক্ষ জগতের, তাই তার আবেদন সীমাহীন।

প্রেম-বিকাশের অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে চাঁদের আলোর মাধুর্য দিয়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সদানন্দের মানস-প্রকাশে সহায়তা করেছে। শরৎচন্দ্র রচনার প্রারম্ভে বর্ণনা করছেন—"সে রাত্রে চাঁদের বড় বাহার ছিল। শুভ্র, স্নিগ্ধ, শান্ত কৌমুদী স্তরে স্তরে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশ বড় নির্মল, বড় নীল, বড় শোভাময়। শুধু সুদূর

প্রান্তস্থিত দুই একটা খণ্ড শুভ্র মেঘ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সেগুলা বড় লঘু হৃদয়। কাছে আসিয়া, আশে-পাশে ছুটিয়া বেড়াইয় চাঁদকে চঞ্চল করিয়া দেয়।" এইভাবে বর্ণনার দ্বারা প্রেমময় পরিবেশ-সৃষ্টি সার্থক হ'য়ে উঠেছে। নরনারীর হৃদয়াকুতির প্রকাশ প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যের পটভূমিতে প্রকাশিত, তাই এ বর্ণনা সার্থক। এইভাবে প্রেমের জাগরণ ও তার পরিণতি দুঃসহ বিরহবোধের হাহাকারে—"আজ···চন্দ্রমা কিছু গম্ভীর প্রকৃতির।" একদিকে প্রাণচাঞ্চল্য অন্যদিকে গুরুগম্ভীরতা—এই দুই বৈপরীত্যের ফলে সৌন্দর্য আরও আবেদনশীল হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘাক্রান্ত আকাশের তলে চিরবিরহীর হৃদয় আকুল হ'য়ে ওঠে—তার এই অনুভূতি জাগাতে প্রয়োজন হয় এই পরিবেশে মেঘদূতের দৌত্য। তেমনি আজকের চন্দ্রের শোভা এমনই হৃদয়গ্রাহী, এমনই মনোমুগ্ধকর যে সামান্য মানুষের মনেও বাসনালোকের, সত্ত্ব গুণের জাগরণ ঘটে। সে প্রেমে তৃপ্তি নেই, আছে শুধু দাহ। এই পটভূমিকায় এই পরিবেশে শ্রীরাধার বিরহে সমব্যথী হ'য়ে গঞ্জিকাসেবী সদানন্দ ব্যথাতুর বিরহাতুর হ'য়ে উঠ্‌লো।—"শুধু একটা গ্রাম্য, অতি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ পদ অসময়ে তাহার চক্ষে জল টানিয়া আনিয়াছে।" এই ক্ষুদ্র পংক্তির স্পর্শমাত্রেই সদানন্দের অন্তঃসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। তার মন বাস্তব জগতের ধূলি-মলিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। রোহিণীকুমার অভিভূত হয়নি বটে, কিন্তু পরাভূত হয়েছে। তার কারণ বাস্তববোধ বা সামাজিক বুদ্ধি নিয়ে সে যতই বিরক্ত হোক্ না কেন, রাস্তায় বেরিয়ে একাকিত্ব অনুভব ক'রে সে-ও রাধার বিরহে সমব্যথা প্রকাশ করেছে। বিরহের প্রচণ্ডতা যখন সদানন্দের কাছে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে, সে বলেছে, "দয়াময়, তুমি ফিরিয়া এসো।"

শ্রীরাধার জন্য বিরহবোধের (শরৎ শশীর জন্য নয়!) কারণ শ্রীরাধার জন্য বেদনাবোধ মনের আবিষ্কার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই কেকাধ্বনির মধ্যেও কবিরা সৌন্দর্যসুধা আহরণ করেন, অমাবস্যা রাত্রিতে শ্মশানের মধ্যেও শরৎচন্দ্র সৌন্দর্যের তরঙ্গ দেখ্‌তে পান। এ দেখা চোখের নয়, মনের দেখা।

তাই যুগের পর যুগ ধরে যে ব্যথা মনোলোকে সঞ্চিত হ'য়ে আছে, শ্রীরাধার জন্য দুঃখবোধ তারই প্রকাশ। যেমন হিমালয়কে যে তার সত্যরূপে দেখেছে, যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষরূপে হিমালয়ের সৌন্দর্য অন্তরে একবার উপলব্ধি করেছে, তার কাছে শিলাখণ্ডের মধ্যেই সেই অনন্ত সৌন্দর্য লুক্কায়িত। শরৎচন্দ্র বলেন—"এই সক্ষমতাই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের গৌরব। সে যে শ্লাঘ্যের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব, মহতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্বের ইহাই শ্লাঘা, ছায়ার ইহাই মহত্ত্ব। ভক্তের নিকট বৃন্দাবনের একবিন্দু বালুকণাও সমাদরে মস্তকে স্থান পায়, সে কি বালুকণার বস্তুগত গুণ না বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য? তাহারা মহতের স্মৃতি লইয়া, ভক্ত বাঞ্ছিতের ছায়া-স্বরূপিনী হইয়া মর্মে উপস্থিত হয়, তাই তাহাদের এতো সম্মান, এতো পূজা।" সন্তানহারা জননীর কোলে মৃত পুত্রের পরিবর্তে মাটির পুতুল স্থান পায়. "বক্ষে স্থান দিবার সময়ে জননী মনে করেন না যে, ইহা একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা।" এইভাবেই স্মৃতিলোক বা মাতৃত্বের বাসনালোকের জাগরণ ঘটে এই মাটির পুতুলকে কেন্দ্র ক'রে। মাটির পুতুল উপলক্ষ, লক্ষ্য মানস-উদ্‌ঘাটন। তাই রাধাবিনোদিনীর দুঃখকে উপলক্ষ ক'রেই সদানন্দের মানস-উদ্‌ঘাটন, পংক্তিটি সেখানে সোনার জাদু কাঠি, ঘুমন্ত মানস-রাজকন্যাকে জাগাবার জন্য। "...যাহাকে দেখিলে তাহার বিশেষ্যকে মনে পড়ে, বিশেষ্যের সেইটিই বিশেষণ, সেইটিই প্রতিবিম্ব সেইটিই ছায়া।" এ বিশেষণ দ্বারাই সদানন্দের অন্তরসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং এই বিশেষ পংক্তিটির কোনো অতিরিক্ত মূল্য নেই। এর মূল্য এখানেই চরম যে, সমস্তটি জড়িয়ে যে ব্যঞ্জনা অণুরণিত হয়েছে, তারই ফলে বাসনালোকের প্রকাশ ঘটেছে; ক্ষুদ্র পংক্তির সেখানেই পরম গৌরব। সমস্ত রাত্রি যে সদানন্দ জেগেছে, সে সামাজিক মানুষ নয়, প্রয়োজনবোধে কর্মরত সদানন্দ নয়, গঞ্জিকাসেবী সদানন্দ নয়, সে সেই চিরন্তন সদানন্দ, চিরবিরহী সদানন্দ যে যুগে যুগে শুধু কেঁদেছে এই বিরহবোধের আঘাতে এবং তৃপ্তি পেয়েছে—এ কান্নায় এত সুখ অথচ ব্যথা, এত মাধুর্য অথচ দুঃখ, এত সৌন্দর্য অথচ অশ্রু!

শরৎ-সাহিত্যে পরবর্তীকালে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে দৃষ্টিভঙ্গী

ক্রিয়াশীল, তারই সুস্পষ্ট আভাস এখানে ধ্বনিত হয়েছে। কাশীনাথ-কমলা থেকে আরম্ভ ক'রে সুরেন্দ্র-মাধবী, দেবদাস-চন্দ্রমুখী, বা-থিন-মা-শোয়ে, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, সতীশ-সাবিত্রী, রমা-রমেশ ইত্যাদি চরিত্রে দেখি নরনারী পরস্পর মিল্‌তে পারছে না, কোথায় যেন বিরোধ, কোথায় যেন ব্যবধান। এ ব্যবধান, এ বিরহ সেই চিরন্তন বিরহবোধের সগোত্র, যে বেদনার উপলব্ধিতে শ্রীরাধা ব্যথিত, যে ব্যথায় প্রতি নরনারী বিরহাতুর। প্রত্যেকটি মানুষ যেন এক একটি নির্জন দ্বীপে বাস করছে; প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখছে, জানছে, তবুও মিল্‌তে পারছে না চারিদিকের লবণাম্বু সমুদ্রের ব্যবধানকে অতিক্রম ক'রে। অশ্রুসিক্ত তাই লবণাক্ত সমুদ্রের ব্যবধান রয়েছে ঘিরে প্রতিটি মানুষকে। সেজন্যই তো এই বিরহ, এই না-পাওয়ার বেদনায় নরনারী চঞ্চল। তাই তো জীবন কোনদিনই পূর্ণ নয়। অপূর্ণতা জগৎ-জীবনের অঙ্গ। সেই অপূর্ণতাকে জান্‌তে এবং বুঝ্‌তে যুগে যুগে কত মনীষী কত সাধনা করেছেন, কত ত্যাগ করেছেন, তবুও জেনেছেন কি? যেদিন এই অপূর্ণতা পূর্ণ হবে, এই বিরহবোধ দূর হবে, সেদিন পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ এবং সৌন্দর্য বিদায় নেবে। জগতে সব-পাওয়ার আনন্দে মানুষ মত্ত হবে। প্রেমের মধ্যে এই বিরহবোধ না থাকলে প্রেমের মহিমা হবে খর্ব। এই চিরন্তন প্রশ্নটি যুগে যুগে মনীষীদের ভাবিয়েছে, কেন একটি নর এবং একটি নারী পরস্পর অতি-সান্নিধ্যে এসেও মিল্‌তে পারছে না। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে তারই প্রকাশ দেখি। "ক্ষুদ্রের গৌরব" রচনাটির মধ্যেও তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে; এখানে শরৎ-মানসের প্রবণতা সহজেই নজরে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "একা" রচনাটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। "একা" রচনাটির প্রভাব যে এতে পড়েনি, তা জোর ক'রে বলা যায় না।

শরৎচন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ ভাষার মিষ্টতা প্রাথমিক পর্বের রচনাতেও স্পষ্ট-ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই কাহিনীক রচনাটিতেও ঘরোয়া পরিবেশ ও বাস্তব-স্পর্শী মনোভাব এবং বর্ণনা দেখতে পাই। ছোট ছোট কথার তীক্ষ্ণতায় সংলাপ বেশ জীবন্ত এবং ঘটনা যেটুকু জানাবার তার মধ্যে দিয়েই

তা বিবৃত হয়েছে; সদানন্দ-রোহিণীকুমারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

এই রচনাটিকে "রম্য রচনা" আখ্যা দিয়েছি কেন, সে সম্পর্কে দু'একটি কথা ব'লে বর্তমান আলোচনার উপসংহার টান্‌বো। সদানন্দ-রোহিণীকুমারের একদিনের গঞ্জিকাসেবনকে কেন্দ্র ক'রে ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে কবি-মন কোন্ সুদূর কল্পলোকে চলে গেল উন্মুক্ত ডানা মেলে, আবার ক্রমে ডানা গুটিয়ে সেই ঘটনার মধ্যেই ফিরে এলো রচনা-সমাপ্তিতে। মধ্যবর্তী অংশের সারাংশ কিছুই নয়। একটা উপলক্ষ পেয়ে শরৎচন্দ্রের কবি-মন উদার পাখা মেলে লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চল্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মনকেও টেনে নিয়ে গেলো। এই যে লক্ষ্যহীন উদার বিচরণ এবং তার মধ্যে দিয়ে "বাজে কথার ফুলের চাষ" বা অপ্রয়োজনীয় আনন্দের আস্বাদন ও উপলব্ধি, তাকে "রম্য রচনা" আখ্যা দেব না? এই রচনাটি লঘু চালে, নৃত্যছন্দে এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। তাই "ক্ষুদ্রের গৌরব" বিষয়বস্তু গৌরবে নগণ্য, কিন্তু রচনারসসম্ভোগে অতুলনীয়, অনুপম।

গল্পকার শরৎচন্দ্র

নব-জাগরণ পর্ব*

(১)

—"রামের সুমতি"—

'রামের সুমতি' গল্পটি শরৎ-সাহিত্যে একটি অভিনব ধারার প্রবর্তনা। এর পূর্ববর্তী ধারায় কাহিনী ধনী পরিবারের মধ্যেই সীমায়িত ছিল এবং সেখানে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতি ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র বিক্ষোভের বিশ্লেষণই ছিল মূল বিষয়। কিন্তু 'রামের সুমতি' শুধু মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়েই নয়, সম্পূর্ণ অভিনব কাহিনী-পরিকল্পনার জন্য পাঠক-সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন, এই সব ভায়ে-ভায়ে বিবাদ, জায়ে-জায়ে মনোমালিন্য ইত্যাদি নিয়ে গল্প লিখ্‌লে পাঠকের মন সহজেই জয় করা যায়। তাই তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি এ ধরণের গল্পই লিখবেন। আমরা জানি, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয় তাঁর ষোল-সতেরো থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে। কিন্তু এরপর দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধান। ৩৬-৩৭ বছর বয়সে তিনি নতুনভাবে সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত করেন উপরি-উক্ত কাহিনী-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই পর্বের নাম দিয়েছি "নব-জাগরণ পর্ব"।

---

*"...সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখ্‌তে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে ক'রে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চ'লে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম। আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম।..."

কাহিনী পরিকল্পনা

'রামের সুমতি' কাহিনীটিকে নয়টি উপকাহিনীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম কাহিনীটির মধ্যে নারায়ণীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র ক'রে রামের দুর্দান্তপনার প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটির মধ্যেও রামের সারল্য, দুরন্তপনা অথচ নারায়ণীর প্রতি বাধ্যতার পরিচয় পাই। দিগম্বরীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ কাহিনীভাগে দ্বন্দ্বের পূর্বে রাম ও নারায়ণীর মধুর সম্পর্কের একটা খণ্ড চিত্র পাই। দিগম্বরীর আগমনের পর যে সাতটি উপকাহিনী চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে অনিবার্যভাবে পারস্পরিক যোগসূত্র নেই। কিন্তু ছোট গল্পে পূর্ব ঘটনার অনিবার্য পরিণতি রূপেই পরবর্তী ঘটনা আসে। গল্পের শুরুতে লেখক রাম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন—"অত্যাচার···কখন কোন্‌দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে ··অনুমান করিবার যো ছিল না।"—এই মন্তব্যের সার্থকতা আনতে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। যদি এই কাহিনী থেকে দু'একটি ঘটনা বাদও দেওয়া যায়, তাতেও গল্পটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব'লে মনে হয় না। রামকে পৃথক্ ক'রে দেওয়ার পর যে সুদীর্ঘ ঘটনাবলী চিত্রিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে কাহিনীকে জোর ক'রে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

কাহিনীর সূত্রপাতে প্রথম অনুচ্ছেদটি (Para) অহেতুক ; কারণ এই অনুচ্ছেদে যে কথা বলা হয়েছে তা কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক জানতে পারে। পূর্ব থেকেই এভাবে চরিত্র বা ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া লেখকের দুর্বলতার পরিচায়ক এবং ছোটগল্পের আঙ্গিকের দিক দিয়েও ত্রুটিপূর্ণ।

চরিত্র-বিচারের দিক দিয়েও রাম-চরিত্রে ছোট গল্পের লক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ছোটগল্পে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের বিশেষ একদিকেরই প্রকাশ ঘটে থাকে। সেদিক দিয়ে নারায়ণী-দিগম্বরী-শ্যামলাল ছোটগল্পে চিত্রিত চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত ; কিন্তু রাম-চরিত্রে একাধিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দু'টি ঘটনার মধ্যে রামের দরদী মন ও দুরন্তপনার পরিচয় পাই। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম ঘটনার মধ্যে রামের শিশু-সুলভ কার্য-কলাপ ও দুরন্তপনার

পরিচয় পাই। এতগুলি ঘটনার মধ্য দিয়ে রাম-চরিত্রের অশান্তপনার দিকটিই যথেষ্ট পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। অষ্টম ঘটনায় রাম-চরিত্রের গতি ভিন্ন পথ ধরেছে এবং শেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে রাম-চরিত্রের যে দিকের পরিচয় পাই তা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এখানে রাম শুধু অভিমানী নয়, তার মনের কোন্ এক গোপন কোণে এমন আঘাত লেগেছে, যার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেছে রামের দুরন্তপনার পরিসমাপ্তিতে। এ পরিবর্তন শুধু ঘটনাগত নয়—চরিত্রগত; কারণ বউদির সঙ্গে দু'দিনের ব্যবধানে তার মনে যে গভীর আঘাত লেগেছে তা শুধুমাত্র শিশু-সুলভ হ'লে, বউদির কাছে ফিরে গিয়ে রাম ক্ষমা চাইতো। কিন্তু রামের এ শ্রেণীর মনোভাব তার চরিত্রের অন্যদিকেরও পরিচয় বহন করে।

'রামের সুমতি'র শুরু যেমন ত্রুটিপূর্ণ, সমাপ্তিও তাই। এখানে কাহিনী যে ভাবে শেষ হয়েছে তাতে পাঠকের কৌতূহল খুব তীব্র থাকে না। এ শ্রেণীর সমাপ্তির পর যে কৌতূহল তা উপন্যাসের সমাপ্তিতেও দেখা যায়। কিন্তু ছোটগল্পের সমাপ্তির আকস্মিকতায় যে বিস্ময় ও কৌতূহল তা তীব্র হ'য়ে উঠতো যদি কাহিনী শেষ হ'তো—ভোলা যখন দু'টাকার পরিবর্তে এক টাকা তার দা'ঠাকুরের জন্যে নারায়ণীর কাছে প্রার্থনা করেছে এবং জানিয়েছে "বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ী" সেখানে রাম চলে যেতে রাজি। কিন্তু "রামের সুমতি" নামকরণকে সার্থক করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কাহিনীর বর্তমান পরিণতি দেখাতে বাধ্য হয়েছেন।

শরৎচন্দ্র "রামের সুমতি"কে ছোটগল্পই বলেছেন। এর পশ্চাতে যে কারণ কার্যকরী তা হচ্ছে ঘটনাবলী বিভিন্ন হ'লেও, বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তা ছাড়া মূল কাহিনী এখানে দিক পরিবর্তন করতে করতে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়নি।

রাম-নারায়ণী-দিগম্বরী চরিত্র-পরিকল্পনার সার্থকতা

সম্পর্ক যেখানে গড়ে তুলতে হয়, গড়ে ওঠে না—সেখানে তা অত্যন্ত নিগূঢ় আকারে দেখা দেয়। রক্তের সঙ্গে সম্বন্ধ যেখানে নিবিড় নয়, সেখানে

যদি আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হয় গভীর।' শরৎ-সাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে স্নেহের সম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে, এই তত্ত্বকে ভিত্তি ক'রে। রাম ও নারায়ণী সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। রামকে আড়াই বছরের রেখে তের বছরের নারায়ণীর ওপর সংসারের ভার দিয়ে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। নারায়ণী পুতুল খেলা শেষ ক'রে সংসার করতে এসেই পেলো আড়াই বছরের শিশু রামকে। জননী হবার পূর্বেই নারীর সহজাত সংস্কারের বশে তার যে মাতৃত্ববোধ, তা রামকে কেন্দ্র ক'রে জাগরিত হয়েছে। রামকে মানুষ ক'রে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্নেহ করা, শাসন করা সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে তাকেই কেন্দ্র ক'রে। তাই গোবিন্দের জন্ম হওয়া সত্বেও নারায়ণীর মন বিভক্ত হ'য়ে পড়েনি। গোবিন্দের প্রতি নারায়ণী মায়ের কর্তব্য পালন করেছে, কিন্তু স্নেহ পেয়েছে রাম। রামের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হ'য়ে ওঠবার পেছনে আর একটি কারণ ক্রিয়াশীল। বিবাহের পর নারীর যে ভালবাসা স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, শ্যামলালের তথাকথিত নির্লিপ্ততার জন্য তা সম্ভব হয়নি নারায়ণীর পক্ষে। শ্যামলাল যে নারায়ণীকে ভালবাসে না এমন নয়, কিন্তু নর-নারীর মিলনের প্রথম পর্বে হৃদয়ের যে উদ্বেলতা, উচ্ছলতা, তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তখন ঘটেনি। তাই নারায়ণীর সেই ভালবাসা স্নেহে রূপান্তরিত হ'য়ে এতো তীব্ররূপ ধারণ করেছে যে, তা সব সময়ে স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করতে পারেনি। শ্যামলালের অন্তর্লীন প্রণয় নারায়ণীর মনকে খণ্ডিত করতে পারেনি। তাই রামের প্রতি নারায়ণীর ভালবাসা পুর্বাপর সমান রয়েছে।

রাম যে পরিবারে ও পরিবেশে মানুষ হয়েছে উঠেছে, সেখানে রাম-চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলির বিকাশের অবসর নেই। রাম দুরন্তপনা করেছে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে এবং কৈশোর-সুলভ আনন্দ পেয়েছে; তাই কৈশোরের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়িয়েও তার সেই চাপল্য দিক-পরিবর্তন করেনি। ছেলেদের তের থেকে পনেরো এমন একটা বয়স যখন থেকে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী রূপান্তরিত হ'তে থাকে। কিন্তু এই বয়সেও রাম তার বউদির স্নেহপুটের

অন্তরালে বর্ধিত হ'য়ে চরিত্রের অন্যান্য বৃত্তির জাগরণ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তাই তার অশান্তপনার মধ্যে ছেলেমানুষী ভাব কাটেনি। অন্যের কাছে এই বয়সেও রামের প্রতি নারায়ণীর পূর্ববৎ আচরণ অসঙ্গত ঠেকলেও, নারায়ণীর কাছে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই পনেরো-ষোল বছরের ছেলেকেও নারায়ণী কোলে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছে, রাম বউদির বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে, বউদির গলা জড়িয়ে ধরে আদর কেড়েছে, আবার বউদির বেত্রাঘাত নীরবে সহ্য করেছে, কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এ সব কার্য-কলাপের মধ্যে রামের কোন সঙ্কোচবোধ জাগেনি।

রাম তার বউদিকে শুধু ভালবাসে না, ভক্তি এবং ভয়ও করে। তাই তার প্রকৃতি কখনো বউদির আদেশ-বিরুদ্ধ কাজ করেনি; যা সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে দিগম্বরীকে কেন্দ্র ক'রে। যখন রাম ডাক্তার ডাক্‌তে গেল নারায়ণীর জ্বরের জন্য এবং ফিরে আসার পর নারায়ণী রামকে ডাকতেই, রাম গোবিন্দের সঙ্গে পাখীর খাঁচা তৈরী করতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বউদির ডাকে কাছে এসেছিল। শশা চুরির অপরাধে বউদির হুকুমে সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। আবার নৃত্যর মুখে বউদির হুকুম শুনে সে পুকুরে স্নান ক'রে এসেছে। যখন বউদি কাজের অজুহাতে অনুরোধ করলো রামকে আপনি খেয়ে নিতে, রাম বিনা দ্বিধায় তখন "···ভাত খাইয়া জামা পরিয়া স্কুলে চলিয়া গেল।" অশ্বত্থ গাছ মঙ্গলবারে পুঁত্‌লে বাড়ীর বড় বউ মারা যায় এ কথাও সে মেনে নিয়েছে।

নারায়ণী-রামের সম্পর্কটি আমাদের ইন্দ্রনাথ-অন্নদাদিদির কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্নদাদিদির মতোই নারায়ণীর মোহিনী শক্তি রামকে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছে। দিগম্বরীর কুটিল চক্রান্ত নারায়ণীকে শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে, তাই নারায়ণী রামকে দৈহিক শাসন দ্বারা দমন করেছে। কিন্তু রামকে আয়ত্ত করবার সমস্ত কৌশলই নারায়ণীর জানা ছিল।

সেই রামকে দিগম্বরীর কুটিল ব্যবহার অবাধ্য ক'রে তুলেছে। 'কার্তিক-গণেশ'কে কেন্দ্র ক'রে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে রামের দুঃখের গভীরতা ও

অসহায় বোধ তাকে বউদির কথা অমান্য করতে বাধ্য করেছে। বউদির কথা স্বীকার ক'রে নিতেই রাম তার ভিটে ত্যাগ ক'রে মামার বাড়ী চলে যেতে চেয়েছে। এই রামই আবার বউদির আহ্বানে ফিরে এসেছে। তাই এই বাধ্যতা শুধু ভয়ের জন্যই নয়, ভালবাসার জন্যও। অথচ এই বয়সে অন্তরে কোন বড় রকমের আঘাত লাগলে মানুষের চিত্ত-বৃত্তি ভিন্নমুখী পথ অবলম্বন করে। কিন্তু রামের চিত্ত-বৃত্তি থেকে শিশু-জনোচিত সারল্যবোধ পরিণত বয়সেও দূরীভূত হয়নি।

রামের দুরন্তপনার আধিক্য তাকে লেখা-পড়ার ব্যাপারে অমনোযোগী ক'রে তোলেনি; কারণ খেলার অজুহাতে সে কখনো পাঠে অবহেলা করেনি। দেবদাস বাল্যকালে দুরন্তপনার জন্য পিতা কর্তৃক কলকাতায় প্রেরিত হয়েছিল। লেখাপড়াকে সে চিরদিনই অবহেলা করেছে। ঠিক দেবদাসের মত চরিত্রের পরিচয় পাই বাল্যস্মৃতির সুকুমারের চরিত্রে। কিন্তু রাম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

প্রকৃতপক্ষে রাম এবং নারায়ণীর সম্পর্কের গভীরতা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো দিগম্বরীর আগমনে। দিগম্বরী রাম-নারায়ণীর এই মধুর সম্পর্ককে সুনজরে দেখতে পারেনি। ঈর্ষাপরায়ণ মন নিয়ে দিগম্বরী রামকে প্রতিপদে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। নারায়ণীর নিরবচ্ছিন্ন স্নেহাতিশয্যের প্রতি দিগম্বরীর কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ রামকে ক'রে তুলেছে বিদ্বেষ-পরায়ণ। শুধু তাই নয়, কাহিনীতে স্পষ্টভাবে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় এই রাম ও দিগম্বরীর বিরোধাকারকে ভিত্তি ক'রে। দিগম্বরী-চরিত্রে নারীসুলভ সৎগুণগুলির সম্পূর্ণ অভাব; নিকৃষ্ট চিত্ত-বৃত্তির বশে সর্বপ্রকার অনিষ্টকারী মনোভাব সে মনে মনে পোষণ করেছে। রামের ক্ষতিসাধন করা, শ্যামলালের কাছে রাম সম্পর্কে সত্য-মিথ্যায় বানিয়ে বলা, রামের অমঙ্গল চিন্তা করা, এমন কি মৃত্যু-কামনা করতেও দিগম্বরী পশ্চাদ্পদ হয়নি। শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্রগুলি অবিমিশ্র নিষ্ঠুর প্রায়ই হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু দিগম্বরী বাক্যে-ব্যবহারে-অন্তরে কোন দিক দিয়েই চরিত্রের সুসম্পদ্ পাঠকের দৃষ্টিপথে উপস্থাপিত করেনি। এলোকেশী ও

নয়নতাঁরা অপেক্ষা কঠিন হৃদয়-সম্পন্না নারী দিগম্বরী, যে জন্য আপন কন্যা নারায়ণীর শ্রদ্ধা পর্যন্ত সে হারিয়েছে। রাসমণি-গোত্রীয়া দিগম্বরী রামের মতো কিশোর বালকের সঙ্গে শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত। রামের প্রতি দিগম্বরীর বিদ্বেষ মনোভাব থাকতে পারে এই জন্য যে রাম তার কন্যার অন্তরের সমস্ত অংশটুকুকেই অধিকার ক'রে বসেছিল। স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব। অশ্বথ-গাছ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে, ঝাল-রান্না সম্পর্কে, ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষে, মাছ ধরা নিয়ে, জমিদার পুত্রের সঙ্গে মারামারি ঘটিত বিষয়ে এবং শেষ পর্যন্ত পেয়ারা ছুঁড়ে মারার কারণে রাম-দিগম্বরীর দ্বন্দ্ব, কাহিনীকে একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই রামের প্রতি দিগম্বরীর তীব্র কটাক্ষ এবং মন্তব্য অসহনীয় হ'য়ে নারায়ণীকে বিদ্ধ করেছে। রামের প্রতি স্নেহে অন্ধ ব'লে নারায়ণীর অন্তরই দিগম্বরীর কথায় বিরূপ হয়েছে তা নয়; ঝি নেত্য পর্যন্ত দিগম্বরীর কটূক্তিতে প্রতিবাদ না ক'রে পারেনি। রাম অশান্ত ছিল শৈশব থেকেই, কিন্তু অশিষ্ট ছিল না— দিগম্বরীর অকারণ বিষাক্ত উক্তি তাকে উগ্র ক'রে তুলেছিল। তাই সে দিগম্বরীর উদ্দেশ্যে বলেছে—"ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেব।" এবং যে "বিশেষণটা দিগম্বরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন" রাম সেই 'বুড়ি', 'ডাইনী' কথাগুলিকে বারবার উচ্চারণ ক'রে দিগম্বরীকে উত্যক্ত করেছে।

দিগম্বরীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে রামকে পৃথগন্ন ক'রে দেবার পর। রামের খাওয়া-দাওয়ার দুর্গতিতে সন্তানের জননী হ'য়েও দিগম্বরীর উল্লাস তার পাষাণ হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছে। অথচ রামের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে নারায়ণীর অন্তর্দাহ শরৎচন্দ্র বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করলেও পাঠক অনুভব করতে পেরেছে।

রাম বুঝতে পেরেছিলো দিগম্বরীকে উপলক্ষ ক'রেই তাদের শান্তির সংসারে জ্বলেছে অশান্তির আগুন—সুতরাং সমস্ত আক্রোশ তার দিগম্বরীর উদ্দেশ্যে পুঞ্জীভূত হ'লেও, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দিগম্বরীর সঙ্গে সে অসৎ ব্যবহার করেনি। দিগম্বরীর তৎপরতার জন্যই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের অবতারণা

হয়েছে। দিগম্বরী শেষ পর্যন্ত কঠোর মনোভাব নিয়েই থেকেছে—কিন্তু রামের হয়েছে 'সুমতি'।

দিগম্বরীর আগমনের পূর্বে রামের দুর্মতির এমন কোন আভাস শরৎচন্দ্র দেননি যাতে তার সুমতির প্রয়োজন ছিল। কারণ কৈশোরোচিত চাপল্য বা দুষ্টবুদ্ধি কোন প্রকার বৃহৎ অশুভ ফলের আশঙ্কা পোষণ করে না। দিগম্বরীর সঙ্গে রামের সংঘাতের ফলে রাম ক্রমশঃ দুর্মতিপরায়ণ হ'য়ে উঠ্‌ছিলো এবং তার অবসান হয়েছে রামের 'সুমতি' লাভের মধ্য দিয়ে। রামের জীবনে দিগম্বরী অনাকাঙ্ক্ষিত হ'লেও পরোক্ষভাবে সে তার মঙ্গলই বিধান করেছে। রামের চরিত্রে একটা বিদ্রোহী, অশিষ্টাচারী সত্তা প্রচ্ছন্ন ছিল—যা হয়তো তাকে পরবর্তী জীবনে অমিতাচারী ক'রে তুলতো; শুধু তাই নয়, রামের গুণপনার দিক্‌টিও আবৃত হ'য়ে পড়তো। মানুষের জীবনে এক সময় কোন প্রকার অশুভ আঘাত এসে তার চরিত্রের গ্লানিপূর্ণ মালিন্যকে পরিশুদ্ধ ক'রে দিয়ে যায়। দিগম্বরীর মাধ্যমে রামের জীবনে সেই পরিশুদ্ধি চরিতার্থ হয়েছে। আগামীকালে রাম বোধ করি চির-বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় নিয়েই জীবন-পথে অগ্রসর হবে। নারায়ণীর স্নেহাবরণে রাম আবৃত হয়েছিলো—তাই হয়তো পরিণত বয়সে সে যে দুঃখ পেতো, তার চরম পরীক্ষা ঘটে গেল তার 'সুমতি' লাভের সঙ্গে সঙ্গে।

রাম ও শ্যামলালের সম্পর্ক বিচার

'রামের সুমতি' গল্পে শ্যামলাল এবং রামকে কখন পরস্পরের সম্মুখীন হ'তে দেখা যায় যায়নি। শ্যামের প্রতি রামের যে কি মনোভাব শরৎচন্দ্র তা আমাদের জানাননি। দাদাকে খুব সম্ভবত সে ভক্তি এবং ভয় ক'রেই চলতো। কিন্তু শ্যামলালের রামের প্রতি মনোভাব কিছু রহস্যপূর্ণ ব'লেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছোট ভাইকে অন্যায় সম্পর্কে সে কোনদিন শাসন করেনি, ভাল-মন্দ কোন প্রকার মন্তব্যই সে রাম-সম্বন্ধে কখনো প্রকাশ করেনি। দিগম্বরী রামের বিরুদ্ধে শ্যামলালের কাছে নানা কথা বলেছে। রামের হাত

থেকে নিক্ষিপ্ত পেয়ারার আঘাতে নারায়ণী আহত হ'লে শ্যামলাল নারায়ণীকে দিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলেছে—"আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোনদিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক, সেইদিন যেন তুমি আমার মাথা খাও।" সন্তান-সম ছোট ভাইয়ের অন্যায়কে এত বড় কঠিন ব্যবস্থার দ্বারা স্খালন করার পক্ষে অনিবার্য কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, রামকে শ্যামলাল তার সংসার থেকে বিতাড়িত করেছে। নারায়ণীর মতো শ্যামলাল যদি রামকে দৈহিক শাসন করতো সেটাই বড় ভাইয়ের কর্তব্য অনুযায়ী সঙ্গত হ'তো ব'লে মনে হয়; কিংবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে রামকে সতর্ক ক'রে দেওয়া শ্যামলালের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আপাত-নির্লিপ্ত থেকে শ্যামলাল রামের ব্যাপারে চির-ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। জমিদার-পুত্রকে মারার অপরাধে রামের প্রতি নারায়ণীর শাস্তি প্রদান এবং শ্যামলালের শ্বশ্রূ-সমর্থিত ব্যবস্থার—"...এ নিয়ে বকা-ঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে। ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।"—আপেক্ষিক তারতম্য লক্ষ্য করলেই শ্যামলালের চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

শ্যামলাল কোনদিন ভোলেনি রাম তার বৈমাত্রেয় ভাই—"সে সৎমার ছেলে, লোকে নিন্দা করবে, তাই এতদিন কোন মতে সহ্য করেছিলুম, কিন্তু আর নয়।" নারায়ণীর অন্তরের স্নেহ-মমতা-আকুলতা সবটুকুই যখন ক্রমশঃ রাম অধিকার ক'রে নিয়েছিলো, তখন শ্যামলালের অন্তরের গোপন স্থানে উপ্ত একটি ঈর্ষার বীজও ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ শ্যামলালের রামের প্রতি হৃদয়হীন মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। একদিন শাশুড়ীর অভিসন্ধিপূর্ণ কান্নার প্রতাপে শ্যামলাল অর্ধভুক্ত অবস্থায় রাগ ক'রে উঠে যায়। এই রাগ ঠিক কার উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র তা স্পষ্ট ক'রে বলেননি। কিন্তু রাত্রিবেলা নারায়ণীকে উদ্দেশ্য ক'রে শ্যামলাল যখন রামের বিষয় সম্পত্তি আলাদা ক'রে দেবার প্রস্তাব করেছে এবং শাশুড়ীর অপমানে হৃদয় তার বিচলিত হ'য়ে উঠেছে, তখন শ্যামলালের ঈর্ষা-কাতর মনটি আর গোপন থাকেনি। নারায়ণীর

স্নেহ-ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত ভাবের প্রতি "শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ওকি করবে, সে ওই জানে।" শ্যামলালের সংসারের প্রতি উদাসীনতা যে কি পরিমাণে আপাত এবং কৃত্রিম তা তার নিজের কথাতে ধরা পড়ে—"আমি নিজে কি কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, তাই তুমি মনে কর?" রামের সর্ববিধ কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্যামলাল সচেতন; সুতরাং যে অপ্রীতিকর মনোভাব শ্যামলালের অন্তরে পুষ্টিলাভ করছিলো, দিগম্বরীর সহযোগিতায় তা পরিবর্ধিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তবুও নিজের এই অপ্রশমিত ঈর্ষা সম্বন্ধে শ্যামলাল যথাসম্ভব সতর্ক ছিলো। একটা প্রচ্ছন্ন পথ খুঁজে নিয়ে তার ঈর্ষাকাতর মন আত্ম-প্রকাশে উন্মুখ হয়েছে, কারণ সাবধানী শ্যামলাল নিজের ওপর দোষ টানতে রাজী নয়। তা না হ'লে দিগম্বরীর সঙ্গে শ্যামলালের এমন কোন প্রাণের টান ছিলো না যে, দিগম্বরীর শান্তি-বিধানার্থে রামের পৃথক্ ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। শ্যামলাল-চরিত্রে রামের প্রতি গভীর উদাসীনতাই আমাদের সন্দেহকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছে। সাংসারিক জীবনে শ্যামলাল নারায়ণীর স্নেহ-ব্যূহ ভেদ ক'রে প্রবেশ করতে পারেনি। রাম যেন তাদের উভয়ের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে দণ্ডায়মান। স্ত্রীর সমস্ত সত্তার ওপর অধিকার বিস্তার না করতে পেরে শ্যামলাল অন্তরে হয়েছে ক্ষুব্ধ. তাই রামের কাছ থেকে নারায়ণীকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা তার মনে ছিল, কিন্তু স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভয় করতো ব'লেই পারেনি। শেষ পর্যন্ত রামের বহুদিনের সঞ্চিত "অন্যায়ের" গুরুত্বকে ভিত্তি ক'রে সে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছে; কারণ রামের প্রত্যেকটি দুরন্তপনার নিদর্শন তার ঈর্ষা-সঙ্কুল ব্যবস্থার কাছে এতই অকিঞ্চিৎকর যে, শ্যামলালের ইচ্ছা থাকলেও লোক-লজ্জার ভয়ে সে একাজে বিরত থেকেছিল।

বাঙালী জীবনালেখ্য

বাঙ্‌লার একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত। এখানে আত্মীয়তার ক্ষীণতম সূত্র ধরেও বিভিন্ন সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। রাম ও

নারায়ণীকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামিন্ জীবনের যেমন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের চিত্র। নারায়ণীর সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই; দাসী নৃত্যকালী তার কাজের সঙ্গী। কিন্তু এই সংসারেও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হ'লো দিগম্বরীকে কেন্দ্র ক'রে। এই শ্রেণীর বৃদ্ধা বিধবারা এক একটি পরিবারে বিষাক্ত ক্ষতের মতো বিরাজ করে, যার উপস্থিতি সমস্ত পরিবারের শান্তি হরণ করতে উদ্যত হয়। দিগম্বরী শ্রেণীর বৃদ্ধারা নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন জগতের অন্য কোনও বিষয়ে জানতে চায় না। বাঙলার মধ্যবিত্ত সংসারে এ শ্রেণীর চরিত্রের অসদ্ভাব নেই।

ভৃত্য-দাসীকে বাঙালী পরিবারভুক্ত একজন ব'লেই মনে করে। তারা যে বাইরের মানুষ, বেতন-ভোজনের পরিবর্তে রয়েছে, এ কথা উভয়পক্ষই ভুলে যায়। প্রভুর সংসারকে তারা ঘর ক'রে তোলে। ভোলা রামের সাথী, কার্য-অপকার্যের সহচর। রামের ভাল-মন্দকে সে নিজেরই মনে করে। এ ধরণের চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে অপ্রচুর নয়। যেমন দেখি, 'বাল্যস্মৃতি' গল্পের গদাধর ও সুকুমারের সম্পর্ক। দাসী নৃত্যকালী সংসারের ভাল-মন্দ, প্রভু পরিবারের সুখ-দুঃখকে নিজেরই মনে করে। তাই প্রভু পরিবারের পক্ষে সে নানা মন্তব্য প্রকাশ করে। সে নিজেকে পরিবারের দাসী ভাবে না এবং দাসীর মত ব্যবহারও পায় না। গ্রাম্য চিকিৎসক নিজের এককত্বের সুযোগে যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন, তা অত্যন্ত জীবন্তভাবে এখানে চিত্রিত হয়েছে। তা ছাড়া দিগম্বরীর 'পাড়া-কুঁদুলী' মনোভাব অত্যন্ত নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হয়েছে। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত রামের প্রকৃতি ও চিত্র অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।

শ্যামলালের গৃহের মধ্যিখানে মাটির উঠান, একপাশে রান্নাঘর ও খাওয়ার বারান্দা। রামের জলখাবার মুড়ি ও নাড়ু, খাওয়ার ঠাঁই পুকুরের পাড়। এই ভাবে বাঙ্লার এক গ্রামের পারিপার্শ্বিকতায় মধ্যবিত্ত সংসারের এক মধুর সম্পর্কজনিত চিত্র শরৎচন্দ্র চিত্রিত করেছেন, যেখানে শুধু হৃদয়-বৃত্তিরই প্রকাশ ঘটেনি, প্রকাশ পেয়েছে বাঙ্লার সামাজিক জীবনালেখ্য।

উপসংহার

'রামের সুমতি' শুধু সংলাপ এবং ঘটনার দ্বারা বিবৃত হয়েছে, তাই এখানে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সংলাপের মিষ্টতা। এখানে রাম-নারায়ণীর সংলাপ তাদের স্ব স্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দিগম্বরীর কুটিলতা এবং স্বার্থপরতা তার সংলাপের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। "রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক্ করতে জানি না।"—রামের রান্নার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে দিগম্বরীর এই উক্তি আমাদের হাস্যের উদ্রেক করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রের প্রকৃতি আমাদের অগোচর থাকে না।

শরৎচন্দ্র এখানে যতদূর সম্ভব নিজেকে অন্তরালে রেখেছেন। কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁর ভাব-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে মাত্র। যেমন—শ্যামলাল নাকি ডাক্তারের পায়ে ধরে তাকে ডেকে আনে, ডাক্তারের এই উক্তির উত্তরে রামের মত ছেলে কখনও অত গুরুগম্ভীর কথা বলতে পারে না—"…তুমি ছোট-জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেল্‌লে পায়ে ধরে ডাকৃতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না।…" প্রথম ঘটনায় রামের এই শ্রেণীর কথাবার্তা ও পরবর্তী-রামের ছেলেমানুষীপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

এখানে হাস্যরসের প্রকাশ ঘটেছে সাধারণ কথাকে গুরুগম্ভীরভাবে প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যা শরৎ-সাহিত্যের হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—"…নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাটির ভিতর গেলেন,—দুনিয়ায় কারও ভাল ক'রতে নেই।" অথবা তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে একটি হাস্যরসাত্মক বর্ণনায়—"…দিগম্বরীর পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়ীতে চুপ করিয়াছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল; অবশ্য স্বপ্নে…"। কয়েকটি অসঙ্গতি সহজেই নজরে পড়ে—যেমন

রামের বয়সের হিসাব। নৃতকালী যখন বলছে, "...বার তের বছর বয়সে..." তখন আসলে রামের বয়স ১৫ বছর আট মাস। ভাষার সামান্য ত্রুটি দু'এক ক্ষেত্রে নজরে পড়লেও বর্ণনাভঙ্গী, সংলাপের ভাষা-ব্যবহারে শরৎচন্দ্র পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং ভাষার গতিতে কাহিনী সাবলীল-ভাবে অগ্রসর হয়েছে।

বর্ণনার দিক দিয়ে এখানে যেটুকু অবসর ছিল, শরৎচন্দ্র সে সুযোগ পুর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। দিগম্বরী নদী থেকে গা ধুয়ে ফেরবার পথে কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার বর্ণনা যেমন বাস্তব তেমনি সরসভঙ্গীতে চিত্রিত হয়েছে—"...সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টি-ছাড়া মতিবুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে তাপে অসময়ে অল্প বয়সে নিজের মাথার চুল পাকাইবার কারণ দর্শাইয়া, নিজেকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরিতেছিলেন..."। উপমা-প্রয়োগ সার্থক এবং স্বাভাবিক।

(২)

পথ-নির্দেশ

নামকরণের সার্থকতা

'পথ-নির্দেশ' রচনাটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে কয়েকস্থানে নানারূপ মন্তব্য করেছেন। এই রচনাটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ,—"তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝবে না।" এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের কিছু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। যেজন্য আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"পথ-নির্দেশ বুঝতে পারলে কি ?"—

এ কথাই 'পথ-নির্দেশ' নামকরণের মধ্যে রচনার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতরূপে আত্মগোপন করেছে। হেমনলিনীর পিতার মৃত্যুতে মাতা সুলোচনা কন্যার হাত ধরে পথে দাঁড়ালেন। তাঁর নিজের জীবন সমাপ্তির পথ ধরেছে, কিন্তু জীবন-পথের প্রারম্ভে যে অসহায় কিশোরীটি এসে দাঁড়ালো তার ভবিষ্যৎ-নির্দেশ কোন্‌দিকে ? সুলোচনার অপরিণামদর্শিতায় হেমকে যে সমাজ-নির্ধারিত পথে এগিয়ে দেওয়া হ'লো, সে পথ ছিল ভুল। পথের দেবতার নির্বাক ইঙ্গিতে সে ভুলের ফসল হেম ও গুণীকে চিরজীবন আহরণ করতে হ'লো। জীবনে অগ্রগমনটাই সর্বাপেক্ষা সত্য। পিছনের দিকে তাকিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় নেই। তাই সুলোচনা মৃত্যু-শয্যায় আপন দুষ্কৃতির কালিমা উভয়ের জীবনকে পুনর্বার যুক্ত ক'রে মুছে ফেলতে চাইলেও সেই অবজ্ঞাত অতীত কখনও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় চিরসুন্দর পরিণামে পর্যবসিত হয়নি। তা দুঃখ-বেদনা-পরিতাপে মধুর—কারণ হেম ও গুণী দু'জনের মাঝখানে একটি অনির্দেশ্য ব্যবধান পথের দেবতা কখন নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। সে জন্যই হেম জীবনে পথ চলতে নির্দেশ চেয়েছে ; সঠিক পথে চলতে পারেনি ব'লে দুঃখ পেয়েছে ; কারণ গুণীর সঙ্গে মিলনের যে-পথ আগে সুগম ছিল সে-পথ চিরকালের জন্য হ'য়ে গেছে রুদ্ধ। হেম ধর্ম-কর্ম-পূজা-পার্বণে কোনও সুখ না পেয়ে গুণীর কাছে পথের সন্ধান চেয়েছে—"...আমি যে পথে চল্‌চি, সেকি ঠিক পথ ?" গুণী সেদিন হেমের প্রেমকে অজ্ঞাতে আহত ক'রে বলেছে—"...যে মেলা সবচেয়ে বড় মেলা, যার কাছে যেতে পারলে আর কারো কাছে যেতে ইচ্ছে হবে না, অথচ সমস্ত রকমের মিলনের ইচ্ছাই আপনা-আপনি পরিপূর্ণ, সার্থক হ'য়ে যাবে, তুমি সেই মিলনের কামনা কর। তোমার পথ থেকে তোমাকে কেউ যেন টেনে নিয়ে না যায়...". স্নেহ-প্রেম-মমতায় পরিবৃত হ'য়ে হেমের নারী-প্রকৃতি গুণিন্‌কে কেন্দ্র ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনে পথের নির্দেশ হয়তো পেতো ; কিন্তু গুণিনের ঔদাসীন্যে আবার হেম ভুল পথ অবলম্বন করেছে—তার মন্ত্রদাতা গুরু হয়েছেন কাশীবাসী সন্ন্যাসী। প্রেমহীন জপ-তপ-সমাকীর্ণ যাত্রাপথে হেমের অন্তর-সত্তা আলোর সন্ধান পায়নি। আশাহীন,

সান্ত্বনাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ হেমকে যন্ত্র-চালিতের মতো আকর্ষণ করছিলো। তাই আর সে কাশী ফিরে যায়নি—সতীলক্ষ্মী বধূর মতো মৃত স্বামীর গৃহে ফিরেছে, ভেবেছে বাঙালী-সমাজে এখানেই নারীর পথের নির্দেশ রয়েছে—মৃত স্বামীর কথা স্মরণ ক'রে অনায়াসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেম আবার কাশী যাত্রা করলো—এবার তার মন্ত্রদাতা নয়, শাস্তিদাতা-গুরু গুণিন্।…"যে কটা দিন আরো আছি, সে কটা দিনের শেষ সেবা তোমার, ভগবানের আশীর্বাদে অক্ষয় হ'য়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।" হেম রহস্যময় পথের দেবতার নির্দেশ এতদিনে পেয়েছে, অসীম দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে সে জেনেছে—"…অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ ক'রে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত ক'রে রেখে যায়, …কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর,…।"

গুণী নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা পুরুষ—হেমকে ভালবেসে সে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু হেমের মতো বিভ্রান্ত তার ঘটেনি। নিজের দিকে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে; কারণ পুরুষকে জীবনে বিশেষ নির্দেশ নিয়ে চলতে হয়না—বিরাট তার বিচরণক্ষেত্র, বিস্তৃত তার কর্ম-জীবন। এখানে একমাত্র নির্দেশ রয়েছে উদার-প্রাণতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া। নারী চায় গভীর প্রতিষ্ঠা। ধর্ম-নিষ্ঠা, কর্ম-নিষ্ঠা, সমাজ-নিষ্ঠা দ্বারা নারী নিয়ন্ত্রিত হয় ব'লেই তার জীবনে নির্দেশের প্রয়োজন। আর সেই নির্দেশ রয়েছে তার অসীম-গভীর প্রেমানুভূতির মধ্যে। প্রেমের মন্ত্র নারীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে—তাই হেম গুণীর কাছেই প্রথম পথ-নির্দেশ নিতে চেয়েছিলো।

কাহিনী পরিকল্পনা

প্রথম যুগের শেষ রচনা "শুভদা"র পর প্রায় আঠার বছর পরে শরৎচন্দ্রের পুনরায় সাহিত্য-জীবন শুরু হয় "রামের সুমতি" এবং "পথ-নির্দেশ" দিয়ে।

"'পথ-নির্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ-নির্দেশ'টাই ভাল।…আমিও অনেকের অনেক মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, 'রামের সুমতি' যদিও বা লেখা যায়, 'পথ-নির্দেশ' লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়তো সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ Circumstance-এর ভিতরে খেই হারাইয়া একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়তো ধৈর্যের অভাবে শেষ হবার পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে।"—শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য 'পথ-নির্দেশ' সম্বন্ধে অযৌক্তিক নয়। কাহিনীর পাত্র-পাত্রী গুণী ও হেমকে কেন্দ্র ক'রে ঘটনাবর্ত এবং উভয়ের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য এমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে যে, 'পথ-নির্দেশে'র কাহিনী-পরিকল্পনা ছোটগল্পের অনুগামী হ'লেও, ছোটগল্পের সহজ পরিবেশকে একটা রহস্যের আবরণে আবৃত করেছে। হেমনলিনীর পিতার মৃত্যু দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। সুলোচনা এবং হেমের গুণীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণে কাহিনীর বিস্তৃতি-লাভ এবং হেমের বিবাহে কাহিনী জটিল পরিস্থিতি অভিমুখী হয়েছে। হেমের বৈধব্য বরণের পর কাহিনীভাগে যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক ঘটনাগত নয়—হেম ও গুণীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগত; কারণ হেমের কাশীবাস, পুনরায় গুণীর কাছে ফিরে আসা, মিথ্যা ভুলের ভিত্তিতে হেমের মৃত-স্বামীর গৃহে ফিরে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত গুণীর স্মরণাপন্ন হওয়া—সমস্ত ঘটনাগুলিই হেম এবং গুণীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'পথ-নির্দেশ' রচনায় এমন শিল্প-নির্দেশ দিয়েছেন যে কাহিনীভাগ দীর্ঘতর হ'য়ে পড়লেও অসঙ্গতি দ্বারা ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েনি। ছোটগল্পের ঔৎসুক্যটুকু শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে, কারণ ঘটনার অবতারণা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ছোটগল্পের আকস্মিকতা নিয়ে কাহিনীর আরম্ভ হয়েছে কিন্তু উপসংহারটি অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে—এত স্পষ্ট যে পাঠকের বিশেষ জানবার কৌতূহল আর বাকী থাকে না। অথচ 'পথ নির্দেশ' রচনাটির আঙ্গিক-কৌশল এমন পরিমিত এবং শৈথিল্যহীন যে পাঠক-মনে অবসাদও দেখা যায় না। প্রকৃত-পক্ষে শরৎচন্দ্র অশেষ ধৈর্য-সহকারে কাহিনীতে উপসংহার টেনেছেন।

ছোটগল্পে সাধারণতঃ চরিত্র-বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবনের কোনও একটি রহস্যপুর্ণ অনুভূতির দিক গল্পকারের কয়েকটি ইঙ্গিতপুর্ণ ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। চরিত্রের অবস্থান্তর ঘটানো ঐ সব পারিপার্শ্বিক ঘটনার উদ্দেশ্য নয়। "পথ-নির্দেশ" গল্পের আঙ্গিক সামগ্রিকভাবে বেশ সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে হেম-গুণিন্-চরিত্রের সূক্ষ্মতর জীবন-চেতনার বৈচিত্র্যপুর্ণ বিকাশ পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে তাই অনেক সময় মনে হয়েছে, হেম-চরিত্র পরিবর্তনশীল। শরৎচন্দ্র ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে হেমের পরিচয় দিতে গিয়ে যে দু'তিনটি উক্তি করেছেন, তা অনুধাবন করলেই পাঠকের আপাত ধারণাটি সংশয়পুর্ণ হ'য়ে উঠবে—"মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই হেমের আচার-ব্যবহারের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল।" সুতরাং "আচার-ব্যবহারের" পরিবর্তন ঘটেছে, চরিত্রের নয়। আচার-ব্যবহার চরিত্রের বাহ্যিক অংশকে ভিত্তি ক'রে দেখা দেয়। চরিত্রের স্বতঃপ্রবণতা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। তাই হেম মান-অভিমানের বশে যে ভাবেই জীবনকে পরিচালিত করুক না কেন, চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়; কারণ নারী-চরিত্র রক্ষণশীল—তা যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। গুণীর সঙ্গে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে কথোপকথনের সময় হেমের অসঙ্কুচিত ভাব সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"তখনকার হেমের সহিত আজিকার হেমের যেন সংস্রব পর্যন্ত নাই।"—কিন্তু পুর্বজীবনেও হেম সর্বক্ষেত্রেই স্পষ্ট-বাদিনী। নারীসুলভ লজ্জা-জড়িত ভাষায় সে কোনদিন কথা বলেনি—কাজেও সে পুরুষোচিত তৎপরতারই পরিচয় দিয়েছে। কাশী থেকে ফিরে এসে হেম গুণীকে নিয়মিত প্রণাম করেনি। শরৎচন্দ্র বলেছেন,—"এই নিয়ম-চ্যুতি গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—একটা পরিবর্তন তাহার চোখে পড়িয়াছিল।"—এ পরিবর্তনও ব্যবহারগত। এই ত গেল শরৎচন্দ্রের উক্তির বিরুদ্ধে হেম-চরিত্রের অপরিবর্তনীয়তার প্রমাণ।

ঘটনাগতভাবে হেমের চরিত্র-পরিবর্তনের একটি আভাস পাওয়া যায় গুণীর উচ্ছিষ্ট-গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আমাদের মনে হয় সুলোচনার সংস্কার-

পূর্ণ মনের মতো হেমের চরিত্র সংস্কারপূর্ণ ছিল না। প্রথমতঃ হেম শিক্ষিতা, সুতরাং মন তার যুক্তিপরায়ণ। যাকে ভালবাসা যায়, তার সঙ্গে যে কোন পার্থক্য রেখে চলা যায় না, হেম এ কথাটা একটু দেরীতে বুঝেছিল। তাই মানুষের সৃষ্ট জাত-আচার-নিয়মকে স্বীকার করা অপেক্ষা প্রেমের অনুশাসন মানা অনেক বেশী মহৎ যুক্তির পরিচয়, হেম গুণীর কাছে সে কথাই সেদিন প্রমাণ করেছে। মানুষের চরিত্র অনেকটা অসীম নীলিমার মতো। রং তার আছে,—অপরের চোখ তাতে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু মন তাতে থই পায় না। সুতরাং চরিত্রের মূল ভিত্তিতে যদি কঠোর আঘাত না পড়ে তবে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। হেমের স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না ক'রেই তাকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হেম পার্বতীর মতোই দৃঢ়ভাবে জানে গুণীদার ভালবাসার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত নয়। সেই সান্ত্বনা হেমকে স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছে—সুখী করেছে কি-না জানি না। ছোটগল্প হিসেবে "পথ-নির্দেশে" আমাদের কৌতূহল এদিক দিয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। প্রধান কথা গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুণীর মতো নিশ্চলভাবে হেম অবস্থান না করলেও—বিভিন্ন-রূপে কাহিনী-ভাগে আবর্তিত হয়েছে। আবর্তনের প্রধান ভিত্তি গুণীর প্রতি প্রেম এবং সমাজ সমস্যা। গুণীর হৃদয়ের আশ্রয় হেম আগেও চেয়েছে—তা থেকে ব্যর্থ হ'য়ে পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে আবার গুণীর উদার হৃদয়ের সান্নিধ্যে হয়তো তৃপ্তিও পেয়েছে। "পথ-নির্দেশ" গল্পের উপসংহার সামাজিক মিলনে পরিসমাপ্ত না হ'লেও পাঠক-মনে তৃপ্তির আনন্দ লক্ষ্য করা যায়।

হেম-গুণিনের প্রেম-প্রকৃতি

শরৎচন্দ্র তাঁর কোন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চিঠির মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"পথ-নির্দেশ পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা?" হেমনলিনী এবং গুণিনের সম্পর্ক কোনও একটি বাস্তব

তথ্যকে ভিত্তি ক'রে পরিস্ফুট হয়েছে, উপরিদ্ধৃত উক্তি থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু গোপন তথ্যটি যখন "পথ-নির্দেশ" গল্পের অন্তরালে থেকে গেছে, তাকে আর যুক্তি-প্রমাণের শৃঙ্খলে বন্ধনগ্রস্ত করবার প্রয়োজন নেই। সাহিত্য-রসিকের কাছে প্রত্যক্ষ বস্তুর সর্বজনীন আবেদনটিই অতি সহজে গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে।

হেম-গুণিনের প্রেম-প্রকৃতির মধ্যে নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত যে সমস্যা উভয়ের জীবনে পরিপন্থী ব'লে মনে হয়, তা সবই বাহ্যিক বাধা মাত্র। গুণিন্‌কে কেন্দ্র ক'রে নিষ্ক্রিয়-উদাসীন পুরুষ-চরিত্র এবং হেমকে কেন্দ্র ক'রে সক্রিয় শক্তিসম্পন্না নারী-চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। নারীর প্রধান শক্তি প্রেম-পরায়ণতা—এই প্রেমবোধকে অবলম্বন ক'রে দেখা দেয় স্নেহ-মমতা-কর্তব্য-নিষ্ঠা-আকুলতা সব কিছু। হেম-চরিত্রে এই সব নারীজনোচিত গুণগুলি অপ্রচুর ছিল না, কিন্তু তার চরিত্রে নারীসুলভ ধীর-স্থির-সহনশীল দিকটির অভাব ছিল যথেষ্ট। তাই হেম অতি বুদ্ধিমতী এমনকি শিক্ষিতা হয়েও অভিমানের অতিপ্রাবল্যে স্থিতিহীনভাবে আত্মগ্লানি সঞ্চয় করেছে। মনের দৃঢ়তায় সে আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজে নিতে পারেনি। হেম-চরিত্রের সঙ্গে পার্বতী-চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। অভিমানের তীব্রতায় 'মা-শোয়ে' এবং 'কমলা'র মতো হেম নিজেও দুঃখ পেয়েছে এবং দুঃখ দিয়েছে গুণিন্‌কে।

সুলোচনা মৃত্যুশয্যায় হেমকে বলেছিলেন, "·· তোরা একদিনের দেখাতেই চিরকালের মতো এক হ'য়ে গিয়েছিলি!"—এই উপলব্ধিকে একসময় সুলোচনাই অস্বীকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে হেম ও গুণীর সম্পর্ক কোনরূপ জটিলতর সম্ভাবনায় পর্যবসিত হয়, এই আশঙ্কায় সুলোচনা প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ই হেম ও গুণীর মধ্যে ভাই-বোনের সম্বন্ধ টেনে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দর্শনে গুণিনের রূপমুগ্ধতার আভাস তার বিস্ময় ও হতবুদ্ধি-জনিত ভাবের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্ম-সংযমশীল গুণিন্ সুলোচনার আরোপিত ভাই-বোনের সম্পর্ককে বেশ দৃঢ়ভাবে মেনে নিয়ে বলেছে—"হেম

শুন্‌লে ত—আমাদের একই মা।”—মানুষের নির্ধারিত আত্মীয়তা-স্থাপন ও আকাঙ্ক্ষা যে কতই অকিঞ্চিৎকর হ’য়ে দেখা দিতে পারে তা হেম ও গুণিনের পারস্পরিক অথচ অন্যের অলক্ষিত প্রেম-সঞ্চারেই প্রমাণিত হয়েছে। “এই দুটিতে কেমন করিয়া যে এত সত্বর আপনার হইয়া গেল,”—এ শুধু সুলোচনার বিস্ময় নয়—প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় শক্তির বিকাশে চিরকাল মানুষ এ-জাতীয় বিস্ময় প্রকাশ ক’রে থাকে। প্রেম তাতেই হয় মহিমান্বিত।

হেমনলিনীর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত হেম এবং গুণিন্ দু’জনের অন্তরের গোপন বাসনা রহস্যময় হ’য়েই পরিস্ফুট হয়েছে। একান্তে দু’জনে যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে, উক্তি-প্রত্যুক্তি করেছে, তখন এমন কোন কথা বা অব্যাখ্যাত ইঙ্গিতের আভাস উভয়ের মধ্যে প্রকাশ পায়নি যাতে তাদের প্রেমাসক্তি সম্বন্ধে কোন দৃঢ় ধারণা পাঠকের অনুভূতিতে ক্রিয়াশীল হ’তে পারে। হেমের বিবাহ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই গুণিনের মুখে কালোছায়ার প্রতিফলন, দীর্ঘ-নিশ্বাস-পতন, আত্ম-সংবরণ, হেমের প্রতি গুণিনের নিগূঢ় ভালবাসার পরিচয় বটে কিন্তু তা প্রত্যক্ষ নয়। হেমও তার বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত গুণিনের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে কিশোরী বয়সের অগভীর হৃদয়-চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটেছে। গুণীদার ওপর বেশ একটা অধিকার স্থাপন ক’রে লেখা-পড়া এবং শোয়া-বসার মধ্যে দিন যাপন ক’রে হেম বেশ সুখেই ছিল। সুলোচনা বিবাহ সম্পর্কে কোন কথা তুল্‌লেই হেম গুণিনের প্রতি অভিমানে শতমুখ হ’য়ে উঠতো—কান্নায়, অনুরোধে ব্যতিব্যস্ত ক’রে তুলতো গুণীকে—“তোমাকে কিচ্ছু কর্‌তে হবে না, গুণীদা, কিচ্ছু না। এই অঘ্রাণ মাসে? এই একমাস পরে? তোমার দু’টি পায়ে পড়ি গুণীদা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও।” এই আকুলতা প্রকাশে প্রেমবোধের পরিচয় অপেক্ষা গুণীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্কেরই পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়েছে। গুণিনের উচ্ছিষ্টাবশেষ গ্রহণের মধ্য দিয়ে হেমের কিশোরী বয়সের অস্থিরচিত্ততা এবং সহজ-সরল বুদ্ধির লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। হেম গুণীর প্রতি তার আকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে তখনও সচেতন হয়নি, তাই স্পষ্ট উক্তিতে সে নিজের

মনোভাব প্রকাশ করেছে ; কোন লজ্জা-সঙ্কোচ-দ্বিধা তার মনে স্থান পায়নি। হেম যখনই কোন কথা বলেছে, সব সময়েই "ক্রুদ্ধ হইয়া," "ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকিয়া," "কাঁদিয়া", "রাগিয়া"। এ পর্যায়ে তার মন গভীরতা লাভ করেনি—তাই উত্তর-জীবনে কঠিন জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হ'য়েও সে হ'য়ে উঠেছে অত্যন্ত অভিমানিনী। অন্যদিকে গুণিন্ হেমের প্রতি তার মনোভাবকে যথাসম্ভব সংযত রেখেই চলেছে। সুরেন্দ্রনাথ-বা-থিন-দেবদাসের মতো গুণী নির্লিপ্ত-উদাসীন নয়। গুণীর চরিত্র কিছু পরিমাণে কাশীনাথ-জাতীয়। এ-জাতীয় পুরুষের ঔদাসীন্য অনেকটা আপাত। চরিত্রের গভীরতায়, অচঞ্চল অনুভূতিতে এবং সংযমশীলতায় গুণী জীবনে সব রকম দুঃখকেই সহ্য করতে পেরেছে। কোনপ্রকার প্রতিবাদ-অভিযোগ-দাবি নিয়ে সে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি।

গুণীর প্রতি হেমের শ্রদ্ধা গ্রন্থের বহু জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে। সুলোচনাকে হেম একবার জানিয়েছিল—"...তুমি যে বাড়ীতে আছ মা, সে বাড়ীর হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। ওখানে থেকেও যদি তোমার পুণ্য সঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না।" হেমের স্বামীগৃহে সুলোচনা অসুস্থ হ'লে হেম বলেছে—"আর কেন মা; বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করতে হয়; যদি বাঁচতে চাও গুণীদাকে ডাক দাও।" গুণীদাকে হেম জীবনে গুরুর স্থানে বসিয়েছিল। বিবাহিত জীবনে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু হ'য়ে দেখা দেয়, কিন্তু হেমের ক্ষেত্রে তা ঘটেছিল ব'লে মনে হয় না। তাই সে স্বামীর মৃত্যুর পর সহজভাবে তার পরম আশ্রয়স্থল, নির্ভর-স্থল গুণীদার কাছে এসে দাঁড়ালো—নিজের বৈধব্যের জন্য কোন-প্রকার বিচলিত ভাব তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি। যেন পূর্বজীবনে ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে হেম তার মা এবং গুণীদার কাজের সমালোচনা ক'রে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছে—"তোমরা ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টের পেয়েছিলাম। তখন আমার কথা তোমরা গ্রাহ্য করলে না—এখন কান্না, আর হায়, হায়?"

প্রকৃতপক্ষে সুলোচনার মৃত্যুর পর হেমের আত্ম-সচেতনতা যেন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। মৃত্যু-শয্যায় মায়ের অনুতাপ-জর্জরিত চিত্ত এবং বেদনাপূর্ণ উক্তিই হেমের সুপ্ত প্রেমবোধকে জাগ্রত করেছে। যেইমাত্র গুণীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটি স্পষ্টভাবে সে মুমূর্ষু মায়ের মুখে জেনেছে—"তার যা ধর্ম, তোর ধর্মও তাই···তোদের ওপর আমার এই শেষ অনুরোধ রইল মা, আমার অন্যায়, আমার পাপকে চিরকাল স্বীকার ক'রে আমার দুষ্কৃতিকে যেন অক্ষয় ক'রে রাখিস্‌নে।"—এই উক্তির ইঙ্গিতই হেমের অবচেতন মনের আবরণ ছিন্ন ক'রে ফেলেছে এবং হেম যেন তার বিবাহ এবং বৈধব্যের জন্ম এতদিন পরে অভিমান ও বেদনায় গুণীর প্রতি আবেগ-বিক্ষুব্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েছে—"কাছে থাকিয়াও যেন প্রতিদিন নিজেকে কোন সুদূর অন্তরালের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া যাইতে লাগিল।" হেমের আচার-ব্যবহারে দ্বিধা-সঙ্কোচ ভাব, গুণীর সান্নিধ্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা, আচার-বিচার-ধর্মের আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা "তাহার হৃদয়বাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকারীর চলা-ফেরার পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে···।" মায়ের "দুষ্কৃতি"র অপনোদন করতে হেমের অন্তরের গোপন "দুষ্কৃতকারী"র জাগরণ ঘটেছে—কিন্তু এই অদম্য শক্তিকে নির্বাপিত করবার সাধ্য হেমের নেই। "পথ-নির্দেশ" গল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত এই প্রেম শক্তিরই বিচিত্র বিকাশ; পরিণতির চিত্রে হেম ও গুণীর জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় এবং মহিমময় দিকের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে।

গুণেন্দ্রর চির-সহিষ্ণু এবং নিস্তরঙ্গ প্রকৃতিতেও এবার মৃদু আন্দোলন দেখা দিল। প্রথমতঃ কিছুদিন সে হেমের দ্বিধা-সঙ্কোচপূর্ণ দূরত্বকে বিনা প্রতিবাদেই সহ্য করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হেমের গুরু-মন্ত্র নেবার কথায় তার সযত্ন-সাধ্য ধৈর্যের বাঁধ স্খলিত হয়েছে। অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে গুণী বলেছে,—"ভয় নেই ভাই, তোমাকে আত্মরক্ষার জন্যে নিত্য নূতন কবচ আঁটতে হবে না।"—এখান থেকেই গুণী হেমকে ভুল বুঝেছে। জাত-ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ সমস্যা-সঙ্কুল কথা তুলে, হেমের সহজ আত্ম-সমর্পণের পথকে করেছে রুদ্ধ। গুণীর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, হেম নিজেই

হয়তো এসেছিলো মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী পথ খুঁজে নিতে। সে নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছে ধর্ম-কর্মে সে সুখ পায়নি। স্বামীকে সে কখনো ভালবাসেনি, এতেও বিধবা-বিবাহ সম্ভব কি? তার উত্তরে গুণী যখন হেমকে সতীলক্ষ্মীর আদর্শ পালনের উপদেশ দিয়েছে, তখন হেম বলেছে—"আমিও সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণকালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি এই কথাই মনে করব!" কতখানি দৃঢ় মনোবল নিয়ে হেম গুণীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলো। কিন্তু গুণী স্বামী-স্ত্রীর জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন, কর্মফলের দোহাই দিয়ে হেমের উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সবলে দমন করেছে। এখানে অবশ্য গুণীর ইচ্ছাকৃত আঘাতের প্রয়াস অপেক্ষা ঔদাসীন্য প্রাধান্য পেয়েছে। হেমের উন্মুখ উৎকণ্ঠাকে আহত ক'রে গুণী নিজে অন্তর্দাহে তীব্রভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। হেমের প্রতি তার গভীর প্রেমের স্বরূপকে গুণী কখনো প্রকাশ হ'তে দেয়নি—"বিষধর সর্পের" অজানা দংশনের মতোই একটা অজানা ভয় গুণীকে সব সময় বাধা দিয়েছে—এমন কি "আজ তাহার (হেমের) মুখ হইতে স্পষ্ট করিয়া শুনিয়াও সে কোন মতেই নিজের কথাটা বলিতে পারিল না।"

গুণীর ঔদাসীন্যে গভীর আঘাত পেয়েছে অভিমানিনী হেম। হেমের কঠোর বৈধব্য-নিষ্ঠা 'মাধবী'র কথা এবং ধর্ম-নিষ্ঠা 'রাজলক্ষ্মী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু হেম এ দুই নারীর মতো প্রেমকে নিগৃহীত করলেও, তা অনির্বাণ হ'য়ে তার অন্তরে স্পন্দিত হয়েছে। আহত প্রেমকে সমূলে বিনষ্ট করবার চেষ্টায় হেম কাশীবাসিনী হয়েছে; ধর্ম-কর্মের প্রাচীর তুলে ভুলতে চেয়েছে আপন অস্তিত্বকে। গুণীর অসুস্থতার জন্য তাকে কয়েকদিন পরে ফিরে আসতে হয়েছে বটে, কিন্তু এবার হেম গুণীকে কঠিন কথায় এবং ব্যবহারে আঘাত ক'রে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। গুণীর অসুস্থ অবস্থায় আবেগপূর্ণ উক্তি হেমের অবরুদ্ধ প্রেম এবং অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রেম দ্বারা মন্ত্রপূত হ'য়ে একদিন হেম গুণীর জীবনে আবির্ভূত হ'তে চেয়েছিলো। আজকে প্রেমামৃত বিষে রূপান্তরিত হ'য়ে দংশনোদ্যত হয়েছে। নারী চরিত্রের দৃপ্ত অংশটুকু হেম চরিত্রে চির-বর্তমান। বৈধব্যের পরও সে এত নিষ্ঠুর হ'য়ে

ওঠেনি—কিন্তু প্রেমের অবমাননায় তার নারী-প্রকৃতি আত্ম-বিসর্জনে উদ্যত, তাই অপ্রকৃতিস্থ ; কারণ পূর্ব-মুহূর্তে "তুমি ভাল না হ'লে আমি বাঁচবো কি করে?" ব'লে পরমুহূর্তেই—"শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও"—এই দুই উক্তির মধ্যে প্রকৃতিস্থ মনের সামঞ্জস্যবোধ পাওয়া যায় না।

হেমের প্রেমকে একদিন গুণী প্রত্যাখ্যান করায় হেম জীবন-প্রবাহে একটি নির্ভরপূর্ণ আশ্রয়-লাভে বঞ্চিত হ'য়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, আবার "অভিমানীর চোখের জলের" মূল্য দিতে তাকে আপন অভিমানের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হয়েছে। গুণীর মরণাপন্ন অসুখ এবং তার সংসারে বিশৃঙ্খলতার সংবাদ মানদার কাছে শুনে হেম আর স্থির থাকতে পারেনি—নারী-ধর্ম প্রতিষ্ঠার এত বড় সুযোগ সে আর অবহেলায় লাঞ্ছিত হ'তে দিতে প্রস্তুত নয়। এতদিন তার দ্বন্দ্ব হয়েছে গুণীদার সঙ্গে, সেখানে তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ছিল না। কিন্তু আপন অধিকার-চ্যুতির ভয় হেমকে আজ বিচলিত করেছে। তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনের এই দুঃসময়ে সে বৃথা দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে নির্বাক হ'য়ে থাকতে পারেনি।

গুণীর সঙ্গে হেমের সমাজগত মিলন শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে দেখান নি। কিন্তু উভয়ের অন্তরে যে বিচ্ছেদের দুঃখ-দহনের পর ভাব-সম্মিলন হয়েছে, তাতে আছে তৃপ্তির মাধুর্য এবং আনন্দের অপরিসীম প্রকাশ। দীর্ঘ চার বছর দু'জন পরস্পরকে ভালবেসে যে দুঃখ সহ্য করেছে তার সান্ত্বনা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন হেমের প্রতি গুণীর শেষ আশ্বাস-বাণীর মধ্য দিয়ে—···"সংসারে ভালবাসাকে মহা মহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায়নি···।" হেম ও গুণীর প্রেমের ট্র্যাজিক প্রবর্তনা ব্যথায় মধুর এবং করুণ হ'য়ে পাঠকের রসচেতনাকে ভাবাতুর ক'রে তুলেছে।

সুলোচনা চরিত্র

'পথ-নির্দেশ' গ্রন্থে সুলোচনা চরিত্র সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর দু'টি জটিল পরিস্থিতিপূর্ণ অংশে সুলোচনার সক্রিয়তায় হেম ও গুণিনের জীবন

নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সুলোচনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ব্যবহারিক জ্ঞান-বিশিষ্টা এবং সামাজিক সর্ববিধ সংস্কারে পরিবৃতা। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়া সুলোচনা একমাত্র বালিকা কন্যাকে নিয়ে বিশুষ্ক চোখে জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। কলকাতায় গুণিনের আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুলোচনাকে অনুগৃহীতা মনে হয়নি। গুণিনের 'সইমা' হিসেবে তিনি সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হ'য়ে বসেছিলেন।

হেমকে গুণিনের হাতে সমর্পণ করবার ইচ্ছা যে সুলোচনার ছিল না, একথা জোর ক'রে বলা যায় না। কারণ মেয়ের রূপ এবং বিদ্যার যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁকে প্রথম থেকেই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠতে দেখা যায়। "গুণী, হেমকে তোর হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচারে নিষেধ থাকৃত।" তা ছাড়া গুণী ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী—এই সংবাদে "মনে মনে যেন শক্ত আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িলেন।"

গুণিন-হেমের ভাই-বোনের সম্পর্ক সুলোচনা যত উচ্চকণ্ঠেই প্রচার করুন না কেন, একটি অপ্রকাশিত আশা তাঁর মনে প্রথমে ছিলই। কিন্তু লোকাচার-দেশাচার-জাতি-ধর্ম ইত্যাদির অনুশাসনকে মেনে চলতে গিয়ে হেম-গুণিনের হৃদয়ের দিকটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত অপরিণামদর্শী হ'য়ে হেমের বিবাহ দিয়ে, হেম এবং গুণীর মধ্যে ব্যবধান আনতে চেষ্টা করেছেন। সুলোচনা চরিত্র যে ঠিক স্বার্থপরতার পরিচায়ক তা নয়। সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর নিজের বিবেচনায় যা বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর চরিত্রে শরৎ-সাহিত্যের পরবর্তী মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-মমতাপূর্ণ অবিস্মরণীয় সম্পদ্ অপরিস্ফুট। মাতৃ-হৃদয়ের উদারতার অভাবটুকুই এখানে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমের বিবাহের পূর্বে তাদের অসঙ্কোচ ঘনিষ্ঠতায় সুলোচনা আতঙ্কিত হয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-সংস্কারের যুক্তি তুলে যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছেন—"ওকি কচ্ছিস্ হেম? ও যে গুণীর এঁটো পাত; যা কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ্ ক'রে আয়।"

সুলোচনার মনোভাবে মহৎ-প্রাণতার পরিচয় নেই; দোষ-গুণ সমন্বিত

চরিত্র নিয়েই তিনি এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু হেমের বিবাহের পর তার শ্বশুরালয়ে সুলোচনা অত্যন্ত দুর্বল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের পূর্বাপর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যখন তিনি বলেছেন—"এ তবুও মেয়ে-জামায়ের বাড়ী, সেইখানেই বা কোন্ নিজের বাড়ীতে ফিরে যাব, শুনি ?"—নিজের সন্তানের কাছে থাক্‌বার আশায় হয়তো তিনি এ-কথা বলেছেন ; কিন্তু সুলোচনার চরিত্র তাতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে পড়েছে। মাতৃ-স্নেহের ঔদার্যটুকুই যদি না থাকে তবে মাতৃ-প্রেমের বন্দনায় যুগে যুগে কবিরা মুখরিত হয়েছেন কেন ?

সুলোচনার মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় হেমের বৈধব্যের পর। মৃত্যু-সন্নিধানে যে দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে হেম-গুণীর পূর্ব সম্বন্ধকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সুস্থ-শরীরে তা সুলোচনার পক্ষে সম্ভব হ'তো কিনা সন্দেহ। হেমের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে দায়ী ক'রে সুলোচনা অনুতাপে জর্জরিত হয়েছেন—"আমার অপরাধ যে কত বড়, গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না…অজানা পাপের উপায় আছে কিন্তু জেনে শুনে করা পাপ কি কথায় মোচন পাব… ?" সুলোচনা শেষ পর্যন্ত গুণীকে ইঙ্গিতে যে কথা বলেছেন—"একদিন তুই আমার হেমকে স্নেহ করতিস্, আর একবার চেষ্টা করলে কি তাকে আবার স্নেহ করতে পারিস্ নে ?" কিংবা হেমের উদ্দেশ্যে বলেছেন—"কোনদিন তার অবাধ্য হ'স্‌নে, মা, কোনদিন তাকে দুঃখ দিস্‌নে।"—এ সকল উক্তির ভবিষ্যৎ-পরিণামে যে ফল দেখা যায় তাতে হেম ও গুণীর জীবন গভীরতর দ্বন্দ্ব-অভিঘাতের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছে। সুলোচনার বর্তমানে হেম ও গুণিন্ প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মনের কাছে অগ্রসর হ'তে পারেনি ; তখন তাদের দুঃখের কারণ হ'য়ে দেখা দিয়েছেন সুলোচনা। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে তারা প্রত্যক্ষভাবে একে অন্যের সান্নিধ্যে এসেছে—"সুলোচনার শেস আশীর্বচন" উভয়ের হৃদয়কে করেছে আন্দোলিত।

শরৎ-মানসের প্রকাশ

'পথ-নির্দেশ' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র প্রথম সমাজ-জাতি-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কয়েকটি সর্বজনীন তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। কোনও গ্রন্থে লেখক যদি তত্ত্ব নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন—তবে লেখকের স্রষ্টা-ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাহিনী-ভাগে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর জীবন-লীলায় ধর্ম-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করবে।

গুণেন্দ্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বলেছেন, জাতি-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে দেশ-কাল-পাত্রকে কেন্দ্র ক'রে এবং কেবলমাত্র ইহকালকে ভিত্তি ক'রে। কিন্তু ধর্ম, যা মানুষের ইহকাল-পরকাল পরিবৃত ক'রে বিরাজমান অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে যা ধারণ ক'রে আছে—সেই ধর্ম-তত্ত্ব মানুষের লোকাচার-দেশাচারের অনেক ঊর্ধ্বে। সেখানে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতির কোন ভেদ নেই, মানব-ধর্মই একমাত্র অপরিবর্তনীয় নিত্যকালের বস্তু। হেম ও গুণীর জীবনে মানব-ধর্মের একটি প্রধান শাখা প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। সেই প্রেম-সত্তাকে সমাজের নিয়ম-পাশে নিষ্পিষ্ট ক'রে ফেলতে চাইলেও, তার সমুন্নত মহৎশক্তি নির্জীব হ'য়ে পড়ে না। হেম ও গুণীর জীবনে প্রেম ভোগের বস্তু হ'য়ে দেখা দেয়নি, ভোগাতীত সামগ্রীরূপে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

স্বামী-স্ত্রীর চির-সম্বন্ধের বিপক্ষে শরৎচন্দ্র কর্মফলের দোহাই দিয়ে গুণীর উক্তির মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন—"স্ত্রী নিজের কর্মে স্বর্গে যায়, স্বামী হয়ত জন্ম-জন্ম নরক ভোগ করে—হাজার কামনা করলেও আর এক হবার উপায় থাকে না?" সুতরাং বিধবা-বিবাহে সতী-লক্ষ্মীর সতীপনা ক্ষুণ্ণ হবে এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আত্ম-সমর্থন থাকলে মানুষের পক্ষে সব কাজই সুফল প্রদান করবে—তবে তার উদ্দেশ্য যেন হীন না হয়। শরৎচন্দ্র হেম-গুণীর মধ্যে সামাজিক মিলন সম্ভব ক'রে তোলেননি; কারণ বিবাহ বন্ধনেই যে সকল সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য যে জীবন-সমস্যার অবতারণা করে তাতে কোন বিধানই

প্রযোজ্য নয়। গুণীর দীর্ঘ উক্তির মধ্য দিয়ে বা হেমের প্রতি গুণীর উপদেশ ভাষণের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র জীবন-সমাজ-ধর্ম ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাত্ত্বিক আলোচনায় হয়েছিলেন মগ্ন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিপ্রবণ অনুভূতি শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেনি—হেম ও গুণীর অন্তর্বিক্ষুব্ধ অনুরাগের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা শরৎচন্দ্র নিরপেক্ষ থেকেছেন। কোনপ্রকার তত্ত্ব-ভাষণে হেম-গুণীর জীবন-রহস্যকে আবৃত করেননি।

উপসংহার

শরৎ-সাহিত্যে নব-জাগরণের সূচনা "রামের সুমতি," "পথ-নির্দেশ" গল্পে পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত ত্রুটির জন্য শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলি নিঃসংশয়িতভাবে সার্থক গল্প অথবা উপন্যাসের বাহন হ'য়ে ওঠেনি, দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধানে ঐ সকল ত্রুটিগুলি বেশ সুপ্রকটভাবে অন্তর্হিত হয়েছে। 'পথ-নির্দেশ' কাহিনীর প্রথম থেকে সুলোচনার মৃত্যু-শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিভঙ্গীতে কাহিনী-ভাগের অটুট বাঁধুনি রক্ষিত হয়েছে, সংলাপের অত্যন্ত পরিমিতিবোধে অথচ ভাবব্যঞ্জক ইঙ্গিতে। অকারণ তথ্যপূর্ণ অনুচ্ছেদের অবতারণা দ্বারা সুলোচনা-গুণিন্-হেমের অতীত যোগ-সূত্রের কাহিনী শরৎচন্দ্র এখানে উপস্থাপিত করেননি। শরৎচন্দ্রের লেখনী যে অত্যন্ত সংযম-দক্ষ হ'য়ে উঠেছে, তার স্পষ্ট পরিচয় এই গল্পে পাওয়া যায়। তবে সুলোচনার মৃত্যুর পূর্বের সংলাপ বক্তৃতায় পরিণত হয়েছে এবং গুণীর তত্ত্ব-সঙ্কুল দীর্ঘ সংলাপ 'পথ-নির্দেশ' গল্পের শেষাংশে কিছু পরিমাণে ত্রুটি বহন করেছে। এ সব স্থলে সংলাপ কিছু সংক্ষিপ্ত হ'লে 'পথ-নির্দেশ' সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠতো। উপসংহারে গুণীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা কাব্য-রস সিঞ্চন করেছে।

এখানে ভাষার দিক দিয়ে অসঙ্গতি একেবারেই লুপ্ত-প্রায়—মিশ্রণ দোষ পাঠকের দৃষ্টিকে আর কণ্টকিত ক'রে তোলে না। বর্ণনাভঙ্গী সহজ এবং ভাবোদ্দীপক ; আতিশয্য সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে—গুণীর অগোছাল প্রকৃতি, হেমের গৃহিণীপনা, হেমের বৈধব্য-নিষ্ঠা, গুণীর আত্ম-দমন ও ধৈর্যচ্যুতির

রহস্য বর্ণনা অত্যন্ত নিপুণভাবে শরৎচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। সমালোচনার প্রবৃত্তিকে এখানে তিনি কঠোরভাবেই দমন করেছেন ব'লে মনে হয়। পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করবার যে রচনা-কৌশল শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক এবং পরিণত সব রচনায়ই বর্তমান—তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এখানেও আছে। সুমিষ্ট কথার ভঙ্গীতে পাঠক-চিত্তকে মুহুর্মুহু আনন্দ-বিষাদ-আবেগক্লিষ্ট ক'রে শরৎচন্দ্র এখানে প্রকৃত শিল্পী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। উপমা স্থানে স্থানে কষ্ট-কল্পিত হ'লেও পাঠকের সহজ বোধশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে না।

(৩)

বিন্দুর ছেলে

কাহিনী পরিকল্পনা

'বিন্দুর ছেলে' রচনাটি প্রায় বার-তের বছরের ঘটনা নিয়ে পরিস্ফুট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গল্পের কালিক এবং দৈর্ঘিক পরিমাপে 'বিন্দুর ছেলে' একটি উপন্যাস হ'য়ে উঠতে পারতো। কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে' উপন্যাস নয়, ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত। দেড় বছরের অমূল্যকে কেন্দ্র ক'রে প্রকৃতপক্ষে কাহিনীর সূত্রপাত। 'রামের সুমতি'র রামের মতো অমূল্য এই গল্পে প্রাধান্য পায়নি। হৃদয়ের কতকগুলি সহজাত মানসিক বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে অন্নপূর্ণা এবং বিন্দুবাসিনীর বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক লীলা-বৈচিত্র্যই 'বিন্দুর ছেলে' গল্পের প্রকৃত উপজীব্য বিষয়। অমূল্য এখানে উপলক্ষ মাত্র।

নয়টি পরিচ্ছেদ নিয়ে মূল কাহিনীতে ঘটনা-উপঘটনার বাহুল্য অপরিমেয়। তার ফলে কাহিনীতে ব্যাপ্তি যতখানি, জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতর ক্ষেত্র ততখানি পরিপুষ্ট নয়। সাধারণ বাঙালী গৃহজীবনের অপ্রীতিকর মনো-মালিন্যকে প্রাধান্য দিয়ে শরৎচন্দ্র গৃহজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলির সূত্র খুঁজে বের করেছেন। তার ফলে কাহিনীতে অতি সামান্য ব্যাপার থেকে

আরম্ভ ক'রে গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারে পারিবারিক জীবনের আন্দোলনকে ফুটিয়ে তুলতেই 'বিন্দুর ছেলে' গল্পের সার্থকতা সুচিত হয়েছে।

সাধারণভাবে 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে ঘটনা-বৈশিষ্ট্য অমূল্যধনের শৈশবাবস্থা এবং পাঠ্যাবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অমূল্যের খাওয়া-পরা-পাঠশালা যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই আবর্তিত। অন্নপূর্ণার "অমূল্যকে তুই নে"—কথাটিকে বিন্দু অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছিলো এবং ছেলের ভাল-মন্দ নিয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে যে তার প্রায়ই কলহ উপস্থিত হ'তো, তাতে যত কিছু বৈচিত্র্য, তা তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এলোকেশী-নরেনের আবির্ভাবে এই পরিবারের জীবন-প্রণালী ধীরে ধীরে দিক্ পরিবর্তন করেছে। এখন থেকে ঘটনাগুলি ঠিক প্রধান কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে আবর্তিত নয়, বিবর্তিত হ'য়ে পরিণাম-প্রয়াসী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাহিনী-ভাগ এখান থেকেই গতিশীল হ'য়ে উঠেছে; কারণ এতদিন অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর মনোমালিন্য সম্পূর্ণভাবে ছিল বাহ্যিক। যাদব-মাধব এবং অন্নপূর্ণা-বিন্দুর নিরবচ্ছিন্ন সুখের সংসারে মাঝে মাঝে অন্নপূর্ণা-বিন্দুর তিক্ত-মধুর বাক্য-বিনিময় একটু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে বৈকি! কিন্তু এলোকেশী ও নরেনের আগমনে দু'জায়ের এই সুন্দর সম্বন্ধটি কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনার দ্বারা একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামকে অনিবার্য ক'রে তুলেছে। নরেনের সান্নিধ্য অমূল্যকে বিকৃত পথে এগিয়ে দিচ্ছে এই আশঙ্কায় শুধু নয়, প্রত্যক্ষ কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা বিন্দুর মন অত্যন্ত তিক্ত এবং তীব্র আকার ধারণ করে। অমূল্যের দশ আনা-বার আনা ক'রে চুল ছাঁটা, পুজার বাড়ীতে নাচ দেখতে যাওয়া, সিগারেট খাওয়া এবং নরেনের সঙ্গে অন্যের বাগানে আমচুরি ক'রে খাওয়া ও উড়ে মালীকে মারধোর করার ব্যাপারে জরিমানা দেওয়ায় বিন্দুর মনের প্রতিক্রিয়া এত মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে উঠ্লো যে, অন্নপূর্ণার প্রতি বিন্দুর কঠিন মন্তব্য এবার টাকাকড়িকে ভিত্তি ক'রে অন্নপূর্ণার আত্মসম্মানে আঘাত করলো। বিন্দু ছেলের মঙ্গলের জন্য "দুর্জন" আত্মীয়কে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু অন্নপূর্ণা

বিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী সমাজ-নিষ্ঠ। সে পুত্রের কল্যাণের জন্য আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করতে রাজী নয়। তা ছাড়া অমূল্যের ব্যাপারে বিন্দুকে অতিক্রম ক'রে অন্নপূর্ণার হস্তক্ষেপ এবং টাকাকড়ি দিয়ে অশান্তি দূর করা—কাহিনীর পক্ষে দ্বন্দ্বসঙ্কুলতার অনিবার্য কারণ নয়; কারণ বিন্দু এবং অন্নপূর্ণার অন্তরের সম্পর্কটি পারস্পরিক বিদ্বেষাত্মক নয়। পারিবারিক জীবনে ব্যষ্টিগত স্বার্থ এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংঘাত এলোকেশী ও নরেনকে উপলক্ষ ক'রে দেখা দিয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ বিন্দুর অন্তর্দাহের পরিচয় বহন করেছে। নবম পরিচ্ছেদে বিন্দুর 'আত্মহত্যা'র চেষ্টার মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিসমাপ্ত হয়েছে। বিন্দুর চরিত্র অনুযায়ী কাহিনীর শেষাংশে তার আত্মনির্যাতনের ভেতর দিয়ে প্রতিশোধ-গ্রহণের ইচ্ছা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'কে নিয়ে উপস্থাপিত হ'লেও অমূল্য এখানে সক্রিয় নয়। বিন্দু চরিত্রই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। যাদব-মাধব-অন্নপূর্ণা-বিন্দু সব চরিত্রগুলিই স্থির। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পাংশটির দীর্ঘায়তন ঘটনার আকস্মিকতায় রূপ পেলেও এর অন্য কারণ রয়েছে। বাঙালী জীবনের মন্থরতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একই সমস্যার পুনরাবর্তন ঘটেছে বিভিন্নতর আকার-বিশিষ্ট হ'য়ে। বিন্দু অমূল্যকে মানুষ ক'রে তুল্‌ছে একটা উচ্চতর আদর্শ নিয়ে। অন্নপূর্ণার আদর্শ ঠিক বিন্দুর মতো সুদূর-প্রসারী না হ'লেও, সে-ও অমূল্যের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে। কিন্তু পারিবারিক আপাত-সমস্যার আবির্ভাবে এবং ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈষম্যের ফলে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে পরিবারের দুই গৃহিণী অভিমানে সংসারে স্থায়িভাবে অশান্তির সৃষ্টি করলেন। এর জন্য স্পষ্টভাবে কাউকেই দায়ী করা যায় না; কারণ বাঙালী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই এই তুচ্ছতর ব্যাপারকে প্রত্যহ কিছু ইন্ধন দিয়ে জটিলতর ক'রে তোলা। যা সহজেই মীমাংসিত হ'তে পারে, তা অযথা সমাধানহীন হ'তে থাকে। এমনি ক'রেই গড়ে ওঠে বাঙালীর ঘরের গল্প—এখানে আকস্মিক সমাপ্তির ইঙ্গিত অপেক্ষা একটা চূড়ান্ত সমাধান নিয়ে গল্প

পরিসমাপ্ত। তীব্রতর সম্ভাবনার তৃপ্তিদায়ক প্রশান্তি নিয়ে 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটিও শেষ হয়েছে।

বিন্দু-অমূল্য-অন্নপূর্ণার সম্পর্ক বিচার

"ছোট বউ (বিন্দুবাসিনী) যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।" তাই বড় বউ অন্নপূর্ণা সুন্দরী দেবর-বধূকে গৃহে এনে প্রথমদিন যে ভাবে আনন্দাশ্রুতে বিহ্বল হ'য়েছিলো, ক্রমশঃ সে একটি বিপরীত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জেনেছিল, ছোট বউর রূপ ও রূপাই তার সবটুকু পরিচয় নয়—'এ যে কেউটে সাপ।' সুতরাং অন্নপূর্ণা এখন থেকে ছোট বউকে কেবলমাত্র বোনটির মতো স্নেহ ক'রেই আশ্বস্ত হয়নি, যথেষ্ট ভয় নিয়েই সে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করলো। অন্নপূর্ণার মনে ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছিলো বিন্দুর মাঝে মাঝে একটি ভয়াবহ অবস্থান্তর লক্ষ্য ক'রে। আত্মাভিমানিনী বিন্দুর মনের মতো কিছু না হ'লেই কিংবা কোন প্রকার কটু বা রূঢ় উক্তি তার উদ্দেশ্যে উক্ত হ'লেই সে মূর্চ্ছাহত হ'য়ে পড়তো, "ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না।" শেষ পর্যন্ত সকলের মনে একথা দৃঢ় সত্য হ'য়ে দেখা দিল যে, বিন্দুকে ভ্রাতৃ-বধূরূপে ঘরে নিয়ে এসে যাদব তার সাংসারিক বুদ্ধির চালে এবার ভুল করেছে। কিন্তু "যাদব হাল ছাড়িলেন না"।

শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে বিন্দুবাসিনী একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। যাদবের নিরপেক্ষ দৃষ্টিই শুধু বিন্দুর চরিত্রের ঐশ্বর্যকে সর্বপ্রথম নিরীক্ষণ ক'রেছিলো। "মায়ের আমার এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ"—অন্তরেও বিন্দু জগদ্ধাত্রীর মতোই গুণ-সম্পন্না,—যাদব তা মনে-প্রাণেই করেছে বিশ্বাস। অমূল্যকে সন্তান-স্নেহে পালন ক'রে তুলতে গিয়েই বিন্দুর চরিত্রের অনন্যসাধারণ রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিন্দুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অন্নপূর্ণা। এই পরিবারে জগদ্ধাত্রী-স্বরূপিনী বিন্দু এবং অন্নপূর্ণা একে অন্যের পরিপূরক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আদ্যাশক্তির দু'টি স্বরূপ এই দু'টি নারীকে কেন্দ্র ক'রে পরিস্ফুট।

একটি স্নেহের বস্তুকে উপলক্ষ ক'রে দু'টি স্নেহ-বৎসলা হৃদয়ের আন্দোলনে তাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। বিন্দু নিজের আত্ম-সম্ভ্রম নিয়ে গৃহজীবনেও একক জীবনযাপন করেছে। কিন্তু অন্নপূর্ণার স্নেহ-মমতা থেকে পরিবারের কেউ বাদ পড়েনি। বিন্দু অমূল্যকে প্রথম বুকে নিয়ে তার মূর্ছা সংযত করেছে বটে, কিন্তু পুত্র-স্নেহের মাত্রাধিক্যে এবং কর্তব্য পালনে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেছে পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে। বিন্দুর গুণের অন্ত ছিল না; সাধারণ গৃহস্থ-বধূর দোষগুলি তার চরিত্রে নেই বললেই হয়। তবুও রুক্ষ-ভাষণে তার সংযম ছিল না বলেই অন্নপূর্ণার মন মাঝে মাঝে তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌তো তার প্রতি। বিন্দু যাদবকে শ্রদ্ধা করেছে দেবতার মতো; অন্নপূর্ণার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল, তার পরিচয় বিন্দুর উক্তি থেকেই জানা যায়—"দিদি তুমি সত্য-যুগের মানুষ। কেন মরতে একালে এসে জন্মেছিলে?" অথবা এলোকেশীকে বিন্দুর অন্নপূর্ণা সম্পর্কে উক্তি—"ঐ রকম ছিট্ যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি!" কিন্তু সমস্ত কাহিনী-ভাগে বেশীর ভাগ অংশেই বিন্দুকে "রণচণ্ডী" মূর্তিতে "খাঁড়া" হাতেই দেখা যায়। বরাভয়-রূপিনী বিন্দুর স্বরূপ সহজে চোখে পড়েনি।

ধনী কন্যা বিন্দুর উগ্রতা থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। আত্ম-মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলাও তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং এজন্য অন্নপূর্ণাকে যে সে বিদ্রূপ করেছে তা তার পক্ষে দুর্বিনীতার পরিচায়ক হ'লেও ধৃষ্টতা নয়। তা ছাড়া বিন্দু কখনো সংসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লিপ্ত থাকেনি বা অন্নপূর্ণাকে গঞ্জনা দিয়ে দুঃখ দেয়নি। সংসার সম্পর্কে বিন্দু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নির্বিকার। সে কি জানে না এই ভাসুর-জা-স্বামী-পরিবৃত সংসারটি তার পিতৃদত্ত টাকাতেই পরিপুষ্ট! সেদিক দিয়ে কোন প্রকার নীচ দৃষ্টি বিন্দুর ছিল না। তবু তার জীবনে ছিল না শান্তি। চিত্ত তার মুহূর্তে হ'য়ে উঠ্‌তো ক্ষিপ্ত। অন্নপূর্ণা-যাদবের স্নেহের বন্ধন, স্বামীর সান্নিধ্য সব কিছুই বিন্দুর জীবনে বিপরীত ফল প্রদান করতো। তার অন্তরের গোপন রহস্যটুকু এই—সে নিঃসন্তানা। এই ক্ষতটি ছিল ব'লেই তার মতো ঐশ্বর্যশালিনী চরিত্রও একটা অস্বাভাবিক

তীব্রতা নিয়ে সর্বদা বিরাজ করেছে। নারীর সহনশীলতা, ধৈর্য বিন্দু-চরিত্রে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা নিজের সন্তান বিন্দুর কোলে তুলে দিয়ে তার চরিত্রের গোপন ক্ষতটি দূর করতে চেয়েছে। কিন্তু এখানেও কোন সুফল দেখা দেয়নি। পরিপূর্ণ মাতৃ-স্নেহরস এত ঘনীভূত হ'য়ে অমূল্যকে বেষ্টন ক'রেছিল যে, অমূল্যের সুখ-সুবিধার সামান্য ত্রুটিতেও বিন্দু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করতো। এর কারণ হয়তো এই, অমূল্য যে তার নিজের সন্তান নয়, এই চিন্তার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন। রাম ও নারায়ণীর মতো 'গড়ে-ওঠা' সম্পর্ক বিন্দু-অমূল্যের মধ্যে বিরাজমান—বিন্দুও সে কথাটা ভুলে যেতে পারেনি ব'লেই সমস্ত অন্তর দিয়ে অমূল্যকে আবৃত ক'রে রাখ্‌তে চেয়েছে। সেখানে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হ'লে সে কঠোর হাতে তার প্রতি-বিধানে ব্যস্ত হয়েছে। সাতরাত সাতদিন ভেবেও যেখানে অন্নপূর্ণা ভাবতে পারে না অমূল্যের চোখ তার সঙ্গী-পোড়োরা কানা ক'রে দিতে পারে, বিন্দু ছেলেকে পাঠশালায় পাঠিয়ে পরমুহূর্তেই ভাব্‌তে পারে অমূল্যের চোখ কানা হ'য়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতকে দিয়ে পাঠশালা স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করাও বিন্দুর পক্ষে হয়েছে সম্ভব। দুধ খাওয়া, জাঁতি দিয়ে আঙুল কাটা, পোশাক-পরানো ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে বিন্দুর আতিশয্যের অন্ত নেই। নারায়ণীর স্নেহাতিশয্যের স্বরূপটি ঠিক বিন্দুর মতো নয়।

অন্নপূর্ণা বাঙালী ঘরের স্নেহময়ী কল্যাণময়ী গৃহিণী। যাদব এবং মাধব দু'জনেই সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত। সুতরাং সংসারে বিন্দুর সঙ্গেই অন্নপূর্ণার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে প্রতিক্ষেত্রে। বিন্দুকে অন্নপূর্ণা যথেষ্ট ভালবাসতো ; তা না হ'লে কোনপ্রকার দাবি না ক'রেই ছেলেকে ছোট বউর হাতে তুলে দিতে পারতো না। ছেলের ওপর অধিকার স্থাপনের প্রসঙ্গ নিয়ে দু'জায়ের কোনদিনই বিবাদ হয়নি। অন্নপূর্ণা বিন্দুর আতিশয্য দেখে অনেক সময় কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করলেই বিন্দু উগ্র হ'য়ে উঠতো এবং বড়-জা হ'লেও কিছুমাত্র মর্যাদা রক্ষা না ক'রে সে অন্নপূর্ণাকে কটু কথা বল্‌তো।

অন্নপূর্ণা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা এবং বধূ, তা ছাড়া সন্তানবতী। বিন্দুর সঙ্গে এখানেই অন্নপূর্ণার তফাৎ। অন্নপূর্ণার স্নেহ কেবলমাত্র তার পুত্রকে কেন্দ্র ক'রে পরিস্ফুট হয়নি—তা সর্বক্ষেত্রে সমভাবে বিস্তৃত। তাই সর্বদা অমূল্যের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়নি—সংসারে আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও তাকে অনেক কর্তব্য পালন করতে হয়েছে।

নরেন-এলোকেশীর আগমনের পর অমূল্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিন্দু বিচলিত হ'য়ে উঠলে, অন্নপূর্ণা তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিন্দু যে যুগের এবং যে সমাজের বধূ ছিল, তা অপেক্ষা অনেক আধুনিকা ছিল সে মনে-প্রাণে। তাই অমূল্যের কল্যাণের জন্য সে আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে লৌকিকতা ছিন্ন করতেও রাজী। নরেনের আবির্ভাবের পর অমূল্যকে পরিবৃত ক'রে বিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত ছবি অন্নপূর্ণা বিন্দুর কথা থেকে জেনেছে। অন্নপূর্ণা অবাক হ'য়ে ভেবেছে—"...কেন বিন্দু অমূল্য সম্বন্ধে এমন যক্ষের মত সজাগ। এমন প্রেতের মত সতর্ক!" বিন্দু-চরিত্রের এখানেই স্বাভাবিক প্রকাশ। অমূল্য-চরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু এত উগ্র মনোভাব পোষণ করতে লাগলো যে, একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করাও বিন্দুর পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। তা ছাড়া অমূল্যকে বিন্দু শৈশব থেকে এত বিধি-বিধানের মধ্যে মানুষ করেছে যে কোন প্রকার নূতনত্বের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ হওয়া শুধুমাত্র অমূল্যের পক্ষেই নয়, এইভাবে প্রতিপালিত যে কোনও বালকের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং নরেনের সংস্পর্শে না এলেও যে অমূল্য অন্য বাইরের ছেলের সংস্পর্শে কতকগুলি বালকসুলভ ঔৎসুক্যের প্রতি আগ্রহশীল হ'য়ে উঠতো না, তা জোর ক'রে বলা যায় না। কিন্তু বিন্দু অমূল্যের কয়েকটি অন্যায় কাজে এত বেশী হতাশ হ'য়ে পড়েছে এবং রুক্ষ উক্তিতে অন্নপূর্ণাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে যে অন্নপূর্ণা একদিকে লৌকিক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, অন্যদিকে বিন্দুর ক্রোধ নিরসনের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কোনপ্রকার সুব্যবস্থাই অন্নপূর্ণা ক'রে উঠতে পারে নি; বরং অমূল্যকে পূজোবাড়ীতে নাচ দেখতে যেতে দেওয়ায় এবং

তার হ'য়ে জরিমানা দেওয়ায় বিন্দু অতিমাত্রায় ক্রোধান্ধ হ'য়ে উঠেছে। দু' জায়ের মধ্যে ঘটে গেল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। বিন্দুর ব্যবহারের তীব্রতায় অন্নপূর্ণা মাঝে মাঝে আত্মবিহ্বল হ'য়ে বিবেচনা-বিরুদ্ধ কাজও ক'রে ফেলেছে; কারণ অন্নপূর্ণা ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ প্রকৃতির নারী, শাসন অপেক্ষা স্নেহই সকলে তার কাছে পেয়েছে। সুতরাং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রে সর্বদা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত করা অন্নপূর্ণার পক্ষে ছিল স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিন্দুর সে গুণ ছিল—তাই যাদব বিন্দুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জগদ্ধাত্রীর রূপটি। কিন্তু বিন্দুর অভিমান-জেদ এবং গর্বিত ভাবটুকু সবক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়ে সুগৃহিণীসুলভ সুকৌশলী নৈপুণ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে।

অমূল্য সম্পর্কে অন্যের হস্তক্ষেপ বিন্দুর পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌লে সে অমূল্য সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকেছে। অমূল্যও বিন্দুর ভয়ে দূরে দূরেই থাকতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু বিন্দু ভেবেছে এ অন্নপূর্ণার প্ররোচনা। ক্রমশঃ তার টাকার ব্যাপার নিয়ে অন্নপূর্ণাকে আঘাত করাতে পারিবারিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খল এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ট্র্যাজিডির ছায়া ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে। অন্নপূর্ণাও অনেক সহ্যের পর এবার কঠিন আঘাত পেয়ে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে শুরু হয়েছে বিন্দুর আত্ম-দহনকারী প্রায়শ্চিত্ত। বিন্দুর অন্তর্দহন আমরা কাহিনীতে প্রত্যক্ষ করলেও অন্নপূর্ণার অন্তর্বেদনা পরোক্ষভাবে করেছি উপলব্ধি। নারী সংসারে বহন ক'রে আনে শান্তি, কল্যাণ। সেখানে যদি কোনও ক্রমে বিকৃতির আবির্ভাব ঘটে, তবে তা এমনিভাবেই প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ আকার ধারণ কর্‌বে। বিন্দুর তীব্র অভিমান ও দুর্বিনীত ভাব তার অন্যান্য সমস্ত গুণকে নির্বাপিত ক'রে রেখেছিল। মাতৃসমা বড়-জাকে কঠিন বাক্যবাণে আহত ক'রে নিজের দিক্ থেকে বিন্দু হয়েছে সচেতন। আত্মত্যাগ কিছু পরিমাণে না করলে বিচিত্র মনের মানুষ কি ভাবে একে অন্যের সঙ্গে জীবন-পথে এগিয়ে যাবে? বিন্দুর তাই হয়েছিলো আত্মত্যাগের প্রয়োজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুপথ অবলম্বন করেছিল, তবুও যাদব-অন্নপূর্ণার কাছে নিজের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়নি। যাদবের উক্তি—"...

বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি!"—এই আহ্বানটুকু শোন্‌বার জন্যই বিন্দু মনে মনে হ'য়ে উঠেছিল ব্যাকুল। কাহিনীর শেষ ক'টি পরিচ্ছেদে তার অনুতাপ এবং আত্মশুদ্ধির চিত্র দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে না কি অন্নপুর্ণার স্নেহকাতর অন্তরটিও বিন্দুর জন্য নিত্য হ'য়ে উঠেছে উদ্বেল; আত্মগ্লানিতে মন হয়েছে ব্যথিত। বিন্দুর রোগশয্যার পাশে এসে—"আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্!"—ব'লে যখন অন্নপুর্ণা দাঁড়াল, বিন্দুর কাছে অন্নপুর্ণার এই আগমন কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত ছিল না। অন্নপুর্ণা-হীন গৃহে বিন্দুর যে বিষাক্ত অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো বিন্দু চলেছিল মরণের পথে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল বিন্দু নরেনের মুখে অমূল্যের কষ্টের কথা শুনে। তার এত আদরের অমূল্যধন ভাল ক'রে খেতে পায় না! বিন্দু তাই শুরু করেছে আমরণ অনশন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশে এই তো আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা!!

বধূ হ'য়ে বিন্দুবাসিনী স্বামীগৃহে প্রবেশ করার পর থেকেই অভিমানের ক্ষেত্রে বরাবর প্রশ্রয় পেয়েছে অন্নপুর্ণা ও যাদবের কাছে। স্বামীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার চিত্র এখানে আমরা পাই না। তাই সেই অভিমানের জোরেই শেষ পর্যন্ত বিন্দু জয় করেছে যাদব-অন্নপুর্ণার চিত্ত। অমূল্যের ওপর তার অধিকার কেউ তো কেড়ে নেয়নি, সে নিজেই জানিয়েছে—"...তোমাদের ছেলে তোমরা নাও—আমাকে রেহাই দাও!" কিন্তু একথা যে বিন্দুর অন্তরের কথা নয়, অন্নপুর্ণা তা জানে।

বিন্দু-চরিত্রের তীব্রতা, রুক্ষতা অতিসুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে তার অন্তরকে দগ্ধ ক'রে প্রশমিত হয়েছে; বিন্দু যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে— "...বিন্দুকে এত নত, এমন নম্র হইতে কেহ কোন দিন দেখে নাই।" দাসী-বামুনঠাকুরুণের কাছেও তার আর আত্মমর্যাদা রক্ষার চেষ্টা নেই। তবুও অভিমানকে সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। একদিন যেভাবে সে যাদব-অন্নপুর্ণার স্নেহের পাত্রী হ'য়ে গৃহে প্রবেশ করেছিলো, প্রতিষ্ঠা

পেয়েছিলো, অমূল্যের একমাত্র ভাল-মন্দের অধিকারিণী হ'য়ে উঠেছিলো, পুনর্বার প্রত্যাবর্তন কালেও তাকে সকলের বরণ ক'রেই নিতে হয়েছিলো।

এলোকেশী ও নরেন চরিত্রের সার্থকতা

দৈনন্দিন তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিন্দু এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে একটা অসন্তোষের বীজ চিরস্থায়ীভাবে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এই অবস্থায় তৃতীয় পক্ষ হিসেবে এলোকেশী এবং নরেনের আগমন বিন্দু এবং অন্নপূর্ণার মনোমালিন্যের ক্ষেত্রটিকে আরও সুগঠিত ক'রে তুলেছে। আপাত দৃষ্টিতে অন্নপূর্ণার পারিবারিক ক্ষেত্রে এই দু'জনের উপস্থিতি শুভ না হ'লেও বিন্দু-অন্নপূর্ণার অমূল্য-সংক্রান্ত নিত্যদ্বন্দ্বের একটি চূড়ান্ত পরিণামের পথ নির্দেশিত হয়েছে।

অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর "ঠাকুরঝি দেখিতে বোকার মতো ছিলেন, কিন্তু সেটা ভুল।" নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এলোকেশী পুত্রসহ ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃ-বধূদের আশ্রয়ে এসেছে ও স্বার্থচরিতার্থের জন্য সর্বপ্রকার সক্রিয়তাই তার দিক্ থেকে পরিলক্ষিত হয়। অমূল্যের পরিবর্তে নরেনকে বিন্দুর প্রিয়পাত্র ক'রে তুল্‌তে—"ছোট-বৌয়ের প্রতি ঠাকুরঝির স্নেহ-প্রীতি বন্যার মতো ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।" কিন্তু বিন্দুর দৃঢ়তার কাছে এলোকেশীর কূটবুদ্ধিও পরাজিত হ'য়ে গিয়েছে। এলোকেশী অমূল্যের প্রতি গোপনে যত অন্যায় প্ররোচনায় লিপ্ত থাকুক্ না কেন, প্রকাশ্যে মাথা তুল্‌তে পারেনি; বিন্দুর কাছে প্রতিপদে আহত হয়েছে সে। শুধু তাই নয়, কাহিনীতে এলোকেশী যত প্রাধান্য নিয়ে প্রথম দিকে দেখা দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত অপ্রধান হ'য়েই সে বিন্দুর অন্তর্দহনের পশ্চাতে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কোন প্রতিষ্ঠাই সে শেষ পর্যন্ত পায়নি।

নরেন খুব মন্দ-প্রকৃতির ছেলে ছিল না। মায়ের অতিরিক্ত আদরে নরেন পথভ্রষ্ট হয়েছিলো এবং লেখাপড়ার চেয়ে তার যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতির প্রতি মন অধিক পরিমাণে হয়েছিলো আকৃষ্ট। কিন্তু নরেন ধূর্ত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট নয়, বরং বুদ্ধি বস্তুটি তার কিছু পরিমাণে কম ছিল। এ জাতীয়

ছেলেদের কুসংসর্গে কুপথে যেতে যেমন দেরী হয় না, সুপথে চালিত হ'লে আদর্শ চরিত্রের ছেলে এরাই হ'তে পারে। নরেনের মতো ছেলেরাই ব্যক্তিত্বহীন জীবন যাপন করে। নরেনের কোনও প্রকার কুপ্রবৃত্তির পরিচয় কাহিনীতে নেই। দেবদাস-সুকুমার-রাম প্রভৃতি চরিত্রের সমজাতীয় না হ'লেও ভিন্নজাতীয় সংস্করণরূপে কাহিনীতে নরেনের আবির্ভাব। নরেনের মনের একটু মমতাপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় অমূল্য সম্পর্কে—"…নরেন তাহার নিজের ধরণে অমূল্যকে ভালবাসিয়াছিল"। অমূল্যকে মাষ্টার দিয়ে অযথা নির্যাতন করাতে নরেন তার মায়ের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য প্রকাশ করেছে—"…আমার মা-টিও কম বজ্জাত নয়, মামী…!" টিফিন খাবার ব্যাপারে অমূল্যের প্রতি নরেনের করুণার সঞ্চার হয়েছে, তা তার কথার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। এলোকেশী ও নরেন চরিত্র বিন্দুর আত্মশুদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

যাদব ও মাধব চরিত্রের পরিকল্পনা

যাদব চরিত্রে শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি" গল্পের গিরীশ-চরিত্রের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। যাদব সাংসারিক ক্ষেত্রে নিরাসক্ত পুরুষ, কিন্তু নির্লিপ্ত নয়। সামান্য দরিদ্র অবস্থা থেকে মাধবকে লেখাপড়া শিখিয়ে সে মানুষ ক'রে তুলেছে এবং ধনী-কন্যা বিন্দুকে ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে আন্‌তে সমর্থ হয়েছে। যাদবের নির্লিপ্ত নিরাসক্তির মধ্যেও একটা চিরজাগ্রত বৈষয়িক মন ক্রিয়াশীল ছিল। তাই সে পারিবারিক খুঁটিনাটি তুচ্ছতায় কোনদিন মন না দিলেও পরিবারের মঙ্গলের জন্য সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। যাদব সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। অমূল্যকে নিয়ে বিন্দু এবং অন্নপূর্ণা যখন বিবাদের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে তখনও যাদব নির্বিকার। যে বিশ্বাসের জোরে যাদব বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংসারের ধারক হ'য়ে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বাস নিয়েই সে জেনেছে বিন্দুবাসিনী তার সংসারের প্রাণ-স্বরূপা। তার সত্যনিষ্ঠার যথাযোগ্য মূল্য একদিন বিন্দুকে দিয়েই রক্ষিত হবে, যাদব তা বিশ্বাস করে। তাই;

অন্নপূর্ণা যতই বিন্দুর প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠেছে, যাদব ততই তার ভ্রাতৃবধূটির প্রতি সহানুভূতি এবং করুণায় বিচলিত ভাব প্রকাশ করেছে। বিন্দুর নির্মম আঘাতে অন্নপূর্ণা যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলো, যাদবের ধৈর্য সেখানেও ছিল অটুট। গৃহপ্রবেশের সমস্ত আয়োজন সে হাসিমুখে করেছে, কোন-প্রকার অভিযোগ-অনুযোগ যাদব প্রকাশ করেনি। যাদবের মহৎ এবং উদার প্রাণ অন্নপুর্ণা এবং বিন্দুর দ্বন্দ্বকে কখনই গুরুত্বপুর্ণভাবে দেখ্‌তে চায়নি। তার অসীম সহ্যশক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতার উদাহরণই তার পরিবারে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। বিন্দুকে যে যাদব কত স্নেহ করতো, তার পরিচয় পাওয়া যায়—"...আমার মাকে তোমরা কেউ চিন্‌লে না!...আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি!..." যাদব অন্নপূর্ণাকে বলেছে সংসারে বড় হ'তে হ'লে অনেক ত্যাগের প্রয়োজন—সেখানে চাই সহ্য, ধৈর্য এবং বিবেচনা। তাই বিপুল স্নেহ-মমতায় পরিপ্লুত হ'য়ে যাদব অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরিয়ে আন্‌তে গিয়েছে বিন্দুকে। এখানে যাদব 'ছোট' হ'য়ে যায়নি, হয়েছে আরও মহান্, আরও মহৎ। সঙ্কীর্ণ-মন নীচু হবার ভয়ে ভীত হয়, সহ্য-ধৈর্যকে দুর্বলতা ব'লে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু চিত্তের ঔদার্য দুর্বলতাকে সবল ক'রে তোলে। বিন্দুর অহংকার এবং অভিমান তাকে করেছে দুর্বল; কিন্তু যাদব যখন তার দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের ফলে বিন্দুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দাবি জানিয়েছে, অনিবার্য মৃত্যুর হাত তখন হয়েছে সঙ্কুচিত। বিন্দুর প্রবল আগ্রহ "...আর ভয় নেই—আমি মরবো না!"—উক্তিই তার যথার্থ প্রমাণ।

মাধব যাদবের বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু তারা "যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা তো ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল।" মাধব সংসার সম্বন্ধে শুধু নির্বিকার নয়, একেবারে উদাসীন। তার এই চরিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল অটুট। বিন্দুর স্বামীরূপে মাধবকে কখনও অনুভব করবার সুযোগ পাঠকের ঘটেনি; মাধব যাদবের আদর্শ-জীবন গ্রহণ ক'রে অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। মাধবের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যাদব এবং অন্নপুর্ণার প্রতি সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

স্ত্রীর অযথা অভিমান-অহংকার এবং তীব্র সক্রিয়তাকে মাধব যেমন কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, স্ত্রীর অনুতাপ-জর্জরিত অবস্থাতেও সে থেকেছে আতিশয্যমুক্ত। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মাধব চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন। বিন্দুর গোপন ক্ষতস্থানের রহস্যটি মাধবের জানা ছিল ব'লেই বিন্দুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও সে মতামত জ্ঞাপন করতে ব্যস্ত হয়নি। গৃহপ্রবেশের দিন সমস্ত কাজ পণ্ড হয় দেখে, মাধব অন্নপূর্ণাকে নিয়ে এসে দায় উদ্ধার করেছে; কিন্তু জলস্পর্শ না ক'রে অন্নপূর্ণা চলে যেতে উদ্যত হ'লে বিন্দুর কথার উত্তরে মাধবের সংযত, ভাবান্তরহীন উক্তি পাঠকের মনকে তার চরিত্র সম্পর্কে আকৃষ্ট করে—"...সে তোমার জান্‌বার কথা—আমার নয়। সমস্ত নষ্ট হয় দেখে, নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলাম, এখন নিজে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।"

মাধবের নির্লিপ্ততা বিন্দুর মনোভাবকে উগ্রতা দান করেছে—এ প্রশ্ন মনে জাগ্‌তে পারে। কিন্তু স্বামীর কাছে বিন্দুকে কখনও আমরা প্রেম-প্রত্যাশিনী হ'য়ে প্রত্যাখ্যাত হ'তে দেখিনি। শরৎচন্দ্র যখন সেদিক দিয়ে কোনপ্রকার ইঙ্গিত দিতে চাননি, আমরাও ধ'রে নিতে পারি, স্ত্রী হিসেবে মাধব বিন্দুকে মর্যাদা দিয়েছে; অথচ স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে যাদব এবং অন্নপূর্ণার কাছে কোনপ্রকার অনুরোধ ক'রে সে তার পুরুষোচিত স্থৈর্য নষ্ট করেনি। বিন্দুর সকাতর প্রার্থনার উত্তরে সে বলেছে—"ও বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন, যেন অমনি চুপ ক'রে থেকেই যেতে পারি।" বিন্দুর জীবনে আত্ম-সমর্পণের যে সাধনা শুরু হ'য়েছিলো, মাধবের অটুট মনোবল সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে—"স্বামীর প্রস্তর-কঠিন ধিক্কার যোজনব্যাপী পর্বতের মতো এক নিমেষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আজ সে (বিন্দু) নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে সবাই ত্যাগ করিয়াছে।"

বিন্দু তার পিতৃগৃহে অনশনের মধ্য দিয়ে নিজেকে যখন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, মাধব তখন কর্তব্যপরায়ণ স্বামীরূপে আবির্ভূত হয়েছে পাঠকের কাছে। সে স্বামীজনোচিত অভিমান নিয়ে বলেছে—"সে হবে না বিন্দু!... যাঁর কথা ঠেল্‌তে পারবে না, আমি তাঁকে আন্‌তে চল্‌লুম। শুধু এই কথাটি

আমার রেখো, যেন ফিরে এসে দেখ্‌তে পাই ···।” কোনপ্রকার উচ্ছ্বাস মাধবকে কাতর করেনি। ধীর, স্থিরভাবে সে এবার কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হয়েছে। মাধবের পত্নী-প্রেম সংযম-সিদ্ধ, আবেগ-কাতর নয়। শরৎ-সাহিত্যে মাধব চরিত্র-পরিকল্পনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-প্রসূত।

বাঙালী জীবন-চিত্র

বাঙালী জীবনের একটি সুন্দর প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব আলেখ্য “বিন্দুর ছেলে” গল্পের পটভূমিকাটিকে সঞ্জীবিত রেখেছে। বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি এখানে আদর্শায়িত ব’লে মনে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে সময়ের চিত্র এই গল্পের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন, তখনকার জীবনের মধুরতম দিক্, বর্তমানের মতো বিশুষ্ক হ’য়ে যায়নি। স্বার্থপরতা পরিবারের কারুর মধ্যেই যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র সকলের প্রতি কর্তব্যের আদর্শটি এত প্রধান হ’য়ে দেখা দিত যে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে মানুষ চিন্তার সময় পেতো না। আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিনে বিন্দুবাসিনীর গুণটুকু বর্জিতা বহু সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছে; সর্বব্যাপী স্নেহ-মমতাপূর্ণ মাতৃত্বের হয়েছে বিলোপ-সাধন। যাদব-মাধবের মতো পুরুষ একান্নবর্তী সংসারকে এক সময়ে ধ’রে রেখেছিলো। ‘মেয়েলি-কলহে’ তারা কখনও কর্ণপাত করেনি। কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেনি ব’লেই পারিবারিক মনোমালিন্যের ধারাটি কোন সময়ে স্ফীত হ’য়ে উঠলেও মিলনে হয়েছে পরিসমাপ্ত। পুরুষের নির্বিকার পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ের কাছে পারিবারিক দুর্যোগ প্রতিহত হ’য়ে ধারণ করেছে প্রশান্ত-রূপ। কিন্তু পুরুষের সেই ঔদার্য-স্খলনের ফলে আজকে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরেছে। তাই ত্যাগ-মহিমাকে আজকের মানুষ দুর্বলতার পরিচায়ক ব’লে বিদ্রূপ জানায়।

কিন্তু আদর্শহীন জীবন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যতই উন্নত হোক্, তাতে সরসতা থাকে না। সমস্যা-মুক্ত হ’তে গিয়ে পারিবারিক বৃহত্তর বন্ধন-মুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু মনের অসন্তোষ তাতে দূর হয় না। যাদব-মাধব-বিন্দু-অন্নপূর্ণা-

অমূল্য পরিবৃত সংসারে সমস্যা দেখা দিয়েছে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অবলম্বন ক'রে। এখানে ভোগ সুখের সমস্যা নেই, হৃদয়ের সমস্যাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। বাঙালী সমাজে এক সময়ে হৃদয়ের অনুশাসনই ছিল মুখ্য। সেখানে কৃত্রিমতার অভাব ছিল ব'লেই রুক্ষতা, দীনতা, হীনতা যা কিছু প্রকাশ পেতো, সবই উক্তির মধ্যে দিয়ে। গোপনভাবে একজন অন্যের ক্ষতিসাধনে কুণ্ঠিত হ'তো; অবশ্য এলোকেশীর মতো নারীর অভাব সেদিনকার সমাজে ঘটেনি। তবুও যত নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিই তখন সমাজে আত্মপ্রকাশ করুক্ না কেন, সম্মিলিত আদর্শ-সাধনার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র হৃদয় দিয়ে বাঙালী জীবনের ঘরের খবরগুলি অনুভব করেছিলেন ব'লেই, তাঁর সৃষ্ট নর-নারীর মধ্যে দিয়ে বাস্তব সত্যই চিরন্তনী রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার

"বিন্দুর ছেলে" গল্পটি সম্পূর্ণভাবে সংলাপাত্মক রচনা; বিবৃতি-প্রবণতা এখানে অত্যন্ত সংযত। বাঙালী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি শিল্পগুণে মণ্ডিত ক'রে প্রকাশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র দক্ষ শিল্পীর স্থান অধিকার করেছেন। গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে কাহিনী গতিশীল হয়েছে এবং পাঠক-মন দীর্ঘায়ত কাহিনীর মধ্যেও ছোটগল্পের রস খুঁজে পেয়েছে। পাত্র-পাত্রীর ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের পরিবর্তন লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র এই গল্পে সমালোচক বা ব্যাখ্যাতারূপে কখনও আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁর লেখনী যে ক্রমে সার্থক স্রষ্টার উপযোগী হ'য়ে উঠছে, এই গল্পটি তার স্বাক্ষর বহন করে। "বিন্দুর ছেলে" শরৎ-সাহিত্যের 'জাগরণ পর্বে' একটি সার্থক আঙ্গিকবিশিষ্ট রচনা।

(৪)

পরিণীতা

নামকরণের সার্থকতা

'পরিণীতা' নামকরণের পশ্চাতে নারী-প্রেম-প্রকৃতির একনিষ্ঠতার জয়ধ্বনি ব্যঞ্জিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র সামাজিক অনুশাসনে যে মিলন, মন্ত্রোচ্চারণে যে বন্ধন—তাকেই পরিণয় ব'লে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, যে মেলা সব চেয়ে বড় মেলা, তা হচ্ছে মনের মিলন; এই বন্ধনই সত্যিকার বন্ধন। পরিণয়ের সার্থকতা সেখানেই।

ললিতা যেদিন কৌতুকের ছলে শেখরের কণ্ঠে দিয়েছিল মালা, শেখরের কাছ থেকে ফিরে পেয়েছিল প্রণয়ের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ, সেদিন থেকেই ললিতা জেনেছিল সে শেখরের পরিণীতা। এই দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে অটুট ছিল; তাই সে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পেরেছে—"···সত্যিই আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু তিনি আছেন।" অথবা"···সে (শেখর) ললিতাকে বেশ চিনিত··· একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোন মতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে সে শেখরের ধর্মপত্নী"—এই বিশ্বাস শুধু মুখের নয়, মনেরও। তাই সে বারে বারে প্রয়োজন হ'লেই শেখরের অনুমতি চেয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে শেখর নিজের প্রেমের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সমাজ-পরিবারের সমর্থন ছাড়াই নিজেকে ললিতার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি যত সহজে গ্রহণ করতে পারে, ত্যাগ করতেও তাদের তেমনি বেগ পেতে হয় না। তাই শেখর ললিতাকে ভুল বুঝে শুধু নিজের অন্তরকেই ক্ষত-বিক্ষত করেনি, সে মনে মনে ললিতা-মুক্ত হ'তে চেয়েছে—"তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।" তাই ললিতা সম্পর্কে ভীত হয়েছিলো

শেখর, শেষে ললিতার আপাত-নির্লিপ্ততায় সে হয়েছে নিশ্চিন্ত। কিন্তু ললিতা নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাকে একবার অন্তরের সঙ্গে মেনে নিয়েছে, তাকে কোনও অবস্থাতেই অস্বীকৃতি জানাতে পারেনি—না ব্যবহারে, না চিন্তায়। শেখরের দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ললিতা হয়েছে নিঃসহায়। হাসিমুখে কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে ললিতার সহনশীলতাই তাকে জয়মাল্য দিয়েছে—তার সাধনায় এসেছে সিদ্ধি। তাই এই কাহিনীর নামকরণ "পরিণীত" না হ'য়ে হয়েছে "পরিণীতা"—কারণ এ শেখরের ললিতাকে পাওয়া নয়—ললিতার শেখরকে জয় করা।

কাহিনী পরিকল্পনা

'পরিণীতা'র কাহিনী আকারে দীর্ঘ হ'লেও ছোটগল্পের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত। কাহিনীর সূত্রপাতে ছোটগল্পের ইঙ্গিতময়তা, পরিমিত বর্ণনাভঙ্গী, সংযত সংলাপ শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। শেষ পরিচ্ছেদে যথেষ্ট নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণীর আকস্মিকতা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। গিরীনের "ললিতাদি" সম্বোধন এবং সমস্ত রহস্য প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের কৌতূহল জাগ্রত থাকে। তবে এই রহস্য প্রকাশের পরেও কাহিনীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতে আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, কারণ ছোটগল্পের সমাপ্তি এমন স্বচ্ছ, নিশ্চিন্ত হয় না; এর ফলে অতর্কিত ভাবটি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই ভুবনেশ্বরী-ললিতা-শেখরকে নিয়ে যে শেষ উপকাহিনীটি রচিত হয়েছে—সেই অংশটি বাদ দিলেই আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা অধিক সঙ্গত হ'তো। তেরো বছরের মেয়ে ললিতাকে পাই কাহিনীর শুরুতে এবং শেষের দিকে "সপ্তদশ বর্ষীয়া পরস্ত্রী" ললিতাকে দেখি। সুতরাং কাহিনীর সময়-কাল চার বছর।

এখানে প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই অকারণে অতিরিক্ত দীর্ঘ করা হয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় যে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিত্র-চিত্রণই তার উপপাদ্য বিষয়। কিন্তু এখানে

মূল উপাখ্যান শেখর-ললিতার প্রেম-কাহিনী অপ্রধান অংশ পেয়েছে। ছোট গল্পে একাধিক কাহিনীর প্রাধান্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এখানে দেখি গিরীন-গুরুচরণের কাহিনী মূল কাহিনীকে পরিস্ফুট না ক'রে বরং অপ্রধান ক'রে দিয়েছে এবং গিরীন-গুরুচরণ কাহিনী প্রধান হ'য়ে উঠেছে। কয়েকটি পরিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্লান্তিজনক দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাতে বা অন্য উপকাহিনী বর্ণনায়। তাই প্রথম দিকের পরিমিতি-বোধ কাহিনী দীর্ঘ করার জন্য একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে এবং কাহিনীর গ্রন্থন অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। তা ছাড়া যে ক'টি চরিত্র এখানে প্রাধান্য পেয়েছে সব ক'টিকে জীবন্ত ক'রে তোলবার জন্য অতিরিক্ত সংলাপ দিয়ে পরিচ্ছেদ গুলিকে দীর্ঘ ক'রে তোলা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই একটি ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা জানিয়ে বেশ সহজ, সাবলীল গতিতে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আগেই বলেছি, ছোটগল্পে সাধারণতঃ একটি ঘটনা প্রধান থাকে, তার পাশে আরও ছোটখাট ঘটনা এসে প্রধান ঘটনার আবর্তনে সাহায্য করে। এই গল্পে চরিত্র বিবর্তিত হয়নি সত্য কিন্তু ঘটনা বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের জন্য গিরীন সম্পর্কিত কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষ্য করবার বিষয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই কাহিনীতে গিরীনকে পাওয়া যাচ্ছে এবং শেষ পরিচ্ছেদেও সে আছে। শুধু একাদশ পরিচ্ছেদে সে নেই। শেখর-ললিতা কাহিনীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল মনোভাবের একঘেয়েমী নষ্ট করতে গুরুচরণ-গিরীন কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই দুই কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। তাই দেখা যায় তিনি শেখর-ললিতার পারস্পরিক চিত্তবৃত্তির লীলা অপেক্ষা শেখরের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। ললিতার মনের খবর জানাতে শরৎচন্দ্র ভুলে গেছেন। তাস-খেলা, থিয়েটার দেখা, গিরীনের টাকা দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি কাহিনী প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছে। তা ছাড়া গিরীন ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই বেশী অংশ অধিকার ক'রে আছে। কাহিনীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতেই গিরীনকে কলকাতায় আনা হয়েছে অত্যন্ত সু-

কৌশলে। কাহিনীর গঠন-পরিকল্পনার জন্যই বোধ করি কাহিনী-ভাগে প্রধান পাত্র-পাত্রীকে কেন্দ্র ক'রে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির যে জাগরণ, তা বিবৃত করা সম্ভব হয়নি। এর চেয়ে ঢের বেশী প্রাধান্য পেয়েছে গুরুচরণের পারিবারিক সমস্যা। ধর্মতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র সমস্যা দ্বারা কাহিনী-ভাগ কণ্টকিত। শরৎ-সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য নর-নারীর মনের সূক্ষ্মতর বৃত্তির অনুরণন, তা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। একমাত্র শেখরের মনের খবর তবুও খানিকটা স্থান পেয়েছে। নবম পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে শেখরের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। দশম পরিচ্ছেদে সংলাপ অপেক্ষা বর্ণনার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। একাদশ পরিচ্ছেদের যে প্রয়োজনীয়তা তা একটি অনুচ্ছেদেই অনায়াসে বলা যেতো এবং সেটাই আঙ্গিকের দিক দিয়ে ত্রুটিহীন হ'তো।

রচনার সংযম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যত সচেতনই থাকুন না কেন—নিজে এখানে মোটেই লেখার পরিমিতি বজায় রাখতে পারেননি। "লেখার চেয়েও না-লেখার কৌশল আয়ত্ত করা আরও শক্ত"—এ বোধ তাঁর জাগলেও লেখনীর পরিণতি এখনও আসেনি। তাই কাহিনীর অটুট বাঁধন এখানে রক্ষিত হয়নি এবং বহুস্থানে শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাতে শরৎচন্দ্র যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন। "পথ-নির্দেশ" রচনায় যে সমস্যার অবতারণা এখানে ঠিক তা না হ'লেও ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই প্রথম কাহিনীর পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে কলকাতা শহরের মধ্যেই নিবদ্ধ। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' রচনার পরে 'পরিণীতা' প্রকাশিত হলেও রচনার শৈথিল্যের দিক এবং চরিত্রের অগভীরতা বিচার করলে 'পরিণীতা' রচনাটিকে 'জাগরণ-পর্বে'র পরিণত লেখনীর রচনা ব'লে বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ব'লে এ বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে আমাদের বিশ্বাস 'পরিণীতা' 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প তিনটির পূর্ববর্তী রচনা।

শেখর-ললিতার প্রেম-প্রকৃতি

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর প্রেম-প্রকৃতির মূল স্বরূপ যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এখানে ঠিক সেই স্বরূপের পরিচয় পাই না। এখানে শেখরের সচেতন সক্রিয়তা শরৎ-সাহিত্যের পুরুষ-প্রকৃতি-বিরোধী। শেখর ললিতাকে আট বছর বয়স থেকে মানুষ ক'রে তুলেছে ; তখন ললিতা তার শেখরদার কাছ থেকে পেয়েছে অফুরন্ত স্নেহ, কিন্তু আজ তের বছরের ললিতার প্রতি শেখরের "শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না।"

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর মিলনের মধ্যে যে ব্যর্থতা, যে ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত, শেখর-ললিতার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সে রকম কোনও নিগূঢ় বীজ আত্মগোপন ক'রে নেই। শেখর-ললিতার পরিণতি মিলনমূলক। শেখরের ললিতাকে লাভ করার পথে যে বাধা, তা নিতান্ত বাহ্যিক বাধা। তার প্রথম এবং প্রধান বাধা পিতা নবীন রায়ের অর্থকরী মনোভাব ; তাই ললিতার সঙ্গে মিলিত হবার পুর্বে নবীন রায়ের মৃত্যু ঘটাতে হয়েছে। শেখরের মনের কোণে বরাবর ললিতার প্রতি স্নেহের অন্তরালে প্রেমের বীজ লুকিয়ে ছিল, তা না হলে শেখরের বিবাহের সম্বন্ধ উঠলেই সে এ-ব্যাপারে একটা আপাত আগ্রহ দেখালেও মোটেই বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। ভুবনেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয়ের দর্পণে এই রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। এর পরেই যখন থিয়েটার দেখার অন্যতম সঙ্গী হিসেবে গিরীনের নাম শেখর শুন্‌লো, তখন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে শেখরের মনের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। থিয়েটার দেখাটাই বড় কথা নয়, কারণ এই সব ব্যাপারে শেখর উদার ছিল, কিন্তু অন্য একজন পুরুষের প্রতি ললিতার আগ্রহ তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাই ক্ষোভ ও অভিমান ক্রোধে রূপান্তরিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ললিতাও শেখরদার ক্রোধকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং "শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত।" তাই লজ্জাজনক হ'লেও সে থিয়েটার যেতে আপত্তি জানিয়েছে অসুস্থতার অজুহাতে।

গিরীনের সঙ্গে তাস-খেলার ব্যাপার শেখর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই ললিতার সঙ্কোচের পরিসীমা ছিল না। তা ছাড়া গিরীনের বিশেষ-দৃষ্টি তাকে নিজের সম্পর্কে প্রথম সজাগ করেছে—"পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এত বড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপুর্বে কল্পনাও করে নাই।" শেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে শেখর তাকে ব্যঙ্গের দ্বারা আঘাত করেছে। এই আঘাত দিয়ে শেখর ললিতাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলেছে। তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখি, শেখর সম্পর্কে ললিতার কৌতূহলের বিরাম নেই। শেখরের প্রতি তার শুধু ভয়ই নেই, আরও কিছু অতিরিক্ত বোধ জেগেছে, যে জন্য শেখরদার ডাক শুনে সে সমস্ত সঙ্কোচ ভুলে যেতে পেরেছে। ললিতার এই ভীতির পেছনে আর একটি কারণ সক্রিয়, তা হচ্ছে অনুগৃহীতার বোধ। সে যে শেখরের অর্থ সাহায্যে পুষ্ট, শেখরের মা এবং তার পরিবারের বিশেষ স্নেহের এবং কৃপার পাত্রী—এ বোধ ললিতা ভুলতে পারেনি। তাই তার অবচেতন মনে প্রেমের ক্ষীণতম অনুরণন জাগলেও, তাকে সে জাগাতে সাহস পায়নি। ললিতার প্রকৃতি গঠনে হেমনলিনী ও সরযু চরিত্রের মিশ্রণ ঘটেছে। হেমনলিনীও এই ভাবে গুণিনের অর্থপুষ্ট, তার মনে প্রথমে একটা অনুগৃহীতার ভাব ছিল। সরযু নিজেকে বরাবর চন্দ্রনাথের কৃপাপাত্রী ভেবে এসেছে, তাই স্ত্রী হ'য়েও সে জোর ক'রে নিজেকে প্রেম-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সঙ্কুচিত হয়েছে। ললিতা সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। এ প্রেমের মধ্যে দৃঢ়তা আছে, দম্ভ নেই, গৌরব আছে, গর্ব নেই।

ললিতার বিবাহের ব্যাপারে গুরুচরণের অত্যধিক উদ্বেগ এবং সমাধানহীন হতাশায় তার পরিসমাপ্তি এবং এই সব ব্যাপারে গিরীনের উদারতার ফলে "...সে (ললিতা) গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।" গিরীনের প্রতি তার যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা শ্রদ্ধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, দিক্ পরিবর্তন করেনি। তাই শেখরের এই ক'দিনের নির্লিপ্ততায় ললিতা অভিমানে ফুলে উঠেছে এবং শেখরের দর্শনে নিজেকে সে সামলে রাখতে পারেনি—এই ভাবে কান্না, তার প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রকাশ সূচিত করেছে।

এর পরের ঘটনাতেই কাহিনীর গতি Climax-মুখী হ'য়ে উঠেছে। ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে শেখর প্রতি বছর পশ্চিমে যায় এবং প্রতি বছর ললিতাও সঙ্গে যায়। এবারে ললিতা যাবে না, কারণ তার বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং গিরীন সমস্ত খরচ বহন করছে। এ সংবাদ এতো মর্মান্তিক যে তা শেখরকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। সে ললিতাকে ডেকেও কথা বলতে পারেনি। এদিকে ললিতা যত সহজে শেখরের ডাকে এসেছে তত সহজে শেখরের আপাত নির্লিপ্ততাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই ঘণ্টা দুই পরে শেখর ফিরে এসে দেখেছে—"তাহার (ললিতার) দুই চোখ জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ হইয়াছে।" শেখর কিন্তু সমস্ত জেনেও নির্লিপ্তভাব দেখিয়েছে। গুরুচরণের সঙ্গে গিরীন ও শেখরের ললিতার বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তা শুনে ললিতা লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। ললিতার বিয়ের খবর পেয়ে শেখরের "…মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।" শেখর সম্পর্কে ললিতার সচেতন যত্ন তাকে আরও আকুল ক'রে তুলেছে—তাই সে ললিতাকে অন্যের কাছে দিতেই পারে না। ললিতা যে তার একান্ত আপনার, তার নিজের হাতে গড়া প্রতিমা—তার প্রতি শেখরের প্রেমবোধ আর বাধা মান্‌তে চায় না। কালীর পুতুলের বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে যে মালা বদলের পালা এবং তার প্রণয়ের তীব্র আবেগময়তার প্রকাশ—এখানেই কাহিনী Climax-এ উঠেছে।

ললিতা কৌতুকের ছলে যে মালা শেখরের কণ্ঠে দিয়েছিল, তা যে এত গুরুতর আকার নেবে, সে ভাবতেই পারেনি। সে বিশ্বাস করে "সে অনাথা এবং নিরুপায়", তাই সবাই তাকে দয়া করে। শেখরের কিন্তু এই অনুকম্পাবোধ নেই, আছে প্রেম। তাই ললিতার কণ্ঠে মালা ফিরিয়ে দিয়ে সে তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ ক'রে চুম্বন করেছে। ললিতা এবারে যেন নিজের পথ নির্দেশ পেয়ে গেলো। তাই শেখরকে প্রণাম ক'রে সে প্রশ্ন করলো—"আমি কি করবো ব'লে দিয়ে যাও।" শেখর জানাল, তার প্রেমের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়,—"আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছি…আজ স্থির করেছি, কেন

না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেচি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।" এই ভাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ললিতার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটেছে, কারণ সে পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু শেখরের মন হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। শেখর ললিতার মনকে বুঝে উঠতে পারেনি, কারণ সে-মনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেনি। তা ছাড়া গুরুচরণের মতিগতি, গিরীনের উপস্থিতি তাকে দগ্ধ করেছে। শেখর ললিতাকে যত ভাবেই আঘাত দিতে চেষ্টা করেছে, ললিতা পঞ্চতপা পার্বতীর মতো কঠোর সাধনায় হয়েছে রত; সে নানাভাবে জানাতে চেয়েছে যে, শেখরকেই সে স্বামীর পদে বরণ করেছে। এমন কি টাকার কথা ওঠাতে সে জানিয়েছে, মামা 'গিরীনের কাছ থেকে "টাকা নিয়েছেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রী করবার অধিকার তাঁর নেই; এ অধিকার আছে শুধু তোমারি।"

ললিতার এই উক্তি শেখরকে অন্তর্দ্বন্দ্বে করেছে লাঞ্ছিত। "ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর..." একথাই শেখর বার বার ভেবেছে। ললিতাকে হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু ললিতা যে অন্য কারুর হ'য়ে যাবে, তাও সে সহ্য করতে পারেনি ব'লেই সেদিন রাত্রে মালা বদল ক'রে সে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে ললিতা সম্পূর্ণভাবে নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজে পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে সেই প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। তাই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে শেখরের; সে একবার অনুশোচনা করেছে, পরমুহূর্তেই হয়েছে ব্যাকুল। ললিতার এই নিষ্ক্রিয় অথচ দৃঢ় মনোবল-সম্পন্নভাব শরৎ-সাহিত্যে এই প্রথম। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য স্মরণ করা যেতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদে দেখি ললিতার এই বাহ্যিক নির্লিপ্ততাকে শেখর ভুল বুঝেছে এবং সে মনে করেছে ললিতার মন তার প্রতি আর আসক্ত নয়। তাই সেদিনের উচ্ছ্বসিত আবেগের কথা যাতে প্রকাশ না হ'য়ে পড়ে, সে জন্যই শেখর বেশী উদ্‌গ্রীব হয়েছে। কিন্তু যখন এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে,

"তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন?...তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?" এইভাবে দ্বন্দ্বে নারী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে, পুরুষ থেকেছে নির্বিকার, কোথাও সত্যকার, কোথাও আপাত। কিন্তু এখানে শেখরের দ্বন্দ্ব এবং ললিতার আপাত-নির্লিপ্ততা একটা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণে এই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। এখানে যে ট্র্যাজিডির রূপ ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো তা বাহ্যিক, শেখর বা ললিতার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত নয়।

গুরুচরণের অসুস্থতাকে কেন্দ্র ক'রে ললিতার নির্লিপ্ততা এবং গিরীনের সঙ্গে হৃদ্যতার ভান, শেখরকে নিশ্চিন্ত করেছে সত্য, কিন্তু ব্যর্থতার বেদনার তীব্রতায় সে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছে। নিজের ভুল সম্পর্কে শেখর সচেতন ছিল না ব'লেই সে দগ্ধ হয়েছে। ললিতার নির্লিপ্ততা তাকে আরও ব্যাকুল ক'রে তুলেছে, যখন ললিতা কালীকে সঙ্গে নিয়ে শেখরের কাছে বিদায় নিতে এসেছে। শেখরের মনে অনেক অভিযোগ জমে ছিল, কিন্তু সে কিছুই বলতে পারলো না—এই প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের নর-নারীর সাধারণতঃ যে প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার একেবারে বিপরীত। ললিতার কাছে শেখর যতভাবেই এসেছে, শেখরের মুখরতা মূক হ'য়ে গেছে। শেষে যখন গিরীনের কাছে সত্যকার তথ্য জানতে পেরেছে, তখন শেখরের দ্বন্দ্বের ঘটেছে সমাপ্তি এবং যে গিরীনকে সে এতদিন বিদ্বেষ ও ঘৃণা ক'রে এসেছে আজ তার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। ললিতা সম্পর্কে ভুল ভেঙ্গে যাবার পর শেখর বেশ খুসী মনেই ললিতাকে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রেমের পথে নয়, মিলনের পথে যে আপাত-বাধা ছিল, তা দূর হ'য়ে গেছে বেশ নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে এবং কাহিনীর পরিসমাপ্তি প্রেমের গৌরবে মহীয়ান্‌।

গিরীন-গুরুচরণ-ভুবনেশ্বরী চরিত্রের সার্থকতা

গিরীন চরিত্রটি পুরুষোচিত ঔদার্য নিয়ে গঠিত। সে শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন যুবক; কলকাতায় এসেছে পড়াশুনা করতে। ললিতার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ-বোধ কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এমন কি ললিতাকে গ্রহণ করবার যোগ্যতাও তার আছে।

গুরুচরণের দুঃখে সে বিগলিত হয়েছে এবং তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছে, কারণ তার মতে—"ওদের সমাজে (হিন্দু সমাজে) সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে।" ব্রাহ্মধর্মের উদার মতের পক্ষ সে সমর্থন করেছে সত্য, কিন্তু এই ধর্মাধর্মবোধের উর্ধ্বে যে চিত্তবৃত্তি তাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছে, তা হচ্ছে গিরীনের মহানুভবতা, মানবতাবোধ। সে গুরুচরণের ঋণের ভার লাঘব ক'রে দিতে চেয়েছে। এর পেছনে হয়তো তার অবচেতন মনে ললিতাকে লাভ করার আশা ক্রিয়াশীল; তবুও গিরীনের ঔদার্যকে অস্বীকার করা যায় না। গিরীনের ধর্মমতের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এবং তাদের সঙ্গে তুলনায় তার উৎকর্ষ নিরূপণ ক'রে ললিতা গিরীনকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে।

গুরুচরণের অন্তিমশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে গিরীন প্রতিজ্ঞা করলো, "সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায়"—সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে সে ললিতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে; কিন্তু যে মুহূর্তে জেনেছে, ললিতা শুধু বাগদত্তা নয়, অপরের স্ত্রী, সেই মুহূর্তেই সে তার মনকে ললিতা থেকে সংহত ক'রে এনেছে এবং আন্নাকালীকে বিবাহ ক'রে গুরুচরণের কথা রেখেছে। এই ত্যাগের মধ্যে প্রকাশের ব্যগ্রতা নেই, গিরীন সহজভাবেই সব ব্যাপারকে গ্রহণ করেছে—এই পরিবারের সুখদুঃখকে সে আপনার ক'রে নিয়েছে। শেখরের ভুল ভেঙ্গে যেতে সে যা করেছে, সেই বোধ পাঠক-চিত্তেও জাগ্রত হয়—"শেখর ...অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কত বড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।"

গুরুচরণের চরিত্রটি বাঙালী কেরাণী সমাজের জীবন্ত প্রতিনিধি। কাহিনী-সূত্রপাতে যে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে তাতে আমরা একসঙ্গে হাস্যমুখর ও অশ্রুসজল হ'য়ে উঠি। দারিদ্র্য গুরুচরণের দেহকে দগ্ধ ক'রে দিয়েছে বটে, কিন্তু মনের সারল্য নষ্ট করতে পারেনি। তবে তাঁকে নৈরাশ্যবাদী ক'রে তুলেছে। জীবন সম্পর্কে হতাশা গুরুচরণকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে এবং জীবনের কোন অবস্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। "...গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।" তাই যে ধর্মমতে, সমাজ গঠনের মধ্যে জীবনের আশা শুনেছেন, জেনেছেন এই বন্ধনমুক্তির গান, তাকেই তিনি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের এটাও অন্যতম কারণ। "...দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেব, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হব, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম আত্মঘাতী না হ'য়ে, ব্রহ্মজ্ঞানী হই..."। কিন্তু এতেও তিনি সুখী হ'তে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন, এই ধর্মমত পরিবর্তনের ফলে জীবনে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু সে বিষয়ে তাকে হতাশ হ'তে হয়েছে। তবুও গিরীনের প্রতি তাঁর স্নেহের অপ্রাচুর্য ছিল না। গিরীনের উপকার, তাঁকে ঋণমুক্ত করা, তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, এদিকে শেখরের প্রতিও রাজা হবার আশীর্বচন উচ্চারণ করেছেন। প্রত্যেকের প্রতিই স্নেহশীল দৃষ্টি নিয়ে নিজের অবস্থা সম্পর্কে নত হ'য়ে তিনি প্রত্যেকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ললিতার সঙ্গে পাঠকও জানায়, তার মামার মত লোক সংসারে সহজে দেখা যায় না। লেখকও জানিয়েছেন—"গুরুচরণ সেই ধাতের মানুষ, যাহার সহিত যে কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে।"

শেখরের মা ভুবনেশ্বরী সার্থকনামা। শরৎচন্দ্রের মতে—"...এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃ-হৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন, আরও কোমল।" মাতৃ-হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত স্নেহধারায় শুধু শেখর বা ললিতাই অভিষিক্ত হয়নি, যে কাছে এসেছে সেই হয়েছে মুগ্ধ। ধনী-গৃহিণী হ'য়েও মনের ঔদার্যের

জন্য ললিতাদের দুঃখে তিনি বিগলিত হয়েছেন—এই পরিবারের সুখ-দুঃখকে নিজের মনে করেছেন। এই শ্রেণীর মাতৃ-চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে নতুন নয়। মাধবীর স্নেহপ্রবণ মন, সুলোচনার স্নেহ, নারায়ণী, অন্নপূর্ণা, বিন্দুর স্নেহ যেন আরও বিস্তৃতিলাভ ক'রে বিশ্বজননীর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ভাবে মাতৃস্নেহের প্রকাশ পরিণতি লাভ করেছে, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। ভুবনেশ্বরী চরিত্রের এই উদারতা না থাকলে শেখর-ললিতার পরিণতি এ রকম মিলনমূলক হ'য়ে উঠতো কিনা সন্দেহ।

উপসংহার

উপমা-প্রয়োগ এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। সুন্দর, স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব উপমাগুলি ভাব-প্রকাশে প্রচুর সাহায্য করেছে। কাহিনীর সূত্রপাতই হয়েছে উপমার সরস ভঙ্গী দিয়ে। গুরুচরণের দেহ বর্ণনা প্রসঙ্গে উপমাটি অপূর্ব—"দেহটিও যেমন ঠিকা-গাড়ীর ঘোড়ার মতো শুষ্ক শীর্ণ, চোখে মুখেও তেমনি তাঁহাদেরি মতো একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্তভাব।" এই ধরণের সার্থক উপমা-অলঙ্করণ এই গ্রন্থের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—এর পূর্বে যা এত স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব ক্ষমতাগুলি পুষ্টিলাভ করে।

কিন্তু সংলাপ-প্রয়োগ এ গ্রন্থে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি। ভাব-প্রকাশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার অধিক বিরক্তিকর। এখানে প্রথমদিকে কিছুটা পরিমিতি-বোধ বজায় থাকলেও শেষের দিকে সংলাপগুলি কোথাও বক্তৃতায় পরিণত হয়েছে, কোথাও বা অগভীর হয়েছে। শরৎচন্দ্র বলেন, রচনার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে যতদূর সম্ভব বক্তব্য বিবৃত করা উচিত ; যেখানে তা একেবারে অসম্ভব, সেখানেই শুধু লেখকের বর্ণনা করা .উচিত। কিন্তু এখানে দেখি, লেখক পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তার মধ্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন এবং গুরুচরণের দুঃখে বিচলিত হ'য়ে সমাজ সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের রূঢ় উক্তি এই গ্রন্থে সহজেই নজরে পড়ে।

যেমন—"...এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল।...যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্য।" এসব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা-গুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শরৎচন্দ্র সমাজ-সমালোচক হ'য়ে উঠেছেন।

বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেও প্রচুর শৈথিল্য রয়েছে এবং একই ভাবের বিভিন্নরূপে প্রকাশ, একই পংক্তির পুনরাবৃত্তি এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কাহিনীকে দীর্ঘ করার ফলে বর্ণনাভঙ্গী ঘনীভূত হ'য়ে উঠতে পারেনি। কাহিনী সূত্রপাতে বর্ণনাভঙ্গী অথবা চতুর্থ পরিচ্ছেদের ভিক্ষুকের বর্ণনা কাহিনীর মধ্যে সরসতার সৃষ্টি করেছে।

(৫)

আঁধারে আলো

নামকরণ

"আঁধারে আলো" গল্পের নামকরণ সার্থক হ'য়ে উঠেছে, বিজ্‌লী বাইজীর নারী-মহিমার আলোতে প্রতিভাসিত হ'য়ে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে। বিজ্‌লীর নারী-সত্তা অমর্যাদা, লাঞ্ছনা এবং নিকৃষ্টতর চেতনায় ছিল আবৃত ; তাই তার যে রূপটি সত্যেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ছলনায় আঘাত দিয়েছিলো, তা বিজ্‌লীর বিকৃত নারী-প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। সত্যেন্দ্রনাথের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিন্ন করেছে বিজ্‌লীর তমসাবৃত, অনুভূতিহীন চেতনার আবরণকে। যে জীবন বিজ্‌লী এতদিন যাপন করেছে, তাতে নারীত্বের ঘটেছিল অপমৃত্যু ; এবার সত্যেন্দ্রের প্রেমের অমৃতস্পর্শে বিজ্‌লী দুঃখ এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্ম-স্বরূপে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। তার নর্তকী-জীবনের অভিশাপ মুক্তি বিজ্‌লীর নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে—"যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার

মরে, সূর্য্যি উঠ্‌লে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু!…” এ পথ ছাড়া জীবনে কোন পথই মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না। শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর জীবনে সমস্যা-অসঙ্গতি-বিপর্যয় প্রেমের অপ্রতিহত শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের পথ তারা খুঁজে পেয়েছে প্রেমের দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে।

কাহিনী-গ্রন্থন

“আঁধারে আলো” রচনাটি ছোটগল্পের আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করলেও কয়েকটি প্রশ্ন এই গল্পের বিচার-প্রসঙ্গে উত্থাপিত হ'তে পারে। “আঁধারে আলো”-র সূচনা এবং সমাপ্তি ছোটগল্পের আকস্মিকতা নিয়ে রচিত। তবে গল্পকার শরৎচন্দ্রের জাগরণ-পর্বের রচনাগুলির মধ্যে “আঁধারে আলো”-র স্থান নির্দিষ্ট হ'লেও সম্পূর্ণভাবে একে ত্রুটিহীন বল্‌তে পারি না।

“আঁধারে আলো”-র প্রধান উপজীব্য বিষয় সত্যেন্দ্রের প্রেম কেমন ক'রে বিজ্‌লীকে অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার পথ দেখিয়েছে; শুধু তাই নয়, তার অবচেতন সত্তায় রাধারাণীর স্মৃতিই বিজ্‌লীকে কেন্দ্র ক'রে একনিষ্ঠ প্রেমে সমুদ্ভাসিত হয়েছে, অবশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে রাধারাণীকে বরণ ক'রে। কিন্তু তিনটি নর-নারীর জীবনে প্রেমের আকস্মিক বিপর্যয় যতই অনিবার্য হ'য়ে উঠুক্ না কেন, তার গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত ও মানসলোকের সামগ্রী, তাই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। সুতরাং যেখানে এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়টি একটি উপন্যাসের সম্ভাবনা সূচিত করে, সেখানে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে, ইঙ্গিতমাত্র না দিয়ে একটির পর একটি আকস্মিক পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন; অথচ পাঠকের কৌতূহলকে সর্বাংশে তৃপ্ত করা হয়নি। ঘটনা বা বর্ণনার পরিমিতিতে লেখকের রচনাকৌশল “আঁধারে আলো”-র অপ্রত্যক্ষ দিক্‌গুলিকে আরও একটু স্ফুটমান ক'রে তুল্‌লে গল্পটি আরও উন্নত হ'য়ে উঠ্‌তো।

প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদের অর্ধাংশ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিতা রমণীর সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন পাঠকের কৌতূহলকে অক্ষুণ্ন রেখে সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু রমণীর জলের কলসীর জলের ইশারার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাবধানবাণী রোমান্স-রসের গাঢ়তা নষ্ট ক'রে ফেলেছে। এ জাতীয় বর্ণনাভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৌশলের সমগোত্রীয়। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এখানে নেই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশে রহস্যময়ী রমণী ও দাসীর সংলাপে রমণীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, অথচ এখনও পর্যন্ত শরৎচন্দ্র রমণীর নামটিও প্রকাশ করেননি। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশে সত্যেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রমণীর গোপন ইচ্ছার প্রকাশ একদিকে যেমন পাঠকের কৌতূহলকে করেছে ক্ষুণ্ন, অন্যদিকে পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তাকেও করেছে ব্যর্থ। এই অংশটুকু বাদ দিলে কিংবা পরে যোগ করলে আঙ্গিক-শুদ্ধি দেখা যেতো। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রের স্নানার্থিনী সহযাত্রিনীর "স্বর্ণলতা"র (বা "সরলা"র) সমালোচনা-প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশ এবং যুক্তিপদ্ধতি কোনও শিক্ষিতা এবং মার্জিতা ভদ্রনারীচরিত্রের পরিচয়ই বহন করে। কিন্তু 'শ্রীমতী বিজ্‌লী'র সত্যেন্দ্রকে অভ্যর্থনার যে পরিচয় আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাই, তাতে বিজ্‌লী চরিত্রের বিন্দুমাত্র পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। কোনও নারীর মুখে এমন অশোভন উক্তি, (সে যত হীন কাজেই প্রবৃত্ত থাকুক না কেন) অন্ততঃ শরৎ-সাহিত্যে আর কোথাও আমরা পাই না। অথচ এই বিজ্‌লীরই পরবর্তী জীবনে কি গভীর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ না ক'রে উপায় নেই। চন্দ্রমুখীর প্রথম আবির্ভাব এবং তার পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্‌লীর মতো একটি লঘু ব্যঙ্গপ্রবণ চরিত্রের পরিবর্তন বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য অঙ্গুলি-নির্দেশে ঘটে থাকলেও তার সংক্ষিপ্ত অবিশ্লেষিত পরিচয় জেনেই পাঠকমন পরিতৃপ্ত হয় না। একটা অসামঞ্জস্যবোধ পরিপূর্ণ রসবোধকে অনবরত বিদ্ধ করতে থাকে। তাই বলেছি, উপন্যাসের আঙ্গিকে যা ত্রুটিহীন হ'য়ে উঠ্‌তো, ছোটগল্পের সীমায় তার অঙ্গচ্ছেদ ঘটেছে। তা ছাড়া চরিত্র হিসেবে সত্যেন্দ্র এবং বিজ্‌লী পরিবর্তিত। কাহিনী আকস্মিক

ঘটনায় শেষ হ'লেও সমাপ্তির পর অজ্ঞাত কৌতূহল আর জাগ্রত হয় না; কারণ বিজ্‌লীর জীবনের পরিণাম আমাদের জানা হ'য়ে গেছে। প্রধান কথা, কাহিনীটিতে জীবন-জিজ্ঞাসা যত ব্যাপক এবং গভীরতর ভাবে সঞ্চরমান, সেই তুলনায় ঘটনার আকস্মিকতা অপেক্ষা হৃদয়ের সূক্ষ্মবৃত্তির লীলাময়তার পরিচয় দানই অধিক পরিমাণে যুক্তিযুক্ত। ছোটগল্পের মানদণ্ডে তাই "আঁধারে আলো" যত সহজেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাক্ না কেন, তাতে উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাঠকচিত্তে তাই সংমিশ্রণজাত রসের সিঞ্চন হয়েছে মাত্র, গভীরতালাভ করেনি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাধারাণীর কাছে সত্যেন্দ্রের বিজ্‌লী-ঘটিত পূর্ব-জীবনের কথা জ্ঞাপন অবর্ণিত। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই বর্ণনার প্রয়োজন নেই সত্য, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে আছে। শরৎচন্দ্রের রচনাকুশলতার ত্রুটি এখানেই যে তিনি পাঠককে বিজলীর পরিবর্তনের ইতিহাস এবং সত্যেন্দ্রনাথের বর্তমান পরিণতির কথা আকস্মিক-ভাবে জানিয়েও তৃপ্ত করতে পারেননি। শরৎচন্দ্র এখানে রচনাশৈলীর ইঙ্গিত-ইশারায় যে বস্তুকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারেননি, উপন্যাসের আঙ্গিকে তা সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌তো।

বিজ্‌লী-সত্যেন্দ্রনাথ-রাধারাণীর প্রেম-প্রকৃতি বিচার

গঙ্গার ঘাটে সত্যেন্দ্র বিজ্‌লীর "একসঙ্গে এতরূপ" দেখে প্রথম আকৃষ্ট হয়। "চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন" অথচ আঠার-উনিশ বছরের অবিবাহিতা একটি মেয়েকে পাণ্ডার হাতে চন্দনের ছাপ নিতে দেখেও কোন প্রকার সন্দেহ তার মনে জাগ্রত হয়নি; বরং ঔদাসীন্য গভীরতর নারী-আসক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের মনে হয় সত্যেন্দ্রের চরিত্রে যে উদাসীনতার কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, তা আপাত। সেজন্য যত সহজে সে "...এক ফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া...এম্‌. এ. পাশ করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে।..." তত সহজে "...কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ভুলিতে পারে না।..." সুতরাং বেশ বোঝা যায় রাধারাণীকে প্রথম দেখে

সত্যেন্দ্রের রূপমোহ জন্মেছিল, কিন্তু লেখাপড়ার অজুহাতে সে সেই মোহকে অন্তরে নির্বাপিত করতে চেয়েছিল। নারীর প্রতি ঔদাসীন্য মোহকে আবৃত করবার একটা উপলক্ষ মাত্র।

বিজ্‌লীকে 'প্রথম দর্শনে' (Love at first sight) সত্যেন্দ্রের পূর্বস্মৃতির ঘটে জাগরণ—রাধারাণীর স্থানে বিজ্‌লীর আবির্ভাবে এবার আর মোহ নয়, তার অন্তরে প্রেমের জাগরণ ঘটে। অপরিচিতা অসামান্যা রূপসী সত্যেন্দ্রের মনে গভীর স্থান অধিকার করতে থাকে। একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে সত্যেন্দ্র প্রতিদিন গঙ্গাঘাটে একটি বিশেষ সময়ে উপস্থিত হ'তে থাকে এবং রূপসীর চোখের ভাষায় সত্যেন্দ্র তার অনুমোদন উপলব্ধি করে। "কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মতো শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।"—সে শুধু সত্যেন্দ্রের এই প্রথম প্রেমোন্মাদনা অনুভব করতে পেরেছিলো। এখানে তাকে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত পুরুষ মনে না হ'লেও অসংযমী মনে হয়নি। শরৎচন্দ্রের গল্প-পর্যায়ে সত্যেন্দ্রই বোধ হয় একক পুরুষ যে, অপরিচিতা নারীকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছে। তা ছাড়া এ ভালবাসার তীব্রতা এত অধিক যে সত্যেন্দ্রের সাধারণ বিবেচনা শক্তি পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে। কোন ভদ্র যুবতীর পক্ষে একাকিনী গঙ্গাস্নান ক'রে পাণ্ডার হাতে চন্দনের ছাপ গ্রহণ যে কতখানি বিসদৃশ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তার জাগেনি। রমণীর চোখের ভাষা এবং কটাক্ষের ইঙ্গিতে সত্যেন্দ্র বিমুগ্ধ—অপরিচিতার সাহায্য প্রার্থনায় নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করেছে এবং রহস্যময়ীর দিন কয়েকের অদর্শনে সে হ'য়ে উঠেছে উদ্বিগ্ন। সত্যেন্দ্র নিজে শিক্ষিত যুবক; "অপরিচিতা প্রেমাস্পদা-"র প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগেছে, তার শিক্ষা ও জীবনসমস্যা সম্পর্কে ধারণার পরিচয় পেয়ে। তাই চারদিনের অদর্শনে সত্যেন্দ্রের আশঙ্কার অন্ত নেই, কারণ তার পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"সে যথার্থ ভালবাসিয়াছে! চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-

কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিলনা, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।"

সত্যেন্দ্রনাথের সাক্ষাতে অপূর্ব কটাক্ষ এবং ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে জাহ্নবী তীরে শ্রীমতী বিজলীর প্রথম আবির্ভাব। "...যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়...", তাই প্রথম সাতদিন উভয়ের চার চোখের মিলনই শুধু ঘটেছে। তবুও "এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাদের অ-প্রাপ্য কিছুই নাই!" সত্যেন্দ্রনাথের প্রেম তো সেখানে অতি সুলভ। কিন্তু বিজলী তাকে করেছে প্রতারণা। শরৎ-সাহিত্যে কোনও সমাজ-স্খলিতার চরিত্র প্রথম আবির্ভাবেও এত অগভীর এবং বিকৃত হ'য়ে দেখা দেয়নি। তাই পরবর্তী-জীবনে বিজলীর গভীর পরিবর্তন অত্যন্ত আকস্মিক ও অতি-নাটকীয়। সত্যেন্দ্রের একনিষ্ঠ সাধনা এবং বিশ্বাসের প্রতি অতি-কঠিন আঘাত দিয়ে একদিন নর্তকী বিজলী আত্মপ্রকাশ করেছে। তার প্রতি কথায়, প্রতি ভঙ্গীতে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত সত্যেন্দ্রের সর্বাঙ্গে বিষাক্ত অনুভূতির সঞ্চার করেছে। কিন্তু বিজলীর পরিবেশ এবং প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রের গোপন উচ্ছ্বসিত প্রেম পাষাণের মতো কঠিন হ'য়ে উঠেছে। সে পুরুষোচিত তীব্র অভিমানে বিজলীর অভিনীত নাটকে চিরদিনের জন্য যবনিকা টেনে দিয়ে নিজেকে সংহত ক'রে নিয়েছে— "...আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখনও শিখিনি, কিন্তু নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।"

সত্যেন্দ্রনাথের তীব্র ঘৃণা এবং অবজ্ঞা বিজলীকে দিয়েছিল আলোর সন্ধান। সত্যেন্দ্র বলেছে তীক্ষ্ণ ঘৃণায়—"...আপনি যা তাই।...কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না।...আপনার নিশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে..."। কিন্তু সত্যেন্দ্রের "সুদৃঢ় অপ্রত্যয়" বিজলী সম্পর্কে একটা বিকৃত অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রত্যাবর্তন করেছে। বিজলীর অবচেতন সত্তায় প্রেমের অঙ্কুরটিকে পদদলিত ক'রে সত্যেন্দ্র চলে গেছে, অথচ "...যে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতোই

ত্যাগ করিতে পারে…”। কিন্তু সত্যেন্দ্রের প্রত্যাখানে বিজলীর পুনর্জন্ম শরৎচন্দ্র অনেকটা নাটকীয় আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন, হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতির আন্দোলনে তা প্রকাশিত হয়নি। তাই পাঠকের অন্তরে এমন সুন্দর অংশটিও কোনও গভীর রেখাপাত করতে পারেনি।

দেবদাস চন্দ্রমুখীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে এবং ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবনকে ভুলে থাক্‌বার জন্য। পার্বতীকে সে আর ফিরে পায়নি, সুতরাং নৈরাশ্যপুর্ণ জীবনে তার সান্ত্বনা ছিল না কোথাও। সত্যেন্দ্র রাধারাণীকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলো, কিন্তু আবার সে রাধারাণীকে নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীর প্রেম তার জীবনের ক্ষতকে আবৃত ক'রে দিয়েছে। “নারীদেহের উপরে শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে তো অস্বীকার করা চলে না।…” প্রেমের স্পর্শে বিজলী নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, প্রেমের আলো তাকে দৃষ্টিদান করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রতিষ্ঠাহীন পথে বিজলীর যাত্রা হয়েছে শুরু। এই যাত্রাপথ বিজলীর অশ্রুপাতে হয়েছে সিক্ত, ত্যাগ-নিষ্ঠায় রেখেছে আকীর্ণ ক'রে। বিজলীর শেষ উক্তি এবং বাড়ী বিক্রী ক'রে সব ছেড়ে চলে যাওয়া চন্দ্রমুখীর পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

সত্যেন্দ্র রাধারাণীকে যখন জানালো তার প্রতিশোধ গ্রহণের ইতিবৃত্ত, তার “…নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল।” আর রাধারাণী! যার ঔদার্যে এবং পাতিব্রত্যে সত্যেন্দ্রনাথ সুখী হ'য়েছিলো, সেই রাধারাণী তার অপুর্ব নারী-মহিমা নিয়ে বিজলীর অপমানকে মুছে ফেল্‌তে চাইলো। বিজলীর উদ্দেশ্যে তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার অবধি নেই—“দিদি, সমুদ্র-মন্থন ক'রে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন ব'লেই আমি তাঁকে পেয়েচি।” বিজলীও দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজে হয়েছে পরিশুদ্ধ। তার আর অনুশোচনা বা আত্মগ্লানি নেই—দুঃখ-ভোগের বিষ নিজকণ্ঠে

ধারণ ক'রে বিজলী মুক্তির অমৃত আস্বাদ করেছে। তাই সত্যেন্দ্রের সান্নিধ্যও সে আজ আর কামনা করে না। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অপমানিত হবার ভয়ও তার আর নেই; রাধারাণীকে তাই সে বলেছে—"…আমার নিজের ব'লে আর কিছু নেই! অপমান করলে সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।…"

উপসংহার

"আঁধারে আলো" রচনাটির মধ্যে অপরিণত লেখনীর চিহ্ন বহুস্থানে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। "জাগরণ পর্বে"র রচনাগুলির মধ্যে এ শ্রেণীর দুর্বল কাহিনী-গ্রন্থন আর নজরে পড়ে না। এর কারণ, রচনার প্রথম থেকেই শরৎচন্দ্রের মনে জীবনের একটা সত্য প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি ছিল। সেজন্য স্বাভাবিক ভাবে জীবন-জিজ্ঞাসার যে সমাধান আসে, এখানে তা অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় কাহিনীর গতি দ্রুত হয়েছে। সৃষ্টির আবিষ্ট মুহূর্তে জীবন-রহস্যের যে প্রকাশ ঘটে থাকে, শরৎচন্দ্রের সচেতন মন তাকে প্রতিপদে খণ্ডিত ক'রে স্রষ্টাধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছে; তাই এখানে শিল্পী শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ব্যাখ্যাতা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ ঘটেছে অধিক। কাহিনী প্রথম থেকে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, অকস্মাৎ সত্যেন্দ্রের অপরিণামদর্শিতায় শরৎচন্দ্রের সাবধান-বাণী—"…ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল শব্দে, অর্থাৎ ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এসব ছলনা—সব ফাঁকি…" যেন স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের প্রতি সাবধান বাণী! এই অংশের সমস্ত গুরুত্ব এই দুই পংক্তির কুঠারাঘাতে ভূমিস্মাৎ হ'য়েছে। তা ছাড়া চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদও শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির দুর্বলতার পরিচায়ক। একস্থানে বর্ণনাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"…সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য!…" এর পরই দীর্ঘ বর্ণনা-অসামর্থ্যের তালিকা দিয়ে নিজের লেখনীর প্রতি এ শ্রেণীর অবিশ্বাস প্রকাশ করা অন্তত শরৎচন্দ্রের শোভা পায় না।

"আঁধারে আলো" রচনাকালে শরৎচন্দ্র একবার মেদিনীপুরে যান। এই

সময়েই তারকবাবুর "স্বর্ণলতা" নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থখানি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত ক'রেছিলো ; তার প্রমাণ পাই, 'আঁধারে আলো'র মধ্যে অকস্মাৎ বিজলী বাইজীর 'স্বর্ণলতা' সমালোচনার মধ্যে। এতে শুধু শরৎচন্দ্রের সমালোচনার প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাতে বিজলী চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব হয়েছে ক্ষুণ্ণ।

এই রচনাটির যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, কয়েক স্থানে সংলাপ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর। মধুসংলাপী শরৎচন্দ্রের এই ক্ষমতা অন্যান্য ত্রুটিকে অনেকাংশে আবৃত ক'রে দিয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সংলাপ বক্তৃতায় নয় তো বাণীতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু শেষের দিকে কয়েকস্থানে সংলাপ সার্থক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। যেমন বিজলীর উক্তি—"...বিশ্বাস কর, সকলের দেহেতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না।...সব মন্দিরেই দেবতার পুজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা! তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না!"

সত্যেন্দ্রের প্রথম প্রণয়ে মানসিক অবস্থা বর্ণনায় শরৎচন্দ্র সার্থক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন—"...সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া...গঙ্গাযাত্রা করিল।" এখানে ভাষার মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন বহুস্থানে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে ত্রুটি প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে যৌগিক ক্রিয়ার আধিক্য। এখানেও যৌগিক ক্রিয়ার আধিক্য তেমনি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যেমন—"...বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাতজোড় করিয়া সুরু করিয়া দিল—"।

প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনায় সত্যেন্দ্রের পুর্ব-পরিচিতি আরও ইঙ্গিতপুর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হ'লে ভাল হ'তো। এখানে সংলাপের তুলনায় বর্ণনা অধিক, কিন্তু সে বর্ণনাভঙ্গী ক্লান্তিজনক হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। রচনাকৌশল এমন সুগঠিত হওয়া উচিত যে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও যাতে ঘটনার সঙ্গে

এক হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু দু'এক ক্ষেত্রে সার্থক বর্ণনাভঙ্গীর পরিচয় পেলেও মোটের ওপর 'জাগরণ পর্বে'র রচনা হিসেবে "আঁধারে আলো" এই পর্বের অন্যান্য গল্পগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র নিজে বারবার বলেছেন যে তিনি আগের থেকে প্লট ভেবে গল্প লেখেন না। কিন্তু এখানে প্লট ভেবে তাকে জোর ক'রে সংক্ষিপ্ত আকার দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

(৬)

মেজদিদি

নামকরণের সার্থকতা

"মেজদিদি" গল্পটির আদি নামকরণ ছিল "মেজ বউ।" শরৎচন্দ্র পরবর্তী-কালে এই নাম পরিবর্তন ক'রে রাখেন "মেজদিদি"। নবীন ও বিপিন দুই ভাই, উভয়ের স্ত্রী যথাক্রমে কাদম্বিনী এবং হেমাঙ্গিনী ও তাদের পুত্র-কন্যাসহ একটি পারিবারিক জীবন-চিত্র এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে। হেমাঙ্গিনী এ গৃহের মেজ বউ। সাংসারিক মনোমালিন্যে দুই ভাই পৃথক হয়েছে এবং কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে যে বিবাদ দুটি পরিবারে দেখা দিয়েছে, মেজবউ কেষ্টর পক্ষে দাঁড়িয়ে অনাথ বালককে রক্ষা করেছে। কিন্তু এর পেছনে যে মনোভাব কার্যকরী, তাতে দেখা যায় এ গৃহের বা বিপিনের মেজ বউ হওয়াই হেমাঙ্গিনীর বড় পরিচয় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় পরিচয় নিঃসম্পর্কিত কেষ্টর মেজদিদি হিসেবে গল্পে তার আবির্ভাব। কেষ্ট তাকে মেজদিদি ব'লে ডেকেছে, হেমাঙ্গিনী নিজেকে কেষ্টর মৃত-মা মনে ক'রে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিরাশ্রিত কেষ্টকে আশ্রয় দিয়েছে।

আঙ্গিক পর্যালোচনা

শরৎ-সাহিত্যে যে কটি ছোট গল্প সার্থক, "মেজদিদি" তার মধ্যে অন্যতম। 'জাগরণ পর্বে' যে কটি ছোট গল্পে এই ধরণের সাংসারিক সম্পর্কের ওপর বিরোধ

গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে 'রামের সুমতি'তে বৈমাত্র দেবর ও বউদি রাম-নারায়ণী, 'বিন্দুর ছেলে'তে ভাসুরপো-কাকীমা, কিন্তু 'মেজদিদি' গল্পে আত্মীয়তার সূত্র আরও ক্ষীণ, কিন্তু কতো গভীর তাদের সম্পর্ক! শরৎচন্দ্র এই সব আবেগপ্রধান গল্পের দ্বারা ভাবপ্রবণ বাঙালী চিত্ত জয় করেছেন।

'মেজদিদি' গল্পটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে কাহিনী-সূত্রপাত ছোটগল্পের সার্থক লক্ষণাক্রান্ত। এই পরিচ্ছেদে হেমাঙ্গিনীকে অত্যন্ত সুকৌশলে এবং স্বাভাবিকভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত ও পরিচিত করান হয়েছে। এতো সহজে এতো সার্থকতা এর পূর্বে দেখা যায়নি। ছোটগল্পের সংযত বর্ণনাভঙ্গী, সংহত কলা-কৌশল শরৎচন্দ্র নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত যে, কেষ্টর প্রথম আবির্ভাব থেকেই সে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, তা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি। এর কারণ বাঙালীর ভাবপ্রবণতার ওপর গল্পের মূল রস আবর্তিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে নবীন-বিপিনের যে পূর্ব-পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে শরৎ-লেখনী তেমন সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেনি। এই বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ হ'লে আঙ্গিকের দিক দিয়ে নিখুঁত হ'তো। এই পরিচ্ছেদেই কেষ্ট-হেমাঙ্গিনীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হেমাঙ্গিনীর গৃহে নিমন্ত্রণ খাওয়া ও অত্যন্ত বেলায় কেষ্টর ভাত খাওয়া হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হেমাঙ্গিনীর জ্বরকে কেন্দ্র ক'রে কেষ্টর সঙ্গে তার আরও হৃদ্যতা স্থাপন এবং অন্যদিকে কাদম্বিনীর অত্যাচারের ক্রমবর্ধমানতা কাহিনীর গতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ক্রমে হেমাঙ্গিনীর কাছে কেষ্টর ভাত খেতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে হেমাঙ্গিনীর স্নেহকে অধিক আকর্ষণ করা এবং তার ফলে কাদম্বিনীর গাত্রদাহ ও বিপিনের অসন্তোষ কাহিনীর দ্বন্দ্বকে তীব্র ক'রে তুলেছে। দু'টি পরিবারের মধ্যে যে অসন্তোষের বীজ সুপ্ত হয়েছিল, কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে আবার তা নবতমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একদিকে

কেষ্টর প্রতি একপক্ষের অত্যাচার বেড়ে চলেছে, অন্য পক্ষের সেই অনুপাতে স্নেহবন্ধন আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে—হেমাঙ্গিনী যেন কেষ্টকে শত স্নেহ ক'রেও পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। তার এই স্নেহপ্রবণতা বিপিনের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া সত্ত্বেও অটুট থেকেছে এবং দ্বন্দ্ববহুল ঘটনা কাহিনীকে চূড়ান্ত পরিণতিমুখী ক'রে তুলেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে মেজদিদির অসুস্থতাকে কেন্দ্র ক'রে ঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে। মেজদির সুস্থতা কামনা ক'রে কেষ্ট দোকান থেকে টাকা চুরি ক'রে পুজো দিতে গেছে, তাতে তাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে; কিন্তু মেজদির জন্য কেষ্ট নীরবে তা সহ্য করেছে। ফলে হেমাঙ্গিনীর মনে লেগেছে আঘাত এবং সে স্বামীর কাছে কেষ্টকে প্রার্থনা করেছে নিজের কাছে রাখবার জন্য। চুরির অপবাদে কেষ্টর লাঞ্ছনা এবং রক্তপাতেই কাহিনী Climax-এ উঠেছে। হেমাঙ্গিনীর নিরুপায় এবং উচ্ছ্বসিত আবেগের প্রকাশ ঘটেছে সকলের সমক্ষে কেষ্টকে দৈহিক আঘাত দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অন্তরে সে দগ্ধ হয়েছে কেষ্টর দুঃখে। অবশেষে নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি সে খুঁজে পেয়েছে এবং স্বামীকে জানিয়েছে—"আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে। আমি কেষ্টর মা।"—এখানে হেমাঙ্গিনীর একনিষ্ঠ মাতৃত্ববোধের হয়েছে জয় এবং কাহিনী শেষ হয়েছে হেমাঙ্গিনী-কেষ্টর চিরবন্ধনকে বিপিনের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী ক'রে। এই ভাবে কাহিনীর সমাপ্তি ছোটগল্পেরই সার্থক পরিণতি।

'মেজদিদি' গল্পের চরিত্র-সৃষ্টিতে সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। এখানে কেষ্ট-হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি কোন চরিত্রই বিবর্তিত হয়নি—সমস্ত কাহিনীর মধ্যে সব কটি চরিত্র এক রূপ নিয়ে প্রকাশমান। কাদম্বিনী ও তার কুটিলতা কাহিনীর পরিণতির জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা শেষ ক'রে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে—তার চারিত্রিক কোন পরিবর্তন হয়নি। হেমাঙ্গিনী প্রথম থেকেই স্নেহপ্রবণ। বিপিনের চরিত্রও অপরিবর্তনীয়, শেষের দিকে কেষ্টকে গ্রহণ, ঘটনার পরিণতিকে বাধ্য হ'য়ে স্বীকৃতিদান ভিন্ন কিছুই নয়। সুতরাং সবদিক বিচার ক'রে দেখা যায় যে 'মেজদিদি' সার্থক ছোটগল্প।

কাদম্বিনী-কেষ্ট-হেমাঙ্গিনীর সম্পর্ক বিচার

প্রবাদ আছে, মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ বেশী, সে হয় দানবী। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ অধিক হ'য়েও মাসী দানবী না হ'য়ে, হ'য়ে উঠেছেন দেবী। অর্থাৎ শরৎ-সাহিত্যে যেখানেই দেখা গেছে সম্পর্কের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র দূরতম, যেখানে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেখানে নিকটের চেয়ে দূরই হয়েছে বড় আপনার জন। 'জাগরণ-পর্বে'র অন্যান্য গল্পগুলির মতো এই মন্তব্য 'মেজদিদি' গল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মাতৃহারা কেষ্ট যখন বৈমাত্রেয় বোন কাদম্বিনীর গৃহে আশ্রিতরূপে দেখা দিল, তখন কুটিলা, স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি কাদম্বিনী তাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলো না। প্রথম দর্শনেই বিমাতাকে তার 'বজ্জাতমাগী' সম্বোধন, কেষ্টকে 'ভাত মারতে' এসেছে ব'লে অভিযোগ, প্রথম থেকেই কেষ্টর প্রতি আমাদের মনকে টেনে নেয়। কেষ্ট দরিদ্র হ'য়েও মায়ের স্নেহপুটে লালিত হয়েছে, কখনও কষ্ট পায়নি। তার মিতভাষণই আমাদের সহানুভূতি আরও অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। সেই স্বল্পভাষী কেষ্ট যখন ভাগ্য-বিপর্যয়ে মাকে হারিয়ে কাদম্বিনীর গৃহে এলো, তখন কাদম্বিনীর সম্বোধন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে সে প্রথমে বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু অবশেষে রাজহাটের পরিবেশকে কেষ্ট স্বীকার ক'রে নিয়েছে, ভেবেছে এই হয়তো স্বাভাবিক। বেশী ভাত খাওয়ার অভিযোগে কেষ্টর নীরবে অশ্রুবিসর্জন এবং তা ভয়ে গোপন করা—কেষ্ট চরিত্রের এই কোমল অংশগুলি পাঠকের হৃদয়কে ব্যথাক্লিষ্ট করে। কেষ্ট রামের প্রকৃতি-বিশিষ্ট নয়, আবার অমূল্য-নরেন গোত্রীয় নয়। এই বয়সের বালক চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের প্রাথমিক-পর্ব থেকেই দেখা যায়। কাশীনাথ, দেবদাস, সুকুমার থেকে শুরু ক'রে রাম-অমূল্য-নরেন-কেষ্ট প্রভৃতি চরিত্র এই কিশোর বয়সেরই এক একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দেবদাস-সুকুমার-রামের দুরন্তপনা এক গোত্রীয় হ'লেও দেবদাসের দুরন্তপনার মধ্যে যৌবনোচিত গাম্ভীর্য ছিল, রামের মধ্যে

চাপল্য ছিল অধিক। কিন্তু কেষ্ট-চরিত্রের মধ্য দিয়ে বালক-চরিত্রের আর এক গোপন দিকের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে। দুঃখ নির্যাতনের সঙ্গে পূর্বের অপরিচয় এবং অনভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দিদির আশ্রয়ে কেষ্টর সহনশীলতার পরিচয় প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। নিজের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে কেষ্টর সচেতন অনুভূতি, তাকে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করবার শক্তি দান করেছে; তাই তার ধৈর্য-সঙ্কোচ-অভিমান প্রভৃতির চিত্র পাঠককে অশ্রুসজল ক'রে তোলে। শরৎচন্দ্র বলেছেন—"আঘাত যতই গুরুতর হোক্, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগেনা। পর্বতশিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই যখন পদতলপৃষ্ঠ কঠিন ভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর।" এই কারণেই কাদম্বিনীর অত্যাচারকে পরিস্ফুট করতে অথবা হেমাঙ্গিনীর স্নেহপ্রবণতাকে প্রত্যক্ষীভূত ক'রে তুলতে দুই বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে।

কেষ্টর আগমনে কাদম্বিনী বিমুখ হ'য়ে উঠলেও তার স্বার্থসিদ্ধির একটি সুবর্ণ সুযোগ লক্ষ্য ক'রে, কেষ্টর সেই বৃদ্ধ পথ-প্রদর্শকের অনেক অনুরোধের পর কেষ্টকে গৃহে আশ্রয় দিয়েছে; কারণ বিনা পারিশ্রমিকে দোকানের কাজ করিয়ে নেবার সুবিধেটুকু কাদম্বিনীই বা গ্রহণ করবে না কেন? দুর্নামের ভয়, মুখে যতই বলুক, কাদম্বিনী তাতে বেশী ভয় পেতো না—ভয় পেতো সে অপব্যয়ের জন্য। নিরাশ্রয় ভাইয়ের ভরণ-পোষণের ব্যয় কাদম্বিনী অন্যভাবে পূরণ ক'রে নিতে পারবে ব'লেই তার সমস্ত অনিচ্ছাকে সে সেদিনের মতো দমন করেছিল। কিন্তু কেষ্টর প্রতি কাদম্বিনীর ন্যায়হীন অত্যাচারের আদি অন্ত নেই এবং ক্রমে তা নিষ্ঠুরতম রূপ নিয়ে বেড়েই চলেছে। কাদম্বিনী দিগম্বরী চরিত্রের উত্তরাধিকারিণী এবং রাসমণি প্রভৃতি চরিত্রের পূর্ববর্তী সংস্করণ।

কেষ্টর পক্ষে কাদম্বিনীর আশ্রয় কোন অংশেই সুখকর ছিল না বটে, কিন্তু দুঃখের চরম উপলব্ধি তার জীবনে এখানে ঘটেছিল ব'লেই, কেষ্ট তার কল্যাণ-কামী মেজদিদির দেখা পেয়েছিল। কেষ্টকে হেমাঙ্গিনী প্রথম যে মধুর কণ্ঠে

সম্বোধন করেছে, তাতেও সে হয়েছে বিহ্বল—"এদেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে,, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।" প্রথম দর্শনেই হেমাঙ্গিনীর মাতৃহৃদয় হতভাগ্য অনাথ বালকটির প্রতি স্নেহাতুর হ'য়ে উঠেছে ; কারণ কেষ্টকে কাদম্বিনী যে কাজে নিযুক্ত করেছে, তাতে কোন জননীর হৃদয় আন্দোলিত না হ'য়ে পারে না। তা ছাড়া হেমাঙ্গিনী-চরিত্র প্রকৃত পক্ষেই অনন্যসাধারণ। তার চরিত্রের একদিকে বিন্দু-চরিত্রের দৃঢ়তা অন্যদিকে নারায়ণী-চরিত্রের স্নিগ্ধতার মিশ্রণ ঘটেছে। এই দুই চরিত্রের আতিশয্য বর্জন করলে যে রূপ পায় হেমাঙ্গিনী তারই পরিণতি। হেমাঙ্গিনী শৈলজা বা সিদ্ধেশ্বরীর পূর্বাভাস নয়। সুতরাং শরৎচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন মেজবউর প্রকৃতি সম্বন্ধে—"ঝগড়াটা প্রথমে সেই করিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু সেই মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য, ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া···শেষে হাতে পায়ে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড়-জাকে নিজের ঘরে ধরিয়া লইয়া গিয়া ভাব করিত।"—তার পরিচয় কাহিনী ভাগে কোথাও পাওয়া যায় না।

কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়েছে কাদম্বিনীর দুর্ব্যবহারের কয়েকটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে। বেলা তিনটের সময় কেষ্টর "একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুক্‌নো ড্যালা পাকান ভাত" খাওয়া বিনা-তরকারিতে হেমাঙ্গিনীর মাতৃহৃদয়ে গুরুতর আঘাত দিয়েছে, কারণ "হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলের এই অবস্থার" কথা ভেবে তার অন্তঃকরণ কেঁদে উঠেছে। এরপরে হেমাঙ্গিনীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র ক'রে কেষ্টর পেয়ারা সংগ্রহ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে কেষ্টর প্রতি মেজদিদির স্নেহের বন্ধন আরও নিবিড় হ'য়ে উঠতে থাকে। কেষ্ট যে "অতিশয় লাজুক ও ভীরু স্বভাব" তা হেমাঙ্গিনী জান্‌তো, তাই অনেক কৌশলে তার ভয় ভাঙিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো—"এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোসনে কেষ্ট, যখন যা দরকার হবে চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্—নিবি তো ?" শরৎচন্দ্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সত্যকার স্নেহের আস্বাদ কেষ্ট তার

দরিদ্রা জননীর কাছে পেয়েছিল, তাই—"এই মেজদি'র মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল।"

হেমাঙ্গিনীর স্নেহ-ধারায় কেষ্ট যতই অভিষিক্ত হয়েছে, কাদম্বিনীর অত্যাচার তার প্রতি ততই বেড়ে চলেছে। তাই কাদম্বিনীর অত্যাচারকে যেন হেমাঙ্গিনী শত স্নেহ দিয়েও দূর করতে পারছে না। রাত্রে কেষ্ট ভাত খায়নি শুনে হেমাঙ্গিনীর মাতৃহৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—"...আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা-মা ব'লে মনে করবি।" এর ফলে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে কাদম্বিনীর প্রকাশ্য কলহ হ'য়ে গেলো এবং হেমাঙ্গিনী জানলো অত্যাচরিত কেষ্ট স্নেহের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে জানিয়েছে—"আমার মেজদি' থাকতে কাউকে ভয় করিনে।" তাই খেতে না পেলেও তার অভয়দাত্রী মেজদি' আছে। ক্রমশঃ হেমাঙ্গিনীকে কেষ্টর পক্ষ সমর্থন ক'রে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে; স্বামী অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, ভাসুর পর্যন্ত তীক্ষ্ণ কথা বলেছে। অভিমানিনী হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে খেতে দিলে কন্যা উমা ভয় পাওয়ায় সে জানিয়েছে তার স্বামীকে—"পেটের মেয়েটা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে।" এই উক্তি যে কতদূর বেদনা-প্রসূত, তা সে-ই একমাত্র জেনেছে। কেষ্টর প্রতি স্নেহাধিক্যের জন্য নবীন রোষপ্রকাশ করেছে জেনে হেমাঙ্গিনী জানিয়েছে—"আমি মা! আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন।"—অবশেষে অভিমান ক'রে কেষ্টকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছে হেমাঙ্গিনী নিজেই। নবীন এবং কাদম্বিনীর ব্যবহার ও রুক্ষ কথায় মাঝে মাঝে সে উত্যক্ত হ'য়ে তাদের বিরুদ্ধে দুর্বিনয়সূচক উক্তি প্রয়োগ করলেও গুরুজনদের প্রতি সে যথেষ্ট পরিমাণেই শ্রদ্ধাশীলা ছিল। কিন্তু নিঃসহায় লাঞ্ছিত বালক কেষ্টর প্রতি কর্তব্য-পরায়ণতা, হেমাঙ্গিনীর ধৈর্যকে সব সময় অটুট রাখতে পারেনি।

মাতৃ-সমা মেজদি'র অসুখ জেনে কেষ্টর কোমল হৃদয় আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েছে, তার উদ্বেগের সীমা নেই। ভীরু স্বভাব কেষ্ট মেজদির সাম্‌নে আসতে

সাহস পায়নি, কিন্তু গোপনে মেজদি'র দর্শন-প্রার্থী হ'য়ে অনুমতির প্রতীক্ষা করেছে। মেজদি'র কাছ থেকে বিতাড়িত হ'য়েও তার কোন অভিমান নেই, কোন গ্লানি তাকে স্পর্শ করেনি। মেজদি'র স্নেহ কেষ্টকে এতো দুঃসাহসিক ক'রে তুলেছে যে, সে নবীনের দোকান থেকে টাকা নিয়ে তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী মেজদি'র আরোগ্য কামনা ক'রে বিশালাক্ষী ঠাকুরের কাছে পুজো দিতে গিয়েছে। তার ফলে সে সহ্য করেছে অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু সেজন্য কেষ্ট বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়—"এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাঁরই আঁচলের অল্প একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙ্গালের মতো কি করিয়াই না বেড়াইতেছে।" কেষ্ট-হেমাঙ্গিনী সম্পর্কের মধ্যে আতিশয্যের প্রকাশ ছিল না; এবার কিন্তু তারই জন্য কেষ্টর প্রতি প্রহারের আধিক্য ও তার ফলে রক্তপাতে হেমাঙ্গিনী ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছেচে এবং স্বামীর কাছে কেষ্টকে ভিক্ষা চেয়েছে—"ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেচি।" হেমাঙ্গিনীর মানসিক ক্ষমতা যে তাকে অবলা গৃহবধূর পর্যায় থেকে অন্যস্তরে উন্নীত করেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটে নবীনের কেষ্টর প্রতি শারীরিক দণ্ড দেবার পর থেকে। হেমাঙ্গিনী এবার অভিমান-অনুরোধের পথ ত্যাগ ক'রে আত্ম-শক্তিতে নির্ভর করেছে। সে দৃঢ়তার সঙ্গে কেষ্টকে নিয়ে স্বতন্ত্র জীবনপথে যাত্রা করতেই বিপিন আর উদাসীন হ'য়ে থাকতে পারেনি। অনাথ বালকের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে হেমাঙ্গিনী চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু বিপিনের গৃহ-জীবন ভেঙে পড়েছে—তাই বিপিন চঞ্চলা নারী-প্রকৃতিকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছে হেমাঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষিত স্নেহের জনটিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে। শরৎ-সাহিত্যে নারীধর্ম যে সর্বাংশে মাতৃত্বের আবরণে পরিবৃত, তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় জ্ঞাপন করেছে হেমাঙ্গিনী-চরিত্র। বিকৃত নারী-চরিত্রের প্রতিবিম্ব কাদম্বিনীর এই কাহিনী-ভাগে সক্রিয়তা শুধু বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে এবং গল্পের গতি পরিণতি-মুখী হ'য়ে উঠলে, কাদম্বিনীও নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে কাহিনী থেকে।

উপসংহার

নবীন সংসারের বড় ভাই। আমরা শ্যামলাল, যাদব থেকে শুরু ক'রে শরৎ-সাহিত্যে 'বিভিন্ন ধরণের বড় ভাই দেখেছি, কিন্তু নবীন শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন অথচ নীচ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন চরিত্র আর দেখা যায় না। নবীন স্ত্রী কাদম্বিনীর দ্বারা পরিচালিত এবং নিজের মতামত ব'লে কিছু নেই। তাই স্ত্রীর নির্দেশে যে কোন হীন কাজ করতে সে পশ্চাৎপদ্ নয়।

বিপিন চরিত্রে স্ত্রীর প্রতি যে আনুগত্য তা ভালবাসার জন্য। "বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন।" শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা যায় না—এই উক্তি বিপিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। তবে শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাদার প্রতি বিপিন শ্রদ্ধাশীল ব'লেই মাঝে মাঝে হেমাঙ্গিনীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তা ছাড়া সে একটু নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির মানুষ।

'মেজদিদি' গল্পে বর্ণনাভঙ্গীর যেটুকু প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত নেই বললেই চলে। সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিতময় ভাষায় শরৎচন্দ্র কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং কোথাও তিনি সমালোচক হ'য়ে কেষ্টর দুঃখে বিগলিত চিত্তে বক্তৃতা দেন নি; আবার কাদম্বিনীর অত্যাচারে খড়্গহস্ত হননি। যেটুকু প্রয়োজন তার অধিক শরৎচন্দ্র এই গল্পে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন নি। শরৎ-প্রতিভার মধ্যাহ্নসূর্য এবার আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, কারণ 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে শরৎ-প্রতিভার পুর্ণতম বিকাশ ঘটেছে বলা যেতে পারে।

এই গল্পের সংলাপ অত্যন্ত সার্থক। সাংসারিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে এতো ঘরোয়া সংলাপ শরৎচন্দ্রের পুর্বে বাঙলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। সংলাপ-সৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত নিখুঁত এবং স্বাভাবিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। গল্পে কেষ্টর বেশী সংলাপ নেই, অথচ তার মনের কোনও কথাই আমাদের অজানা নেই। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব স্ব উক্তিতে নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

'পরিণীতা' গ্রন্থে অলঙ্করণে যে সার্থকতা শরৎচন্দ্র আয়ত্ত করেছিলেন, 'মেজদিদি' গল্পেও তা অটুট রয়েছে। সহজ স্বাভাবিক কথা দিয়ে বক্তব্যকে পরিষ্কার ক'রে তোলার রীতি এতো ঘরোয়াভাবে সে যুগে আর কেউ আয়ত্ত

করেছিলেন কিনা সন্দেহ। যেমন—"এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগারও মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র।" উপমা-প্রয়োগ সবক্ষেত্রেই সার্থক হ'য়ে উঠেছে। যেমন, "ভারী গাড়ীশুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায় তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল।"

প্রসন্নর মা-চরিত্রটি নেত্যকালীরই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই শ্রেণীর চরিত্র গ্রামের গৃহস্থ সংসারের অন্যতম অঙ্গ বলেই নিজেদের মনে করতো।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির যে আঙ্গিক তা হচ্ছে সহজ কথাকে গুরুগম্ভীর ভাবে প্রকাশ করা। এই করুণ-রসাত্মক গল্পের মধ্যেও এ ধরণের দু'একটি বর্ণনা দেখা যায়। যেমন, যখন কাদম্বিনী নবীনকে জানালো "কেষ্টকে মেজগিন্নি বিগড়ে না দেয় তো আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।"—তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"নবীন মৌন হইয়া রহিল। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে (কেষ্টকে) বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না।"

(৭)

দর্পচূর্ণ

নামকরণ

'দর্পচূর্ণ' গল্পের নামকরণ সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাহীন। কোন রচনার নামকরণ তাৎপর্যহীন বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাপেক্ষ হ'য়ে উঠলে, সেই রচনার, বিশেষ ক'রে ছোট গল্পের ইঙ্গিতময় বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর ছোট গল্পগুলির নামকরণে যথেষ্ট সার্থকতাই রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু 'দর্পচূর্ণ' গল্পে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলক অনুভূতিটি এতো অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল হ'য়ে পড়েছে যে, তিনি নামকরণ প্রসঙ্গেও উদ্দেশ্যকে সুপ্রকট ক'রে তুলেছেন। নামকরণের ছদ্মবেশের অন্তরালে কাহিনীকে রহস্যময়তা দান

করার ধৈর্যও শরৎচন্দ্রের এক্ষেত্রে ছিল না ব'লে মনে হয়। তাই ইন্দুমতীর নারীত্বের স্পর্ধিত দর্প ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হয়েছেন।

কাহিনী-গ্রন্থন

নবম পরিচ্ছেদ-বিশিষ্ট 'দর্পচূর্ণ' প্রারম্ভে এবং পরিশেষে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু পারম্পরিক পরিচ্ছেদ-গ্রন্থনে অনেকক্ষেত্রে সামঞ্জস্য-চ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য সামগ্রিকভাবে গল্পরস পাঠক চিত্তে আস্বাদ্য হ'য়ে ওঠে নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের মনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তত্ত্বটিকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা অত্যন্ত বলবতী; সেজন্যই কাহিনীটিকে একটি উদ্দেশ্যের বাহন ব'লে মনে হয় এবং কাহিনীভাগে অনেক ঘটনা শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যটিকে প্রমাণ করবার জন্য অগ্রসর হয়েছে ব'লে মনে হয়। সাহিত্যে জীবন-রহস্য উন্মোচন বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য যত উচ্চ স্তরের হোক না কেন, সব সময়েই যদি একটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার চেষ্টা থাকে, তবে তা রস-সৃষ্টি হ'য়ে উঠবে না। তেমনি ছোটগল্পের কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য রচনাকারের শিল্প-কৌশলে আবৃত হ'য়ে ক্রিয়াশীল হ'লে তা হবে সার্থক-সৃষ্টি। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'দর্পচূর্ণ' গল্পে উদ্দেশ্যধর্মী মনোভাবকে কিছুতে যেন দমন করতে পারেন নি। গল্পটির আঙ্গিক-সজ্জার বিচারেই তা ধরা পড়বে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই নরেন ও ইন্দুমতীর সম্পর্কটি যে মধুর নয় তা পাঠকের কাছে স্বাভাবিকভাবে শরৎচন্দ্র পরিবেশন করেছেন। কোনপ্রকার ভূমিকা বা সুদীর্ঘ বর্ণনা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মনোভাবকে পরিস্ফুট করবার ব্যগ্রতা নেই। ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনা শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশে, নরেন্দ্রের চিন্তার মাধ্যমে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। পুর্ব-পরিচিতির এ রকম সংক্ষিপ্তকরণ ছোটগল্পের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই গল্পে শরৎচন্দ্র ঘটনার দ্রুত আবর্তনে ও পরিবর্তনে নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর মানসিক বিভ্রান্তিকে একটা অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এভাবে নর-নারীর জীবনের ব্যর্থ ইতিহাস শরৎচন্দ্রের শিল্পবোধের নিপুণতায়

আত্মপ্রকাশ করেছে এবং 'দর্পচূর্ণ' গ্রন্থের যা কিছু বৈশিষ্ট্য, তা ঘটনা বৈচিত্র্যের অভিঘাতে নরেন্দ্র-ইন্দুমতীর জীবনে দুর্গ্রহ মুক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতবাদের বিপরীত পরিচয় রয়েছে এই গল্পে। তাঁর পত্রাবলীতে তিনি 'না-লেখার সংযম' সম্বন্ধে বহু জায়গায় অন্যকে সাবধান করেছেন এবং বলেছেন, "যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।" কিন্তু 'দর্পচূর্ণ' গল্পে এই ত্রুটি সবচেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র ইন্দুমতীর নারীত্বের স্পর্ধাকে কোনক্রমেই যেন সহ্য করতে পারেন নি। তাই যতভাবে হোক ইন্দুমতীর দম্ভকে আঘাত দিয়ে ধূলি-লুণ্ঠিত করবার ইচ্ছা শরৎচন্দ্রকে উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলেছে; নারীর স্পর্ধিত গর্বের সেখানে স্থান নেই।

প্রথম পরিচ্ছেদে ইন্দুমতী ও বিমলার নারী-পুরুষের অধিকার এবং প্রাধান্য নিয়ে কথোপকথন কাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে বাধাদান করেছে। এই অংশটি আরও একটু সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতে বিবৃত করলে সুসঙ্গত হ'তো ব'লে মনে হয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেও ইন্দুমতী-বিমলার এই ধরণের স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদার তারতম্য নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য চরিতার্থের বাহন হ'য়ে দেখা দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য-ভালবাসা-দাবি প্রভৃতি নিয়ে 'দর্পচূর্ণ' গল্পের স্থানে স্থানে শরৎচন্দ্র যে দীর্ঘ সংলাপ যুক্ত করেছেন, তা 'নারী-কল্যাণ সমিতি'র তর্ক-বিতর্কযুক্ত বিভিন্ন অভিমতের পরিচায়ক হ'তে পারে, কিন্তু জীবন-মথিত সমস্যাকে গল্পের আঙ্গিকে সর্বজনীন আবেদনশীল ক'রে তোলবার পক্ষে একান্ত পরিপন্থী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর পারস্পরিক সম্বন্ধটি আরও স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে ও নরেন্দ্রের নিঃসহায় করুণ অবস্থাটিকে বেশ সঙ্গতি রক্ষা ক'রেই বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দুমতীর অনুপস্থিতিতে নরেন্দ্রের অসুস্থতা এবং বিমলার গৃহে নরেন্দ্রের গমন কাহিনী-ভাগে জটিল পরিস্থিতির সূচনা করেছে। নরেন্দ্র ও ইন্দুমতীর পারিবারিক জীবনের

বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে বিমলা-গগনবাবুর সুখের সংসারের চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে। এদের সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ যেন আরও গভীরভাবে তা অনুভব করেছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে নরেন্দ্রের ইন্দুমতীর প্রতি ভালবাসার গভীরতা। ছোটগল্পের কাহিনী ভাগে ঘটনাবর্তন অনুযায়ী এই পরিচ্ছেদটি বৈচিত্র্য দান করেছে। ইন্দুমতীর প্রথমবার বাপের বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও গভীরতরভাবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে। বিমলা এবং তার পারিবারিক জীবন প্রত্যক্ষ ক'রে ইন্দুমতী অন্তরে যতই আহত হ'তে থাকে, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও হ'য়ে ওঠে জটিল এবং সমাধানহীন। শরৎচন্দ্র ইন্দুমতীর দাম্পত্য জীবনে বৈপরীত্য সৃষ্টি করবার জন্য এবার আর একটি পরিবারের আমদানী করেছেন। কিন্তু তার ফলে কাহিনীর ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি—বিমলা এবং অম্বিকাবাবুর স্ত্রী ইন্দুমতী-চরিত্রের প্রতিকূলতা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য-প্রাধান্যকে অনাবৃত ক'রে ফেলেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইন্দুমতীর স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যগ্রতায় তার আন্তরিকতা বা হৃদ্যতা অপেক্ষা আড়ম্বরেরই প্রকাশ ঘটেছে বিশেষ ভাবে। শুধু তাই নয়, নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর মধ্যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তাদের জীবনকে অভিশপ্ত ক'রে তুলেছে। সপ্তম অষ্টম এবং নবম পরিচ্ছেদে নরেন্দ্রের পাষাণ-কঠিন ঔদাসীন্য ইন্দুমতীর মানসিক দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ করেছে। এর পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সংঘাত দেখা গিয়েছিল, তা ছিল আপাত এবং সেজন্যই কোন সমাধান দেখা যায়নি। এবার নরেন্দ্রের কাঠিন্যপূর্ণ মনোভাব ইন্দুকে দুর্বল করেছিল ব'লেই সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। নরেন্দ্রের জেলে যাবার ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে ইন্দুমতী চরিত্র-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনীতে সমাপ্তি ঘটেছে। ছোটগল্প হিসেবে ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রের জীবনের সমস্যাবহুল দিকটির প্রতিই শরৎচন্দ্র তীব্র আলোক সম্পাত করেছেন এবং এই সমস্যা বহির্ভূত অন্য কোন ঘটনার দ্বারা কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেননি। কিন্তু তবুও 'দর্পচূর্ণ' সার্থক সৃষ্টি হ'য়ে ওঠেনি এজন্য যে, লেখকের অন্তরের অভিপ্রায়

প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে অম্বিকাবাবুর যাদুঘর দেখতে যাওয়া ও গগনবাবুর নীলামে জিনিস কেনার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আনুগত্যের নিদর্শন লক্ষ্য ক'রে বিস্ময়ান্বিত হ'য়ে ওঠার মধ্যে যেন শরৎচন্দ্রেরই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে। সুতরাং 'দর্পচূর্ণ' গল্পটি এই সমস্ত ত্রুটি বর্জিত হ'লে 'জাগরণ-পর্বে'র একটি সার্থক রচনারূপে প্রতীয়মান হ'তো।

ইন্দুমতী-নরেন্দ্র-বিমলার সম্পর্ক পর্যালোচনা

"শুধু বয়স্থা ও শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই…" ইন্দুমতীর ধনশালী পিতা নিজের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই নরেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যে পরিণয় একটা প্রবল মানসিক আকর্ষণকে প্রতিরোধ না করতে পেরে দু'টি নর-নারীর জীবনে অনিবার্য পরিণাম হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, 'দর্পচূর্ণ' কাহিনীতে সেই মিলনই আবার প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হ'তে চলেছে। ইন্দুমতী গল্পকার শরৎচন্দ্রের প্রথম শিক্ষিতা নায়িকা নয়। তার আগে আমরা পেয়েছি হেমনলিনীকে। হেমের চরিত্রে শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য ছিল, তেজ এবং অভিমানও কম ছিল না। কিন্তু ইন্দুমতীর চরিত্র সর্বাংশে ভারতীয় নারী-প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। নিজের মর্যাদা, সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে একটা স্পর্ধিত দর্পের আবরণে নিজেকে সে রেখেছে ঢেকে। তার ফলে প্রতিপদে ইন্দুমতী নরেন্দ্রকে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা করেছে; তা ছাড়া নারীত্ব সম্পর্কে তার যে সচেতনতা, তার কৃত্রিম দুর্বিনয়টুকুই শরৎ-সাহিত্যের নারী শক্তির মহিমাকে কাঁটার মতো বিদ্ধ করেছে। ইন্দুমতী-চরিত্র শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির মধ্যে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি। প্রথম থেকেই জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো নরেন্দ্রকে দগ্ধ ক'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে তপ্ত স্পর্শ দান ক'রে ইন্দুমতী কাহিনীতে সক্রিয় হয়েছে। তাই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ক্ষণিক দাহিকা শক্তির দ্বারা নরেন্দ্রের নির্লিপ্ত উদাসীন সমাহিত চরিত্রের ধ্যান ভাঙ্গিয়ে ইন্দুমতী নিজ সত্তার তেজ হারিয়েছে।

শরৎচন্দ্র নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর চরিত্র-সংঘাতের মধ্যে নর-নারীর চিরন্তন প্রকৃতির পরিচয় দান করেছেন। কাহিনী-ভাগে যে বহির্দ্বন্দ্বমূলক কারণগুলি তাদের মানসিক আদান-প্রদানের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সূচনা করেছে, তা অপেক্ষা অন্য নিগূঢ় কারণ উভয়ের দাম্পত্য বিরোধের মূলে রয়েছে ব'লে মনে হয়। নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর বিবাহ গভীর অনুরাগের ফলশ্রুতি হ'লেও, তখন মোহই ছিল প্রবল, বিশেষ ক'রে ইন্দুমতীর পক্ষে। তাই প্রত্যক্ষ জীবনে যখন তারা পরস্পরের সম্মুখীন হ'লো তখন প্রতিপদে স্বামীর ত্রুটি ইন্দুমতীকে ক্ষুব্ধ করতে লাগলো। ইন্দুমতীর জীবনে সবচেয়ে যে বড় অভাব সেই স্বামী-প্রেমের অভাবই তাকে করেছে বিকৃত মনোভাবসম্পন্না। কিন্তু সে নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। লেখা-পড়া জানার ফলে সে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য কিছু বজায় রেখেই চলেছে। তাই কোন দিনই নারীজনোচিত কান্না এবং অভিমানে স্বামীর প্রেম-প্রত্যাশিনী হ'য়ে ওঠেনি। ইন্দুমতীর সঙ্গে কাশীনাথের স্ত্রী কমলার এখানেই পার্থক্য। কমলা তার প্রতি কাশীনাথের প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপলব্ধি করবার জন্য অভিমানে কান্নায় নিজে হয়েছে অভিভূত, কখনো কাশীনাথকে কঠিন কথায় আঘাত দিয়ে করেছে বিহ্বল। কিন্তু ইন্দুমতী এদিক থেকে একেবারেই নির্বিকার।

নরেন্দ্র ইন্দুমতীকে ভালবেসেছে বটে, কিন্তু কখনো মাথা তুলে সগর্বে নয়। ধনী-কন্যাকে বিবাহ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিপালনের কথা এতো গভীরভাবে নরেন্দ্রের চিত্তকে আন্দোলিত করেছে যে, সে পুরুষের দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্ত্রীর কাছে অগ্রসর হ'তে পারেনি। ইন্দুমতীর কাছে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অসহায়রূপে উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু পুরুষ-চরিত্রের এই দৌর্বল্য ইন্দুকে এমন জায়গায় আঘাত করেছে যে, নারীর সর্বাপেক্ষা যে কাম্য বস্তু পুরুষের প্রেম এবং সাংসারিক জীবনে পুরুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অধিকারিণী হ'য়ে ওঠা, তা থেকেই ইন্দু হয়েছে বঞ্চিতা। সে জন্যই ইন্দু অনুভব করেছে যে, স্বামী তার এতো অনুগত হ'য়েও কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। যে ফাঁকটি পূরণ করবার জন্য সে বিমলার কাছে বারে বারে

বলেছে—"আমার মত গুণের স্বামী, কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে!… আমি সঙ্গিনী, সহধর্মিণী, তাঁর ক্রীতদাসী নই।…আমার নারীদেহেও ভগবান বাস করেন একথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুলতে দিইনে।"

নরেন্দ্র শরৎ-সাহিত্যের পুরুষ চরিত্রগুলির মতো নির্লিপ্ত হ'লেও সবল চরিত্রবিশিষ্ট হ'য়ে প্রথমে দেখা দেয় নি। একটা ব্যথা-ক্লিষ্ট, ম্লান দৃষ্টি তার চোখে, ব্যবহারে তার কুণ্ঠা, অন্তরে তার সীমাহীন দীর্ঘশ্বাস। তাই সে ইন্দুকে ভালবেসেছে অনেকটা দূরত্ব রক্ষা ক'রে। তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক যেন শুধু টাকার এবং স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার। ইন্দুমতীকে সে কখনো তার অন্তরের সান্নিধ্যে পৌঁছোতে দেয়নি। শিক্ষিতা ধনী-কন্যার কাছে নিজে আত্মসমর্পণ করেছে, সম্পূর্ণভাবে পদানত হ'য়ে ভালবাসার অর্ঘ তুলে দিতে চেয়েছে স্ত্রীকে। কিন্তু এখানেই সে সবচেয়ে বঞ্চনা করেছে ইন্দুমতীকে। "কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না, শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যাইত।" পুরুষত্বের অধিকার নিয়ে নিজের সবটুকু ভার ইন্দুমতীর ওপর তুলে দিয়ে নরেন্দ্র যদি সংসারে উদাসীন জীবন-যাপন করতো তবে ইন্দুমতীর জীবনেও হয়তো বিভ্রান্তির অবকাশ থাকতো না। কিন্তু নরেন্দ্র স্ত্রীর উগ্রতায় নিজেকে যতই সরিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে, ইন্দুমতী ততই নারী-মর্যাদার দোহাই তুলে উভয়ের ব্যবধানকে অন্যের চোখে চাপা দিতে চেয়েছে। স্বামীর প্রেম ইন্দু যথার্থভাবে লাভ করেনি ব'লেই উচ্চকণ্ঠে নর-নারীর প্রেমের বিশ্লেষণ করেছে নিজের অতৃপ্তিকে সান্ত্বনা দিতে—"আমার নারী-মর্যাদাকে ডিঙ্গিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন-সত্তাকে লঙ্ঘন ক'রে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।"

সমগ্র কাহিনী-ভাগে পাঠক ইন্দুমতীর কথায় এবং ব্যবহারে তার প্রতি বিরক্তিভাব পোষণ করে বটে, কিন্তু ইন্দুমতীর চরিত্রের এই পরিণতির জন্য

দায়ী নরেন্দ্র। ইন্দুমতীর চরিত্রে সহ্য-ধৈর্য এবং নম্রতার অভাব ছিল ; রুক্ষ উক্তি প্রয়োগেও ছিল সে স্বামীর প্রতি মুক্তকণ্ঠ। কিন্তু ইন্দুমতীর চরিত্রে প্রধান লক্ষণীয় দিক্ হচ্ছে, তার মনে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নি। স্বামীকে সে নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে বটে, কিন্তু স্বামীর স্নেহের পাত্রী বিমলাকে নিয়ে কোনপ্রকার নীচ মনোভাব সে পোষণ করেনি। বিমলাকে সে ভালবেসেছে এবং ভয় করেছে।

নরেন্দ্রের নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ইন্দুমতী স্বাভাবিকভাবে প্রবেশের পথ পায়নি। তাই মাঝে মাঝে সে টাকাকড়ির অভাব নিয়ে নরেন্দ্রের মৌনতা ভঙ্গ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। গৃহজীবনে স্বামীর ভালবাসাকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তার ঘটেনি—সে অনুভূতিও যেন ইন্দুমতীর ছিল না; কারণ সে দেখেছে স্বামী তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কর্তব্যশীল ; সুতরাং এই বোধহয় স্বামী-প্রেমের প্রধান পরিচয়। তাই ইন্দুমতী ভোগ-সুখের দিক্ থেকে বাধা না পেয়েই সুখী হ'তে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিমলার সান্নিধ্যে তার পারিবারিক জীবনের খবর জেনে নিজের জীবন সম্পর্কে সে যেন কিছু সচেতন হয়েছে; অথচ তখন আর ফেরবার পথ নেই। বিমলা স্বামীর ভালবাসার কথা তুললে ইন্দুমতী তার উত্তরে বলেছে—"না ঠাকুরঝি, অরুচি হ'য়ে গেছে। বরং ওটা কম ক'রে নিজের কর্তব্যটা করলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।" বিমলা ভেবেছে এ বুঝি ইন্দুমতীর স্বামী-প্রেমকে অগ্রাহ্য করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই ইন্দুমতী নরেন্দ্রের প্রেম-স্পর্শ লাভ করেনি—সেজন্যই পুরুষের সমান মর্যাদা পাবার জন্য সে আকুল।

সমাজে নারী যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারিণী সে সম্পর্কে কোন ধারণা ইন্দুমতীর ছিল না। সংসারে স্বামী বস্তুটিকে নারী স্নেহে-প্রেমে পরিপুষ্ট ক'রে রেখেছে। বিমলা এবং অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর স্বামী সেবা, গগনবাবু ও অম্বিকাবাবুর নিজেদের স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য-স্বীকার ইত্যাদি দ্বারাই যে নারীর অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা চিরকাল নারীকে মর্যাদা দান করেছে, তা দেখবার দৃষ্টি ইন্দুমতী হারিয়েছিল। তাই বিমলার মুখে

অসুস্থ অম্বিকাবাবুর কথা শুনে…"তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গম্ভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।"—এ যেন ইন্দুমতীর আত্ম-সচেতনতার প্রথম সূচনা।

ইন্দুমতীর প্রতি নরেন্দ্রের নিরাসক্তি ক্রমশঃ তাকে ক'রে তুলেছে ক্ষিপ্ত। তাই সে সুখী সংসার-চিত্র পর্যবেক্ষণ ক'রেও নিজের ভুল শোধরাতে পারেনি। নরেন্দ্রের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং ইন্দুমতীর বিষয়ে ঔদাসীন্য ইন্দুমতীর চিত্তকে আরও ক'রে তুলেছে বিভ্রান্ত। শরৎচন্দ্র ইন্দুমতীর কঠোর দর্পিত নারীত্বের ভিত্তিকে আন্দোলিত করতে কতকগুলি কঠিন আঘাতের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। ইন্দুমতীর প্রকৃত নারী-প্রকৃতির জাগরণ ঘটাতে সমগ্র কাহিনী-ভাগে যে প্রস্তুতির সজ্জা লক্ষ্য করা যায়, তাতে দেখা যায় শরৎ-সাহিত্যে নারী শক্তিরই একটি প্রতিকূল অবস্থার মোহভঙ্গের চেষ্টা।

নরেন্দ্রের কঠিন অসুখের খবর ইন্দুমতী না জানতে পারায় প্রথম আঘাত সে পেয়েছে—"কেন সে কি কেহ নয় যে এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল অথচ তাহাকে জানান পর্যন্ত হইল না।" স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইন্দুমতীর অকস্মাৎ সচেতনতায় নরেন্দ্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এবার নরেন্দ্রের দিক থেকেও অন্য-প্রকার ব্যবহার ইন্দুমতী পেয়েছে। নরেন্দ্রের কাছ থেকে শুনেছে কটু কথা, পেয়েছে বিরক্তিপূর্ণ ব্যবহার। মেয়ের গলায় পেতলের হার নিয়ে যেদিন বিমলার সম্মুখে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়—সেদিন নরেন্দ্র স্ত্রীর প্রতি তার মনোভাব বিমলার কাছে প্রকাশ করেছে স্পষ্টভাবে—"যে দুঃখে বাপ হ'য়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েছি সে তুই কি বুঝবি। তবুও মেয়েকে ঠকাতে পেরেছি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।"—কিন্তু ইন্দুমতী ঠকেছিলো স্বামী-প্রেমে বঞ্চিত হ'য়ে—যে গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল বিমলা এবং অম্বিকাবাবুর স্ত্রী। এবার কিন্তু নরেন্দ্রের 'দুঃসাহস'ই ইন্দুমতীর দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিয়েছে। ইন্দুমতীর সান্নিধ্যও যে নরেন্দ্র পছন্দ করে না, রোগে স্ত্রীর সেবা স্পর্শও যে নরেন্দ্রের

কাছে সুখদায়ক নয় একথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতীর "অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষার স্তূপ" বিগলিত হ'তে শুরু করেছে।

বিমলা চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে ইন্দুমতীর দ্বন্দ্ববহুল জীবনকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্য। কারণ নরেন্দ্রের দিক থেকে ইন্দুমতী নিজেকে স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বিমলা ইন্দুমতীর মঙ্গলকামী; ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছিল ব'লেই বিমলার 'খরতপ্ত' কথাগুলি ইন্দুমতীর অন্তরে সর্বদা ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাই সে আত্ম-সচেতন হ'য়ে যখন দেখেছে—"এত কাদামাটি-আবর্জনা—এত কর্কশ কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়াছিল, তাহা সেত স্বপ্নেও ভাবে নাই।"—একথা ভাববার সুযোগ বিমলার আগমনেই সম্ভব হয়েছে, কারণ উভয়ের সখিত্ব ছিল অত্যন্ত গভীর। নরেন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভালবাসা হারিয়ে ফেল্‌ছিল ব'লে বিমলা যতই ইন্দুমতীকে সাবধান করেছে, ইন্দুমতীর তাতে ক্রমশঃ বহুদিনের সঞ্চিত অভিমান এবং দর্পের আবরণ খসে পড়েছে। স্বামী-প্রেমের স্বরূপ তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে সাংসারিক ব্যাপারে গগনবাবু এবং অম্বিকাবাবুর নিজেদের স্ত্রীর কাছে অনুমতি প্রার্থনার ঘটনা দু'টিতে—"স্বামীদের প্রশ্নগুলিতেও সে বেশী প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী দু'টির আদেশগুলিও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। ...কেবলই মনে হইতে লাগিল কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।"

নরেন্দ্র মনে মনে স্ত্রীকে যত ভালবেসে থাকুক না কেন এবং ইন্দুর কাছ থেকে যত দুঃখই পাক না কেন, সে যে-জাতীয় চরিত্রের পুরুষ তাতে দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিরোধ না ঘটে উপায় নেই। পুরুষের আত্মসমর্পণ নারীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জনের পরিপন্থী। তাই শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রের পুরুষোচিত মনোভাবই ইন্দুমতীকে স্বস্থানে স্থাপন করেছে, যার প্রধান সহায়ক বিমলা। ইন্দুমতী শেষবার বাপের বাড়ী গিয়ে বুঝেছে—"তাঁর অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা...কিন্তু ইহাকে

এত যে ভয়ানক লজ্জা,...ভ্রূণহত্যা নরহত্যার মত এ যে কেবলই লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারও কাছে স্বীকার করা যায় না স্বামী ভালবাসেন না?"—তাই বিমলা যখন ইন্দুকে বলেছে "অনেক সুখই ত তুমি তাকে দিলে, এবার মুক্তি দাও"—ইন্দুমতী এবার নিজে মুক্তি পেয়েছে তার অভিমান এবং দর্প থেকে। সেইজন্যই স্বামী-প্রেমে নিজেকে বন্ধনগ্রস্ত করবার আশায় নিজে নত হ'য়ে ভিখারিণীর মতো স্বামীর সঙ্গে মিলিত হ'তে চলেছে। আত্ম-দর্প চূর্ণ ক'রে ইন্দুমতী তার হারানো প্রেম খুঁজে পেয়েছে—"যা এতদিন আমাকে আলাদা ক'রে রেখেছিলো, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে আমি নিজের স্থান নিতে চল্লুম"—কারণ বিমলা যে তার প্রকৃতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী, প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়। বিমলার আকুল কামনাই যেন নরেন্দ্র-ইন্দুমতীর জীবনের অভিশাপ-মুক্তি ঘটিয়েছে।

উপসংহার

"দর্পচূর্ণ" গল্পটি শরৎচন্দ্রের গল্পসমষ্টির মধ্যে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্য পূর্ণ গল্প তাতে সন্দেহ নেই। ছোট গল্পের আঙ্গিকে নর-নারীর জীবন-সমস্যার একটি দুরূহ দিকের সমাধান শরৎচন্দ্র এখানে দিতে চেষ্টা করেছেন। নরনারীর প্রেম প্রকৃতির ওপর ভিত্তি ক'রে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মানস এখানে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাই সমালোচক অপেক্ষা স্রষ্টার আসনেই তাঁকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবিষ্ট থাকতে হয়েছে। নরেন্দ্র এবং ইন্দুমতীর দ্বন্দ্ববহুল চিত্রাঙ্কনে তাই শরৎ-চন্দ্রের সাফল্য তাঁর উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবকে অতিক্রম করেছে অনেক ক্ষেত্রে।

'দর্পচূর্ণ' গল্পটির যা কিছু ত্রুটি তা শরৎচন্দ্রের ইন্দুমতী চরিত্র পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি-বাহুল্যে। এ সব ক্ষেত্রে আরও কিছু পরিমাণে সামঞ্জস্য স্থাপন করলে বোধ হয় গল্পটির সুসঙ্গতি এবং সুষ্ঠুরূপ আমাদের কাছে প্রতীয়মান হ'তো। সংলাপের দীর্ঘতা এই গল্পের আর একটি ত্রুটি। বিমলা এবং ইন্দুমতীর কথোপকথন আরও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার পরিমিত বর্ণনা এই গল্পের নিখুঁত বৈশিষ্ট্য। বিমলার উপদেশ, অম্বিকাবাবুর

পরিবারের পরিচয় কাহিনীকে অনেক সময় ভারাক্রান্ত করেছে ব'লে মনে হয়।

'দর্পচূর্ণ' গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কাশীনাথ-কমলার সমস্যাকেই আর একটি নূতনতর সংস্করণে রূপায়িত করা। সুতরাং শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির যে ধারাটি 'উদ্বোধন-পর্ব' থেকে ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে চ'লে এসেছে, 'নব-জাগরণ-পর্ব' পর্যন্ত তার স্পষ্টতর প্রকাশ দেখা যায় 'দর্পচূর্ণ' গল্পটিতেও।

(৮)

বৈকুণ্ঠের উইল

নামকরণের সার্থকতা

"বৈকুণ্ঠের উইল" নামকরণটি আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হ'লেও শরৎচন্দ্রের প্রবণতার পরিচয় এই নামের মধ্যে পাওয়া যায়। বিনোদকে বঞ্চিত ক'রে যখন তার মা ভবানী সপত্নী-পুত্র গোকুলকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে বৈকুণ্ঠকে অনুরোধ জানালেন, তখন বৈকুণ্ঠও বুঝেছিলেন, গোকুলের নামে এই উইল ক'রে যাওয়া মানে শুধু নিজের সম্পত্তিকেই বাঁচান নয়, বিনোদকেও বাঁচান। বিনোদ অর্থের প্রাচুর্যে ধীরে ধীরে যে পথে নেমে চলেছিলো, যদি গোকুলের নামে উইল করা যায়, হয়তো বিনোদ সুপথে ফিরে আসবে। বৈকুণ্ঠ জানে, গোকুল বিনোদকে বঞ্চিত করবে না। এই ভাবে নিজের কষ্টোপার্জিত সম্পত্তির উইল করার মধ্যে বৈকুণ্ঠের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানী যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ভবিষ্যতে তা আশীর্বাদরূপে ফিরে এসেছে। সম্পত্তির সমান বণ্টনে হয়তো দুই ভায়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটে যেতো—বৈকুণ্ঠের এই উইল করার জন্য তা সম্ভব হ'লো না। গল্পের নামকরণের মধ্যেই উইলের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই উইলকে কেন্দ্র ক'রেই বিবাদ আবর্তিত এবং শেষে মিলনমূলক পরিণতি (happy ending) হওয়া সম্ভব হ'লো।

আঙ্গিক বিচার

তেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত "বৈকুণ্ঠের উইল" ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমে চরিত্রের দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, প্রধান চরিত্রগুলি অপরিবর্তিত। গোকুল চরিত্রটিকে প্রথমে যে রূপে পাই, তা হচ্ছে সত্যবাদিতা এবং সাধুতার রূপ-বিগ্রহ। গোকুলের ভ্রাতৃ-স্নেহ, মাতৃভক্তি, ঔদার্য অথচ রুক্ষ স্বভাব গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে সমাপ্তিতেও অপরিবর্তনীয়রূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। শুধু গোকুল চরিত্রটি নয়, ভবানী, মনোরমা, বাঁড়ুয্যেমশাই, নিমাই রায় চরিত্রগুলিও শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। বিনোদের কাহিনী-সমাপ্তির সন্ধিক্ষণে পরিবর্তন ঠিক চরিত্রগত নয়, ঘটনাগত। এই গল্পে গোকুল চরিত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যান্য চরিত্রগুলি এসেছে গোকুলকেই ফুটিয়ে তুলতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চরিত্রের দিক দিয়ে 'বৈকুণ্ঠের উইল' সার্থক ছোটগল্পের সমগোত্রীয়।

এবার ঘটনার দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে, এটি কতদূর ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের দোকান যখন ঝড়ঝাপ্‌টা সহ্য করেও টিকে রইল, সেখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। রচনাশৈলীর দিক দিয়ে এই প্রারম্ভ ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্ধারিত। এরপর বালক গোকুল ও বিনোদের প্রকৃতিগত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে ভবানীর সঙ্গে বাঁড়ুয্যে-মশাইয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে। শরৎচন্দ্র প্রথম পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনী গ্রন্থন করতে পারেননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়েছে দশ বছর অতিবাহিত হ'য়ে যাবার পর। বৈকুণ্ঠের দোকান প্রকাণ্ড গোলদারী দোকানে পরিণত হয়েছে। ছোট গোকুল ও বিনোদ বড় হ'য়ে উঠেছে এবং বিনোদ ক'লকাতায় এম্. এ. পড়তে গেছে। গোকুল দোকানের উন্নতিতে নিজেকে ছোট থেকেই লাগিয়েছে। এই পরিচ্ছেদেই কাহিনীতে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই সমস্ত গল্পটি রচিত। এখানে বৈকুণ্ঠের মৃত্যুশয্যায় ভবানী

নিজপুত্র বিনোদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা শুনে সপত্নী-পুত্র গোকুলের নামে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে স্বামীকে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সাক্ষী স্বরূপ নিজে উইলে নাম সই করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে গোকুলের যে প্রকৃতির পরিচয় পাই, কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত তা অটুট আছে। বিনোদের প্রতি গোকুলের স্নেহপ্রবণতার পরিচয় বিভিন্নভাবে এই পরিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে 'বৈকুণ্ঠের উইল' কাহিনীর দ্বন্দ্ব-প্রবণ গতির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গোকুলের স্ত্রী মনোরমার কুটিল দুরভিসন্ধির ফলে গোকুল এবং ভবানীর মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মিথ্যা অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। গোকুলের শিশুসুলভ সারল্যের সুযোগ গ্রহণ ক'রে একদিকে মনোরমা তার স্বার্থসিদ্ধির চরম সাফল্যলাভে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে, অন্যদিকে গোকুলের সামঞ্জস্যহীন অপ্রিয় মন্তব্যে ভবানী অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হ'তে থাকেন। শুধু তাই নয়, মনোরমার প্ররোচনায় গোকুলের সঙ্গে ভবানীর একটা মৌখিক সংঘাতও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঘটে যায়। তার ফলে ভবানী যতই সংসার থেকে, এমন কি বৈকুণ্ঠের শ্রাদ্ধ-ঘটিত ব্যাপার থেকেও নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন, গোকুলও নিজেকে অসহায় ভেবে মায়ের প্রতি অভিমানবশতঃ স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

একদিকে পিতৃবিয়োগ, অন্যদিকে ভ্রাতৃ-স্নেহ এবং মায়ের ঔদাসীন্য গোকুলকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। তার ওপর স্ত্রীর নিত্য-কুটিল চক্রান্তে গোকুল একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অবশেষে বিনোদের আগমনে গোকুল চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পরিচয় নিয়ে সপ্তম এবং অষ্টম পরিচ্ছেদ দু'টি পরিস্ফুট হয়েছে। এখান থেকেই গোকুল ভবানী এবং বিনোদের নির্লিপ্ততায় অপ্রকৃতস্থ হ'য়ে উঠতে থাকে। শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মূল কাহিনীটি যখন গোকুল-ভবানী-বিনোদ-মনোরমার স্ব স্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আবর্তিত হ'তে থাকে, তখন নবম পরিচ্ছেদে গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায়ের আবির্ভাবে কাহিনীগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। এই অংশে গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের আঙ্গিক-পরিকল্পনার

করতে পারেনি যে, "আর যাই হোক লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না।" বৈকুণ্ঠের সত্যনিষ্ঠার উত্তর-অধিকারী হয়েছিল গোকুল ; তাঁর গোকুলকে দীক্ষা দেবার এই ছিল মূলমন্ত্র—"এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখ কষ্টও পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্যাদাটুকু বজায় রাখিস্ বাবা।"

বাঁড়ুয্যেমশাই

মনুষ্য সমাজে শৃগাল-চরিত্র-বিশিষ্ট একজাতীয় লোকের আবির্ভাব দেখা যায়। স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করতে এই সব চরিত্রের লোকেরা যেমন তৎপর, আবার সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অনিষ্টসাধনে এরা তেমনি যত্নশীল। শরৎ-সাহিত্যের গল্প-পর্যায়ে এরূপ নিরঙ্কুশ শঠ-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য প্রথম প্রকাশ বাঁড়ুয্যেমশাই, যার সমগোত্রীয় গোলক চাটুয্যে এবং বেণী ঘোষাল ইত্যাদি চরিত্র। স্বার্থপরায়ণ পুরুষ-চরিত্র শরৎচন্দ্র খুব বেশী চিত্রিত করেননি ; কারণ তাঁর দৃষ্টিতে পুরুষ আত্মভোলা নির্লিপ্ত জীব। সেজন্যই বাঁড়ুয্যেমশাই চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্রের ধারায় ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

শিক্ষকতার মতো গুরু দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেও তিনি গোকুল প্রভৃতি শিশুদের অকল্যাণকর পথ অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'তে উৎসাহিত করেছেন। নানাপ্রকার কঠিন কথায় শিশু-মনে আঘাত দিতে বাঁড়ুয্যেমশাই কখনো পশ্চাৎপদ হননি। প্রাপ্তবয়স্ক গোকুলের সরলতার সুযোগ নিয়ে তিনি প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন ; অথচ গোকুলকে তিনি তার শৈশব থেকেই বিষদৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। কুটিল চক্রান্তকারী বাঁড়ুয্যেমশাই নিমাই রায়ের সহযোগিতা করতে এসে এক সময়ে গোকুলের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে ওঠেন। আবার এই বাঁড়ুয্যেই ভবানীর বৈশাখ-সংক্রান্তি উদ্‌যাপনে বিনোদের পক্ষ সমর্থন করবার প্রয়াসে গোকুলকে সর্বসমক্ষে অপমান করেন। এমন কি বিনোদকে গোকুলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত ক'রে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হননি। অপর

পরিবারের এই দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে বাঁড়ুয্যেমশাই-জাতীয় চরিত্রের ঈর্ষা-পরায়ণতা চরিতার্থ হবার সুযোগ পায়। ব্যক্তিগত লাভালাভের চিন্তা ছাড়াও বাঁড়ুয্যে অপরের অনিষ্টকল্পে তৎপর। সামাজিক জীবনের কণ্টক-স্বরূপ এই চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্র নিখুঁত রূপায়ণে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই সব ক্ষুদ্রাশয়েরা মহদাশয়ের সম্মুখে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর মনে করে ব'লেই মহৎপ্রাণগুলিকে নির্জীব ক'রে রাখতে চায়। অজ্ঞতার ধর্মই এই, বিজ্ঞতাকে বাগে পেয়ে পীড়ন করা।

নিমাই রায়

নিমাই রায় বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের প্রায় সমকক্ষ হ'লেও সম্পূর্ণাংশে নয়। সে অর্থশালী জামাইয়ের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন ক'রে ভোগসুখে নিমজ্জিত হ'তে চেয়েছিলো। তবে নিমাই রায় প্রভৃতি অতিমাত্রায় স্বার্থপর ব্যক্তিদের চরিত্রে লোভের প্রাবল্য তাদের নীচ এবং হীন কার্যে প্রবৃত্ত করায়। বাক্য-প্রয়োগ-কৌশলে নিমাই রায় অসাধারণ; কিন্তু গোকুলের নীরবতার কাছে তা প্রতিহত হয়েছে। কন্যার ব্যাকুল আহ্বানে এবং নিজের সাগ্রহ চেষ্টায় নিমাই রায় "নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া" সশরীরে জামাইয়ের জটিল অবস্থাপূর্ণ সংসারের হাল ধরতে চাইলো। কিন্তু 'স্নিগ্ধ গম্ভীর হাস্যে' এবং আন্তরিকতার ভানে শেষ পর্যন্ত সে গোকুলের সর্বস্ব আত্মসাৎ করতে পারেনি। কি জানি কেন গোকুল এত বড় মুরুব্বি শ্বশুরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলো না। সরল এবং সহজ পন্থীরা শত্রুপক্ষদের যেমন সন্দেহ করতে শেখে, ভুঁইফোড় মিত্রপক্ষীয়দের প্রতিও তাদের অবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর-ভাবে দেখা দেয়। তাই 'বিন্দুপাড়া'র নিমাই রায়ও গোকুলের মতো সরল প্রকৃতির কাছ থেকে "বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার" গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। এমনকি বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের মতো কুচক্রীর সাহচর্যও এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু জামাইয়ের বিশাল সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবার লোভটুকু কুণ্ডুদের ঐশ্বর্যপূর্ণ আড়তের আকর্ষণ থেকে নিমাই রায়কে

স্থানচ্যুত করতে পারেনি। চক্রবর্তীকে কেন্দ্র ক'রে ভবানীর আদেশ পালন করতে বাধ্য হওয়ায় নিমাই রায়কে প্রথম অপমানিত হ'তে হয়েছিল। "ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য" যে কাজ গোকুলের সযত্ন লালিত বিষয়-সম্পত্তির লোভে সেই নিমাই রায় বিড়াল-তপস্বী হ'য়ে কন্যা-জামাতাকে কিছুতেই যেন অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারলো না। নীরব কর্মী হ'য়ে শেষ পর্যন্ত নিমাই রায় ভবানী এবং বিনোদকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করলেও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কোন আশাই তার সফল হয়নি। "সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেম্‌নি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা পারেনি। গোকুলকে ক্রমশঃ উত্যক্ত ক'রে তোলবার ফলে নিমাই রায় জামাতার কাছেই চরমভাবে অসম্মানিত হয়েছে; কিন্তু 'যে সয় সে রয়'—কথাটি এ ক্ষেত্রে বেশ প্রযোজ্য ব'লেই বলা যেতে পারে যে, ধৈর্যশীল নিমাই রায় আশা ত্যাগ তখনও করেনি। তাই শেষ মুহূর্তে গোকুলের অতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভয়ে সব চেয়ে বেশী ব্যাকুল হয়েছে নিমাই রায়—তার মতো কৌশলীর পক্ষে এ গভীর পরাজয়েরই নামান্তর।

মনোরমা

শরৎ-সাহিত্যে কুটিল চরিত্র-বিশিষ্টাদের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী মনোরমা অন্যতমা এবং নিমাই রায়ের কন্যা হিসেবে দুর্নীতি-পরায়ণতার যথার্থ উত্তর-অধিকারিণী। হরকালী, দিগম্বরী, এলোকেশী এবং নয়নতারা প্রভৃতি চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট ধারা এখানে মনোরমাকে কেন্দ্র ক'রে নূতনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মনোরমা চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে 'দেবদাসে'র বউদি এবং পার্বতীর বড় পুত্রবধূর চরিত্রের কথা মনে পড়ে। পার্বতীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলো তার পুত্রবধূ এবং ভবানীর বিরুদ্ধে বিষোদগার তুলেছে মনোরমা। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামীকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হ'তে দেখে মনোরমার অন্তরের ঈর্ষাপরায়ণ কুটিলতা কুণ্ডলাকৃতি নির্জীবতা পরিত্যাগ ক'রে

বিপক্ষকে দংশনে প্রবৃত্ত হয়েছে। মনোরমার প্রথম আত্মপরিচয়েই ভবানী স্তম্ভিত হয়েছিলেন। পিতৃভক্ত কন্যা মনোরমা পিতার সহায়তায় সমস্ত ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে চেয়েছে; কারণ গোকুলের ওপর তার ভরসাই ছিল না। কিন্তু পিতা এবং কন্যার যুক্তসাধনা গোকুলের নির্লিপ্ততার কাছে ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে। অবশ্য পিতা অপেক্ষা মনোরমা আরও করিৎকর্মা। তার ক্রমাগত কঠিন এবং অপমানসূচক বাক্যবাণে ভবানী বিনোদকে নিয়ে পৃথক্ বাড়ীতে যেতে বাধ্য হ'লেন। গোকুলকে মুহূর্তের জন্যও মনোরমা নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়নি। মিথ্যার সহায়তায় মিথ্যা দ্বন্দ্বে পারিবারিক জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলতে গিয়ে মনোরমার সযত্ন কল্পনা ধূলিসাৎ হয়েছে। মনোরমার দুর্ভাগ্য যে, সে গোকুলের মতো শিব-প্রতিম স্বামীকে চিনতে পারেনি। স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে সে স্বামীরই অমঙ্গলের পথ সুগম করেছে। কাহিনীর শেষভাগে মনোরমাকে আর আমরা পাইনি, প্রয়োজনও ছিল না। হয়তো মনোরমা নিজের অবস্থা উপলব্ধি ক'রে ততক্ষণে আত্মবিবরে আত্মরক্ষা করেছে; কারণ বিষ-দাঁত তার ভেঙ্গেছে গোকুলের একনিষ্ঠ সত্যপালনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

উপসংহার

"বৈকুণ্ঠের উইল" শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প পর্যায়ের সার্থক সৃষ্টি। আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে, চরিত্র-পরিকল্পনায় এবং রচনাবৈগুণ্যে "বৈকুণ্ঠের উইল" গ্রন্থটিকে 'জাগরণ পর্বে'র প্রথম শ্রেণীর রচনাভুক্ত করা যেতে পারে। গল্পাংশে নূতনত্বদান করবার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র চরিত্র-চিত্রণেও নূতন বৈশিষ্ট্যদান করেছেন। পারিবারিক জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ের একটি অধ্যায়কে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন করেছেন শরৎচন্দ্র। মাতা, পুত্র এবং সপত্নী-পুত্র সম্পর্কের মধ্যে যে চিরন্তন অপ্রীতিকর সমস্যার উদ্ভাবনা দেখা যায়, তারই একটি আবরণ উন্মোচিত হয়েছে "বৈকুণ্ঠের উইল" গ্রন্থে।

কাহিনীর বিস্তৃতি আখ্যানভাগের সীমাবদ্ধতায় বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়েনি।

বর্ণনাভঙ্গীর সজীব চমৎকৃতি শরৎচন্দ্রের এই অধ্যায়ের পরিণতির বলিষ্ঠ প্রমাণ। "বৈকুণ্ঠের উইলে"র আর একটি প্রধান গুণ পূর্বাপর কৌতূহল বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া। পাঠক-চিত্তে একটা তন্ময় পরিস্থিতি এনে কাহিনী সমাপ্তিলাভ করেছে। রচনা-সৌষ্ঠব দান করতে শিল্পীর বিভিন্ন উপাদান প্রয়োগেও সিদ্ধহস্ত হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সেরূপ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। উপমা-প্রয়োগে এবং ব্যঙ্গ রচনা-কৌশলেও যথেষ্ট পরিণত লেখনীর চিহ্ন পাওয়া যায়।

উপরি-উদ্ধৃত লক্ষণ থেকে এই প্রমাণিত হয়, শরৎচন্দ্র স্রষ্টার আবেশ মুহূর্তের সুযোগ এখানে সুন্দরভাবেই গ্রহণ করেছেন। তাই স্বাভাবিকত্ব এখানে সর্বাংশে রক্ষিত হয়েছে। সমালোচকের ভূমিকা থেকে এই গল্পে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

(৯)

নিষ্কৃতি

নামকরণের সার্থকতা

"নিষ্কৃতি" গল্পের নামকরণে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ সত্য আত্মগোপন করেছে। ভবানীপুরের চাটুজ্জে-বংশের একান্নবর্তী পরিবারে যথাক্রমে গিরীশ, হরিশ ও রমেশ এবং সিদ্ধেশ্বরী, নয়নতারা ও শৈলজার চরিত্র-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশঃ যে একটি জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছিলো, তা থেকে সকলেই নিষ্কৃতি চেয়েছিলো। কিন্তু নিষ্কৃতিলাভের স্বরূপটি বিধাতার রহস্যময় খেয়ালের দ্বারা কি অপূর্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো, "নিষ্কৃতি" গল্পের প্রকৃত পরিচয়-বৈশিষ্ট্য সেখানেই।

বড়জা সিদ্ধেশ্বরী শৈলজার প্রতি স্নেহের অভিমানে যখন পারিবারিক সমস্যার কোন সমাধানই খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি অসহায়ভাবে নয়নতারার দুরভিসন্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু আহত স্নেহের বন্ধন থেকে

তিনি কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পেলেন না। হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বড়জার কাছ থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটি হস্তগত করতে যেমন তৎপর হ'লো, অন্যদিকে স্বামী হরিশ রমেশের নামে মামলা চালিয়ে তাকে পথের ভিখারী করতে উদ্যত হ'লো; কারণ তাদের ধারণায় সংসারে স্বার্থবোধটুকুকে রক্ষা করতে প্রতিকূল অবস্থার ক্ষতিসাধন করলেই সত্যকার নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শৈলজা অঙ্গের শেষ অলঙ্কারটি নিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো তার স্বামী-পুত্রের দুর্ভোগ মুক্তির জন্য। দেব-প্রতিম ভাশুর গিরীশ শৈলর লাঞ্ছিত জীবনে নিষ্কৃতির পথ অবারিত ক'রে দিলেন সমস্ত পরিবারের ভবিষ্যৎ দায়িত্বের বন্ধনে তাকে অলঙ্কৃত ক'রে। শৈলজার নিষ্কৃতিলাভ কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে তাকে আরও গভীরভাবে বন্ধনগ্রস্ত করলো।

"কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ" গিরীশ চাটুজ্জে-বংশের পারিবারিক সমস্যার জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অশেষ গুণবতী ছোট ভ্রাতৃজায়াকেই মনোনীত করেছিলেন। আত্মভোলা, সংসার-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন গিরীশ খাঁটি রত্ন চিনতেন, কারণ সহজ সরল ব্যক্তির কাছে অকৃত্রিম বস্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়। চাটুজ্জে-বংশের গুরুদায়িত্ব শৈলজার হাতে অর্পণ ক'রে, গিরীশ যে নিষ্কৃতি লাভ করলেন তাতে তাঁর সাংসারিক জ্ঞানের কতখানি পরিচয় ঘটলো জানি না, কিন্তু ত্যাগের পথ দিয়েই যে তিনি পরম সত্যের অনুসরণ ক'রে জীবনে নিষ্কৃতি লাভ করলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামীর মহান্ উদারতাটুকু ধরা পড়েছিলো সিদ্ধেশ্বরীর কাছে। তাই স্বামীর নির্ধারিত কর্তব্য তাঁর স্নেহের ক্ষতকে মুছে দিল। এই চির-উদাসীন মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি দীর্ঘ এক বৎসরের অন্তর্দাহ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

যে অপার আনন্দবোধের মধ্যে দিয়ে পাঠক-মন গল্পের সমাপ্তিতে "নিষ্কৃতি"র স্বাদ অনুভব করে, তা থেকে বঞ্চিত হ'লো হরিশ এবং নয়নতারা।

আঙ্গিক পরিকল্পনা

"নিষ্কৃতি" গল্পটি মূলত ছোটগল্প হ'লেও কয়েক স্থানে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি

লক্ষ্য করা যায়। গল্পটি বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়বে। কাহিনীর সূত্রপাত সম্পূর্ণ উপন্যাসধর্মী। গিরীশ এবং হরিশের পূর্বাবস্থা কি ছিল, তাঁদের পিতার অবস্থা কেমন ছিল—কি ভাবে তাঁদের সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, শেষে কি ক'রে গিরীশ, হরিশ উকিল হ'য়ে হৃত-সম্পত্তির চতুর্গুণ অর্জন করেছিল, এসব বিষয় ছোটগল্পের বহির্ভূত। ছোটগল্পের পাঠকের কাছে এ শুধু অতিরিক্ত নয়, ত্রুটিপূর্ণ। এর পরের অনুচ্ছেদ থেকেই মূল কাহিনীর সূত্রপাত। সেই প্রসঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী, শৈলজার দীর্ঘ পরিচিতি আরও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

এই পরিচিতি-পর্ব শেষ ক'রে মূল কাহিনী শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট পথ ধ'রে। এই উপন্যাসসুলভ পূর্ব-পরিচিতিতে পাঠক-মনের suspense বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাতে ছোটগল্পের রসের নিবিড়তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সিদ্ধেশ্বরীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র ক'রে একান্নবর্তী পরিবারের সন্তানদের একটি জীবন্ত চিত্র সরসভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজার প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব কোন্ পর্যায়ের, তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। নয়নতারা-হরিশের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত একটি সুখী পরিবারের চিত্র ভেসে উঠেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়েছে হরিশ এবং নয়নতারার চরিত্রগত পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। অতুলের কোটকে কেন্দ্র ক'রে যে ঘটনা ঘটে গেলো, তার দ্বারা কাহিনীর দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করেছে। শৈলজাকে নয়নতারা কোন্ দৃষ্টিতে দেখতো, তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিন জায়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ঘটনারাজির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাওয়ায় আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা সার্থক হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়েছে অতুলের বকুনি খাওয়ার পর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায়। অতুলের একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য যে ঘটনা ঘটে গেল, সেই ঘটনা নিয়েই এই পরিচ্ছেদটি রচিত এবং এখানে কাহিনীর দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

দিন পাঁচেক বাদে নয়নতারা গৃহ পরিত্যাগের উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত এবং তার কারণ-স্বরূপ জানা গেল শৈলজার নির্দেশে বাড়ীর সমস্ত ছেলেরা

অতুলের সঙ্গে অসহযোগিতা (non-co-operation) আরম্ভ করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে নয়নতারা ও শৈলজার মধ্যে সাম্‌নাসাম্‌নি তর্ক হ'য়ে গেল। পরবর্তী ঘটনায় সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলজার প্রতি বিরূপ হ'য়ে ওঠে। এখানে একটা বিষয়ে পাঠক-মনে প্রশ্ন জাগে, অতুলের অন্যান্য ভাই যারা ছিল, তারাও কি শৈলজার নির্দেশ মেনেছিল? সেটা কতদূর স্বাভাবিক? তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত অতুল কাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে কেন্দ্র ক'রেই সংসারে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অতুলের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। এ যেন সংসারে বিপদের সূত্রপাত ঘটিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হওয়া—অতুল কাহিনীতে বিবাদের উপলক্ষ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৫ম পরিচ্ছেদে গিরীশ চরিত্রের সম্পূর্ণ স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং এই পরিচ্ছেদেই কাহিনীতে গিরীশের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। নয়নতারার গতিবিধির চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন, সিদ্ধেশ্বরীর সারল্যের সুযোগ গ্রহণ এবং তার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহার কাহিনীতে যথেষ্ট নাটকীয় রসের সঞ্চার করেছে। অকস্মাৎ শৈলজার প্রতি সিদ্ধেশ্বরীর বিরূপতা এবং বিষোদ্গার কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে। এই পরিচ্ছেদেই রমেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। তা ছাড়া, হরিশের সত্যকার প্রকৃতি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে সিদ্ধেশ্বরীর শৈলজার জন্য আকুলতা তার চরিত্রকে আরও আবেদনশীল ক'রে তুলেছে পাঠকের কাছে। নয়নতারাকে টাকা দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে শৈলজার সিদ্ধেশ্বরীকে চাবি ফেরত দেওয়া এবং সিদ্ধেশ্বরীর প্রত্যক্ষ অভিযোগ ও অভিমান ক্রোধে রূপান্তরিত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৮ম পরিচ্ছেদে সিদ্ধেশ্বরীর শৈল-হীন গৃহে মানসিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষ ক'রে পটল-কানাইয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ, সেই প্রসঙ্গে বাড়ীর সন্তানদের নিয়ে সিদ্ধেশ্বরীর দিন কিভাবে কাটে, তা অত্যন্ত সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। গণেশ চক্রবর্তীর ঘটনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য বক্তব্য প্রকাশের দিক দিয়ে সার্থক।

শেষ পরিচ্ছেদের সূত্রপাত একবছর বাদে। হরিশ-নয়নতারার শৈল-রমেশকে নিঃস্ব করবার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে মামলা দায়ের করা এবং সিদ্ধেশ্বরীর কাছে মিথ্যা বানিয়ে বলা অত্যন্ত নাটকীয় রসের সৃষ্টি করেছে। বিশে মাঘ গিরীশের জ্ঞাতি-কন্যার বিয়ে; বাইশে মোকদ্দমার দিন—এইভাবে অত্যন্ত কৌশলে শরৎচন্দ্র পরিবেশ গড়ে তুলেছেন এবং কাহিনী দ্রুত পদ-বিক্ষেপে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত গিরীশের নিষ্কৃতি লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায় আবিষ্কার শুধু নামকরণকেই সার্থক ক'রে তোলেনি, গিরীশ চরিত্রের মহানুভবতার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর পাঠক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে এবং কাহিনী অপূর্ব রসঘন আকারে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। এইভাবে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ঘটনার বাহুল্যের দ্বারা "নিষ্কৃতি" একটি ঘটনা-প্রধান গল্প হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় কাহিনী বিস্তৃতির দিক দিয়ে যতই বড় হোক না কেন, ছোটগল্পের একটি নবতম সংস্করণ রূপে "নিষ্কৃতি" দেখা দিয়েছে।

চরিত্রের দিক্ দিয়ে বিচার করলেও এখানকার প্রত্যেকটি চরিত্রই অপরিবর্তিত রয়েছে। শৈলজার সংযত, অভিমানী, রাগী-প্রকৃতি, সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহপ্রবণতা, নয়নতারার কুটিলতা ও স্বার্থপরতা, গিরীশের উদাসীনতা ও ঔদার্য, হরিশের নীচতা—প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাহিনীতে দেখা দিয়েছে এবং কাহিনীর উপসংহারেও সেই একই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করেছে। সিদ্ধেশ্বরীর যে ঘন ঘন পরিবর্তন তা নিছক ঘটনাগত বাহ্যিক পরিবর্তন, চরিত্রগত মোটেই নয়। শরৎচন্দ্র বলেছেন বটে, সিদ্ধেশ্বরীর প্রকৃতিটা ঠিক বোঝা যেতো না ব'লে পাড়ায় তাঁর সুখ্যাতি-অখ্যাতি অতিমাত্রায় হ'তো। কিন্তু কাহিনীর কোথাও পাড়ার নিন্দা-প্রকাশের চিহ্নমাত্র নেই।

সিদ্ধেশ্বরী-নয়নতারা-শৈলজার প্রকৃতি বিচার

সিদ্ধেশ্বরী আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন অন্নপূর্ণার পরবর্তী সংস্করণরূপে। সিদ্ধেশ্বরী বা অন্নপূর্ণা আদ্যাশক্তির সেই কল্যাণময়ী নারী-

প্রকৃতি যিনি স্নেহ-ভালবাসা-যত্ন ভিন্ন আর কিছুই জানেন না বা মানেন না। সোহাগই তাঁর কাছে শাসন। গৃহিণার পদে অধিষ্ঠিতা হ'য়েও নিজের পদমর্যাদা নিয়ে মগ্ন থাকা অপেক্ষা সবকিছুর অন্তরালে একটা কমনীয় প্রভাব বিস্তার ক'রে সিদ্ধেশ্বরী বিরাজমানা। এইভাবে ত্যাগের দ্বারা সিদ্ধেশ্বরী সংসারের প্রাণস্বরূপা। তা ছাড়া, বিচার-বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তি দ্বারা সিদ্ধেশ্বরী পরিচালিতা। শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—"বাড়ীতে শাশুড়ী এখনও বাঁচিয়া···কিন্তু বড়বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী।" এই কল্যাণময়ী নারী-প্রকৃতি সিদ্ধেশ্বরী অন্নপূর্ণা অপেক্ষা সংসারের ব্যাপকতায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অন্নপূর্ণা তাঁর ছোট ভাকে স্নেহ করেছেন এবং নিজের পুত্রসন্তানের প্রতি মমত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর সংসার আরও বৃহৎ, কর্তব্য তাই আরও জটিল, হৃদয় তাই আরও বিস্তৃত। শরৎচন্দ্র এই ধারার চূড়ান্ত চরিত্র-চিত্রণ করেছেন সিদ্ধেশ্বরীর মাধ্যমে। "···এ সংসারে তিনি ছেলেপিলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না ; কারণ তাঁহার···বিশ্বাস ছিল, ভগবান ··তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই।"

সিদ্ধেশ্বরী প্রাচীনপন্থী। তাই নিজের ছেলে মণি-হরির প্রতি কর্তব্যপালন ক'রেই তাঁর স্নেহমমতা নিঃশেষিত হ'য়ে যায়নি। তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর ছেলেদের মতো হরিশ এবং রমেশের সন্তানও তাঁর বাড়ীর ছেলে। এখানে ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টি তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। এ দৃষ্টি সিদ্ধেশ্বরী-অন্নপূর্ণা শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যেই সম্ভব, বিন্দু-শৈলজার মধ্যে নয় ; তার কারণ পরে আলোচনা করছি। সিদ্ধেশ্বরীর এই সমষ্টিগত মনোভাব বহু স্থানে তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, যখন নয়নতারা অতুলের প্রতি শৈলজার কটু মন্তব্যে তিক্ত হ'য়ে গৃহত্যাগের উদ্যোগ আয়োজন করেছে, তখন সিদ্ধেশ্বরী জানিয়েছেন—"অতুল আমাদের ছেলে।" এ শুধু সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কথা নয়, মনের দৃঢ় বিশ্বাস। শৈলজা-রমেশের গৃহত্যাগের পর কানাই-পটলকে ফিরে পাবার দাবিতে সিদ্ধেশ্বরীর আচরণ এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। যার জোরে তিনি মামলা করতেও চান, হাকিমকে বোঝাতেও চান—" ··মা

ব'লেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারাণীর কিচ্ছু এমন হুকুম নেই!" তাঁর এ আকুতি মানুষ না বুঝলেও দেবতা বুঝেছেন।

সিদ্ধেশ্বরী ছেলেদের পক্ষ সমর্থন করতেন। যেমন—হরিকে ওষুধ দেবার পক্ষে (১ম পরিঃ), হরিকে কোট করিয়ে দেবার পক্ষে (২য় পরিঃ), অথবা—"…কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না।" বাড়ীর ছেলেদের সমস্ত দায়িত্ব সিদ্ধেশ্বরী নিজের ওপর নিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাদের বড়মাকে ঠিক চিন্‌তো—তাই তাঁর পাশে রাত্রে শোবার জন্য তাদের কলহের অন্ত থাকতো না। প্রথম পরিচ্ছেদে এবং কানাই-পটলের অনুপস্থিতিতে সিদ্ধেশ্বরীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় (৮ম পরিচ্ছেদে) বাড়ীর সন্তানদের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—"গোটা দুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ীর কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। …এ অধিকার কাহাকেও দিতেন না।" এইভাবে প্রত্যেকটি ছেলের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যবস্থা ক'রে তিনি সারারাত্রি তাদের ঠিক করতেই কাটিয়ে দিতেন। তাই তাঁর অসুস্থ অবস্থাতেও কেউ তাঁর কাছ-ছাড়া হয়নি। শৈলর আগমনে (১ম পরিঃ) বিপুল কোলাহলে মগ্ন ছেলেদের দল ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হ'য়ে গেল সিদ্ধেশ্বরীর লেপের তলায়—এ থেকে তাঁর চরিত্রের সহিষ্ণুতারও পরিচয় মেলে। কিন্তু এখানেই তাঁর কর্তব্য শেষ নয়। "বাটির ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না।" এই অংশের সুদীর্ঘ সরস বর্ণনায় সিদ্ধেশ্বরী-চরিত্রের এই দিকের পরিচয় প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। সিদ্ধেশ্বরীর সংসার বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে। তারাই সংসারের প্রাণকেন্দ্র—এই বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বরীকে সংসারে থেকেও সিদ্ধি দান করেছে; তাঁর নামের সার্থকতা এসেছে প্রত্যেকের প্রতি সমান

ব্যবহারে ; স্নেহ-মমতায় সংসারের কুটিল আবর্তকে এড়িয়ে সহজের মাঝে মেতে থাকায়।

কিন্তু সুগৃহিণীর পদবাচ্য। সিদ্ধেশ্বরী নন, কারণ সুগৃহিণী শুধু কোমলই হন্ না, সেইসঙ্গে কঠোরও হ'তে হবে তাঁকে। চরিত্রের এই দৃঢ়তার অভাব সিদ্ধেশ্বরীর মধ্যে একান্ত প্রকট। তাই নিজে সংসার-তরণীর হাল ধরলেও মাঝি করতে হয়েছে শৈলকে। তাঁর চরিত্রের এই দুর্বলতার জন্য সংসারের মধ্যে নয়নতারা ফাটল ধরাতে পেরেছে। অত্যধিক সারল্য সিদ্ধেশ্বরীকে বিপর্যস্ত করেছে জীবনে।

তবে সিদ্ধেশ্বরী সংসার সম্পর্কে উদাসীন হ'লেও অনভিজ্ঞ নন। তার প্রমাণ পাই, নয়নতারা শত মিষ্টি কথাতেও, শত কৌশলজাল বিস্তার ক'রেও সিন্দুকের চাবি হস্তগত করতে পারেনি। এ ব্যাপারে সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত সজাগ এবং শৈলজাকে ভিন্ন আর কারুর হাতে যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে তিনি টাকা কড়ি দিতে পারেননি। তা ছাড়া, নয়নতারা শৈলজার বিরুদ্ধে তাঁকে যতই উত্তেজিত করেছে, শৈলর প্রতি অবিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করেছে, তার ফল দাঁড়িয়েছে বিপরীত—"....স্বার্থের জন্য নিরীহলোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না।...সিদ্ধেশ্বরী যে মুহূর্তে ছোট বউয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজ বউকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।" কিন্তু এইভাবে সংসারের ভাঙন যে দ্রুত হয়েছে তার মূলে রয়েছে শৈলর স্বল্পভাষণ।

শরৎচন্দ্র একস্থানে বলেছেন—"সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না।" এই উক্তি কতদূর সিদ্ধেশ্বরী চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, তা বিচার করা দরকার। সিদ্ধেশ্বরীর মন এতদূর সরল, এত স্নেহ-প্রবণ যে, নয়নতারার প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তাই স্নেহের পাত্রী যা বলেছেন, তাই তিনি সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন। একপক্ষ ক্রমাগত শৈলজার বিরুদ্ধে কথা বলেছে,

কিন্তু শৈলজার পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ আসেনি, তাই এটা সম্ভব হয়েছে। এর মূলে রয়েছে শৈলর মিতভাষণ এবং সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ-প্রবণ মনের সরলতা।

কিন্তু যখনই শৈলজা চাবি ফেরৎ দিয়েছে তখনই সিদ্ধেশ্বরী কাঁদতে আরম্ভ করেছেন, চীৎকার ক'রে গালাগাল দিয়েছেন, বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যেতে বলেছেন, 'হরিরনোট' দেবেন এমন কথাও জানিয়েছেন ; আবার যখন বাস্তবিকই শৈলজা বিদায় নিয়েছে, তাদের জন্য প্রাণ কেঁদেছে—গিরীশ যখন গ্রামে জ্ঞাতি-কন্যার বিয়ে দিতে গেছেন তখন শৈলজার সংসারের খোঁজ নিতে বলেছেন। সেই সিদ্ধেশ্বরীই আবার গিরীশের মহানুভবতায় অভিভূত হ'য়ে বলেছেন—"…তুমি যে…সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোন দিন নয়।" এর মূলে হয়তো কানাই-পটলের প্রতি স্নেহাধিক্য, কিন্তু শৈলজা-রমেশের প্রতিও তাঁর স্নেহ কম নয়। শৈলজার প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ উক্তির উল্লেখ কয়েকস্থলে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায়। "…একদণ্ড দেখতে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে…" অথবা শৈলজাকে হরিশ কটূক্তি করলে সিদ্ধেশ্বরী রুক্ষভাবে তার প্রতিবাদ করেছেন, অথবা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সিদ্ধেশ্বরীর আচরণ। কিন্তু শৈলজার প্রতি সিদ্ধেশ্বরীর যে স্নেহ, তা অন্তর্মুখী। বিন্দুর প্রতি অন্নপূর্ণার যে স্নেহ, তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেছে নানা ব্যবহার এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে। রমেশের প্রতি সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, গিরীশের টাকা দেবার ব্যাপারে হরিশ আপত্তি তুললে, তাঁর তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে। তা ছাড়া রমেশের অক্ষমতার ওপর কটাক্ষ করলে শৈল আঘাত পায়, এজন্য তিনি এ সব বিষয় এড়িয়ে যেতে চাইতেন। নিজে গৃহিণী হ'য়েও তিনি শৈলজাকে রীতিমত ভয় করতেন। সত্যকার স্নেহ না করলে অনুগৃহীতকে ভয় ক'রে চলা যায় না। যেখানে নিজের অবস্থিতি (Position) সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, সেখানেই স্নেহের পাত্রীকে ভয় করা যায়। তা ছাড়া এ ঠিক ভয়ের পর্যায়ে পড়ে না, স্নেহের আধিক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। শৈলজা রাগী মানুষ, পাছে উপবাস শুরু করে—এটাই

সর্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার বিষয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভয় করার ভিত্তি স্নেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জায়ে জায়ে কলহে সিদ্ধেশ্বরী মধ্যস্থতা করতে পারেননি—কখনও কেঁদেছেন, কখনও বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন, কখন নীরব থেকেছেন। অতুলকে কেন্দ্র ক'রেই সিদ্ধেশ্বরী প্রথম শৈলজার প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"আমার সংসারে মানিয়ে চলতে না পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও।" কিন্তু একথা বলার উদ্দেশ্য শৈলজাকে তাড়ান নয়, যদি শৈলজার মন নরম হয়; কারণ "ও পক্ষের দোষ যতই হোক্ অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন।"

সিদ্ধেশ্বরী সরল হ'লেও নয়নতারার প্রকৃতিকে যেন মাঝে মাঝে টের পেয়ে যাচ্ছিলেন। নয়নতারা অকস্মাৎ সিদ্ধেশ্বরীর শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে এত অধিক সচেতন হ'য়ে ওঠাতে "সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন।"

সিদ্ধেশ্বরী যে সব কটু তীক্ষ্ণ উক্তি করেছেন, তাঁর অন্যান্য আচরণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। এসব উক্তি যেন একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। কিন্তু অন্তরালে তীক্ষ্ণ উক্তি ক'রেই যখন শৈলজার উপস্থিতি টের পেয়েছেন, তখন তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে, পাছে শৈল আবার উপবাস করে। তাই নীলাকে দিয়ে সে সম্বন্ধে বার বার খবর নিয়েও তিনি যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছিলেন না। গতানুগতিক আচরণের ব্যতিক্রমও যেন অস্বস্তিকর তাঁর কাছে। হয়তো কোন গুরুতর বিপদ আসন্ন হ'য়ে উঠ্ছে—"...তাহার (শৈলর) আচরণে বাড়ীর কেহ কিছুই দেখিতে পায় না। শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্তচিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলর চারিপাশে একটা নির্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঝাপ্সা দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।"

সিদ্ধেশ্বরীর শৈলর প্রতি বিরক্তি যে কতদূর কৃত্রিম এবং আপাত, তার

প্রমাণ পাই শৈল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"আমার এমন ইচ্ছে করেনা যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দু'টি চক্ষের বিষ হ'য়ে গেছে।" পরক্ষণেই নয়নতারার টাকা দেবার ছল ক'রে যে কৌশল-জাল বিস্তার, তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে সিদ্ধেশ্বরীর শৈলকে ডেকে পাঠান, লোহার সিন্দুকে টাকাগুলো তুলে রাখার জন্য—এই দুই আচরণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

শৈলর স্বল্পভাষণ এজন্য যে দায়ী, তা আগেই বলেছি। কারণ শৈলর মুখের একটি কথায় সিদ্ধেশ্বরী যেন বিগলিত হ'য়ে যেতেন, কত আগ্রহ দেখাতেন—সমস্ত অতীতের ব্যবহার যেন এক মুহূর্তে বিস্মৃত হ'য়ে যেতেন। যেমন দেখি নয়নতারার টাকা তুলে রাখার ব্যাপারে শৈল যখন এলো, তখন শৈলর প্রতি আগ্রহ আগের চেয়ে একটু মাত্রাতিরিক্ত। সিদ্ধেশ্বরী বরাবরই নিজের বাক্যে-ব্যবহারে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি, তাই দেখি পরমুহূর্তেই শৈলর প্রতি চুরির অভিযোগ এনে কটূক্তি; অবশ্য এ উক্তি অভিমান-প্রসূত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ নিজের সম্পর্কে শৈলর নির্মম উক্তি সিদ্ধেশ্বরীকে আঘাত দিয়েছে। তাই অভিমানে-ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরী ব্যবহারে ও বাক্যে সামঞ্জস্যবোধ রক্ষা করতে পারেননি।

"লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।" তাই শৈলকে যাত্রা-কালে বাধা দেবার ইচ্ছে থাকলেও নয়নতারার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে তিনি যে গৃহিণী হ'য়েও টাকার অধিকারিণী নন্, অন্য সমস্ত গৃহিণীরা টাকার অধিকারিণী —(নন্দ মিত্তিরের স্ত্রীর অবস্থা) শুনে তিনি আর বাধা দিলেন না। সিদ্ধেশ্বরীর একবারও মনে হ'লো না—"...নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার (শৈলর) হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

শৈল-রমেশকে গৃহ করবার জন্য হরিশ-নয়নতারা মামলা দায়ের করেছিল এবং সিদ্ধেশ্বরীকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর মনও শৈল-বিরোধী ক'রে তুলেছিলো। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর গোপন বাসনা ও কামনার জোরে গিরীশ গ্রামে

গিয়ে মামলার চূড়ান্ত মীমাংসা ক'রে দিয়ে এলেন। এই নারীর নীরব প্রার্থনা যেন ভগবানের দ্বারে গিয়ে আঘাত দিয়েছিল, তাই সিদ্ধেশ্বরীর উদ্যোগই চরম আশীর্বাদরূপে সংসারের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে। গল্প-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মন ভারতীয় নারী-প্রকৃতি, বিশেষতঃ বাঙালী নারী-প্রকৃতির এই বিশেষ প্রকাশের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ সিদ্ধেশ্বরীকে নতি না জানিয়ে পারে না।

শৈলজা এই গল্পে দেখা দিয়েছে সিদ্ধেশ্বরী-চরিত্রের পরিপূরক হিসেবে। শৈলজা বিন্দু-চরিত্রের প্রতিবিম্বন না হ'লেও সমগোত্রীয়া। বিন্দুর মতোই শৈলজা আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্না অর্থাৎ সমষ্টিগত স্বার্থের চেয়েও ব্যষ্টিগত স্বার্থ তার কাছে প্রবল, তবে বিন্দুর মতো তা অত প্রকট হ'য়ে ওঠেনি। অতুলের অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি মনোভাব বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের প্রভাবিত না করতে পারে—সেদিকেই শৈলজার দৃষ্টি অধিক। তাই সোহাগের চেয়ে শাসনই শৈলজার কাছে প্রাথমিক কর্তব্য। বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সে পরিচালিত, হৃদয়বৃত্তির দ্বারা নয়। এই ভাবে সিদ্ধেশ্বরী-চরিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বে কাহিনী সাবলীল হয়েছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির মূলে রয়েছে নয়নতারা-চরিত্রের সক্রিয়তা। নয়নতারার অবর্তমানে এই সংসারে কোন অশান্তি দেখা দেয়নি। একান্নবর্তী পরিবারের মূলে রয়েছে এক পক্ষের ত্যাগ এবং একজনের আধিপত্য স্বীকার। সিদ্ধেশ্বরী সংসারের গৃহিণী হ'য়েও শৈলজার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিনা হস্তক্ষেপে। তাই সংসার চলছিল সুষ্ঠুভাবে। শৈলজা প্রকৃতপক্ষে সুগৃহিণী-পদবাচ্যা। তার মধ্যে শুধু কাঠিন্যই ছিল না, কোমলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সে শুধু কর্তব্যপালনই করেনি, শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্নেহও অপ্রতুল ছিল না তার মধ্যে।

শৈলজা সংসারের কর্তব্য যথারীতি পালন ক'রে যেতো কিন্তু তাকে বেশী কথা বলতে দেখা যায়নি। বিন্দু-চরিত্রের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। বিন্দুর অতিভাষণ তাদের সংসারে এনেছে বিপর্যয়, কিন্তু শৈলজার মিত-ভাষণ তাদের সংসারে ধরিয়েছে ভাঙন। কারণ শৈলজা যদি নয়নতারা বিশেষ ক'রে

সিদ্ধেশ্বরীর অভিযোগের বিরুদ্ধে কথা বলতো, তা হ'লে সিদ্ধেশ্বরীর মন এভাবে বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌তো না। শৈলজা যখনই কথা বলেছে, সিদ্ধেশ্বরী কোনও ক্ষেত্রেই বিরক্তি বা ক্রোধের পরিচয় দেননি। তাই মনে হয়, সংসারের ভাঙনের মূলে শুধু নয়নতারার বিষোদ্গারই একমাত্র কারণ নয়, শৈলজার মিত-ভাষণও অনেকাংশে দায়ী। অন্নপূর্ণার তুলনায় বিন্দু ধনী, শুধু পিতৃকুলে নয়, স্বামীর দিক দিয়েও। কিন্তু 'নিষ্কৃতি' গল্পে ঠিক বিপরীত ধরণের চিত্র পাই। বিন্দুর মধ্যে তেজস্বিতা ছিল, শৈলজার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল। বিন্দুর তেজস্বিতার মূলে রয়েছে সে ধনীকন্যা, কিন্তু শৈলজার এখানেই দুর্বলতা। তা ছাড়া তার স্বামী রোজগারে অসমর্থ। কিন্তু অভিমান তার বিন্দুর মতোই প্রবল। তাই কোন প্রকার কটুবাক্যেই সে নির্মমভাবে উপবাস আরম্ভ করতো। এই নীরব সহিষ্ণুতা বিন্দু-চরিত্র অপেক্ষা শৈলজার চরিত্রকে আরও মহনীয়তা দান করেছে। তা ছাড়া শৈলজা নীরবে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে নিজ সামর্থ্য দিয়ে অর্থের ক্ষতিপূরণ করেছে।

শৈলজা রমেশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তার সঙ্গে নয়নতারার কেন যে বনিবনা হ'তো না, তার কোনও কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি শরৎচন্দ্র। তবে আমাদের মনে হয়, শৈলজার রাগী-প্রকৃতি ও জেদী-মনোভাব নয়নতারা বরদাস্ত করতে পারতো না। তা ছাড়া নয়নতারার স্বার্থবোধ এবং ঈর্ষা-পরায়ণতা সহ্য করতেই পারে না যে, একজন বিনা অর্থে শুধু সামর্থ্য দিয়ে সংসারের এতখানি প্রধান অংশ গ্রহণ করবে এবং সংসারের পরিচালনায় একমাত্র কর্ণধাররূপে বিরাজ করবে। এজন্যই হয়তো বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী শৈলজাকে মানুষ ক'রে তুলেছেন নিজের হাতে, তাই "ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন —"শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ"। তবে তার রাগের প্রকাশ উপবাসের মাধ্যমে—নিজের কৃচ্ছ্রসাধনায়। তাই সিদ্ধেশ্বরীর উৎকণ্ঠার হেতু হওয়ায় এই পথ ধরে সে সর্বদাই জয়যুক্ত হয়েছে। তার রাগ কখনও

অনাদৃত হয়নি। শৈলজা অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিন্দু অন্নপূর্ণার সঙ্গে যত কথা বলেছে, যত আব্দার প্রকাশ করেছে, শৈলজা সেই তুলনায় কথা বলেছে অত্যন্ত অল্প এবং আব্দারের কথা দু'এক স্থানে ব'লে ফেললেও বিন্দুর মতো আতিশয্য প্রকাশ পায়নি। বিন্দুর চরিত্র-চিত্রণে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, শৈলজা-চরিত্রের দ্বারা শরৎচন্দ্র যেন তা পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে শৈলজার কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কর্তব্য-পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় পাই। কোনও ছেলেকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া বা প্রয়োজনাতিরিক্ত আদর দেওয়া শৈলজা সহ্য করতে পারতো না। তাই দেখি অতুলের কোটকে কেন্দ্র ক'রে তার মা যতই ছেলেকে প্রশ্রয় দিক না কেন, শৈলজার নির্মম ঔদাসীন্যপূর্ণ উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, এই ব্যাপারকে সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। অতুলকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্পর্কে শৈলজা তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছে, যখন তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে—অতুলের অশোভন উক্তির ফলে।

"ছোট খুড়ীমাকে বাড়ীশুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।"—এই মন্তব্যের প্রকাশ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠেছে। ছোট খুড়ীমার 'রাশভারী' মৌনতা, শাসনের পরিমিতিবোধ, স্নেহের বাহ্যিক প্রকাশের স্বল্পতা বাড়ীর ছেলেদের মনে শৈলজা সম্পর্কে একটা ভীতির সঞ্চার করেছিলো। তাই শাসনের বাহ্যিক প্রকাশ যত না ঘটুক, বাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত ছিল, যেটা নবাগত অতুলের মন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। শরৎচন্দ্র বল্‌ছেন—"...ছোট খুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিত না।" অতুল শৈলজাকে নিরীক্ষণ ক'রেই উপলব্ধি করলো, "...এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যাঠাইমারও নয়—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই।" অতুলের একগুঁয়েমি এবং ছোটখুড়ীমার হুকুমকে অস্বীকার

শৈলজাকে ক্রোধে, বিস্ময়ে নির্বাক ক'রে দিয়েছিল এবং সেই "অসহায় অবস্থায়" অকস্মাৎ মণীন্দ্র এসে শৈলজার মর্যাদা রক্ষা করেছে। শৈলজা এই অমর্যাদার শাস্তিস্বরূপ বাড়ীর সমস্ত ছেলেকে হুকুম দিয়েছে অতুলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে।

শৈলজার ভাষণ অত্যন্ত সংযত। নয়নতারার তীক্ষ্ণ কথাতেও সে সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে কথার উত্তর দিয়েছে। শরৎচন্দ্র বলেন, "সত্যকে সে (শৈলজা) আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয় হৌক বা অপ্রিয়ই হৌক বলিতে বা শুনিতে কোনদিনই মুখ ফিরাইত না।" সত্যকে পালন করতে গিয়ে, ন্যায়ের পন্থা অনুসরণ করতে গিয়ে শৈলজাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। তবুও সে পথ থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু স্বামী সম্পর্কে তার দুর্বলতা ছিল। পতিব্রতা শৈলজা স্বামী সম্পর্কে কোনও নিন্দা বা অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করতে পারতো না। সে তাই স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই কানে হাত দিয়ে পালিয়ে যেতো। কারণ সে জানতো রোজগারে অসমর্থ তার স্বামী সম্পর্কে অপ্রিয় আলোচনাই হবে। এই পাতিব্রত্যের প্রকৃতি আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। তাই দেখি শিবের নিন্দে শুনে সতী দেহত্যাগ করেছেন। যদিও মহেশ্বর সম্পর্কে দক্ষ যে সমস্ত উক্তি করেছিলেন, তা আপাতদৃষ্টিতে সত্য ; তবুও সতীর পক্ষে পতিনিন্দা সহ্য করা সম্ভব হয়নি। শৈলজা সতীর মতো তেজস্বিনী, সতীর মতো অভিমানিনী, তাঁর মতোই পাতিব্রত্যে মহীয়সী নারী।

স্বামী সম্পর্কে তার উক্তি পাই একমাত্র শেষ দিকে—"…আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কাল-সার হইতেছেন—" শৈলজাকে তার স্বামীর সঙ্গে একবারও কথা বলতে দেখা যায়নি। এ মৌনতা ক্ষোভের না অভিমানের বা ভীরু মনের তা ঠিক বোঝা যায় না। সিদ্ধেশ্বরীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'তে হ'তে নয়নতারার টাকা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে শৈলজা ব'লে ফেলেছে—"তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগচে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগচে না।" এই প্রথম শৈলজা নিজের বিরুদ্ধ-মনোভাব প্রকাশ করেছে, যে জন্য অভিমানে খাওয়া সে বন্ধ করেনি। অভিমান হয় তখনই, যখন

দু'পক্ষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকে। কিন্তু প্রীতি যখন চলে যেতে চায়, তখন অভিমানের প্রকাশ হয় না। তাই দুঃখ-লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য শৈলজা বিদায় নিয়েছে।

শৈলজার স্বল্প-ভাষণ আমাদের ভবানী চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভবানীর মিতভাষণ এবং নীরব সহিষ্ণুতা গোকুলের সংসারে ট্র্যাজিডি এনেছিলো এবং সংসারে ভাঙন্ ধরিয়েছিলো। যখন ভবানী একবার কথা বলেছেন, গোকুল তা সানন্দে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভবানীর নীরবতার সুযোগ নিয়ে নিমাই রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা সংসারে ভাঙন ধরিয়েছে। 'নিষ্কৃতি' গল্পেও দেখি শৈলজার প্রকৃতি ভবানীর অনুরূপ। তাই দেখি অতিরিক্ত মিতভাষণ বা সহিষ্ণুতাও সংসারে ট্র্যাজিডি আনতে পারে।

নয়নতারা এসেছে কুটিল চরিত্রের ধারা অনুসরণ ক'রে। নয়নতারা শুধু নিজের স্বার্থরক্ষা ক'রেই তৃপ্ত নয়, সে চায় না শৈলজা সিদ্ধেশ্বরীর অনুগ্রহ বা স্নেহ লাভ করে। নিজের স্বার্থে আঘাত না লাগলেও নয়নতারা শৈলজার বিরুদ্ধে সিদ্ধেশ্বরীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছে এবং এইভাবে সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে টাকা দিয়ে সাহায্য করার ফন্দি এঁটেছে এবং এ ব্যাপারকে শ্রীরামচন্দ্রের কাঠবিড়ালের সাহায্য গ্রহণ ব'লে ঘোষণা করেছে, সিদ্ধেশ্বরীর মঙ্গলের জন্য যত্নের ত্রুটি করেনি, শৈলজার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ এনেছে নানা গল্পের অছিলায়, তবুও সে শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

শৈলজার নীরবতাকে নয়নতারা হয়তো ভেবেছে দাম্ভিকতা ; তাই তাকে সে বরদাস্ত করতে পারেনি। শৈলজার বাহ্যিক আবরণ ভেদ ক'রে নয়নতারা তার মনের মণিকোঠার সন্ধান পায়নি ব'লে হয়তো বিবাদ আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

প্রথমেই নয়নতারা আঘাত পেলো সংসারের সিন্দুকের চাবি শৈলজার কাছে আছে এ সংবাদ পেয়ে—"কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।" যখন অতুলের কোটের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি দেখে শৈলজা গম্ভীর

হয়েছিল এবং অতুল সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, তখন নয়নতারা প্রথমেই প্রকাশ্যভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে নয়নতারার সিদ্ধেশ্বরীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছে। তাই একে আতিশয্য বলা যেতে পারে।

নয়নতারা জানে সিদ্ধেশ্বরীকে হাত করতে পারলে সংসারের কর্তৃত্ব সে সহজেই দখল করতে পারবে। তাই সিদ্ধেশ্বরীর মন জুগিয়ে কথা সে সব সময়েই বলেছে, এমনকি সিদ্ধেশ্বরীর কটু বাক্যেও সে ধৈর্য হারায়নি। সিদ্ধেশ্বরীর মনে কিসে আঘাত লাগবে, কোন্ পথে কিভাবে অগ্রসর হ'লে সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েই শৈলজাকে তাড়ান যাবে—এসব ব্যাপারে নয়নতারা সিদ্ধহস্ত। তবু এত ক'রেও নয়নতারা সিন্দুকের চাবি হস্তগত করতে পারেনি এবং স্থায়ী ফল আনবার পথে সে ব্যর্থ হয়েছে। শেষে নয়নতারা স্বামীর সাহচর্যে দেশের বাড়ী থেকে তাদের তাড়াতে চেয়েছে এবং গিরীশ-সিদ্ধেশ্বরী দু'জনকেই ভুল বুঝিয়ে মামলা দায়ের করেছে, কিন্তু পরিণামে সফলতা লাভ করতে পারেনি।

এই শ্রেণীর চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে অপ্রচুর নয়। আমরা হরকালী, দিগম্বরী ইত্যাদি চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু নয়নতারার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যেন আরও কুটিল, আরও ঈর্ষাপরায়ণ ও কদর্য। নিজের স্বার্থ পরিতৃপ্তির চেয়েও পরের অকল্যাণ করাই তার উদ্দেশ্য। এ যেন স্বর্ণমঞ্জরী, রাসমণি চরিত্রেরই প্রতিবিম্বন।

গিরীশ

গিরীশ শ্রেণীর চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। 'উদ্বোধন পর্বে' আমরা সুরেন্দ্রনাথ, কাশীনাথ শ্রেণীর উদাসীন নির্লিপ্ত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। 'জাগরণ পর্বে' এই চরিত্রের ধারায় যাদব-গোকুল-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই দুই চরিত্র শুধু উদাসীন বা সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত নয়, তাদের চরিত্রে ঔদার্যের আধিক্য লক্ষণীয়। গিরীশ-চরিত্রে এই উপাদানগুলি সবই বর্তমান। কিন্তু লেখকের আতিশয্যে গিরীশ কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে

এবং ভোলা মহেশ্বরের প্রতিবিম্বরূপে চিত্রিত হ'তে গিয়ে অসঙ্গত হ'য়ে পড়েছে। গিরীশের আত্ম-পর ভেদাভেদ নেই—নিজে রোজগার করেন, খরচ করে অন্যে।

গিরীশ উকিল, পসার তাঁর যথেষ্ট। বার্ষিক আয় তাঁর বিশ্ পঁচিশ হাজার টাকার কাছাকাছি। এ হেন পসারযুক্ত উকিলের পক্ষে স্ত্রীর কথার উত্তরে অন্যমনস্কতার আধিক্যে অসঙ্গত উত্তর প্রদান তাঁর চরিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে দিয়েছে। গিরীশ-চরিত্রের আবির্ভাব কাহিনীতে হাস্যরস্ সৃষ্টি করবার জন্য। গিরীশকে আমরা কাহিনীর যে কটি অংশে পাই, সেখানকার ঘটনাবলী বা গিরীশের কথাবার্তার সঙ্গে শেষ অংশে গিরীশের বিচক্ষণ কার্যাবলীর মধ্যে শরৎচন্দ্র সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেননি। তাঁর চরিত্রকে প্রথমে যে ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে শেষাংশের কার্যাবলী অধিক সঙ্গত।

শরৎচন্দ্র বলেন—"...গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত মোকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না।" কিন্তু গিরীশের অন্যমনস্কতা চরমরূপে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। যে গিরীশ ওকালতি ক'রে এতো পসার করেছেন, তিনি সিদ্ধেশ্বরীর কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না; রমেশকে এ রকমভাবে বকুনি দেওয়া যতই আপনভোলা প্রকৃতির পরিচয় হোক, কোনমতেই স্বাভাবিক নয়। এরপর হরিশের কথাবার্তায় বিনা দ্বিধায় সায় দেওয়া এবং অকারণ 'পাগলামো', খামখেয়ালীপূর্ণ কথাবার্তা গিরীশকে যতই মহিমান্বিত করুক না কেন, অস্বাভাবিক করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া উকিল হ'য়েও টাকার হিসেবপত্র বা কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার জ্ঞান নেই। গিরীশ তবে কি ব্যাপার নিয়ে মোকদ্দমা করতেন? তা কি বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি বাদে? সপ্তম পরিচ্ছেদে গিরীশের কথাবার্তা বা ব্যবহার সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তিনি যতই উদাসীন হোন না কেন সংলাপের মধ্যে এতো অসঙ্গতি কেন, যার কোন অবস্থাতেই সচেতনতা ফিরে আসতো না? গিরীশ চরিত্রের মহানুভবতা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আমাদের হাস্যরসের জোগান দিয়েছে।

শেষ পরিচ্ছেদে গিরীশের কথাবার্তার মধ্যে যেন স্বাভাবিকত্ব ফিরে এসেছে এবং সত্যকার উদাসীন, নির্লিপ্ত পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে এখানে পাঠকের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। এখানে হরিশের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা উদার হৃদয়ের পরিচয় বহন করে এবং শেষ অংশে "পাকাচুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত, স্নিগ্ধ-সৌম্যমূর্তি" আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কর্তব্য-পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, সংসার পরিচালক, উদার গিরীশ-চরিত্রের মহানুভবতা আমাদের শিব-প্রকৃতির ঔদার্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজে নিঃস্ব হ'য়েও যিনি সর্বস্বদান ক'রেই তৃপ্ত। গিরীশের শেষ কর্তব্য তাঁর বুদ্ধির ও বিবেচনার স্বাক্ষর বহন করে।

গিরীশের প্রকৃতির মধ্যে গোকুল এবং যাদব-চরিত্রের উপাদান রয়েছে। গোকুলের "পাগলামো"-প্রকৃতি গিরীশের মধ্যেও প্রকট। তবে গোকুলের এই স্বভাব চিত্রণের মধ্যে শরৎচন্দ্র পরিমিতিবোধ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পেরেছেন; কিন্তু গিরীশ-চরিত্রে সেইটুকু নষ্ট হয়েছে। যাদবের ঔদাসীন্য অথচ কর্তব্যপরায়ণতা—ধ্বংসোন্মুখ সংসারকে সময়োচিত হস্তক্ষেপে রক্ষা করা, গিরীশ-চরিত্রেও প্রকাশ পেয়েছে। যাদব অন্য সময়ে যথেষ্ট নির্লিপ্ত, কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। গিরীশ-চরিত্র সৃষ্টিতে গোকুল ও যাদব-চরিত্রের মিশ্রণ ঘটলেও পরিমিতিবোধের অভাবে 'মহাদেব', "সাক্ষাৎ ঠাকুর দেবতা" গিরীশ পাঠক-মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে পারেনি।

হরিশ

হরিশ-চরিত্র এই গল্পে গৌণ হ'লেও অপ্রয়োজনীয় নয়, কারণ কাহিনীতে গতিবেগ আনতে হরিশের কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। হরিশ স্বার্থপর এবং কুটিল। নিজের ভালমন্দ সে ভালভাবেই বোঝে এবং সেখানে আঘাত লাগলে তার স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধ পর্যন্ত লোপ পায়।

অতুলকে শাসন এবং প্রহার করা নিয়ে হরিশ শৈলজার কাছে জবাবদিহি

চেয়েছে। কিন্তু সে অত্যন্ত সচেতন এবং হুঁসিয়ার লোক। সিদ্ধেশ্বরীর কথায় সে নিজেকে মুহূর্তেই সংযত ক'রে নিয়েছে।

রমেশ তাদের সংসারে বিনা রোজগারে কালাতিপাত করুক, তা হরিশ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া রমেশ সহোদর না হ'য়েও যে প্রীতি গিরীশ ও সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে পেয়েছে, হরিশ সে তুলনায় নিজের প্রাপ্তিকে সামান্য মনে ক'রে রমেশের প্রতি আরও বিরূপভাব পোষণ করেছে। রমেশের বিরুদ্ধে তার যে প্রধান অভিযোগ, তাকে দূর করতে গিরীশ রমেশকে অর্থ দিতে চাইলে হরিশ সেখানেও আপত্তি তুলেছে, "বার বার এতো টাকা নষ্ট করা তো ঠিক নয়!"

হরিশ ঈর্ষাপরায়ণ। গিরীশের টাকা দেওয়ার ব্যাপারটাকে সে যেন ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। বার বার তাই সে সংশয় তুলেছে— "টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি?" গিরীশের সারল্যের সুযোগ নিয়ে সে গিরীশকে টাকা না দেবার বিপক্ষে নানা পরামর্শ দিয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী রমেশকে টাকা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে হরিশ সহোদরের দোহাই দিয়ে "সংসারের টাকা"-র প্রতি অত্যধিক মমত্ব প্রকাশ করেছে।

নয়নতারার মতামতকে হরিশ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতো। সে ক্ষেত্রে তার ভালমন্দ বিচারের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। শৈলজা এবং রমেশের গৃহত্যাগের পর কানাই-পটলের অনুপস্থিতিতে আকুল হ'য়ে সিদ্ধেশ্বরী যখন হরিশের কাছে উকিলের চিঠি লেখাবার জন্য গেলেন, হরিশ যথেষ্ট পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো, রমেশের ক্ষতিসাধনের সুযোগ হবে জেনে। কিন্তু আসল ব্যাপার জেনে "হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল।"

আত্মভোলা গিরীশের সারল্যের সুযোগ নিয়ে হরিশ রমেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা করেছে। সিদ্ধেশ্বরীর সহানুভূতি পাবার জন্য সে রমেশের ওপর মামলার সমস্ত অভিযোগ চাপিয়েছে এবং মণি-হরি-বিপিন ক্ষুদের ভবিষ্যতের চিন্তায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হরিশ শুধু কৌশলী নয়, সুচতুরও বটে! সে নিজেদের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ

ঔদাসীন্যের ভাব দেখায় এবং নিজের হীনতাকে সুকৌশলে চাপা দিয়ে পরোপকারের অভিনয় করে। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে তার সত্যিকারের স্বরূপ মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। সিদ্ধেশ্বরী যখন রমেশের আশ্রয়ের প্রশ্ন তোলেন, হরিশ তার উত্তরে বলে,—"সে খবরে আমাদের দরকার নেই।" কিন্তু পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সাম্‌লে নেয় রমেশের অকৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে।

হরিশের নীচতা এবং স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যের পরিচয় পাই যখন দেখি, সে রমেশ এবং শৈলজার প্রতি অর্থ সম্বন্ধে হীন কটাক্ষ করেছে। যখন সে জানলো রমেশ গিরীশের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে, তখন সে নিষ্ফল আক্রোশে বলে উঠলো—"আমি একাই দেখছি।" কিন্তু তার সব আশাকে নিষ্ফল ক'রে যখন গিরীশ সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি ক'রে এলেন, তখন হরিশের 'মুখ কালি করা' এবং হা-হুতাশ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। হরিশ-চরিত্রের পরিণতি ঘটেছে 'পরেশ' গল্পের হরিচরণের মধ্যে।

রমেশ

রমেশ চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব পরিলক্ষিত হয়। রমেশ তখনকার দিনে বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও চাকরী পায়নি, সম্পূর্ণ বেকার হ'য়ে বসে আছে—এ ব্যাপার কতদূর স্বাভাবিক পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগবেই।

রমেশ-চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে 'জাগরণ পর্বে'র ছোট ভাই পর্যায়েরই ধারা অনুবর্তন ক'রে চিত্রিত। মাধব, বিনোদ স্বল্পভাষী, দাদার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন অভিযোগ আনেনি, দাদার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। রমেশ-চরিত্রে এই উপাদানগুলি বর্তমান। তার স্বল্পভাষণ হয়তো নিজের অক্ষমতার জন্য। কিন্তু তবুও গিরীশের কাছে টাকা চাইতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। দাদার বকুনি বিনা প্রতিবাদে হজম করেছে। খুড়তুতো ভাই হ'য়েও গিরীশকে সে নিজের ভাই ভেবেছে। হরিশের প্রতি রমেশের কি রকম মনোভাব তার কোন প্রকাশ গল্পের মধ্যে পাই না; তবে তা যে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়, তা অনুমান

করা অন্যায় নয়। শরৎচন্দ্র গল্পের প্রথমে রমেশের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সে দু'তিন বার আইন ফেল ক'রে, ব্যবসায়ে টাকা নষ্ট ক'রে "এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ উদ্ধারে রত হইয়াছিল।" রমেশের ব্যবহারে কোথাও অসংযত উক্তি বা বাচালতা প্রকাশ পায় নি এবং তাকে যে দু'এক স্থানে দেখা গেছে, কোথাও তার এ শ্রেণীর প্রকৃতির পরিচয় নেই। সংসারের কোনও ব্যাপারেই রমেশকে মাথা গলাতে দেখা যেতো না। সে তার দাদার মতোই সংসার সম্পর্কে উদাসীন ছিল। দাদাকে সে ভক্তি করতো যথেষ্ট। সংসার ত্যাগ ক'রে যখন সে চলে যায়, তখন দাদার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, গোপনে কিছুই করেনি। তবে "ছোট ভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহ বিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না।"

একান্নবর্তী পরিবারের জীবনালেখ্য ও তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা

এ কাহিনী যে যুগের সে যুগে একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা বাঙালীর সংসারে সহজেই নজরে পড়তো। তখনকার সংসারের যিনি প্রধান বা পরিচালক তাঁর প্রকৃতি ছিল শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে গঠিত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই সংসারে থেকেও যে সন্ন্যাসী, সেই আদর্শ-পুরুষ। গৃহে থেকে গৃহীর কর্তব্য পালন ক'রেও যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা নিয়ে সংসারের মধ্যে বাস করেন, তিনিই প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ। গিরীশের প্রকৃতি এই আদর্শে গঠিত। শুধু গিরীশ কেন, পূর্ববর্তী যাদব, গোকুল চরিত্রও যেন এই আদর্শেরই প্রতিবিম্ব।

এই শ্রেণীর পুরুষ-প্রকৃতি (ভোগ ও ত্যাগের মিশ্রণে মহাদেব প্রকৃতি) সংসারের কর্ণধাররূপে দেখা দিলে একান্নবর্তী পরিবার সচল হ'তে পারে। কারণ এই শ্রেণীর চরিত্র সংসারের সমস্ত অর্থকরী দায়িত্ব বহন ক'রেও নিজের অস্তিত্ব অন্তরালে রাখতে চান—এইভাবে তাঁরা হ'য়ে উঠেন মহীয়ান্। এঁদের দৃষ্টি ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিগতভাবে অধিক কার্যকরী। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

অপেক্ষা সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি তাঁদের অধিক। এই স্বার্থত্যাগের জন্য সংসার থাকে অটুট। সিদ্ধেশ্বরীর দৃষ্টিভঙ্গীও এই শ্রেণীর। তাই হর-পার্বতীর মতো এই ঔদার্য সংসারকে এক ক'রে রেখেছিল। এঁরা প্রাচীন পন্থী।

কিন্তু নয়নতারা-হরিশ বা শৈলজা আধুনিক মনোভাবাপন্ন। তাই সমষ্টি অপেক্ষা ব্যষ্টির প্রতি তাদের অধিক দৃষ্টি। নয়নতারা নিজের স্বার্থের জন্য নিজের সুখ-সুবিধাকেই চরম স্থান দিয়েছে এবং তাই চেয়েছে সংসারকে ভেঙে দিয়ে শৈলজার আধিপত্য থেকে মুক্ত হ'য়ে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে। শৈলজা সংসারের ছেলেদের মঙ্গলের জন্য অতুলের প্রতি বিরূপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু আধুনিকা ব'লে সে ক্ষমার দ্বারা ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিতে পারেনি বা স্নেহের দ্বারা অতুলকে বশ করতে চেষ্টা করেনি। সংসারে মানিয়ে নিতে পারেনি ব'লে সংসার থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। এই কাহিনীর পূর্বরূপ পাই 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে। বিন্দুর মধ্যে নীচতা নেই, শৈলজার মধ্যেও নেই, তবুও তারা মানিয়ে নিতে পারেনি—এটা যুগ-পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

সংসারের খরচপত্র, সংসারের ছেলেমেয়ে, সংসারের দাসদাসী—সমস্তই একই সংসারের। তারা কখনও পৃথক্ ভাব আনতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান যুগের ভাঙন-পর্বে এই মনোভাব লুপ্তপ্রায়। তাই সিদ্ধেশ্বরী-অন্নপূর্ণার যুগ আজ বিদায় নিতে বসেছে।

শিশু-চরিত্র চিত্রণ

শিশু-চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। শিশু-মনের বিচিত্র চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, তন্ময়তা, চঞ্চলতা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্পে শিশুগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শিশু শব্দটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে শিশু-মনের বিকৃতির চিত্রও পাই কয়েকটি গল্পে।

'নিষ্কৃতি' গল্পে শিশু-চরিত্রগুলি কাহিনীর একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে।

অতুল চরিত্রটি নরেন ('বিন্দুর ছেলে') চরিত্রেরই প্রতিরূপ। পিতামাতার নৈতিক শিক্ষাদানের অভাব ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং অত্যধিক প্রশ্রয় ও আদর পেয়ে নরেনের মতো অতুলও বিকৃত হ'য়ে উঠেছিল। গুরুজনদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে ওঠেনি, কারণ নিজের পিতামাতার কাছ থেকে সে এ শিক্ষা পায়নি, এমনকি নয়নতারাকে পর্যন্ত অতুল অবজ্ঞা করে এবং মুখের ওপর কটু কথা বলতেও ছাড়ে না। সে মণীন্দ্রকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, শৈলজার আদেশকে অগ্রাহ্য করে। সে মনে করে এই অগ্রাহ্য করার মধ্যেই যথার্থ বীরত্ব। অতুলকে নিয়েই কাহিনীতে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে। এই শ্রেণীর শিশু-চরিত্র সংসারের শান্তি হরণ করে, যেমন দেখি 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে নরেন-চরিত্র।

নীলা এই কাহিনীতে দেখা দিয়েছে সংবাদবাহিকা হিসেবে। যখনই ঘটনার মধ্যে কোন সংবাদ দেবার, নেবার বা বলবার প্রয়োজন হয়েছে তখনই নীলা 'কি একটা কাজে' সেই স্থান দিয়ে গেছে অথবা উপস্থিত থেকেছে। এইভাবে নীলা কাহিনীতে যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। নীলা সিদ্ধেশ্বরীর মেয়ে হ'লেও শৈলজার অনুগত এবং শৈলজার বিরুদ্ধে কোন কথাকেই সে সহ্য করতে পারেনি। এ জন্য সিদ্ধেশ্বরী-নয়নতারার বিরুদ্ধেও সে তীব্র মন্তব্য করেছে।

অন্যান্য শিশু-চরিত্রের মধ্যে হরিচরণ, কানাই, পটল উল্লেখযোগ্য। হরিচরণ এদের মধ্যে বয়স্ক এবং মণীন্দ্রের তুলনায় অনেক ছোট। সে খুড়ীমাকে যথেষ্ট ভয় করে ; প্রমাণ পাই 'আনন্দমঠ' পাঠের আগ্রহে ওষুধ দেবার কথা বিস্মৃত হ'লে খুড়ীমার ভয়ে সে তটস্থ। অন্যত্র অতুলের সঙ্গে সমতা বজায় রাখতে গিয়েও খুড়ীমার ডাকে "গাড়ু হাতে বিশেষ স্থানের উদ্দেশ্যে সবেগে প্রস্থান" ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে শিশু-চরিত্রের একটি সরস চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। সমগ্রভাবে শিশু-চরিত্র অঙ্কন ও ঘটনা বর্ণনা, শিশুদের কথাবার্তা, ব্যবহার বেশ বাস্তব সরসতার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ বড়মার ডান-বাঁ-পাশে শোবার সমস্যা নিয়ে বিবাদ বা ৮ম পরিচ্ছেদের ঘটনাবলী শিশু-চরিত্রের বাস্তব

রূপায়ণ এবং শরৎচন্দ্র এখানে প্রথম শ্রেণীর রূপদক্ষের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু-চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে কল্পনার মিশ্রণ অধিক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শিশু-চরিত্র বাস্তবের প্রতিবিম্বন। এতো অধিক স্থান নিয়ে এতো বিচিত্র শিশু-মনের চিত্র চিত্রণ এর আগে শরৎ-সাহিত্যে দেখা যায়নি।

উপসংহার

'নিষ্কৃতি' গল্পের ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিণত লেখনীর চিহ্ন এখানে সুস্পষ্ট। বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে পরিমিতিবোধ এবং স্মিত হাস্যরস ছড়িয়ে সরসভঙ্গীতে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ বর্ণনার সরসতাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু নির্দেশ করা যায় না। হাস্যরস বিশেষতঃ ব্যঙ্গরস এই কাহিনীর বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সিদ্ধেশ্বরী যখন গিরীশের সঙ্গে কথা ব'লে কোন সদুত্তর না পেয়ে আফশোষ করছেন, তখনকার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজের হাস্যরস সৃষ্টির একমাত্র রীতি অনুসরণ ক'রে বর্ণনা করেছেন—"বাপ-মা তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না।" প্রথম পরিচ্ছেদে বাড়ীর ছেলেদের দৃশ্যটি চিত্রিত করতে গিয়ে বা ৮ম পরিচ্ছেদের বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির সুনিপুণ দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র এখানে সমালোচকরূপে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেননি। শুধু নবম পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে শরৎচন্দ্রের একটি বাণী আমরা পাই। এখানকার সংলাপ 'জাগরণ পর্বে'র অন্যান্য রচনার মতোই পরিমিতি-বোধ বজায় রেখে রচিত, ভাবের সুষ্ঠু বাহনরূপে। কোথাও সংলাপ বক্তৃতায় বা বাণীতে পরিণত হয়নি—এটি দক্ষ-শিল্পীর পরিণত লেখনীর পরিচয় বহন করে। ভাষা এখানে ত্রুটিহীন, অলঙ্করণ সুন্দর। উপমা-প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত এবং জীবন-অভিজ্ঞতাজাত, কল্পনাজাত নয়। এখানকার উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ উপমাটি বর্ণনা ক'রে পরে আসল বক্তব্যে তার প্রয়োগ—এ

শ্রেণীর নয়। ছোট ছোট উপমা স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে, বক্তব্যকে আরও আবেদনশীল ক'রে তুলতে।

এ কাহিনীতে শাশুড়ীর উল্লেখ দু'ক্ষেত্রে মাত্র আছে; কিন্তু কোথাও তাঁর সাক্ষাৎ বা সে সম্পর্কে কোন কথা নেই। এইভাবে শাশুড়ীকে সংসারের ওপর রাখার কোনও সার্থকতা নেই। একমাত্র সার্থকতা শৈলজা নিরামিষ দিকের রান্না করতো শাশুড়ীর জন্য; শাশুড়ীর রান্না না থাকলে তার কোন কাজ থাকতো না এদিকে। সেদিক দিয়ে শাশুড়ীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উকিলের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা প্রলোভন আছে এবং উকিল হওয়াই শিক্ষিত ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য—এই মনোভাব একযুগে যে ছিল, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

'বিন্দুর ছেলে'র সঙ্গে 'নিষ্কৃতি'র কাহিনীগত সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট। শৈলজাকে সিদ্ধেশ্বরী মানুষ ক'রে তুলেছেন দশ বছর বয়স থেকে যেমন বিন্দুকে অন্নপূর্ণা করেছেন। তৃতীয়ের আগমন ঘটেছে সংসারে বিবাদের সৃষ্টি করতে (এলোকেশী এবং নয়নতারা), অমূলক বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে দু'জনের মধ্যে (সিদ্ধেশ্বরী-শৈলজা এবং বিন্দু-অন্নপূর্ণা) এবং শেষে মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ছোট ছেলেদের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র সংখ্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, তাই সন্তানদের সংখ্যা একটু মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছে। বিপিন, ক্ষুদের কোনও পরিচয় কাহিনীতে নেই। হরিশ সিদ্ধেশ্বরীকে একবার বলেছে "বড় বৌঠান" আবার "বড়বৌ" ব'লেও সম্বোধন করেছে—এই বৈপরীত্য শরৎচন্দ্রের নজরে পড়া উচিত ছিল। মোট কথা 'নিষ্কৃতি' গল্পটি পূর্ববর্তী গল্পগুলির উপাদান নিয়েই রচিত; কোনরকম অভিনবত্ব কাহিনী-পরিকল্পনায় বা চরিত্র-চিত্রণে দেখা যায় না। 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্পের সমপর্যায়ে 'নিষ্কৃতি' রচনাশৈলীর গুণে শরৎচন্দ্রের সার্থক, উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির অন্যতম।

(১০)

অরক্ষণীয়া

নামকরণের সার্থকতা

"অরক্ষণীয়া" নামকরণের মধ্যে কোনও গভীরতর ব্যঞ্জনা অনুরণিত হয়নি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, যাকে অবিবাহিতা রাখা যায় না অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিতে 'বালিকা' কন্যাকে অনূঢ়া রাখা যে কতখানি গর্হিত, তারই একটি বেদনাদায়ক চিত্র জ্ঞানদা-চরিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার দুঃখময় কাহিনীই এই গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয়। 'জাগরণ পর্বে'র সূচনা থেকে এ পর্যন্ত যে গল্পগুলি আমরা পেয়েছি, তার বেশীর ভাগই পারিবারিক জীবনালেখ্য। 'পথনির্দেশ', 'পরিণীতা', 'আঁধারে আলো', প্রভৃতি গল্পে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত পাই বটে, কিন্তু সে সবক্ষেত্রে নর-নারীর হৃদয়াবেগ অপেক্ষা সামাজিক সমস্যা গৌণ স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া এই গল্পগুলির ঘটনাস্থল সবই কলকাতা বা শহরাঞ্চলে। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র এসব ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন আঁকতে গিয়ে সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে খানিকটা আলোচনা করেছেন মাত্র। কিন্তু শুধুমাত্র গ্রামীণ জীবন যেখানে চিত্রিত হয়েছে, সেখানে সামাজিক সমস্যা অপেক্ষা পারিবারিক জীবন অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। "স্বামী" গল্পের পরিবেশ গ্রাম। এখানে নরেন-সৌদামিনীকে নিয়ে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারতো, শরৎচন্দ্র অতি কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেছেন এবং "স্বামী"কে একটি পারিবারিক জীবন-চিত্র হিসেবে অঙ্কিত করেছেন।

'জাগরণ পর্বে'-র মধ্যে "অরক্ষণীয়া"-ই প্রথম গল্প যেখানে পরিবার অপেক্ষা সমাজ প্রাধান্য পেয়েছে এবং এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ। গ্রামই বাঙলার সমাজ-জীবনের প্রাণকেন্দ্র। শহরকে কেন্দ্র ক'রে কখনও সমাজ গড়ে উঠ্‌তে পারে না; কারণ শহরে ব্যষ্টিগত স্বার্থবোধ অত্যধিক প্রাধান্য পায় এবং সমষ্টিগতরূপে কোনও কিছু স্থিতিশীলভাবে গড়ে উঠ্‌তে

পারে না—শহর-জীবন গতির বেগে চঞ্চল। প্রগতি তাই নাগর-জীবনে। স্ব স্ব প্রাধান্য যেখানে মুখ্য, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিতে সভ্যতা (Civilization) গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি (Culture) গড়ে ওঠে সমষ্টির স্বার্থকে ভিত্তি ক'রে। সমষ্টিগতভাবে জীবনোন্নয়ন যেখানে সক্রিয়, সংস্কৃতির জন্ম সেখানেই। গ্রামীণ "সভ্যতা" সমষ্টিগত স্বার্থ নিয়ে গড়ে ওঠে। সভ্যতা কখনও সত্যকার সমাজের পরিচয় দিতে পারে না; সমাজের পরিচয় মেলে জাতির সংস্কৃতির মধ্যে। তাই বাঙলার গ্রাম্য-জীবনের মধ্যেই প্রকৃত সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতি সমাজমূলা, সভ্যতা রাষ্ট্রমূলা। "অরক্ষণীয়া"র কাহিনী-পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে। যে সমস্যা এখানে প্রধান হ'য়ে উঠেছে তা অতুল-জ্ঞানদার প্রেম-প্রকৃতি অপেক্ষা জ্ঞানদার কুশ্রীতার জন্য তার বিবাহ-সমস্যা। তা ছাড়া এই অরক্ষণীয়া অবস্থায় 'তের বছরে পা দেওয়া' সামাজিক দৃষ্টিতে কতো ভয়াবহ, সেই সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় এখানে রয়েছে। সেজন্য নামকরণের দিক্ দিয়ে "অরক্ষণীয়া" অসার্থক নয়— "...সমাজ আমি জানি ত! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে...." (দুর্গামণি)।

কাহিনী-পরিকল্পনা

"অরক্ষণীয়া" গল্পের কাহিনী-ভাগ দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে ছোটগল্পের আকস্মিকতা নিয়ে এবং চুড়ি দেওয়ার ঘটনা নিয়ে জ্ঞানদা-অতুলের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। কাহিনীর সমাপ্তিও এই চুড়িকেই কেন্দ্র ক'রে। ছোটগল্পের পূর্বাপর ঐক্য এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। প্রথম পরিচ্ছেদটিতে যে সমস্যার ইঙ্গিত পাই, সমগ্র কাহিনী-ভাগে সেই সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রেই বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ। এইভাবে কাহিনীর গতি-পরিবর্তন না ক'রে অগ্রগমন ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্ধারিত।

অতুলের সঙ্গে জ্ঞানদার ঘনিষ্ঠতা যে বহুদিনের, তার পরিচয় অতুল-দুর্গামণির কথোপকথন থেকেই জানা যায়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত,

অতুল এই কাহিনীতে এতো প্রধান অংশ গ্রহণ করলেও অতুলের বাড়ীর চিত্র বা তার মায়ের পরিচয় কাহিনীর মধ্যে কোথাও নেই, একমাত্র দুর্গামণির উক্তি ছাড়া। কাহিনী শুধু জ্ঞানদাকে নিয়েই আবর্তিত, এমনকি জ্ঞানদার অনুপস্থিতিতে অনাথের সংসার সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নীরব থেকেছেন। এর থেকেও আমরা অনুমান করতে পারি, "অরক্ষণীয়া" উপন্যাসধর্মী নয়।

অতুল জ্ঞানদার কিশোর-প্রাণের একাগ্র নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানদার কাছে অতুলের 'পান চাওয়া'-কে কেন্দ্র ক'রে রহস্যপূর্ণ কথাবার্তায়। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা উচিত, প্রথম পরিচ্ছেদে জ্ঞানদাকে একবারও কথা বল্‌তে দেখা যায়নি। জ্ঞানদার রূপহীনতা তার বিবাহের অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে অথচ বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতে কুণ্ঠিতা দুর্গামণি দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানাতেও পারছেন না। এই পরিচ্ছেদেই উক্ত সমস্যার ইঙ্গিত পাই। সমাজের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা দুর্গামণি দিয়েছে, আঙ্গিকের দিক্ দিয়ে তা শুধু অতিরিক্ত নয়, ত্রুটিপূর্ণ। এই অংশটি বাদ দিলেও বক্তব্য অব্যক্ত থাক্‌তো না। মহাপ্রসাদ দেবার অছিলায় চুড়ি উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনী নাটকীয় হ'য়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাত জ্ঞানদার পিতৃ-গৃহের পরিচিতি দিয়ে। এই পরিচিতি প্রদান অত্যন্ত সার্থক এবং ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা ও ইঙ্গিতময়তা নিয়ে বিরচিত। এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর সেই দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কাহিনীর পরিবেশের দিক্ দিয়ে তা সার্থক হয়েছে। জ্ঞানদা সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই অংশেই একবার মাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে অতুলকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। এইসব ঘটনারাজি চিত্রণ সার্থক হ'লেও এই পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদটি একেবারে অবান্তর এবং এর দ্বারা শরৎচন্দ্রের রোষ প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু আঙ্গিকের বিচারে তা অসার্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই অর্থাৎ জ্ঞানদার পিতা প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর থেকেই কাহিনীতে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এবং সমস্যার উগ্র প্রকাশ ঘটেছে। এই

পরিচ্ছেদে জ্যাঠাইমা (বড় বউ) স্বর্ণমঞ্জরীর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত হ'য়ে নেই। কাহিনীতে স্বর্ণমঞ্জরীর আবির্ভাব, কথাবার্তা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। সমস্ত সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সে স্নেহের ছলনা ক'রে এবং এইভাবে ছোট দেওরকে পর্যন্ত সে হাত করেছে। এই পরিচ্ছেদে দুর্গামণি-জ্ঞানদার সম্পর্কের নিবিড় ব্যথাভরা আকর্ষণের চিত্র পাই। সেই প্রসঙ্গে জানতে পারি, কিভাবে সাবিত্রীর মতো জ্ঞানদা অতুলকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলো। এখানে ছোট বউয়ের যে পরিচয় পাই, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। অতুলের সঙ্গে দুর্গামণি-জ্ঞানদার ঘনিষ্ঠতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং অতুলের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে দুর্গামণি-জ্ঞানদা হরিপালে এসে উপস্থিত হয়। হরিপালে আসার ফলে কাহিনীর অগ্রগতি ভিন্নপথ ধ'রে দ্বন্দ্ববহুল হ'য়ে উঠেছে; তাই এই ঘটনার গুরুত্ব যথেষ্ট।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে হরিপালে দুর্গামণির দাদা শম্ভু ও বউদি ভামিনীর চরিত্র-চিত্রণ অপূর্ব রসঘন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিচ্ছেদদ্বয়ের উপস্থাপনে কাহিনীর একঘেয়েমি নষ্ট হয়েছে, তবুও কাহিনীর গতি পরিবর্তিত হয়নি। এখানেও জ্ঞানদার বিবাহ-সংক্রান্ত ঘটনাই প্রধান হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ছিল; কারণ এখন থেকেই অতুলের মন জ্ঞানদা থেকে ভিন্নমুখী হয়েছে এবং জ্ঞানদার পত্রের উত্তরে তাচ্ছিল্যপূর্ণ সুর বেজেছে। একথা মনে করা বোধ করি অন্যায় হবে না, হয়তো জ্ঞানদা হরিপালে না গেলে, কাহিনীতে দ্বন্দ্বসৃষ্টি সম্ভব হ'তো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ছোট বউয়ের পরিচয় আরও বিস্তৃত আকারে পাই। যদি প্রথম দিকে ছোট বউয়ের কথাকে ক্ষণিক ক্রোধের প্রকাশ ব'লে স্বীকার করা যায়, তা হ'লে ছোটবউ-চরিত্রের স্নেহময় অথচ অসহায় প্রকাশ ঘটেছে এই পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদটিতে শরৎচন্দ্র অকারণ আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। স্বর্ণমঞ্জরী ও ছোট বউয়ের চরিত্র দু'টির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে কাহিনীকে আরও আবেদনশীল ক'রে তোলা হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে অতুলের প্রতি দুর্গার কটু উক্তি এবং দুর্গামণির মৃত্যুপথ যাত্রার চিত্র চিত্রিত হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে মাধুরীর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে জ্ঞানদার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে জ্ঞানদার অবস্থা আরও করুণ ক'রে তোলা হয়েছে এবং জ্ঞানদা-দুর্গামণির সম্পর্কের নিবিড়তা আরও অনুভূতিপ্রবণ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নবম পরিচ্ছেদে জ্ঞানদার বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এবং বৃদ্ধ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে জ্ঞানদার নীরব সহিষ্ণুতার চিত্র পাই। এই পরিচ্ছেদেও কয়েকক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অকারণ আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। শেষ পরিচ্ছেদে জ্ঞানদার শেষ অগ্নিপরীক্ষারূপে এক অতিবৃদ্ধের সম্মুখে আবির্ভাব এবং প্রত্যাখ্যান, বিদ্রূপবাণে বিপর্যস্ত জ্ঞানদার কাছে অতুলের উপস্থিতি, দুর্গামণির মৃত্যুর ফলে অতুলের মানসিক পরিবর্তন এবং শ্মশান-বৈরাগ্য বোধে ছোট বউয়ের কথায় জ্ঞানদাকে বরণ ক'রে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনী একটি সন্তোষজনক পরিণতি (happy ending) লাভ করেছে।

এই পর্বে শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর পরিণতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মিলনমূলক, অথচ কাহিনীর মধ্যে বিষাদময় ঘটনাই প্রবল। "উদ্বোধন পর্বে" বেশীর ভাগ কাহিনী বিচ্ছেদমূলক। "অরক্ষণীয়া" গল্পের ঘটনা-বৈচিত্র্য ছোটগল্পের পথ-নির্দিষ্ট, কিন্তু এখানে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা উপন্যাসধর্মী। তবে সত্যকার উপন্যাসে সমস্যাকে ঘিরে দ্বন্দ্ববহুল কাহিনী বিবর্তিত হয়, এখানে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে এবং উত্থাপিত সমস্যার কোনও সর্বজনীন সমাধান (general conclusion) এখানে পাই না ; উপন্যাসে যা সাধারণতঃ দেখা যায়।

এবারে চরিত্র-পরিকল্পনার দিক্ দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। জ্ঞানদাকে কাহিনীর প্রথমে যে অবস্থায় পাই, সেই স্বল্পভাষিণী, সংযত, নম্র, সহিষ্ণু জ্ঞানদার কোনও চারিত্রিক পরিবর্তন কাহিনীর সমাপ্তিতে লক্ষ্য করা যায় না। জ্ঞানদার সৌন্দর্যহীনতা ও দারিদ্র্য কাহিনীতে যে সমস্যা এনেছে, পরিণতি পর্যন্ত সেই সমস্যা অটুট থেকেছে, তবুও জ্ঞানদা-চরিত্রের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয়নি। উপন্যাসে প্রধান চরিত্র

সমস্যার দ্বারা যেমন নিয়ন্ত্রিত হবে, সমস্যার দ্বারা তেমনি চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হবে কাহিনীর সমাপ্তিতে। জ্ঞানদার ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় দেখা যায়। অতুল, দুর্গামণি কোনও চরিত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। অতুলের পরিণতি কাহিনীর প্রথম অংশে চিত্রিত চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অঙ্কিত হয়েছে। কাহিনীর মাঝে অতুলের যে পরিবর্তন, তা সাময়িক এবং আপাত, এমনকি অভিমানপ্রসূতও বলা যেতে পারে। কারণ অতুলের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে দুর্গামণি জ্ঞানদা হরিপাল যাত্রা করেছিলো। এর দ্বারা চরিত্রের কোনও গভীরতর পরিবর্তন সূচিত হয় না। সুতরাং চরিত্র চিত্রণের দিক্ দিয়ে বিচার করলেও "অরক্ষণীয়া" ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। তবে কাহিনীর মধ্যে মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখনী উপন্যাসধর্মী যে হ'য়ে ওঠেনি, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। মাঝে মাঝে সমস্যামূলক বক্তৃতা, সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ইত্যাদি কতকগুলি সাধারণ ত্রুটি বাদ দিলে প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক্ দিয়ে "অরক্ষণীয়া"-কে অসার্থক বলা কোনমতেই যায় না।

অতুল-জ্ঞানদার প্রেম-প্রকৃতি

জ্ঞানদা শরৎ-সাহিত্যে প্রথম সৌন্দর্যহীনা নায়িকা। সাহিত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে নায়িকামাত্রেই সৌন্দর্যের আধার। বাঙ্‌লা-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী নয়। এখানে জ্ঞানদা সৌন্দর্যহীনা সত্ত্বেও নায়িকা। অতুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এবং তখন থেকেই উভয়ের মনে প্রণয়-সঞ্চার হয়েছে। কাহিনী ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় প্রণয়-সঞ্চারের পূর্বাবস্থা এবং ধীরে ধীরে অগ্রগতি দেখান সম্ভব হয়নি। কাহিনীর সূত্রপাতে জ্ঞানদার বয়স বার তেরো বছর। অতুলকে দেখে স্বল্পভাষিণীর মনের উচ্ছ্বাস মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেয়েছে—"...একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত,...মেয়েটির চোখ-মুখ দিয়া একটা চাপা হাসি যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।" অতুলের "মুখের উপরে দীপ্তি খেলিয়া একটা অদৃশ্য তড়িৎ-প্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল।" এই

দু'টি কিশোর মনের প্রণয়ের মধ্যে তখন আবেগ এবং চাপল্য ছিল যতখানি, হৃদয়ের নিবিড়তা ততখানি ছিল না। তবে অতুলের মনে জ্ঞানদার প্রতি প্রণয় তখন বেশ পরিণত বলা যেতে পারে, তা নিছক মোহ নয়। কারণ দুর্গামণি জ্ঞানদার জন্য পাত্রের সন্ধান করতে বলায়, অতুল আশ্বাস দিতে গিয়ে "সহসা লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।" তাছাড়া জ্ঞানদা রূপসী নয়, এখানে অতুলের আকর্ষণ রূপমোহজনিত নয়।

পুরী-প্রত্যাগত অতুল বোম্বাই থেকে জ্ঞানদার জন্য চুড়ি এনেছে এবং সেটা দেবার জন্য মহাপ্রসাদ দেবার অছিলায় সে এসেছে। জ্ঞানদা মায়ের ডাকে কাছে এসে "নিঃশব্দ নতমুখে স্নেহের এই প্রথম উপহার হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দু'টি কাঁপিয়া গেল। .. আজ তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানলেন।" অতুলের কাছে কিশোরীর স্বাভাবিক সঙ্কোচ জ্ঞানদা তখনও পর্যন্ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি; তাই অতুলের নানা সরস কথাবার্তা সে নীরবে নতমুখে উপভোগ করেছে, যোগ দিতে পারেনি।

প্রিয়নাথের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বিপদের চরম দিনে জ্ঞানদার অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তার মতো লজ্জাশীলা, নম্র মেয়ে পর্যন্ত আত্মহারা হ'য়ে বিপদের সময়ে পরম আত্মীয় ভেবে অতুলের পায়ে মাথা খুঁড়েছে এবং ভবিষ্যতে অতুলের প্রতিজ্ঞা ফলবতী হোক্ না হোক্ সে চেয়েছে পিতাকে চিন্তামুক্ত করতে। অতুল জ্ঞানদার দুঃখে সমব্যথী হ'য়ে মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট শপথ করেছে জ্ঞানদার ভার গ্রহণ করবার। এ প্রতিজ্ঞা হয়তো সাময়িক আবেগপ্রসূত মনে হ'তে পারে; কিন্তু এই ঘটনার পশ্চাতে অতুলের যে মানসিক প্রবণতা ক্রিয়াশীল ছিল, তা বহুযত্নপোষিত, বহুকাঙ্ক্ষিত প্রেমানুরাগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শুধুমাত্র একজন "আসন্নবিদায়ী"র হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করেছে ব'লেই নয়, জ্ঞানদার ভার নিতে পারার গর্বে ও আনন্দে "অতুল অকস্মাৎ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।"

হরিপাল যাত্রার প্রাক্কালে দুর্গামণি-জ্ঞানদার কথাবার্তায় অতুল-জ্ঞানদার প্রেম-প্রকৃতি আরও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। দুর্গামণির আকুল জিজ্ঞাসা এবং

জ্ঞানদার সসঙ্কোচ ব্যবহার, দুর্গামণির উক্তি—"…অতুলের কত দিনের কত ছোটখাটো কথাই না আজ আমার মনে হচ্ছে। আমি জানি, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয়।" —ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানদার মানসিক প্রবণতা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে, কারণ সে নিজে অত্যন্ত মিতভাষী।

জ্ঞানদার প্রণয় অন্তর্লীন; বাহ্যিক প্রকাশের দ্বারা তরল ক'রে দিতে সে প্রস্তুত নয় তার প্রেমকে। তাই পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অকস্মাৎ যেন তার সযত্নরক্ষিত প্রেমের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু তা একবারের জন্যই। কাহিনীর আর কোথাও দ্বিতীয়বার জ্ঞানদার প্রেমের এ শ্রেণীর উচ্ছ্বাসময় বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তাই মায়ের কথার উত্তরে সে এই কথাই জানিয়েছে, "…তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।…বাবাকে জানাতে বলেছিলাম—তিনি নিজেই ত জানিয়েছেন।…" এই উক্তির পশ্চাতে কি কোনও অভিমান সক্রিয় নেই?

জ্ঞানদার প্রতি অতুলের যে প্রণয়-সঞ্চার, এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ। এই কৃতজ্ঞতা থেকেই এসেছে সহানুভূতি এবং তা থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছে প্রেম। কৃতজ্ঞতার কারণ মৃত্যুমুখ থেকে অতুলকে বালিকা জ্ঞানদা ফিরিয়ে এনেছিলো নিজের সেবার ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। যখন সবাই ভয়ে অতুলকে ত্যাগ করেছিলো—"…সাবিত্রীর মত যাকে যমের হাত থেকে তুই ফিরিয়ে এনেছিলি, তাকে কি ভগবান আর কারু হাতে তুলে দিতে পারেন।…" —দুর্গামণির এই উক্তি "পথনির্দেশ" গল্পের সুলোচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। মৃত্যুশয্যায় সুলোচনা যেমন ইন্ধন জুগিয়ে হেমের প্রণয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, তেমনি দেখি জ্ঞানদার মূক-প্রণয়কে দুর্গামণির জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্ন মুখর ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিলো।

অতুলকে জ্ঞানদা সংবাদ দিয়েছে হরিপাল যাবার। অতুল ছুটে এসেছে কলকাতা থেকে এবং দুর্গামণিকে হরিপালে যেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু দুর্গামণি তৎসত্ত্বেও হরিপাল যাত্রা করেছে। অতুল সহাস্য মুখে কথা বললেও মন তার ভারী হ'য়ে উঠেছিলো, শুধু তাই নয় "ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতেই একপ্রান্ত হইতে একজোড়া জলেভরা আরক্ত চক্ষুর টেলিগ্রাফ পাইয়া” অতুল স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

যদি জ্ঞানদা ও দুর্গামণি হরিপালে যাবার আগে অতুলের সাহায্য অথবা পরামর্শ প্রার্থনা করতো, তা হ'লে হয়তো কাহিনীর পরিণতি বিষাদময় হ'য়ে উঠ তো না। অতুলের অনুরোধকে অগ্রাহ্য ক'রে যখন তারা হরিপালে চলে গেল, তাতে হয়তো অতুল অভিমানবশেই বা মনে আঘাত পেয়েই উদাসীন হ'য়ে উঠেছিল জ্ঞানদার প্রতি। এই অবস্থায় মাধুরীর রূপ ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে সে জ্ঞানদার কথা সাময়িককালের জন্য ভুলে গেলো। এই রূপমোহের দুর্নিবার আকর্ষণে জ্ঞানদার প্রতি অতুলের প্রেমবোধ আবৃত হ'য়ে রইল। জ্ঞানদা হরিপালে নীরবে সমস্ত অবস্থাকে বুঝেও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। প্রেমের এই সংযতপ্রকাশ জ্ঞানদা-চরিত্রে একটি বিশেষ মহিমাদান করেছে। জ্ঞানদা ও অতুলের মিলনের পথে যে বাধা এসেছে, তা নিছক ঘটনাগত বাধা, চরিত্রগত মোটেই নয়। যদি অতুলের কাছে দুর্গামণি আবেদন করতো, হয়তো জ্ঞানদাকে অতুল বরণ ক'রে নিতো। কিন্তু শেষে ভুল বোঝাবুঝির ফলে কাহিনী দুঃখময় হ'য়ে উঠ্‌লো।

জ্ঞানদার প্রেমকে অন্তর্লীন ক'রে শরৎচন্দ্র তাদেব প্রেমপ্রকৃতির মধ্যে নিবিড়তা আনবার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানদার প্রেমের প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে ঘট্‌লে, মুখরা হ'য়ে সে আনীত প্রত্যেক অভিযোগের সত্য উত্তর দিতে চাইলে, জীবনে তার হয়তো দুঃখ আস্‌তো না, কিন্তু পাঠকের অকুণ্ঠ সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত হ'তো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জ্ঞানদার এ প্রেমে দাহ আছে, দৃঢ়তা আছে, উত্তাপ আছে, কিন্তু দম্ভ নেই। যদি জ্ঞানদা অতুলের সাক্ষাতে মুখরা হ'য়ে উঠ্‌তো, তা হলে হয়তো অতুলের প্রণয় নতি জানাতে বাধ্য হ'তো।

অতুলের চিঠির মধ্যে “একটা তাচ্ছিল্যের সুরই যেন দুর্গার কানে বাজিল।” এই তাচ্ছিল্যের পশ্চাতে ছিল ঔদাসীন্য, ছিল বেদনা, ছিল অভিমান। এই পরিস্থিতিতে যদি মাধুরীর আবির্ভাব না ঘটতো, হয়তো অতুলের পক্ষে

নীরব, নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হ'তো না। অতুলের জ্ঞানদার প্রতি ঔদাসীন্যের ইন্ধনরূপেই যেন কাহিনীতে মাধুরীর আবির্ভাব। সপ্তম পরিচ্ছেদে অতুলের প্রতি দুর্গামণির প্রত্যক্ষ অভিযোগ এবং কলহ, তার উত্তরে অতুলের নির্লজ্জ সত্যপ্রকাশ, তার প্রকৃত পরিচয়কে গোপন করেছে। সাময়িক ক্রোধের বশে অতুল বলেছে বটে—"…এ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাবো? আমার কি মরবার দড়ি কলসী জোটে না?" কথাটা অতুলের মনের কথা হ'লে সে রীতিমত হাসিতে যোগ দিতে পারতো অন্যের সঙ্গে। কিন্তু "অতুল হাসিবার মত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া" যে কথা বল্‌লো এবং তার উত্তরে ছোট বউ যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করলো তাতে অতুলের মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌লো এবং উঠে যাবার সময় তার মনে হ'ল—"…এই হোলির দিনে কে যেন তাহার জামা-কাপড়ে লাল রঙ এবং মুখে গাঢ় কালি লেপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।" জ্ঞানদার নীরব সহিষ্ণুতাই শেষ পর্যন্ত তাকে অতুলের বরণীয়া ক'রে তুলেছে—"…এই মেয়েটিকে ভগবান যেন কোন নিগূঢ় কারণে বসুন্ধরার মতই সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়াছিলেন।"

নুন দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞানদার লাঞ্ছনা অতুলের মোহভঙ্গের সূচনা করে—"…অতুলের সমস্ত খাবার বিস্বাদ হইয়া গেল।…জ্ঞানদাকেও তো সে চিনিত।" জ্ঞানদা অতুলকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে; তবু তখনও তার ব্যবহারে চাপল্য বা অসংযত আচরণ প্রকাশ পায়নি। আজকের এই অহৈতুকী লাঞ্ছনা দেখে অতুল যেন জ্ঞানদা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো। তার অন্তরে যে আলোড়নের সূত্রপাত হ'লো, তা চরমে উঠ্‌লো সেদিনই, যেদিন অকস্মাৎ অতুল এসে দেখ্‌লো গোপাল ভট্টাচার্য জ্ঞানদাকে অযোগ্য প্রতিপন্ন ক'রে চলে গেলো। দুর্গামণির মৃত্যুসংবাদ আশঙ্কা ক'রেই সে গৃহে প্রবেশ করেছিলো বটে, কিন্তু সেখানকার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তার কলকাতা ফিরে যাওয়া স্থগিত রইল—"…অতুলের বুকের ভিতরটা কে যেন তপ্ত শলাকা দিয়া বিঁধিয়া দিল।" জ্ঞানদার নীরব সহনশীলতা অতুলকে ক'রে তুললো চঞ্চল। তার সমস্ত অতীত-স্মৃতি আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো। সেই স্মৃতিমন্থনে অতুল স্পষ্ট উপলব্ধি

করলো—"…একদিন সাংঘাতিক রোগে নিজে যখন সে মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকে (জ্ঞানদার) সে ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নয়, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নয়, অকপটেই সমস্ত প্রাণ ঢালিয়াই ভালবাসিয়াছিল।" এই অতীত স্মৃতিমন্থনে আত্মস্থ অতুলের ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মবিস্মৃতি ঘট্‌লো।

অতুলের সমক্ষে তারই দেওয়া চুড়ি নিয়ে স্বর্ণমঞ্জরীর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, জ্ঞানদার অটল, অচল স্থৈর্যে কম্পন তুলেছিলো—"…কখনও সে পরের সমক্ষে কাঁদে নাই,—আজ কিন্তু অতুলের সম্মুখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।" এই অশ্রু অতুলের মানসিক বিক্ষোভের প্রচণ্ডতাকে আরও তীব্র ক'রে তুল্‌লো। তার মনে এবার দেখা দিল অন্তর্দ্বন্দ্ব—একদিকে রূপমোহের দুর্নিবার প্রলোভন, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতাবোধ ও অকৃত্রিম প্রণয়ের অনিবার্য আকর্ষণ। তাই বারে বারে তার ছোট বউয়ের কথাটাই মনে পড়েছে—…"হীরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তার মনস্তাপের আর অবধি থাকে না।" অতুলের মনে হ'লো, জ্ঞানদার এই দুর্ভোগের জন্য সে-ই একমাত্র অপরাধী।

এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দিল দুর্গামণির মৃত্যুতে। জ্ঞানদার পিতার মৃত্যু-মুহূর্তে যে প্রতিজ্ঞা অতুল করেছিল, দুর্গামণির মৃত্যুতে অতুল তা পালন করলো; কাহিনীর সামগ্রিক অগ্রগতিতে জ্ঞানদা হ'য়ে রইল দ্রষ্টা মাত্র। জ্ঞানদার নির্লিপ্ততার পশ্চাতে ছিল ব্যথার পুঞ্জীভূত ইতিহাস, জীবন সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্য। জীবনে সে দিল অনেক, কিন্তু ফিরে পেলো কি? শুধু অনাদর, হতাশার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। জীবনের একমাত্র সহায় মাকে হারিয়ে চরম অবস্থায় "চিরদিন শান্ত, পরম সহিষ্ণু মেয়েটি" যে আত্মহত্যা করতে পারে, এ ভয় কারুর মনে না জাগ্‌লেও অতুলের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিলো। শ্মশানের চিতাগ্নি দেখে অতুলের মনে যে তত্ত্বের উদয় হয়েছে, যে চিরাচরিত সত্যের উদ্ভব হয়েছে, তাকে নিছক শ্মশান-বৈরাগ্য ব'লে অস্বীকার করা যায় না। এই মহাকালের পটভূমিকায় অতুলের মনে গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে দেখা দিল জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র লীলাখেলার ক্ষণিকতা, প্রেমের অবিনাশী শক্তি এবং রূপের ক্ষণভঙ্গুরতা।

জ্ঞানদা সমগ্র জীবনে অতুলের যে দানকে বক্ষে ক'রে রেখেছিলো, শত গঞ্জনাতেও যার অমর্যাদা ক'রে প্রেম-মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেনি, সেই দু'গাছি "অতি তুচ্ছ মহামূল্য" কাঁচের চুড়িকে বিনষ্ট ক'রে নিজের জীবনকে অস্বীকার করেছে—প্রেমের যবনিকা টেনে দিয়ে। প্রথম প্রেমের এই দানকে অতুল কোনও মর্যাদাই দেয়নি, আজ যাকে সে সাগ্রহে তুলে নিতে উদ্‌গ্রীব। যে প্রেমকে যক্ষের মতো জ্ঞানদা রক্ষা করেছিলো, শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও যে প্রেমই তাকে একমাত্র সহ্য করবার প্রেরণা দিয়েছিলো, আজ তাকে অস্বীকার ক'রে অতুলের দৃষ্টি ফিরিয়েছে, মোহজালের গাঢ় আবরণকে ভেদ করেছে—"...আজ যাকে তুমি ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এলে, আমি তাকেই আবার শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলুম।" জ্ঞানদার "উদাস দৃষ্টি" এবং জিজ্ঞাসা অতুলের প্রেমাকুলতাকে পূর্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে—"যা ভাঙ্‌বার নয়, তাকে কিছুতেই জোর করে ভাঙা যায় না। জোর ক'রে কাঁচের চুড়িই ভাঙা যায়, কিন্তু আমাদের সেই দেওয়া-নেওয়াটা আজও তেমনি অটুট হ'য়ে আছে—তাকে ভেঙ্গে ফেলি, এত জোর তোমার আমার কারুর নেই।" জ্ঞানদার কাছে অতুলের ক্ষমা প্রার্থনা নিবিড় প্রেমের জয়ধ্বজা উত্তোলন করেছে। অতুলের এ পরাজয় জয়েরই নামান্তর। জ্ঞানদাকে তার জীবনে বরণ ক'রে নেওয়ার পশ্চাতে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কোনও বাধার সৃষ্টি করেনি। যৌবনে রূপের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবেই, কিন্তু প্রেমের কাছে রূপমোহের নতি স্বীকার শরৎ-সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

অতুলের প্রকৃতি উদাসীন, নির্লিপ্ত নয়, তার ঔদাসীন্য অভিমানপ্রসূত। তাই শরৎচন্দ্রের পুরুষ-প্রকৃতির উপাদান থেকে অতুল পৃথক্ ছাঁচে গড়া। তবে নারী-প্রকৃতির পুরুষকে পাবার জন্য চিরসাধনা, তাকে বাঁধবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা সেই দুর্গা-শিব, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী থেকে শুরু ক'রে বাঙালীর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য এই ধারারই সার্থক অনুসৃতি। জ্ঞানদার সাধনা যেন ধ্যানস্থা যোগিণীর সাধনা, অন্তশ্চেতনার উপলব্ধি। তার নীরব যোগ-সাধনায় যখন সিদ্ধি এসেছে, তার ভিত্তিমূল হয়েছে অচল,

অটল, সুদৃঢ়। জ্ঞানদার প্রেমের যে দ্বন্দ্ব, তা অতুলের নির্লিপ্ততার জন্য তীব্র হ'লেও বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেনি কোথাও—"...শুধু দুর্বল ও শীর্ণ হাতটি অতুলের হাতের মধ্যে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল।" জ্ঞানদার প্রেম গভীর, গূঢ়, গোপন। জ্ঞানদা-চরিত্রটি সরযু-চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। সরযু মিতভাষিণী, লাজুক, নম্রপ্রকৃতির ছিল। তারও প্রেম ছিল অন্তর্মুখী, প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত। তবে তার পেছনে কারণ ছিল সরযুর কুণ্ঠাবোধ এবং দাক্ষিণ্যের ভাব, যেন চন্দ্রনাথের কৃপাপাত্রী সে। তাই সেখানে ছিল দ্বিধা। কিন্তু জ্ঞানদার প্রকৃতির মধ্যে সে কুণ্ঠাবোধ নেই। তবে এখানে প্রেমের চেয়ে জ্ঞানদার জীবনে তার বিবাহ-সমস্যা আরও গুরুতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে ব'লে প্রেমের পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ পাই না।

স্বর্ণমঞ্জরী-দুর্গামণি-ছোটবউ

তিন জায়ের প্রকৃতি তিনটি ভিন্নশ্রেণীর উপাদান নিয়ে গঠিত। এই বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা চরিত্রগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শরৎ-সাহিত্যে যে একশ্রেণীর কুটিলা, স্বার্থান্ধ নারী-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, স্বর্ণমঞ্জরী চরিত্র সেই ধারারই অনুবর্তন। বিধবা স্বর্ণ সন্তানহীনা, পিতৃকুলের সামান্য বিষয়-আশয় বিক্রি ক'রে ছোট দেওরের আশ্রি·· হ'য়ে বাস করছে। স্বর্ণ দিগম্বরী-শ্রেণীর চরিত্রেরই ক্রমপরিণতি এবং এই ধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে রাসমণি চরিত্রে। বর্ণনাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"...বড়জা যেমন মুখরা, তেমনি আত্মমর্যাদাজ্ঞানশূন্যা। মুখের উপর তাহার সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও লজ্জা পাইবে না।"

স্বর্ণমঞ্জরীর বিদ্বেষপরায়ণতা অহৈতুকী। দিগম্বরী, নয়নতারা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে তবুও খানিকটা স্বার্থবোধ ছিল, কিন্তু এই নারীর হিংসাপূর্ণ মনোভাব অকারণ; হয়তো বা দুই জায়ের সংসারে ব্যবধান এনে এই শ্রেণীর মন্থরা-চরিত্র একজনের সংসারে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথ ক'রে নেয়। স্বর্ণর এই স্বরূপ ছোট জায়ের অজানা নেই। ছোটবউ যে স্বর্ণর প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট

সচেতন, তা তার বাক্যে ও ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন দেখি, জ্ঞানদার হরিপাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন স্বর্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলো, তখন ছোটবউ বল্‌লো, "...দিদি! বছর দুই মধু-সংক্রান্তির ব্রত করো—আর জন্মে মুখখানা যদি একটু ভাল হয়।"

স্বর্ণমঞ্জরীকে কাহিনীর প্রথম দু' পরিচ্ছেদে পাই না। সুতরাং তা থেকে কাহিনীর মধ্যে স্বর্ণমঞ্জরীকে চিত্রিত করার সার্থকতা খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে। স্বর্ণকে চিত্রিত করা হয়েছে জ্ঞানদার বেদনাদায়ক চিত্রকে আরও মর্মস্পর্শী ক'রে তোলবার জন্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদেই প্রথম স্বর্ণমঞ্জরীর সাক্ষাৎ পাই। সেখানে কুটিলা, নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্না, স্বর্ণমঞ্জরীর গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অনাথের কন্যার রূপের সঙ্গে পার্থক্য ক'রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটুকথায় স্বর্ণমঞ্জরী-চরিত্র মন্থরারূপী-চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। ক্রোধে স্বর্ণমঞ্জরী সম্পর্ক পর্যন্ত ভুলে গিয়ে কটুকথা ব'লে বসে। যেমন দেখি অতুলের প্রতি ক্রোধপুর্ণ বাক্য।

এই স্বর্ণই আবার প্রয়োজন হ'লে দরদ দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায়। তখন মিষ্টি কথাবার্তায় সে আপন হ'য়ে ওঠে সহজেই। যখন যে শ্রেণীর অভিনয়ের প্রয়োজন, অবস্থা বুঝে স্বর্ণ সেই ভূমিকাতেই অভিনয় করতে পারে। স্বর্ণমঞ্জরী সেদিক দিয়ে একজন প্রথমশ্রেণীর অভিনেত্রী বলা যেতে পারে। যে অতুলের প্রতি একদিন স্বর্ণ কটু ইঙ্গিত করতে দ্বিধাবোধ করেনি, সেই অতুলের পক্ষ নিয়েই সে ঝগড়া করেছে। তার লক্ষ্য ঝগড়া, বিবাদ, নীচতাপ্রকাশ, সেখানে একপক্ষ অবলম্বন, উপলক্ষ মাত্র। সে অতুলের প্রতি দরদ দেখিয়ে জ্ঞানদাকে অপমান করেছে। স্বর্ণমঞ্জরী জ্ঞানদার দুর্বিষহ জীবনকে আরও বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। তার নিষ্ঠুর আচরণ অতুলের দৃষ্টি ফিরিয়েছে। এই কাজটুকু সমাধা করিয়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র স্বর্ণমঞ্জরীকে কাহিনী-শেষে বিদায় দিয়েছেন।

"...ছোট বউয়ের মায়াদয়া ছিল। সে আর যাই হোক, সন্তানের জননী ত!" ছোটবউকে প্রথম দর্শনে পাঠক-মনে যে ধারণা জন্মায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে সে ধারণা পরিবর্তিত হয়। স্নেহপরায়ণা, অন্যায় সম্পর্কে সচেতন, অথচ

প্রতিকারে অসমর্থ ছোটবউ আমাদের সহানুভূতি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না। ছোটবউয়ের চরিত্রে মস্ত দোষ অলসতা। এই কর্মবিমুখতা তার চরিত্রের গুণ-গুলিকে পর্যন্ত যথেষ্ট খর্ব করেছে,—"...পরের দুঃখে সে ব্যথা অনুভব করিত ; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পরিশ্রম দিয়া সে দুঃখ দূর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।" স্বর্ণমঞ্জরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবার মতো সাহস ছোটবউয়ের ছিল না ; তাই অন্যায় জেনেও সে নীরবে তা সহ্য করতো। ছোটবউ ক্রোধের বশে অতুলকে একবার ব্যঙ্গ করলেও, জ্ঞানদার প্রতি স্বর্ণমঞ্জরীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সে কোনদিনই অংশ গ্রহণ করেনি ; বরং তীক্ষ্ণ শ্লেষের দ্বারা তার যথোচিত উত্তর দিয়েছে। অতুলকে আঘাত দিয়ে তার অন্যায় সম্পর্কে সে তাকে সচেতন ক'রে দিতে চেয়েছে। তাই প্রতিবারেই অতুলকে সে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছে। অতুল যখন জ্ঞানদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে তখন বারে বারে তার ছোট-বউয়ের কথাই মনে পড়েছে। এই প্রয়োজনটুকু শেষ ক'রে দিয়েই ছোটবউ মাধুরীকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে এবং কাহিনী থেকেও বিদায় নিয়েছে। জ্ঞানদার শেষ সম্বন্ধের দিন ছোটবউ উপস্থিত ছিল না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, স্বর্ণ এবং ছোটবউকে কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে জ্ঞানদার প্রতি অতুলের সচেতনতা ফিরিয়ে আনবার জন্য—তবে দুই বিপরীত দিক্ থেকে দু'টি চরিত্রের আবির্ভাব। দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বে অতুল-জ্ঞানদার মিলনমূলক পরিণতি সম্ভব হয়েছে।

দুর্গামণি-জ্ঞানদার চরিত্র-পরিকল্পনা সুলোচনা-হেমনলিনীর অনুরূপ। জ্ঞানদাকে দুর্গামণি ভর্ৎসনা করেছে, কটূক্তি করেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। কিন্তু অন্তরের নিবিড় স্নেহ-মমতা-ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই জ্ঞানদার প্রতি দুর্গামণির স্নেহনিবিড়তার পরিচয় পাই। মেয়ের বিয়ে দেবার অক্ষমতা, রূপহীনতার জন্য ব্যথাভরা অন্তর দুর্গামণিকে সমাজের প্রতি, সংসারের প্রতি বিরূপ ক'রে তুলেছে। সমাজের প্রতি কটূক্তি করতে সে দ্বিধাবোধ করেনি।

দুর্গামণি আত্মমর্যাদাসম্পন্না, ধীর, বিচক্ষণা নারী। স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে সে

হরিপালে চলে গেছে, তবুও অতুলের আশ্রয়ে এসে নিজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। অতুলের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে নিজেকে হেয় করেনি। স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে দুর্গামণির উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন তার চরিত্রের গাম্ভীর্য এবং মহিমাকে নষ্ট করতে পারেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর দুর্গামণি নীরবে সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য ক'রে তিলে তিলে নিজের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত, লাঞ্ছিত ক'রে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে অতুলের প্রতি তার তীক্ষ্ণ কটূক্তিতে। হরিপালে গিয়েও দুর্গামণি বিধাতার সমস্ত অভিশাপ মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সমস্ত সহ্যের সীমারেখায় এসে দুর্গার বিকৃতি ঘটেছে। অতুলের ঔদাসীন্য তাকে অধীর ক'রে তুলেছে; জ্ঞানদার প্রতি অবজ্ঞায় তার মানসিক অবস্থা—…"বুদ্ধিবিবেচনাও কেমন যেন দ্রুত বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার যে জননী কলহের ছায়া দেখিলেও শঙ্কিত হইতেন, তিনি আজকাল ইহাতেও যেন বিমুখ নন।…"

দুর্গামণি ব্যথার ভারে, অন্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্রতায় জ্ঞানদাকে কটূক্তি করেছে। জ্ঞানদা যখন তার কাকাকে ভাত বেড়ে দিতে গেলো, স্বর্ণমঞ্জরী তখন ঝঙ্কার দেওয়াতে…"দুর্গা সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল,"…। তাই জ্ঞানদার প্রতি তার কটূক্তি প্রকাশ পেয়েছে; এমন কি মেয়েকে দুর্গা পদাঘাত পর্যন্ত করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। মেয়ের প্রতি তার আকর্ষণের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, মেয়েকে না-ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে এবং সমাজ সংসারের সহস্র লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়েও বৃদ্ধের হাতে কন্যাকে সমর্পণ না করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িতা দুর্গামণিকে বিধাতার অভিশাপের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অতি-বৃদ্ধের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে সে নিজের হাতেই তাকে সাজিয়ে দিয়েছে এবং গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করেছে। এতেও তার পরীক্ষা শেষ হয়নি। এই নিষ্ঠুর আঘাতে দুর্গামণি মৃত্যুকে বরণ করেছে। তবে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য, স্থৈর্যচ্যুতি ঘটেনি এবং সে সম্পর্কে তার উক্তি-প্রত্যুক্তি অত্যন্ত সংযতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সুলোচনা (পথ-নির্দেশ) যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও বাস্তব-চেতনা-সম্পন্না (Practical), কিন্তু দুর্গামণি ততটা নয়। দুর্গামণি জ্ঞানদাকে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়েছে, কাহিনীতে সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু "পথ-নির্দেশে" সমাজ নেপথ্যে তার প্রতাপ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। হেমনলিনী শিক্ষিতা, জ্ঞানদা বিপরীত, বয়স দু'জনেরই সমান। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনীতে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কোনও সন্তানস্থানীয় চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে এবং সেখানে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে মাতৃস্নেহের প্রকাশ নিয়ে। কিন্তু "পথ-নির্দেশ"-এর পর "অরক্ষণীয়া"ই বোধকরি শরৎচন্দ্রের একমাত্র গল্প যেখানে মাতা-কন্যার স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর কাহিনী গড়ে উঠেছে।

পোড়াকাঠ

শম্ভুর স্ত্রী ভামিনী চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টিনিপুণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ভামিনী শম্ভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। "ইনি যেমনি কালো, তেমনই রোগা এবং লম্বা। ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়া কাঠের মত।" ভামিনীর বিকট মুখশ্রী, বীভৎস মাড়ি বের-করা হাসি, তার বাইরের "রূপ-লাবণ্যে"র (!) সবটুকু মিলিয়ে মনে ভীতির সঞ্চার করে। আচার-ব্যবহারে ভব্যতার বালাই তার ছিল না, তার ওপর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ। এতো উচ্চকণ্ঠে সে কথা বলতো যে "···দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা, তেমনি যুদ্ধবিশারদ।" কাউকে মান্য ক'রে কথা বলা তার ধাতে সইতো না।

কিন্তু 'সুন্দর দেহেই সুন্দর মন বাস করে'—এই প্রচলিত 'রীতিকথা'র প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ 'পোড়াকাঠ'। এই ভয়াবহ দেহের অন্তরালে যে স্নেহের অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিলো, তার পরিচয় যে পেয়েছে, সে মাথা নত না ক'রে পারেনি। "···সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চাহিত না।" কিন্তু যখন কোনও কাজকে সে অন্যায় বুঝতো, তখন স্বামী এবং ভাই কাউকে সে রেহাই দিত না। তখন তার রণচণ্ডীবেশে সংগ্রামী মূর্তির কাছে অবনত হ'তে হ'তো।

এই 'পোড়াকাঠ' জ্ঞানদাকে কটু কথা বলেছে, আবার সে-ই নিজের একমাত্র সম্বল "রূপোর বিছে"টা বেচে দিয়ে ডাক্তারের পাঁচন আনিয়েছে। কর্তব্যের প্রতি তার নিষ্ঠা, স্নেহমমতার অন্তর্লীন প্রকাশ সভ্যসমাজে আদৃত হ'তো না, কারণ মৌখিক মিষ্টতা প্রকাশের শিক্ষা সে পায়নি। তবে চরিত্রের মহনীয় ঔদার্যে ভামিনী চরিত্র অবিনশ্বর, অক্ষয়। কয়েকটি মাত্র পরিচ্ছেদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ভামিনীর যে জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টিতে তা অদ্বিতীয়। "... পোড়াকাঠ নিজের ধরণে জ্ঞানদাকে তাহার স্বাভাবিক মাধুর্যের জন্যই বোধ করি ভালবাসিয়াছিল; যত্নও করিত।" দুর্গা তাকে ভুল বুঝেছিল, কিন্তু ভামিনীর স্নেহ অহৈতুকী। জ্ঞানদার সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দেবার প্রস্তাব শুনে ভামিনীর রুদ্রাণী মূর্তি এবং সংলাপ তার চরিত্রের মহিমা প্রকাশ করেছে। অথচ স্বামী বা ভ্রাতার প্রতি তার যে অশ্রদ্ধা আছে তা নয়। দুর্গা বিদায় নেবার আগে যখন "গোটছড়া"র কথা বললো, তখন ভামিনী উত্তর দিল—"ছাই গোটছড়া! এই বল ঠাকুরঝি! হাতের নোয়া নিয়ে স্বামীপুত্তুরের গো-ব্রাহ্মণের সেবা ক'রে যেন যেতে পারি।"—এ কামনা বাঙালী মেয়ের অন্তরের বিনীত প্রার্থনা। এই ক'দিনের পরিচয়ে 'পোড়াকাঠ' সমস্ত স্নেহ যেন নিঃশেষিত ক'রে দিয়েছিলো, তাই দুর্গা জ্ঞানদাকে বিদায় দেবার প্রাক্কালে সে অশ্রুজলের মধ্যে নিজের অনাবিষ্কৃত অন্তরের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এই কুশ্রীতার অন্তরালে দেবীতুল্য হৃদ্‌পদ্মের স্থিতি শরৎচন্দ্রের কবিদৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল আবিষ্কার করা।

অন্যান্য চরিত্র পর্যালোচনা

শম্ভু চরিত্রটি বাঙলার গ্রামীণ চরিত্রের একটি প্রতিনিধিমূলক (representative) প্রকাশ। শম্ভু প্রথম পক্ষের পর দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণে উদ্‌গ্রীব, বৈকালিক পালা-জ্বরে ভোগে, টাকা ধার ক'রে আত্মসাৎ করতে উন্মুখ, সমাজের ভয়ে তটস্থ, স্ত্রীর ভয়ে ভীত, সংসার সম্পর্কে নিরপেক্ষ, কর্তব্য সম্পর্কে তথাকথিত সচেতন গ্রামীণ সংসারের একজন typical গৃহস্বামী।

শম্ভু-চরিত্রে যে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে, তার পশ্চাতে সামাজিক ভীতি সক্রিয় সন্দেহ নেই। নিজের শ্যালকের হীন চরিত্র জেনেও তার হাতে জ্ঞানদাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব এবং সেই অজুহাতে ঋণ পরিশোধের যুক্তি শম্ভু-চরিত্রে হীনতার পরিচয় বহন করে।

অনাথ-চরিত্রটি মেরুদণ্ডহীন। স্বর্ণমঞ্জরীর কথায় সে চালিত হয়। প্রকৃত-পক্ষে অনাথ একেবারে হৃদয়হীন নয়, কিন্তু স্বর্ণের প্ররোচনায় তার চরিত্রের বিপরীত প্রকাশ ঘটেছে। অনাথ সংসার সম্পর্কে আপাত উদাসীন ছিল এবং দুর্গা-জ্ঞানদার প্রতি তার অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়নি। দুর্গার মৃত্যুর পর সে অতুলকে ডেকে দুর্গার সৎকারের ব্যবস্থা করেছে, জ্ঞানদার বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি; প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর দুর্গামণি ও জ্ঞানদাকে অনাথ আশ্রয় দিয়েছে। সমাজের ভয়ে এবং নিজের মেয়ের বিয়ের চিন্তায় সে জ্ঞানদার যে-কোনও উপায়ে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু তাতে অনাথ-চরিত্রের হীনতা অপেক্ষা সামাজিক ভীতিই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। অনাথ-চরিত্রে যেটুকু নীচতা প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য দায়ী স্বর্ণমঞ্জরী। জ্ঞানদাকে অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তাব ছোটবউ অনুমোদন না করাতে অনাথ সে চিন্তা পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অনাথের মেরুদণ্ডহীনতাই তাকে এইভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে।

উপসংহার

"অরক্ষণীয়া" রচনাটিকে ছোটগল্প অথবা উপন্যাস—কোন্ আখ্যাতে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, এ নিয়ে মতান্তরের উদ্ভব হ'তে পারে। এর কারণ হয়তো এই যে, সামাজিক সমস্যার গুরুভারে "অরক্ষণীয়া" গল্পটি এক দিকে যেমন বিশিষ্টতা লাভ করেছে, অন্য দিকে তেমনি মতদ্বৈতের কারণ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। "অরক্ষণীয়া"-র পূর্বে আমরা যে সমস্ত গল্প আলোচনা করেছি, সেখানে দেখেছি, সামাজিক পটভূমিকার ওপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন কাহিনীর উদ্ভব। এই গল্পটি সামাজিক সমস্যার অন্যতম বাহনরূপে পরিগণিত হয়েছে।

তাই এখানে কাহিনীর অনিবার্য পরিক্রমণ-ক্ষেত্ররূপে অনূঢ়া জ্ঞানদার দুর্ভাগ্যের ছবি অঙ্কিত হয়নি, অরক্ষণীয়া কন্যা এবং তার পিতা-মাতার চিরন্তন বেদনাকে পরিদৃশ্যমান ক'রে তুলতেই এই কাহিনীর অবতারণা। তবে এ কথা ঠিক "অরক্ষণীয়া" গল্পের সমস্যা সর্বজনীন নয়, তা নিছক বাঙালীর সে-যুগের সমস্যা। জ্ঞানদা "বিশ্বের পায়ে-ঠেলা" অনাদৃতা সন্তান নয়, বাঙালী-সমাজের নিগৃহীতা কন্যা সে। "অরক্ষণীয়া"গল্পে জ্ঞানদা-সমস্যা শাশ্বত নয়,নিছক সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিক সমস্যার বাহন হ'য়ে "অরক্ষণীয়া" গল্পের সৃষ্টি ব'লেই কাহিনীর প্রত্যেকটি ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণের প্রয়োজনীয়তা সমস্যা-বিশ্লেষণের সহায়ক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। "চন্দ্রনাথ" গল্পে চন্দ্রনাথের পক্ষে সরযুকে গ্রহণ করা বা ত্যাগ করায় সামাজিক সমর্থন অসমর্থনের প্রশ্ন উঠেছে বটে, কিন্তু তা কাহিনীর গতিপথের একাংশ অধিকার করেছে মাত্র; "চন্দ্রনাথে"র সম্পূর্ণ ঘটনারাজিকে আবৃত ক'রে রাখেনি। "অরক্ষণীয়া"-তে জ্ঞানদার বিবাহঘটিত অশান্তি নিয়ে দুর্গামণির দুশ্চিন্তাপূর্ণ জীবনযাত্রার সূত্রপাত এবং সেই দুশ্চিন্তা নিয়েই তার মৃত্যুবরণ। সামাজিক উদগ্র ব্যবস্থার কাছে এমনিভাবেই "কন্যা"-র পিতা-মাতাকে আত্মাহুতি দিয়ে আসতে হয়েছে এই দরিদ্র বাঙলাদেশে। মানুষের গড়ে-তোলা এই অবাঞ্ছিত সমস্যার "কাঠগড়া"য় প্রিয়নাথ-দুর্গামণির অকালমৃত্যুকে, জ্ঞানদার লাবণ্যহীন দেহস্তূপের অন্তরালে জীবন্মৃত প্রাণের লাঞ্ছনাকে দুঃসহ বেদনায় রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাশক্তিকে এখানে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সুখ্যাত উপন্যাস "পল্লী-সমাজ" ছাড়া "অরক্ষণীয়া" গল্পেই আমরা ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙলার গ্রামকে চিনেছি। গ্রাম্য-সৌন্দর্যের কল্পনার স্বপ্নাঞ্জন আমাদের চোখ থেকে গেছে মুছে—বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টিতে আমরা দেখেছি গ্রামীণ সমাজের বিকৃত স্বরূপকে।

"অরক্ষণীয়া" গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের সমালোচক মনটি অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ-শাসনের বিধি-ব্যবস্থায় নিপীড়িত মানবাত্মার পক্ষ হ'য়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা-মানস থেকে বিচ্যুতি সহজেই

নজরে পড়ে। তাই কাহিনীর মধ্যে বারে বারে শরৎচন্দ্রের উষ্মমনের প্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞানদার দুঃখময় ইতিবৃত্ত বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের বিগলিত সহানুভূতি সমাজ-বিধানের নির্মমতার প্রতি নিষ্ঠুর কশাঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই শরৎ-লেখনী কখনও হয়েছে ব্যঙ্গপ্রবণ, কখনও ভগবানের দোহাই দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে, কখনও বা তীব্র কটূক্তিতে জ্ঞানদার প্রতি মমত্ব দেখিয়েছে। শরৎচন্দ্র কখনও নিজেই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, কখনও বা পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছেন। দুর্গামণির সমাজকে লক্ষ্য ক'রে উষ্মতা, প্রিয়নাথের মৃত্যু-বর্ণনাপ্রসঙ্গে অহেতুক ক্রুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ, জ্ঞানদার লাঞ্ছনায় দীর্ঘ বক্তৃতা, কাহিনীর মধ্যে সমাজ-নিয়ন্তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা, বাঙ্‌লার নারী-সমাজের প্রতি অনাদরের জন্য আক্রোশ প্রকাশ শরৎচন্দ্রের স্রষ্টাধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে একটু সংযমের পরিচয় দিলে "অরক্ষণীয়া" আরও উন্নত এবং সার্থক গল্প হিসেবে পাঠক কর্তৃক আদৃত হ'তে পারতো।

অলঙ্করণের দিক্ দিয়ে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিনিপুণ মনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ ক'রে উপমা-প্রয়োগ এই কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সহজ-ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ এবং চলৃতি জীবন থেকে আহৃত উপমাগুলির মৌলিকতা প্রণিধানযোগ্য। যেমন—জ্ঞানদাকে পাত্রপক্ষের সম্মুখে রূপের পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে ঘরে দুর্গামণির মানসিক অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"...দৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের অত্যন্ত কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে থাকিলে, তাহার মা যেমন করিয়া সময় কাটান, তেমনি করিয়া দুর্গা একাকী তাঁহার মলিন শয্যার উপর বসিয়াছিলেন।..."

"অরক্ষণীয়া"-র বর্ণনাভঙ্গী এবং সংলাপ ত্রুটিহীন না হ'লেও শরৎচন্দ্রের লেখনী যথেষ্ট "মুন্সিয়ানা"-র পরিচয় বহন করে। এখানকার হাস্যরস ব্যঙ্গপ্রধান।

(১১)

আসার আশায়

("রূপক-রচনাকার শরৎচন্দ্র")

রূপকধর্মী রচনায় বাংলা সাহিত্যের রত্ন রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়; কিন্তু অনুরূপ রচনা শরৎচন্দ্রেরও যে থাকতে পারে, কে কল্পনা করেছে? রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় পরিচয় রয়েছে, তাঁরা যদি শরৎচন্দ্রের এই রচনাটি পাঠ করেন, বর্ণনাভঙ্গীর সুঠাম গঠনে, ভাষার স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ পারিপাট্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য সহজে ধরা পড়বে না। গল্পটি শরৎ-সাহিত্যে একক এবং এমন একজাতের গল্প যার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গল্পাবলীর সুদীর্ঘ তালিকার কোনটিরই প্রকৃতিগত বা আকৃতিগত বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। গল্পটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব'লেই হয়তো সার্থক সৃষ্টি হ'য়েও শরৎ-রচনাবলীর মধ্যে যথাযথভাবে স্থান পায়নি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অনুসন্ধান করলেই গল্পটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। গল্পটির নাম 'আসার আশায়'। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব রচনাটির সর্বত্র সহজেই অনুভব করা যায় এবং আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্র-রচনাবলী অত্যধিক পাঠ করার ফলে হয়তো তাঁর কবি-প্রাণ রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত রীতিতে একটি রূপকধর্মী গল্প রচনায় সৃষ্টিমুখর হ'য়ে উঠেছিল, যার অপরূপ নিদর্শন 'আসার আশায়'। শিল্পীর স্রষ্টামনের এক অভিনব অভিব্যক্তি! শরৎচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী রচনারীতি, সুমিষ্ট শব্দচয়ন ও বর্ণনার মনোহর ভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কাব্যধর্মী গদ্য ও ভাবকল্পনার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় 'আসার আশায়' রচনাটিকে একটি স্বকীয় মর্যাদা দান করেছে। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, গল্পটি একেবারেই অজ্ঞাত, এমন কি অবজ্ঞাত রয়ে গেছে। গল্পটি রূপক কি রূপকথা পাঠক তা বিচার ক'রে দেখবেন। গল্পটি সম্পর্কে শরৎ-সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠকের আগ্রহবোধ

জন্মান উচিত। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সহায়তা করতেই আমরা গল্পটির একটি রূপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। এই গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চল্‌তি ভাষার ব্যবহার। এর পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে ক্রমাগত সাধুভাষা প্রয়োগ করার পর চল্‌তি ভাষার এতো সুষ্ঠু প্রয়োগ শরৎ-প্রতিভার একটি উজ্জ্বলতর প্রমাণ। এই ভাষা প্রয়োগের আর একটি কারণ, বিশেষ একজনের জবানীতে সমস্ত কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে; অনেকটা আত্মকথার মতো। যেমন দেখা যায়, 'আসার আশায়' গল্পের পরবর্তী রচনা 'স্বামী' গল্পেও চল্‌তি ভাষার ব্যবহার।

আসার আশায়

.'আসার আশায়' গল্পটি রূপকধর্মী। এই শ্রেণীর গল্প শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি। সুতরাং শরৎ-সাহিত্যের কোনও ধারার প্রতিনিধিত্ব করবার অথবা সাদৃশ্য বহন করবার সুযোগ এই গল্পটির নেই। শরৎচন্দ্রের ভাবুক মনের কোনও আবেশ মুহূর্তে এই কথিকার জন্ম। তাই গদ্যের আঙ্গিকে কাব্যরস এই গল্পটিকে কেন্দ্র ক'রে সিঞ্চিত হয়েছে।

গল্পটির অন্তর্নিহিত সুরটি তত্ত্বপূর্ণ; বহিরঙ্গিক সজ্জায় গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গ্রন্থের গল্পগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। তা ছাড়া কবির রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলিকেও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যগুরু—একথা শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক গদ্যরচনা সবই শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'আসার আশায়' গল্পে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় রচনার প্রভাব পড়েছে বল্‌লে শরৎ-সাহিত্য পিপাসুদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন এ ধরণের গল্প আর রচনা করেননি, তখন এটি যে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপ্রসূত নয়—এ কথাই আমরা মেনে নিতে পারি।

জীবন পরিক্রমায় সকলেই এক পদবিক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে না। আর এগিয়েই বা ক'জন যেতে পেরেছে? প্রবহমান জীবনের বিভিন্ন বাঁকে

জীবকুল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আবর্তিত হচ্ছে; কিন্তু অগ্রগমনের জন্য চাই সাধনার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ অন্নময় কোষের গণ্ডী কাটিয়ে উর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে না, তাই জীবনযাপনে সাধনার অবকাশই তারা খুঁজে পায় না। মানুষ শৈশব থেকে কৈশোর এবং তারপর যৌবন পরিক্রমণ ক'রে বার্ধক্যে পৌঁছে ভাবে, বেশ দ্রুততালেই সে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু জীবন্মুক্তি তার ঘটেছে কি? এই অগ্রগমন কি জীবনচক্রে আবর্তিত হওয়া নয়? কেবলমাত্র ভোগ-সুখাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন ক'রে যারা 'যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে' অগ্রসর হ'ল তাদের দ্রুতগামিতায় সাধনার মাধুর্য নেই। জীবন-সাধনায় পিছিয়ে গিয়ে দুঃখকে যদি না বরণ করা যায়, তবে পরম শান্তিময়ের কোলে আশ্রয় পাওয়া কঠিন।

অনন্ত দুঃখই অনন্ত জীবন-প্রবাহের আস্বাদ বহন ক'রে আনে এবং জীবকে স্থাপন করে অনন্ত সুন্দরের প্রাঙ্গণতলে।

"...ওগো তোমরা অমন ক'রে হেস না। গা-টেপা-টিপি ক'রে ব'লো না, আমি পাগল। সত্যি বলছি—আমি পাগল নই।' যে স্বামী স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ ক'রে গেলো, সাধ্বী স্ত্রী অনির্বাণ আশার আলো নিয়েই তো পথ চলে! সমাজ বিদ্রূপ করতে থাকে, মিথ্যা মরীচিকার পেছনে তাকে ছুটে চল্‌তে দেখে। কোনও নারী যদি যথার্থ প্রেমের স্পর্শলাভ করে, সে প্রেমকে চরিতার্থ করতে তার নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার অন্ত থাকে না। এ সাধনা ঈশ্বর-প্রাপ্তির সাধনা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। অনন্ত ব্রহ্মের ঈশিত্ব পাতিব্রত্য সাধনার মধ্যেও রূপ পেয়েছে—তা নইলে কিসের আকর্ষণে নারী ঘর বাঁধে এবং ভেঙ্গে ফেলে নিজের সামান্যতম বিচ্যুতিতে? সান্ত ব্রহ্মের সাধনায় স্বামী বিগ্রহমাত্র; নারীর দৃষ্টি সেখানে উর্ধ্বমুখী। এইভাবেও দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

জীবনকে সাধনক্ষেত্ররূপে গ্রহণ ক'রে পুরুষ বৃহৎ শক্তিকে একসঙ্গে চেয়েছে লাভ করতে। আর পুরুষ বল্‌তে তো সেই একমাত্র পুরুষ, যার বিচরণক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ডলোক। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে,

ভক্ত-সমাজ নারীর স্বরূপে অধিষ্ঠিত। তাদের সাধনা তাই পরকীয়া-সাধনা। পুরুষোত্তম সেই ভগবানকে লাভ করতে ভক্তবৃন্দ নারীভাবে ভাবিত হয়েছে, যেমন ক'রে স্বামীকে নারী সাধনার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কোনও ভেদ নেই। তাই রস-সাধনার বিভিন্ন ক্রম অনুসরণ ক'রে জীবও সেই পাতিব্রত্য ধর্মই পালন করছে, কারণ এই পর্যায় ছাড়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা চরিতার্থ হয় না। এ সাধনা মধুর রসের সাধনা।

পরম ভক্তের অবস্থা অনেকটা স্বামী-পরিত্যক্তা হতভাগিনী নারীর মতো। সহজ সরল অনুভূতি নিয়ে পরিবার এবং সমাজের বুকে একটি নব-অঙ্কুরিত প্রাণ সীমায়িত হয়ে থাকে। মধুর বসন্তে যখন সমস্ত প্রকৃতি তার ঐশ্বর্য নিয়ে বিকশিত, তখন অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে অনন্ত পুরুষ তাঁর রহস্যময় আবরণটি খুলে দেন। কিন্তু সৌন্দর্য অবগাহনে মন হয়তো সক্রিয় হ'য়ে ওঠে না; নিজাবতা ত্যাগ ক'রে সীমাকে ভাঙতে গিয়ে সাধক প্রত্যক্ষ করে যে, সহজ সৌন্দর্যের নির্যাসে যাঁকে জানা যায়, এবার শত দুঃখ পেয়ে পেয়েই তাঁকে জানতে হবে। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনা অশ্রুসজল পথ অতিক্রম ক'রেই তার আঁধার ঘরের অরূপ প্রেমিকের আশীর্বাদ লাভ করেছে। এতো ফোটা ফুল নয় যে, দিনশেষে ঝরে গিয়েই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে? মানুষের শেষের দিনটিতে পেঁৗছোতে দুস্তর বেদনার সীমা লঙ্ঘন ক'রে আসতে হবে।

অন্তরের সৌন্দর্য সকলের থাকে না; বাহ্যিক রূপেরই [illegible] এ পৃথিবীতে। কিন্তু মালিন্যপূর্ণ পৃথিবীতে ব্রহ্মাণ্ডের রাজ্যেশ্বর বাছাই ক'রে আন্তররূপেই অধিক মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। গোপনে কখন্ তাঁর দূত মিলনবার্তা জানিয়ে যায় সেই হৃদয়গুলিকে। তারপর অসীম বিস্ময় এবং রহস্যের মধ্যে দিয়ে রাজ্যেশ্বরের পরম প্রিয়া, মধুর রসের রসিক, জানতে পারে তার জীবনে দুঃখের রাত্রি ঘনায়মান—

"শুধু দুর্দিনে ঝড়ে
দশদিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—

* * *

তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখ দিনের ঝড়ে।"—'খেয়া' কাব্যের 'বালিকা-বধূ' 'আসার আশায়'রতা কিশোরী কি? উভয় রচনার সাদৃশ্য একই সাধনতত্ত্ব নিয়ে রূপকসৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়। কবির ভাষায়—'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার···হে বন্ধু···', কিন্তু আত্মবল তখন দ্বিধাপূর্ণ, সাহসের তখন একান্ত অভাব। চোখে পার্থিব মোহ জড়ানো; কবির ভাষায়—'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি, কি ঘুম তোরে পেয়েছিল···'—ঠিক এমনিভাবেই। 'শেষকালে একদিন রাজপুত্তুর দেখা দিলেন। সে দিন কি ঘুমেই না পেয়েছিলো আমাকে। কত কথা তিনি বলেছিলেন; তার মানে তখন বুঝিনি। এখনই কি ছাই বুঝতে পেরেছি।' ইন্দ্রিয়বোধ তখনও সম্পূর্ণ জগৎমুক্ত নয়। পদে পদে আশঙ্কা এবং ভয়ের বাধা। রাজ্যেশ্বরের প্রেম গ্রহণের ক্ষমতাটুকুও সাধক হারিয়ে ফেলে। অনন্ত বিরহের সমুদ্রে এবার পাড়ি দিতে হবে কিন্তু অন্তরে আশার আলো যেন কখনও না নিভে যায়, রূপসীর মন-ভোলানো সজ্জা নিয়ে সেই ভুবন-ভোলানোকে জয় করতে হবে। এ ত তাঁরই নির্দেশ! এ যেন রাজদণ্ড! কিন্তু দণ্ডধারী সেই রাজার পাদস্পর্শ লাভ জীবনে কি সকলের ঘটে। পরশমণি কখন্ ক্ষ্যাপার জীবনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু আজও সে ক্ষ্যাপা; কারণ নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে সচেতন হয়নি। মানুষের জীবনে এই চির-বিরহের শেষ নেই—তবুও মহৎ প্রাণ উৎসর্গীকৃত হচ্ছে যুগে যুগে। কবির ভাষায়—'কবে তুমি আসবে বলে আমি রইব না বসে, আমি চল্‌বো বাহিরে···।'

(১২)

স্বামী

নামকরণ

"সব মেয়ের মত আমিও আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম।" সামাজিক ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশেষ আনুষ্ঠানিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়েই স্বীকৃত—এই ধারণা সর্বজনীন। অবশ্য দেশ এবং জাতিভেদে এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্বামী-স্ত্রীর এই চিরবন্ধনের যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রত্যক্ষাতীত অনুভূতির বিষয়ীভূত রূপে 'স্বামী' কথাটির মধ্যেই নারীর পূর্ণতম সত্তার ব্যাখ্যা রয়েছে। শরৎচন্দ্র হয়তো এই গ্রন্থের নামকরণে এমনই কোন ইঙ্গিতপূর্ণ তত্ত্ব পরিবেশন ক'রে থাকবেন। 'স্ব-আমি'—স্বামী—"স্বামী যে তোর আত্মা···তুই যে তাঁরই।"—সুতরাং নারী বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যখন জীবন যাপন করে, তখন তার জীবন-ধর্ম অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তাই 'স্ব-আত্মার' পূর্ণতম বিকাশ ঘটে স্বামীর সান্নিধ্যে। এখানে শুধু বহিঃপ্রকাশে দুই নর-নারীর পার্থক্য; হৃদয়ধর্ম পালনে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে না। উভয় আত্মার মিলনসূত্রই প্রেমের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ; বিবাহের মন্ত্র এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। তাই দেখা যায়, বিবাহের পরেও স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে উভয়ের আত্মার আবরণ উন্মোচিত হয়নি, অশুভ এবং অসুন্দর হয়েছে তাদের বিচ্ছিন্ন জীবন-পথ। পুরুষের হয়তো এতে কোন ক্ষতি নেই, তার বৈরাগ্য অথবা নির্লিপ্ততা তাকে জীবন্মুক্তির পথ দেখিয়েছে। কিন্তু নারীকে সমাজ এবং সংসার-সীমায় আবর্তিত হ'য়ে মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। শত সহস্র স্বার্থ-পুষ্ট দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তার জীবন-সাধনার পথ কণ্টকাকীর্ণ। এখানে স্বামী তার মস্তবড় নির্ভর; যুগ্ম-সত্তার শক্তিতে নির্ভর ক'রেই সমাজ-শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্তি পেতে হয়।

অবশ্য সন্ন্যাসধর্ম ছাড়া সংসারধর্ম অতিবাহিত করতে হ'লে পুরুষকেও নারীশক্তিতে নির্ভরশীল না হ'য়ে উপায় নেই।

"স্বামী" গ্রন্থে দেখি সৌদামিনী তার সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমান নিয়ে অতীত জীবনে আবিভূ'ত হয়েছে। ভগবানে অবিশ্বাস তাকে অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে নিজেকেই। এমনিভাবে সৌদামিনী তার নারীধর্ম চরিতার্থের সহজ পথ থেকে হয়েছে বিচ্যুত। তাই নরেনকে যেমন সে নিষ্ঠাসহকারে ভালবাসতে পারেনি, ঘনশ্যামকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করতে তার তেমনই কুণ্ঠা জেগেছে। অহঙ্কারের আড়ালে সৌদামিনীর আত্মা নির্জীব হয়েছিল, কিন্তু তা সজীব এবং স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে ঘনশ্যামের মহৎ-প্রাণতার সংস্পর্শে। নরেনের সঙ্গে সৌদামিনীর আত্মার মিলন সম্ভব হয়নি ; উভয়ের বহিরাবরণের চাকচিক্যেই উভয়ে মোহগ্রস্ত। তাই সৌদামিনীর নারী-মর্যাদা এখানে ক্ষুণ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণতম জীবনের স্বাদ থেকে সে হয়েছে বঞ্চিত। কিন্তু ঘনশ্যামের সান্নিধ্যে এসে ক্রমশঃ অভিমান এবং অহঙ্কারের স্তূপ তার মন থেকে অপসারিত হ'তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সৌদামিনী একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে প্রেমের অগ্নিতে চিনেছে নিজেকে এবং স্ব-আত্মার অধিকারী স্বামীকে। এখানেই সৌদামিনীর আত্ম-সমর্পণ ও আত্মোপলব্ধি—তা থেকে সত্যদর্শন অর্থাৎ আত্মার অভিন্ন রূপ-দর্শন। সাংসারিক ক্ষেত্রে "স্বামী" অনন্ত স্বরূপের সান্ত বিগ্রহ—এ ধারণা শুধু বিশ্বাসের বস্তু নয়—উপলব্ধি-সাপেক্ষ। "স্বামী" গ্রন্থের নামকরণে সেদিক দিয়ে শুধুমাত্র সৌদামিনীর স্বামীকেই লক্ষ্য করা হয়নি—স্বামিত্বের ওপর গুরুত্ব স্থাপন করা হয়েছে ব'লেই মনে হয়।

আঙ্গিক পরিকল্পনা

স্বয়ং গল্পের নায়িকা বক্ত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে "স্বামী" গ্রন্থে। এ জাতীয় রচনা-কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" গ্রন্থে এবং রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করেছি। শরৎচন্দ্র "স্বামী"র অব্যবহিত পূর্ব-রচনা "আসার আশায়"তে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু

'আগার আশায়' একটি রূপক-রচনা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায়, এখানে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী পরিস্ফুট হতে পারেনি। সুতরাং কাহিনীর নায়িকা-চরিত্রের মুখে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে গল্পরস সিঞ্চিত হয়েছে কিনা এই 'স্বামী' গ্রন্থেই তা অনুধাবন করা সম্ভব। কারণ এখানে চরিত্র-চিত্রণ, বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ও কাহিনীর অগ্রগতি বিবৃতির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

"স্বামী" গল্পটিকে শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ সাহিত্যসৃষ্টির প্রধানতম নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ হৃদয়ানুভূতি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রাণবন্ত হয়েছে বিচিত্র ভাবাবেশের অনুরণন তুলে। বর্ণনাকুশলী ও মধুসংলাপী শরৎচন্দ্রের পরিচয়ই এ সময়ে প্রধানভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে। কিন্তু 'স্বামী'-তে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এত অধিক যে, তাতে এক দিকে যেমন গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে অন্য দিকে কোনপ্রকার গভীর ছাপ পাঠক-মনে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সৌদামিনীর আত্ম-অনুশোচনার ফলস্বরূপ কাহিনীর আবির্ভাব ঘটাতে কিছু ভাবাবেগ থাকা সম্ভব, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে পড়ায় আঙ্গিক-প্রস্তুতির দুর্বলতা রসগ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে।

'স্বামী' রচনাটিকে গল্প-পর্যায়ের অন্তর্গত ভেবে নেবার আগে কয়েকটি কৈফিয়তের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। সৌদামিনীর স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় কাহিনীর উদ্ভব এবং পরিণতির কাল সাত-আট বছরের মধ্যে সীমায়িত। এই সময়ের মধ্যে সৌদামিনীর জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার আবির্ভাব হয়। এই সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রণে সৌদামিনীর জীবন কোন একটি বিশেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—তার ভাবোচ্ছ্বাসের দীর্ঘসূত্রতার মধ্যেও তা বেশ স্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই অনুধাবন করা যায়। কিশোরী সৌদামিনীর কিশোরসুলভ ব্যবহার, তত্ত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা, নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তারপর ঘনশ্যামের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে দ্বন্দ্বসঙ্কুল জীবনযাপন করা, নরেনের সঙ্গে গৃহত্যাগ এবং পরিণামে স্বামীর শরণাপন্ন হওয়া—এই প্রধান কয়েকটি ঘটনার গ্রন্থনে গল্পের

নায়িকা সৌদামিনীর জীবন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তাই আপাতভাবে মনে হয় সৌদামিনী-চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এই গল্পে সৌদামিনীই মুখ্য চরিত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাকে কেন্দ্র ক'রে পরিস্ফুট হয়েছে নরেন্দ্র এবং ঘনশ্যাম। কিন্তু গল্পটির এই অগ্রগামিতা প্রকৃতই চরিত্র এবং ঘটনার বিবর্তনে সম্ভব হয়েছে অথবা একই বৈচিত্র্যহীন পরিস্থিতিতে এবং মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতে আবর্তিত হ'য়ে পরিশেষে পরিণামপ্রয়াসী হয়েছে বর্তমানে তাই বিচার করা প্রয়োজন।

সৌদামিনীর অতীত জীবনের কাহিনী তার মুখ দিয়ে বিবৃত হ'য়ে থাকলেও ঘটনার ক্রম-প্রসারতা এবং তৎসঙ্গে চরিত্রের অবস্থান্তর অত্যন্ত সুপ্রকট। ঘটনাপ্রবাহ যে এখানে বিবর্তিত তা কাহিনীর উদ্ভব এবং পরিণতির কাল পরিক্রমণ করলেই বোঝা যায়। পিতৃহীনা সৌদামিনী মামার আশ্রয়ে জীবনের কৈশোর-পর্বে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নরেনের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে সৌদামিনীর নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তারপর মামার মৃত্যুর পর প্রেমশূন্য কঠিনহৃদয়ে স্বামীগৃহে যাত্রা করায় ঘটনাপ্রবাহ রূপান্তর লাভ করেছে। ঘনশ্যাম-সৌদামিনীর দাম্পত্যচিত্র এবং শাশুড়ী-ননদ-জা পরিবেষ্টিত সাংসারিক চিত্র-পর্যালোচনায় কাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার আবর্তনে কিছু পরিমাণে শ্লথগতি দান করা হয়েছে। সৌদামিনীর হৃদয়ে অজ্ঞাতভাবে ঘনশ্যামের জন্য যখন ঔৎসুক্য এবং আকর্ষণ দেখা দিয়ে সৌদামিনীকে অন্তর্দ্বন্দ্বে চঞ্চল ক'রে তুলেছে, তখন শিকার উপলক্ষে সৌদামিনীর শ্বশুরালয়ে নরেনের অকস্মাৎ আগমনে কাহিনী-ভাগে একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। এই অধ্যায়টি কাহিনীর পূর্বমন্থরতাকে হ্রাস ক'রে একটি অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নরেনের আবির্ভাবে সৌদামিনী চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এবং তার জন্য মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ঘটনার দিক দিয়ে নরেনের সঙ্গে সৌদামিনীর গৃহত্যাগ উপন্যাস-সুলভ দিক-পরিবর্তন বলে মনে হ'লেও পুনরায় ঘনশ্যামের সঙ্গে সৌদামিনীর মিলন উপন্যাসের বিচিত্র সম্ভাবনাকে রুদ্ধ ক'রে ছোটগল্পের

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটিয়েছে। ঘনশ্যামের গৃহে নরেনের আগমন থেকে সৌদামিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত ঘটনাবলীর নাটকীয়তা কাহিনী-সংগঠনের দিক দিয়ে সার্থক ব'লেই মনে হয়; বিশেষ ক'রে সৌদামিনীর মায়ের গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় ঘনশ্যামের সঙ্গে সৌদামিনীর মৌখিক দ্বন্দ্ব এবং ঘনশ্যামের অনুপস্থিতিতে নরেনের সঙ্গে গৃহত্যাগ ঘটনা-কৌশলের অনবদ্য সহায়ক হ'য়ে কাহিনী-ভাগে স্থান পেয়েছে। "স্বামী" গল্পের শেষাংশের এই ঘটনাগ্রন্থনের পারস্পরিক যোগসূত্রগুলি মাঝে মাঝে সৌদামিনীর ভাবাকুলতার আতিশয্যপূর্ণ বর্ণনার ভঙ্গীতে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে বটে, কিন্তু একটা সচল এবং সজীব ছন্দে পাঠক পরিণাম জানবার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছে। একমাত্র সৌদামিনীর হৃদয়োচ্ছ্বাস ছাড়া অপ্রাসঙ্গিকতা দ্বারা কাহিনীর আঙ্গিক কোন ক্ষেত্রেই দুর্বল হ'য়ে পড়েনি।

ঔপন্যাসিক প্রবণতা নিয়ে ঘটনাগুলি বিবর্তিত হ'লে চরিত্রের বিবর্তন অনিবার্য না হ'তে পারে না। "স্বামী" গল্পটিতে ঘনশ্যাম ছাড়া নরেন এবং সৌদামিনী-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে ব'লে মনে হয়। তা ছাড়া গল্পের উপসংহারে তার স্পষ্ট নির্দেশ শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন। সৌদামিনী তার উনিশ বছর বয়সে অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে বিগত আট-নয় বছরের জীবনেতিহাস বর্ণনা করতে বসেছে। বর্তমানে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসিনী, সে জগতের কোন অভিজ্ঞতাই তার পুর্বে ছিল না। তার প্রমাণ সৌদামিনী নরেনের সঙ্গে গৃহত্যাগের পুর্ব পর্যন্ত ঘনশ্যামের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, আত্ম-অহঙ্কার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। তবে একথা ঠিক, এই সময় থেকেই সৌদামিনীর মনে একটি প্রতিক্রিয়ার সূচনা হ'তে থাকে, যার ফলস্বরূপ বউবাজারের বাসভবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নরেনের প্রতি সে হ'য়ে ওঠে বীতশ্রদ্ধ। স্বামীর ক্ষমাভিক্ষা ক'রে, তাঁর পদতলে স্থানলাভ করবার আশায় সৌদামিনী ব্যাকুল হয়েছে—কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই। সুতরাং দ্রষ্টারূপে যে সৌদামিনী তার অতীতের বিড়ম্বিত জীবন-চিত্র পর্যালোচনা করতে উদ্যত হয়েছে, তার সঙ্গে কাহিনীতে

অভিনীত সৌদামিনী-চরিত্রের অনেক পার্থক্য। অতীতের সৌদামিনী প্রণয়িনী এবং সহধর্মিণীর দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি। তাই সে নিজের এবং স্বামীর জীবনে ট্র্যাজিডির সূচনা ক'রে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে। কিন্তু পরিণামে স্বামীর পদাশ্রয় লাভ ক'রে সে মুক্ত হয়েছে এবং কল্যাণপূর্ণ জীবনযাত্রা শুরু ক'রে সে ব্যাখ্যা করেছে তার ফেলে-আসা জীবনের রহস্যকে। তাই বলা যায় শরৎচন্দ্র 'স্বামী' গল্পে নবতর রচনানীতি গ্রহণ করায় চরিত্র বিকাশ সম্পর্কে পাঠকের বিভ্রম উপস্থিত হয়েছে। নরেন-চরিত্রের পরিবর্তন কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত তা মতভেদ সাপেক্ষ। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে মনোযোগী হননি। সৌদামিনীর মোহমুক্তি নরেনের মোহমুক্তি ঘটিয়ে থাকলেও আত্মরক্ষার জন্যই নরেনকে বেশী তৎপর হ'তে দেখা যায়। নরেন সম্বন্ধে পাঠকের মনে কিছু পবিমাণে কৌতূহল থেকে যায় ব'লেই মনে হয়। শরৎচন্দ্র যেন এই গল্পের ঔপন্যাসিক প্রবণতাকে রুদ্ধ ক'রে দিতেই শেষাংশে নরেন সম্বন্ধে নির্বিকার থেকেছেন। অতএব 'স্বামী' গল্পটিব ঘটনাগ্রন্থন এবং চবিত্র-চিত্রণ আপাতভাবে সংশয়াত্মক হ'য়ে দেখা দিলেও ছোটগল্পেব সংজ্ঞা-বহির্ভূত নয়।

'স্বামী' গল্পের প্লট অভিনব সন্দেহ নেই। অবশ্য সামাজিক বিবাহবন্ধনের পূর্বে অন্যাসক্তা নারী-চরিত্রে সৌদামিনী ছাড়াও পার্বতী, হেম, ললিতা ইত্যাদির মধ্যে শৈশব-প্রণয়ের ট্র্যাজিডি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'স্বামী' গল্পে নরেন-সৌদামিনীর প্রণয়ের প্রতি শরৎচন্দ্র দৃক্‌পাত করেন নি। এমন কি যে সামাজিক পটভূমিকা শরৎ-সাহিত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূ রূপে পরিগণিত, সেই সামাজিক প্রশ্নোত্তরের হাত থেকে এই গল্পের প্লট সম্পূর্ণ মুক্ত। নরেনের প্রতি সৌদামিনীর কৈশোরের প্রথম আকর্ষণ যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, সৌদামিনীর সেই প্রথম প্রেমকে শরৎচন্দ্র মোহরূপে প্রতিপন্ন করলেন কেন? বেশ বোঝা যায় শরৎচন্দ্র এখানে প্রবৃত্তিকে বড় ক'রে দেখান নি; বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙলায় ক্ষমা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতাব - করবার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রবল্ হ'য়ে ওঠে।

নরেন-সৌদামিনী-ঘনশ্যামের প্রেম-প্রকৃতি

বার বছরের কিশোরী সৌদামিনী যখন মামার শিক্ষানবিশীতে ন্যায়-দর্শন প্রভৃতি দুরূহ তর্কশাস্ত্রে পারদর্শিনী হ'য়ে উঠেছে, তখন তার অন্যতম মুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে নরেন সৌদামিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে। দর্শনের দুর্বোধ্য তত্ত্বসকল অপ্রাপ্তবয়স্কা সৌদামিনীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সর্বপ্রথমেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তবে এ কথাও বলা চলে যে "শুধু শেখাবার capacity"র জন্যই সৌদামিনী ঐ সকল তাত্ত্বিক এবং তার্কিক কৌশল কণ্ঠস্থ করেছিল। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সমর্থন এক্ষেত্রে ছিল কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের মতে "তখনকার দিনে 'Agnosticism'ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া জানাদের ফ্যাসান।"—এই ফ্যাসান আয়ত্ত ক'রেই সৌদামিনী নরেনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তো এবং জয়লাভ করতো। এই জয়লাভের পশ্চাতে নরেনের আত্মসমর্পণ কেবলমাত্র যুক্তি-কৌশলের কাছেই নয়, তর্কযুদ্ধের নায়িকা সৌদামিনীর কাছেও। বিস্ময়ান্বিত নরেন অত্যন্ত অভিভূত হ'য়ে যখন ব'লে উঠেছে—"...এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা..."—সৌদামিনীর প্রতি তখনই তার মন গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছে। গ্রাম্যবালিকা সৌদামিনী ঐশ্বর্যশালী জমিদার-বংশের একমাত্র বংশধরকে মোহ : করেছিল প্রাণহীন কতকগুলি তত্ত্বকথা দিয়ে। সৌদামিনীর অতীত বিবরণে নরেনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার এবং উক্তির মধ্যে দিয়েই নরেন-চরিত্র সম্পর্কে একটি অগভীর ধারণা আমরা লাভ করেছি। তার ফলে নরেনের মনের গোপন খবরটি আমরা পাই নি; তার বাহ্যিক বিকারটুকুই আমাদের ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

"স্বামী" গল্পের নায়িকা সৌদামিনীর পরিচয়ই প্রধান এবং স্পষ্টতরভাবে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। দর্শনতত্ত্ব আলোচনার মধ্যে দিয়েই সৌদামিনী নরেনের সংস্পর্শে এসেছে এবং তার প্রথম কিশোর প্রেম নরেনের

উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়েছে। নরেনের মুখে গল্প-কথা-হাসি সৌদামিনীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল ব'লেই—"সকালে ঘুম ভেঙ্গে পর্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।" নরেনের প্রতি কিশোরী সৌদামিনীর কেবলমাত্র ক্ষণিকের মোহ-সঞ্চার হয়েছিল, একথা আমরা মেনে নিতে পারি না। যদিও শরৎচন্দ্র সৌদামিনীর মুখ দিয়ে তা স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন—"আজ এত বড় মিথ্যেটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্ছে···কিন্তু তখন ভেবেছিলুম···সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালোবাসি।" কিন্তু এই উক্তির স্বপক্ষে কোন পরিষ্কার যুক্তি আমরা আকার-ইঙ্গিতেও অনুধাবন করতে পারি না। দেখা যাচ্ছে, সৌদামিনী তার বিগত জীবনের চিত্ত-দৌর্বল্যের জন্য ব্যথিত এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত। তার সেই মোহগ্রস্ত অবস্থার প্রতি ঘৃণার অন্ত নেই—অনুশোচনায় বর্তমানের মুক্ত জীবনকেও যেন সে গ্রহণ করতে পারছে না।

আমাদের মনে হয় ব্যবহারিক জীবনে দার্শনিক তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার অকিঞ্চিৎকর স্বরূপটি প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। যুক্তিতর্ক প্রমাণ ইত্যাদিতে যে বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়, সে বস্তুর কাছেই জীবনে পদে পদে হার মেনে চল্‌তে হয়। শরৎচন্দ্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনিই একটা সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন "স্বামী" গল্পের মধ্যে। এই গল্পে যে সব চরিত্রগুলি ভগবান সম্পর্কে সন্দেহের সুর তুলেছে—শরৎচন্দ্র তাদের দিয়েই স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন ভগবানের অনিবার্য শক্তির কাছে তাদের মাথা নত করতে হবেই। কিন্তু এর ফলে শরৎচন্দ্রের শিল্পচেতন মন সৃষ্টির মাধুর্য বিকিরণে হয়েছে বিরত। অনেক ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের সর্বজনীন সাহিত্যিক রসধারা তাতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি।

নরেন-সৌদামিনীর পারস্পরিক সম্পর্ককে শরৎচন্দ্র যে ঠিক ইচ্ছে করেই অবহেলা করেছেন তা নয়। নরেন অপেক্ষা ঘনশ্যামকে সৌদামিনীর জীবনে অনেক বেশী আকাঙ্ক্ষিত ক'রে তোলবার জন্যই হয়তো নরেন-সৌদামিনীর

প্রেমকে তিনি মোহ ব'লেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অথচ নরেন-চরিত্র যে একটা হীন পাষণ্ড চরিত্র, তাও আমাদের মনে হয়নি। ঝড়ের দিনে ফুল কুড়োনো উপলক্ষে সৌদামিনীর প্রতি নরেনের যে অসংযমের প্রকাশ ঘটেছে তাকে যৌবনের অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শেখর-ললিতার কথাও স্মরণীয়। ললিতার দায়িত্ব শেখরের নেবার ক্ষমতা আছে এবং সে তা নিতে প্রস্তুত। নরেনের দিক্ থেকেও এমন কোন দায়িত্ব-বোধ দেখা দিত কিনা কে বল্‌তে পারে? সামাজিক বাধার দুর্লঙ্ঘ্যতা সৌদামিনী-নরেনের মধ্যে ছিল অতি বিস্তৃত, যাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি সম্বন্ধে কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তা তথাকথিত প্রগতিপন্থী শরৎচন্দ্রের মনে স্থান পায়নি। তাই নরেন-সৌদামিনীর আকর্ষণের বর্তমান-ভবিষ্যৎ কোন দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করেননি। শুধু একথাই আপাতভাবে মনে হয় সৌদামিনী তার কিশোর বয়সের প্রেমের জন্য যে ভাবে আত্মগ্লানি প্রকাশ করেছে, শরৎ-সাহিত্যে এ অত্যন্ত আকস্মিক এবং অবাঞ্ছিত। প্রেমের মধ্যে মোহ কিছু অংশ অধিকার ক'রে থাকবেই। এই মোহ থেকেই উৎপন্ন হয় অন্ধতা। অর্থাৎ যখন বলি প্রেম অন্ধ—বিচারশক্তি, ভালমন্দ জ্ঞান তখন লুপ্ত হ'য়ে যায়। যে প্রেমের মধ্যে দহনের জ্বালা নেই, সে প্রেম নিষ্প্রাণ, নির্জীব। সে প্রেমের দ্যুতি জোনাকির আলোর মতো। যে প্রেমের মধ্যে উত্তাপ আছে, উত্তেজনা আছে, সে প্রেম দীপশিখার মতো দহনযুক্ত প্রেম। দেহকে কেন্দ্র ক'রে যে প্রেম সেখানে উত্তাপ থাকবেই, প্রেমহীন দেহসর্বস্বতা দাহহীন। এই মোহভঙ্গেই আসে দুঃখ, আসে বিরহ। প্রেমিকবর শ্রীকৃষ্ণের মোহমুক্তির পরই না তাঁর মথুরাগমন—কর্তব্যবোধে প্রত্যাবর্তন। বিরহের অশ্রুসাগর অতিক্রম ক'রে রাধারও ভেঙ্গেছে মোহ; ভাব-সম্মিলনেই তার পূর্ণ হয়েছে প্রেম-সাধনা। সুতরাং মানুষের জীবনে এই মোহ আছে ব'লেই তো বৈচিত্র্যের সন্ধান মানুষ পায়। শুধু প্রেমে কেন, প্রতি পদেই তো মায়াবিষ্ট হচ্ছে জীব এই পৃথিবীতে। কিন্তু নিষ্ঠা থেকে চ্যুতি কোন ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নয়। মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা ক'রে ক'জন জগতে পথ চলতে পেরেছে—পারেনি

ব'লে যাদের জীবনে এসেছে ব্যর্থতা—শরৎচন্দ্রই বলেছেন…"ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্য-জগতের সকল মাধুর্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।"

পার্বতী-হেমনলিনী-রমার মতো সৌদামিনীকে সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়েই স্বামীকে চিন্‌তে হয়েছে। অনূঢ়ার প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে "ছেলেমানুষী" করবার অবকাশ বাঙালী সমাজ-পুষ্ট পরিবারের নেই। কিন্তু নর-নারীর ব্যক্তিমন? তার পরিচয় শরৎচন্দ্রই সর্বাগ্রে দিয়েছেন তাঁর সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির দ্বারা। পার্বতী-হেম-রমার প্রেম-প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ; অথচ যেখানে সৌদামিনী প্রথম থেকেই বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে স্বামীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'লো, নরেনের জন্য কি তার মনে কোন প্রতিক্রিয়াই জাগলো না? ঘনশ্যামের প্রতি সে প্রেম-শূন্যা থাক্‌তে পারে, কিন্তু নরেনের প্রতি তার প্রেম বিশুষ্ক হ'য়ে উঠ্‌বে কেন? তার যথাযোগ্য কারণ গ্রন্থভাগে আমরা পাইনি।

নরেনের অসংযম প্রকাশ তাকে যত ছোটই ক'রে থাকুক না কেন, সৌদামিনীর মনে তখন সে জন্য বিশেষ গ্লানি দেখা দেয়নি। তা ছাড়া সৌদামিনীর মা যখন তার বিবাহের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন, সৌদামিনী সশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। অবশেষে বিবাহ যখন ঠিক হ'য়ে গেল, তার মনে দুর্ভাবনাও দেখা দিয়েছে—এমনকি "শুভদৃষ্টি হোলনা, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুঁজে রইলুম।" তারপর কাঁঠালীচাঁপার কুঞ্জে ব'সে উভয়ের বিদায়-গ্রহণের মুহূর্তে বেদনায় অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা শরৎচন্দ্র সংক্ষেপে চিত্রিত ক'রে থাকলেও প্রথম প্রেমের তুচ্ছতার মূল্য না দিয়ে উপায় নেই। শরৎচন্দ্র সৌদামিনীর উক্তির মধ্যে দিয়েই তাদের প্রেমের প্রতি যে অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু আমরা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি। এখানে নরেন-সৌদামিনীর মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল—কিন্তু তার পরিমাণ বা নিদর্শন শরৎচন্দ্র আমাদের দেননি। আমাদের মনে হয় শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলি থেকে নরেন ভিন্ন গোত্রীয়। পুরুষের যে ছন্নছাড়া নিঃসহায় পরিচয় নারীর মনকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করে তা নরেনের ছিল না।

তাই সৌদামিনীর স্নেহ-মমতা বোধ, দায়িত্বজ্ঞান প্রেমের অনুপূরক হ'য়ে নরেনের প্রতি বর্ষিত হয়নি। নরেনের জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা সৌদামিনী উপলব্ধি করতে পারেনি—অথচ উদাসীন ঘনশ্যামের প্রতি তার পরিবারের দুর্ব্যবহার এবং ঘনশ্যামের অসহায় ভাব সৌদামিনীর বিদ্রোহের প্রাচীরে প্রথম ভাঙন ধরিয়েছে। তাই যখন "সদু" বলেছে, "আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংশ্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি।"—এই উক্তির যাথার্থ্য অপেক্ষা "তার প্রণয় নিবেদনের মুহূর্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত সে আমি ভুলিনি।"—এই উক্তি শরৎচন্দ্রের নারী-প্রকৃতির চিত্তরহস্য উদ্ঘাটনের প্রকৃত সহায়ক। নরেন-সৌদামিনীর প্রণয়ে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা অপেক্ষা উভয়ের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের রহস্যে আস্থা স্থাপন করা এক্ষেত্রে যথাযথ। দেবদাস, গুণীন্দ্র, রমেশ তাদের পুরুষোচিত চির-ঔদাসীন্য দিয়েই তো পার্বতী, হেম, রমাকে বেঁধে রেখেছিলো। ঘনশ্যামের সৌদামিনীকে জয় করবার পক্ষেও এই চিরনির্লিপ্তের আবরণটুকু অটুট ছিল। বৈষ্ণবীয় মহত্ত্বের কথা এখানে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না। নরেনের দুর্ভাগ্যের কারণ তার অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা। কথায়, আতিশয্যে, ক্রন্দনে সৌদামিনীকে সে আকৃষ্ট করতে চেয়েছে, কিন্তু সৌদামিনীর হৃদয়ে কোন গভীর অধিকার তার জন্মায়নি। সেজন্যই বোধ হয়—"...শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কী বাঁক দিয়ে সেই কাঁঠালীচাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যির নীরব সাক্ষী।" অথচ তারপর ছায়ার মতোই মিলিয়ে গেছে সবকিছু স্মৃতি তার মন থেকে। এবার থেকে শুরু হয়েছে সৌদামিনীর স্ত্রী হিসেবে অধিকার স্থাপনের দ্বন্দ্ব। নরেনের সঙ্গে তার আত্মা মিতালী পাতায়নি, পথ পায়নি ব'লে। তাই প্রেম সেখানে অগভীর—মোহও সেখানে খেলার মায়া। এবার সৌদামিনী এবং তার স্বামীর মধ্যে চিরন্তন নর-নারীর লীলারহস্যের হয়েছে সূচনা। নরেনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তার ব্যর্থতার পরিচায়ক।

সৌদামিনী ভেবেছিল নরেন ছাড়া আর কোন পুরুষের কাছে সে নতি-

স্বীকার করতে পারবে না। তাই প্রথম থেকেই আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সে সচেতন হয়েছে, এমনকি স্বামীর প্রতি প্রত্যেক ব্যবহারে সৌদামিনীর দাম্ভিক মনোভাবের পরিচয় পাই। "স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধ'রে ফোঁস ফোঁস ক'রে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।" সুতরাং একদিকে যেমন সৌদামিনীর "স্বামীর ধর্মপত্নী" হবার ইচ্ছে মোটেই নেই, কোনপ্রকার কর্তব্য পালনেও সে বীতরাগ, অন্যদিকে নরেনের জন্য বেদনা-বোধের পরিচয়ও তার মধ্যে পাওয়া যায় না। "...সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্যাদাহীন প্রেমের ভার আল্‌গা দিলেই দুর্বিষহ হ'য়ে ওঠে...।" শরৎচন্দ্রের এই ব্যক্তিগত মতবাদ সৌদামিনীর নরেনের প্রতি প্রেমসঞ্চার এবং সেই প্রেমবোধের প্রতিক্রিয়ায় যথার্থ প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত হ'তে পারতো। কিন্তু তেমন কোনও জীবনের অমীমাংসিত সমস্যা নরেন-সৌদামিনী প্রসঙ্গে উত্থাপিত করবার প্রয়াস শরৎচন্দ্রের এই গ্রন্থ-মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। এদিকে সৌদামিনীর নারীজনোচিত কোন ভাবান্তর আমরা তার বিবাহের পরবর্তী অধ্যায়ে অনুভব করিনি। প্রেমের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে নারী প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সে পুরুষ-প্রকৃতির ঔদাসীন্যের রাশ টেনে ধ'রে চির-বৈরাগ্যের মধ্যে বিস্ময়কাতর মুগ্ধতা আনে। নরেনের দিক থেকে এ জাতীয় সুযোগ সৌদামিনীর জীবনে দেখা দেয়নি। তাই ষোল-সতেরো বছর বয়সে সৌদামিনী তার কিশোরী জীবনের অধ্যায় অতিক্রম ক'রে এসেও নারীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়নি। এ সম্পর্কে অবশ্য সৌদামিনীর ফিলোজফীর অনুপ্রেরণার আত্যন্তিকতা কতকাংশে দায়ী। একদিকে নরেন অন্যদিকে সৌদামিনীর মামা সৌদামিনীর প্রকৃত-চারিত্রিক বিকাশের পথ রেখেছিলো রুদ্ধ ক'রে। সেই রুদ্ধ দ্বারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে স্থিতধী ঘনশ্যামের নির্লিপ্ত অথচ একনিষ্ঠ প্রেমের অনির্দেশ্য সঙ্কেতে। অভিমান, অভিযোগ, প্রতিবাদ, দাবি, কোনপ্রকার পুরুষোচিত সক্রিয়তা নিয়ে ঘনশ্যাম সৌদামিনীর স্পর্শকাতর অনুভূতিতে আঘাত করেনি। বিনয়-নম্র

বচন, স্নেহবিমুগ্ধ ব্যবহার, সেবাপরায়ণ নিষ্ঠা এবং অবিচলিত ধৈর্য ঘনশ্যামকে আত্মস্থ সৌদামিনীর ক্ষণভঙ্গুর বিদ্রোহের প্রতিরোধ করেছে।

সৌদামিনী ঘনশ্যামের সান্নিধ্যে এসে নূতনভাবে জেনেছে, জীবনটা কেবলমাত্র কতকগুলি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক্ষেত্র নয়; অথবা তাল, মাত্রা, লয়-সুরযুক্ত নিখুঁত ছন্দে বাঁধা রাগিণীতে জীবনের ধারা প্রবাহিত নয়। জীবনের প্রতি পদে বেসুরো ছন্দ, বিপর্যস্ত অনুভূতি ও পরস্পর-বিরোধী অভিজ্ঞতা। যুক্তি-তর্কের ছকে ফেলে এ সবের যাচাই চলে না। জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানকল্পে আধুনিকতম সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন adjustment বা Compromise-এর কথা। আমাদের অতি প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শনের বৈষ্ণবীয় অনুভূতিতে এই সমাধানই দেখা দিয়েছে ত্যাগ, ধৈর্য এবং বিশ্বজনীন প্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে। ঘনশ্যাম বৈষ্ণবীয় সাধনার জীবন্ত বিগ্রহ। গিরীশ, গোকুল, যাদবের সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচয় যেন ঘনশ্যামের মধ্যে দিয়েই রূপ পেয়েছে। দৃঢ়-সংযম, স্মিতহাস্য, স্বল্পভাষণ প্রয়োগ ক'রে ঘনশ্যাম তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় জ্ঞাপন করেছে। সৌদামিনীর সযত্নপুষ্ট অনমনীয়তা বিগলিত হ'তে শুরু করেছে ঘনশ্যামের নিষ্ক্রিয় প্রেমানুশীলনের ফলেই। এবার সৌদামিনীর মনের মণি কোঠায় সাড়া পড়েছে, সে বিস্ময়াহত হয়েছে "...মনের মধ্যেও এমন দুটো উল্টো স্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে...।" স্বামীর সঙ্গে যে স্ত্রী কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না, সে স্বামীর অমর্যাদায় মন কাতর হ'য়ে ওঠে কেন? স্বামীর আন্তরিক স্নেহপূর্ণ সেবায় সৌদামিনী অভিভূত হ'য়ে পড়েছে ক্রমশঃ, কিন্তু আত্মসমর্পণের যুক্তি তখনও তার জীবনে দেখা দেয়নি। তাই..."ডাঙ্গায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মতো ভুল শেখা..." ভালবাসায় তার যে বিভ্রান্তি ঘটেছিলো তার প্রায়শ্চিত্তও খুব সহজভাবে তাকে সাধন করতে হয়নি। সুতরাং সৌদামিনীর ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহভাব পূর্বাপেক্ষা শিথিলতা লাভ করলেও বাইরে তার কাঠিন্যটুকু সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। অপ্রিয় সত্য কথা বলায় বীরত্ব প্রকাশ পায় বটে, অপর পক্ষকে আঘাত করা যেতে পারে মাত্র, কিন্তু তাতে তৃপ্তিও

নেই, আনন্দও নেই। সৌদামিনী ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা তুলে ঘনশ্যামকে আঘাত দিয়েছে, কোন কুণ্ঠাই তার জাগেনি। বিবাহিত জীবনযাপন করতে গিয়ে নিজেকে পৃথক ক'রে রাখা চলে না, আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়, গৃহধর্ম পালন করতে হয়—এ সত্যজ্ঞান সৌদামিনীকে ঘনশ্যামই মুক্তকণ্ঠে দান করেছে। স্বামীর প্রতি শাশুড়ী-জা-ননদ প্রভৃতির অন্যায় ব্যবহারে সৌদামিনী অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌লে অথবা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হ'লে ঘনশ্যাম তাকে নিরস্ত ক'রে বলেছে—"...আমি বোষ্টম, আমার তো নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মতো সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হ'তে হবে।" কারণ সৌদামিনী বৈষ্ণবের স্ত্রী। কিন্তু ঘনশ্যাম কি সৌদামিনীর ব্যক্তিসত্তার বিলোপসাধন করতে চেয়েছে? তা নয়। বৈষ্ণবীয় সাধনার সমস্ত লক্ষণই ভারতীয় নারী-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। সৌদামিনীর সেই নারীধর্ম অনুশীলন এতদিন হয়নি, যার ফলে নিজের সম্পর্কে সে এতদিন মিথ্যা ধারণা নিয়ে দিন কাটিয়েছে। আত্মদর্শন তার ঘটেনি ব'লেই নারীর প্রকৃতিগত স্নেহ, মমতা, সহনশীলতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতির মর্যাদা সে কখনও বুঝতে চেষ্টা করেনি। এমনিভাবে স্ব-আত্মার প্রতি সৌদামিনী যেমন ছিল বিমুখ হ'য়ে, স্ব-আত্মার প্রতিফলনে স্বামীর স্বরূপ দর্শনও তার ঘটে ওঠেনি।

ঘনশ্যামের গভীর বিশ্বাস এবং ধৈর্যেই হয়তো শেষ পর্যন্ত সৌদামিনীর চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঘনশ্যামের বিশ্বাসের প্রতি, ভগবানের দোহাই দিয়ে নানাপ্রকার বিদ্রূপ-ব্যঙ্গপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করলেও, নির্লিপ্ত স্বামীর অবিচল সংযম তাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ করেছে। ছলাকলায় স্বামীর বিহ্বলতা ঘটাতে চেষ্টা ক'রেও সৌদামিনী বিফল হয়েছে। কিন্তু কোন্ এক অনবহিত ক্ষণে সৌদামিনীর বিদ্রোহের আবরণ খুলে আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে তা সে নিজেই টের পায়নি। এই সময় নরেনের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সৌদামিনীর ব্যর্থ সংযমের আবরণ অনাবৃত হ'য়ে পড়েছে। এবার যেন কঠিন আঘাত পেয়েই তার অবরুদ্ধ প্রেম আত্মপ্রকাশ করেছে স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে।

ঘনশ্যামের নিষ্কলুষ চিত্ত, দৃঢ় মনোবল, অনায়াসেই পরপুরুষের আতিথেয়তা রক্ষার্থে স্ত্রীকে কর্তব্যসাধনে নিয়োজিত করতে পেরেছে। কোন সঙ্কোচ বা প্রশ্ন তার মনকে উদ্বেল করেনি। সৌদামিনীর উভয় সঙ্কট অবস্থা—ঘনশ্যামের কাছে মাথা নত করতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু নরেনের কাছে তার চিত্তের দার্ঢ্য রক্ষিত হয়নি। অথচ নরেনের উপস্থিতিতে সে অসুখী, কারণ—"কখন কোন ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে গিয়েছিলেন সে আমি টেরও পাইনি।" নরেন এবং ঘনশ্যামকে পাশাপাশি স্থাপন ক'রে সৌদামিনী যেন ঘনশ্যামের উদার চরিত্রের চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে—"আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালোবেসেছেন, সে তো আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালোবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার তো হয়নি।" স্বামীর অশ্রুবিগলিত ধ্যাননিরত মূর্তি সৌদামিনীর অন্তরের সর্বাংশ অধিকার ক'রে দেখা দিয়েছে, তীব্র অন্তর্দাহে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও। "পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হ'য়ে যায়।" সৌদামিনী অবশেষে নরেনের কাছেই অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। নরেন যখন তাকে বুঝিয়ে দিল স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সে চলে যেতে পারে, কারণ স্বামীকে সে ভালোবাসেনি—তার বিরুদ্ধে সৌদামিনী প্রতিবাদ করতে পারেনি। অহঙ্কার-অভিমানে তখনও সে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ। স্বামীকে ভালোবেসে ঘর-সংসার করা তার পক্ষে যেন একান্তই অসম্ভব এ বিশ্বাসকে সৌদামিনী তখনও মন থেকে দূর করতে পারেনি। তা ছাড়া ঘনশ্যামের বিমাতার কাছে যখন তার এবং নরেনের নির্জন সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হ'য়ে পড়ে, একটা প্রচণ্ড শাস্তির জন্যই সে যেন অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু "স্বামীর নিত্যপ্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।" তাই স্বামীর কাছে নিজেকে তার এত ক্ষুদ্র মনে হ'তে থাকে যে, স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই তখন সে দেখতে পায় নি। ঠিক এই সময়ই মায়ের দুঃসংবাদ বহনকারী চিঠি

এবং তা উপলক্ষ ক'রে সৌদামিনীর রুদ্ধ আবেগের ক্রুদ্ধ প্রকাশ ঘটে। ঘনশ্যামের স্থির, ধীর, অনুচ্ছ্বাসিত স্বল্পবাদিতায় সৌদামিনী আরও যেন মরিয়া হ'য়ে ওঠে। অন্তরের নির্বাপিত অগ্নিশিখা এবার নিজেকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যামকেও দগ্ধ করতে উদ্যত হয়। গহনার প্রসঙ্গ উঠতেই সৌদামিনী আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে—ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ঘরের মধ্যে গহনা এবং বেনারসী কাপড়-জামার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু ক'রে দেয়। স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে এতবড় অশান্তিপূর্ণ দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরও সৌদামিনী আত্মঅহঙ্কার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি।—"কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগলো, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।" কিন্তু মান বিসর্জন দিয়ে সেদিন রাত্রেই নরেনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। নরেনের প্রতি সৌদামিনীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণও তো তখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই, তবে কি স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই তার গৃহত্যাগ? নরেনের আশ্রয়ে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিলেও আত্মহত্যা করবার কথা তো সৌদামিনীর মনে পড়েনি। সুমধুর না হোক শুভ দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সৌদামিনী স্বামীর মহৎ প্রাণতার স্পর্শ পেয়েছিল ব'লেই, পুনরায় সেখানে ফিরে গিয়ে জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য লাভ করতে চেয়েছে—"…যতবড় অপরাধ হোক সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই। এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেছি ভাই। আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেন দাদা,…।" সৌদামিনীর এ বিশ্বাস তার জীবনে সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে ঘনশ্যাম যখন তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। একনিষ্ঠ ঔদার্যপূর্ণ অন্তর নিয়ে যে মানুষ বলতে পারে—"…আমি জানি তুমি আমারই আছ।"—তাঁর প্রেমে সৌদামিনীর জীবন ধন্য হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ঘনশ্যামের মহৎ চেতনাকে সমাজের নিষ্ঠুর বিধান আবৃত করতে পারেনি। ত্যাগ-মাহাত্ম্যে যে জীবনের কঠিন দুঃখকে সহ্য করতে পেরেছে, গ্রহণের দায়িত্ব এবং প্রেমের মূল্য তার কাছে কখনও কমে যায় না। যে বিশ্বাসে ঘনশ্যাম মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ সাধক ও সেবক, সে বিশ্বাসেই তার অবারিত প্রেম পত্নীর মর্যাদা রক্ষার্থে উন্মুখ। অপরিবর্তনীয় দৃঢ়তা তাকে জীবনে কখনও

অসাফল্য বা অগৌরবে চিহ্নিত করতে পারে নি। তাই সৌদামিনীর প্রত্যাবর্তন ঘনশ্যামের কাছেও পরমপ্রার্থিত।

হতভাগ্য নরেনের জন্য শরৎচন্দ্র কোন সমাধানই নির্দেশ করেননি। সৌদামিনীকে লাভ করবার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল—একে অন্যায় ব'লে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি পৌরুষ-বিরুদ্ধ ব্যাপার ; হয়তো সৌদামিনী-ঘনশ্যামের সুখকর মিলন হ'লে সে কোনও আশা নিয়েই সৌদামিনীর দাম্পত্যজীবনে আবির্ভূত হ'তো না। দেবদাসের অধঃপতন পার্বতীকে না পেয়েই ঘটেছিলো ব'লে আমাদের দুঃখের সীমা নেই। কিন্তু স্খলিত চরিত্র না হ'য়েও নরেনের প্রতি শরৎচন্দ্র পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেননি। আবেগ-প্রবল মুহূর্তে কতকগুলি উচ্ছ্বাসের ঢেউ তুলতেই যেন নরেন-চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সঙ্গেই কাহিনীতে বক্র ও জটিল গতি-ভঙ্গী দান করতে। ঘনশ্যামের ঔদার্যের অন্তরালে নরেনকে লোপ ক'রে দেবার প্রয়োজন ছিল না। নরেনের বাসনা যতই সমাজ-বিরোধী হোক প্রেমের তীব্রতা তার ছিলই। তা ছাড়া এমন কোনও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিও সে নয় এবং গর্হিত কাজও সে করেনি।

পাত্র-অপাত্র নির্বিশেষে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ এবং সহানুভূতি থেকে নরেনকে বঞ্চিত হ'তে দেখে আমাদের মনে সংশয় জাগে বোধহয় শরৎচন্দ্র ভগবানে অবিশ্বাসীদের প্রতি সুবিচার করতে অস্বীকৃত। সে জন্যই সৌদামিনীর মত অনুতপ্ত শোকোচ্ছ্বাস নরেনের কাছ থেকে তিনি দাবি করেননি।

সৌদামিনীর মামা

"স্বামী" গল্পে সৌদামিনীর মামার ভূমিকা যদিও অনতিবিস্তৃত, তবুও এই চরিত্রের প্রাধান্য সৌদামিনীর শৈশব এবং কৈশোরে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হয়। মামার কাছে আদর-যত্ন-শিক্ষা দীক্ষা লাভ ক'রে পিতৃহীনা সৌদামিনী কোন অভাবই অনুভব করেনি। "...মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক...মুখে বলতেন বটে, তিনি "Agnostic" সেও একটা মস্ত ফাঁকি।" এই ফাঁকির ফল

মামার জীবনে কি ভাবে দেখা দিয়েছিলো জানি না ; কিন্তু মামার সনির্বন্ধ যত্নে ভাগ্নীটি হ'য়ে উঠেছিলো পটু তর্কবিদ। পাড়াগাঁয়ের সমাজের ভয় মামার ছিল না ব'লেই সৌদামিনী অনায়াসে মামার সমর্থনে পনের বছর বয়স পর্যন্ত নরেনের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছে। মামা ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিপন্থী, ঠাকুর-দেবতা, সাধু সন্ন্যাসীর প্রশ্রয় তিনি কখনই দিতেন না এবং সৌদামিনীকেও তাঁর যোগ্য শিষ্যাই ক'রে তুলেছিলেন। মামার মনটি ছিল অত্যন্ত সরল, তাই নরেন-সৌদামিনীর ঘনিষ্ঠতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তিনি দেখেননি। সর্বক্ষণ ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে খুব শিগ্‌গীরই বোধহয় ঈশ্বরের ডাক তাঁর কাছে এসে পৌছেছিলো। তাঁর সযত্ন লালিত সৌদামিনীর পরিণাম দেখে যেতে তিনি পারেননি। ভগবানের পায়ে প্রথম স্থান পায় বিশ্বাসীরা, তারপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসীরা। কারণ "না" যারা বলতে পারে 'হ্যাঁ' বলা তাদের দিয়েই সম্ভব, কোনপ্রকার দ্বিধা-বিভক্ত চিত্ত নিয়ে তারা চলে না। "না" এবং "হ্যাঁ"র মধ্য পথে যারা চলে তাদের সন্দেহ-সংশয়-ভীরুতা কোনদিনই দূর হয় না।

ঘনশ্যামকে প্রথম দর্শনে মামা যত গভীরভাবে চিনেছিলেন, সৌদামিনীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাকে সাধনা ক'রে চিন্‌তে হয়েছে। যে মামার শিক্ষায় সৌদামিনীর দুর্বিনীত অহঙ্কার পরিপুষ্ট হয়েছে, ভগবানকে অস্বীকার করবার সাহস দেখা দিয়েছে, সেই মামাই মৃত্যুশয্যায় ব'লে গেলেন—"সদুর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে।" মামার এই শেষের শুভানুধ্যায়ে সৌদামিনীর পুনর্জন্ম ঘটেছিলো।

সৌদামিনীর সৎ-শাশুড়ী

শরৎ-সাহিত্যে স্বার্থপর হৃদয়হীনা নারীদের অন্যতমা চরিত্ররূপে ঘনশ্যামের বিমাতা আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘনশ্যামের প্রতি এই বিমাতার বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না, তাই বয়স্থা বধূর আগমনে প্রথমে সে সশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলো এই জন্য যে নির্বিচারে অন্যায় করবার সুযোগ থেকে পাছে বঞ্চিত হ'তে হয়। নিরীহ, আশুতুষ্ট ঘনশ্যামের প্রতি দুর্ব্যবহার ক'রেও

বিমাতার মাতৃহৃদয় কিছু পরিমাণে বিচলিত হয়নি; অথচ ঘনশ্যাম কখনও অশ্রদ্ধা করেনি মাকে। সৌদামিনী স্বামীর প্রতি বিরূপ থাকলেও শেষ পর্যন্ত শাশুড়ীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব না ক'রে পারেনি। এদিকে "আড়ি-পাতার ব্রহ্মাস্ত্র" দ্বারা মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ী পুত্রবধূর দাম্পত্য বৈষম্যের খোঁজটুকু সংগ্রহ করতে ভোলেনি। "এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ। প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু নীচুর ব্যবধানই রাখেনি।" সৌদামিনীর সঙ্গে নরেনের গোপন আলাপন লক্ষ্য ক'রে যে মন্তব্য এবং মুখাবয়বের ভাব প্রকাশ সৌদামিনীর শাশুড়ীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তাতে তাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট-মনা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায়না। সৌদামিনীকে রান্নাঘরে ঢুকতে না দেওয়া, বাড়ী থেকে বিদায় করবার মনোভাবে, নিজের পুত্রকন্যার স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থের সুযোগ-গ্রহণে বিমাতাকে তৎপর ব'লে মনে হয়।

ঘনশ্যাম বিমাতাকে ভক্তি করেছে, তার বিধান স্বীকার করেছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব হারায়নি। তা হ'লে সৌদামিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহস পেতোনা। এজন্য তাকে লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে কম নয়। সৌদামিনীর শাশুড়ী মাতার গৌরব লাভ করতে চেয়েছে, কিন্তু মাতার কর্তব্য কিছুই করেনি।

মুক্তো ঝি

মুক্তো ব্যক্তিগতভাবে অসদাচারী নয়, কিন্তু লোভী। লোভের বশবর্তী হ'য়ে সে যে কোন কাজে লিপ্ত হ'তে প্রস্তুত। শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ"-এর সুন্দরী ঝি এই মুক্তোরই সমগোত্রীয়া। মুক্তোর সাহায্যে নরেন সৌদামিনীর গোপন খবর সংগ্রহ করেছে, এবং মুক্তোর হাতে চিঠি দিয়ে গৃহত্যাগের প্রস্তাব জানিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সৌদামিনীর আপাতঃ ব্যবহার থেকে মুক্তো সহজ ভাবেই জেনেছে, সৌদামিনী অসুখী। নরেনের কাছে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য অসুখের কথাই সে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু পরপুরুষের ঔৎসুক্যকে প্রশ্রয় দিয়ে টাকার লোভে মুক্তো-শ্রেণীর দাসীরা গৃহবধূদের সর্বনাশে উদ্যত হয়। মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও এরা পশ্চাৎপদ হয়না। লোভের আত্যন্তিকতায় সাধারণ বিবেকবুদ্ধিটুকুও মুক্তো হারিয়েছিল।

কাহিনীর উপসংহারে মুক্তোর অনুতপ্ত চিত্তের পরিচয় আমরা পেয়েছি। যে মুক্তো সৌদামিনীকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে, তার জন্যই সৌদামিনী আবার ঘরে ফিরেছে। ঘনশ্যামের উদার প্রাণের স্পর্শে এবং সৌদামিনীর অনুতাপ-জর্জরিত অন্তরের কাতরতায় মুক্তোর বিবেকে সাড়া জেগেছে।

উপসংহার

"স্বামী" গল্পের কাহিনী পরিকল্পনায় দোষ-ত্রুটি থাকলেও, কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে এই গল্পের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। প্রথম "আসার আশায়" গল্পে এবং দ্বিতীয় "স্বামী" গল্পে শরৎচন্দ্র সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে চল্‌তি ভাষার প্রয়োগে সাফল্যলাভ করেছেন। সাধারণতঃ অন্যান্য গল্পগুলি তাঁর ভাষার মিশ্রণ-দোষে দুষ্ট। এখানে সংলাপের পরিমিতি এবং সংযত রূপ বিগত ঘটনা-বিবৃতির মাধ্যমেও যথাযোগ্য সজীব হ'য়ে পাঠকের অনুভূতিকে আকৃষ্ট করেছে। তবে সৌদামিনীর উচ্ছ্বাস-পোষিত দীর্ঘ বাণীর প্রাবল্যে বর্ণনাভঙ্গীর মাধুর্য প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অনু-তাপের উদগ্রতায় নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন পূর্ব কার্যকলাপ স্মরণ ক'রে যে সব "যাত্রা ধরণের" উক্তি সৌদামিনী প্রয়োগ করেছে, তাতে দুঃখ বোধের পরিবর্তে হাসির উদ্রেক হয়—"ওরে হতভাগী, সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?" অথবা, "মা বসুমতী, গাড়ীশুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?" শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রবণ মুহূর্তগুলি বর্ণনা-রীতির দুর্বলতায় মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ব'লে মনে হয়। তবে ঘনশ্যাম-সৌদামিনীর পারস্পরিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র রচনায় শরৎচন্দ্র তাঁর স্রষ্টারূপের আবেশ মুহূর্তের সদ্‌ব্যবহার করেছেন। ঘনশ্যামের পারিবারিক চিত্র শিল্পায়ণে একটি নূতনতর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। বিমাতা-সপত্নী-পুত্রের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বিমাতার স্বার্থপরায়ণতার জন্য। কিন্তু পুত্র-পুত্রবধূর দাম্পত্য অশান্তির সূত্র ধ'রে পারিবারিক গোলযোগ গল্প-পর্যায়ে এই প্রথম ব'লেই অভিনবত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়।

(১৩)

একাদশী বৈরাগী

"একাদশী বৈরাগী" সার্থক ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীর সূত্রপাত যেমন আকস্মিক, সমাপ্তি তেমনি অতর্কিত। তা ছাড়া ছোটগল্পের সমাপ্তিতে যে বিস্ময়বোধ কাহিনীর আকস্মিকতায় পাঠক-মনকে আবিষ্ট করে, এখানে সে রসাস্বাদ দুর্লভ নয়। কালীদহ গ্রামের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অপুর্ব-পরিচিতি এবং তার আদর্শবাদের দ্বারা সমগ্র গ্রামবাসী কিভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লো কাহিনীর প্রাথমিক অংশে এই বর্ণনা পাওয়া যায়। এই অংশে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ-নিপুণতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। আদর্শবাদের জোয়ার এবং বিজ্ঞানের প্রভাব যখন দেশের মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত, তখন হিন্দুধর্মের রক্ষকগণ সনাতন ধর্মের রক্ষণকল্পে প্রাচীন রীতি-নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে চালু করতে উদ্‌গ্রীব। এই ব্যাপারে যে কত অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিলো, কত শিক্ষিত যুবক আদর্শবাদের মোহজালে আবিষ্ট হ'য়ে সত্যকার জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছিলো, সে ইতিহাস অজ্ঞাত নয়। অপুর্ব তারই প্রতিনিধি। এই অংশের বর্ণনায় ব্যঙ্গরস অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠেছে বটে, তথাপি বর্ণনা-ভঙ্গীর দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখনী যথেষ্ট সাবলীল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতাটির কথা মনে করা যে॰ ॰ারে।

আদর্শবাদের ধূয়ো তুলে অপুর্ব গ্রামে নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ক'রে গ্রামের নৈতিক উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছে। এই প্রসঙ্গে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কথা ওঠাতে অর্থের সমস্যা দেখা দেয়। সেই সূত্রে একাদশী বৈরাগীর কাহিনীতে আবির্ভাব। এইভাবে কাহিনীতে অন্যতম প্রধান চরিত্রের পরিচিতি ঘটানো অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। অবশ্য অপুর্ব-চরিত্রই এখানে প্রধান, কারণ তার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই কাহিনীতে মুখ্য স্থান নিয়েছে, কিন্তু একাদশীর জীবন-পর্যালোচনা কাহিনীর অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে।

একাদশী বৈরাগীর প্রসঙ্গ ওঠাতে অত্যন্ত কৌশলে তার পুর্ব-পরিচিতি খুব

ইঙ্গিতপূর্ণ এবং পরিমিতি বজায় রেখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এরপর একাদশী চরিত্রের দুই আপাত বিপরীত দিকের পরিচয় পাওয়া যায় কাহিনীতে। তার ফলে অপূর্বের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শেষে একটি আবেগময় পরিণতি দিয়ে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

মোট কথা মূল কাহিনী একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত। চরিত্রের কোনও 'পরিবর্তন কাহিনীতে দেখা যায় না। তা ছাড়া ঘটনার বাহুল্য ছোটগল্পের ইঙ্গিতময়তা ও সাঙ্কেতিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। তাই আঙ্গিকের দিক দিয়ে 'একাদশী বৈরাগী' সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে।

একাদশী চরিত্রে দুই আপাতবিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। পিতৃপুরুষের বাস্তভিটার প্রতি একাদশীর মমতার অন্ত নেই। তাই স্মৃতিরত্নের সেবায় লাগাতে না পেরে সে দুঃখিত, কারণ তার বাবা মরণকালে দিব্যি দিয়েছিলেন, বাস্তভিটে না ছাড়তে। এর দ্বারা দেশের মাটির প্রতি একাদশীর আকর্ষণের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। দেশের সমাজ তাকে ত্যাগ করেছে, দেশের মাটি তো করেনি! সমাজের বিধানকে মানতে বাধ্য হ'য়ে একাদশীকে বাস্তভিটে ত্যাগ করতে হয়েছে, অপযশের নির্মম বোঝা মাথায় নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে, তবুও অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেয়নি; সে দাঁড়িয়েছে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে। সমাজের নিষ্পেষণ একাদশীকে নিষ্করুণ ক'রে তুলেছে। ন্যায়ের পথ থেকে সে কখনও বিচ্যুত হয়নি সত্য, কিন্তু তথাকথিত মনুষ্যত্বকে সে দিয়েছে বিসর্জন—সমাজের বিধান তার মানবতাবোধকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। চেহারায় তাই কাঠিন্য এসেছে—"...বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা...মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে।" কিন্তু দেবদ্বিজে একাদশীর শ্রদ্ধার অপ্রাচুর্য নেই। অপূর্বের দল ব্রাহ্মণ শুনে সে প্রণাম জানিয়েছে সসম্ভ্রমে।

একাদশী বৈমাত্রেয় বোনকে ত্যাগ করতে পারেনি, যৌবনে সামান্য একটিবার ভুলের জন্য। তাই বোনের প্রতি স্নেহের আধিক্যবশতঃ একাদশী

সমাজের লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়েছে। সে বিশ্বাস করে তার বোনের ক্ষণিক মোহের জন্য সারাজীবন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। এই ভুল তার বোন উপলব্ধি ক'রে অনুতপ্ত হয়েছে—তার কাছে সেটাই যথেষ্ট। তাই এই বিশ্বাস নিয়েই সে ন্যায় মনে করেছে বোনকে ত্যাগ না করা। এই ন্যায়বোধের অপ্রাচুর্য ঘটেনি তার জীবনের কোন কাজের মধ্যে। সাত টাকা ছ' আনার ছ' আনা সে ছাড়তে পারেনি, ছ' পয়সার দু' পয়সা সে কোনক্রমেই ত্যাগ করতে পারেনি। সে মনে করে যার নেবার ক্ষমতা আছে, দেবার যোগ্যতা তার থাকা উচিত। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মানবতার দোহাই দিয়ে এই ফাঁকি দেবার অভীপ্সা (tendency) সে সমর্থন করে না। দু'পয়সাটাই তার কাছে বড় কথা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছে সে তার নীতির অনুসরণকে। তার জীবন-নীতি হচ্ছে, অপরকে যেমন বঞ্চনা করার অভিপ্রায় তার নেই, নিজেও সে বঞ্চিত হ'তে চায় না। এই জীবন-নীতিকে সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেছে। তাই দেখি শত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নিঃসহায় বিধবার (পুঁটের মা) ৫০০৲ টাকা আত্মসাৎ করেনি—এমন কি সে টাকা খাটিয়ে যে সুদ হয়েছে, তাও কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে সে উদ্‌গ্রীব। ঘোষালকেও সে এক্ষেত্রে বিশ্বাস করে না, কারণ ঘোষাল তার মনিবের প্রকৃতি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, তাই মুক্তো দু'টো ফাঁকি দেবার মতলব দেখে একাদশী তীব্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছে। তার ব্যঙ্গ করার মধ্যেই সে পরিচয় পাওয়া যায়—"আমি জানি কিনা, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না।" এসব ক্ষেত্রে একাদশীর কোন কার্পণ্য প্রকাশ পায়নি। তার নীতিকে সে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছে।

তা ছাড়া একাদশীর পেশা তেজারতি। যদি প্রতি ক্ষেত্রে দু'আনা-দু'পয়সা ক'রে তাকে ত্যাগ করতে হয় তা হ'লে যার টাকা সে খাটাচ্ছে, তার প্রয়োজনে সে অত টাকা পাবে কোথায়? সে ক্ষেত্রে তাকে তো কার্পণ্য করতে দেখা যায় নি! সুতরাং এইভাবে গরীবের প্রতি মমতা দেখানো, তাদের ফাঁকি দেবার মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া। হয়তো জীবনের বৃহত্তম

ক্ষেত্রে তারা এইভাবে ফাঁকি দেবার মনোভাব পোষণ করবে। একাদশী টাকা দেবার সময় পর্যন্ত হুঁসিয়ার ক'রে দেয়—"...গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় ক'রে ফেল্‌বি রে। আট আনা নিয়ে যা না।" যদি সত্যকার প্রচলিত সুদখোর নির্মম প্রকৃতির লোক একাদশী হতো, তা হ'লে টাকা ধার দেবার সময় এত উপদেশ দিতো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুদ লাভ করাই তার লক্ষ্য নয়, প্রধান লক্ষ্য নিজের জীবন-নীতির অনুসরণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে বটে, যে ব্যক্তি দু'পয়সার মায়া ত্যাগ করতে পারে না, সে সাড়ে সাতশো টাকা (যা অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারতো) কেমন ক'রে দিয়ে দিতে পারে। এই আপাত বিপরীত ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় যদি আমরা তার জীবন-নীতির মূলকে উপলব্ধি করতে পারি।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, একাদশী লাইব্রেরীতে চাঁদ[illegible] এতো কার্পণ্য দেখালো কেন? প্রথম কথা, সে যে ধনী ত[illegible] ভাবে উল্লেখ নেই। লোকপ্রবাদ, লোকটা টাকার কুমীর [illegible] সত্য, এ সংশয় পাঠক-মনে থাকবেই। একাদশীর নিজের মুখে [illegible] সে দরিদ্র—"অপূর্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহি[illegible] গরীব মানুষ! চার আনাই আমার পক্ষে ঢের দয়া ক'রে [illegible] তার গৃহের পরিবেশের বর্ণনায় এই মতেরই সমর্থন করে[illegible] যদি বিনীত ভাবের প্রকাশ বলা হয়, তবে লোকপ্রবাদ[illegible] অন্যায় হবে না।

যে গ্রামের অধিবাসীরা তার প্রতি অন্যায়[illegible] সেই গ্রামের ছেলেরাই এসেছে চাঁদা নিতে। একাদশী[illegible] প্রশ্ন একবারের জন্যও জাগে নি? তাই সেই গ্রা[illegible] ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ পেয়েছে—"...আমাদের ছেলেরা[illegible] পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে [illegible] তাদের কাছে ত চাইতে যায় না...।" এ [illegible] মনোভাব। গ্রামীণ কল্যাণে অর্থের প্রয়োজ[illegible]

দোষ নেই, তার অর্থ গ্রহণে আপত্তি নেই ; আপত্তি তাকে গ্রহণ করতে। চাঁদার অকিঞ্চিৎকরতা সম্পর্কে অপূর্বের দল আপত্তি করলে একাদশী সবিনয়ে জানিয়েছে—"…ছটা পয়সা হক্কের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাচ্‌ড়াপনাই না করতে হয় ?" তাই দান করবার মতো মহৎপ্রাণ বা ঔদার্য একাদশীর নেই। যে পরিবেশের মধ্যে তাকে থাকতে হয় এবং যে নীতি অনুসরণ ক'রে তাকে চল্‌তে হয়– সেখানে দানের প্রশ্ন স্থান পায় না, কারণ দানের প্রতি একাদশীর একান্ত বিতৃষ্ণা। যে সব লোকেরা অর্থ নিয়ে সুদের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বলে অর্থাৎ দান করতে বলে—তাদের সম্পর্কে সে নির্মম। দান করার প্রকৃত অর্থ তার কাছে সঙ্কীর্ণ ভাবেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার এই আপাত কাঠিন্য ও ব্যবহারে মানুষ তাকে ভুল বুঝেছে, তার কার্পণ্যকে বিদ্রূপ ক'রে তার নাম রেখেছে একাদশী। "লোকটা নাকি টাকার কুমীর, কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না, হাঁড়ি ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে।"

একাদশীর অন্তরে স্নেহের মাধুর্য ; তাই বোনের সম্পর্কে কোনও রকম কটু মন্তব্য সে সহ্য করতে পারতো না। এ সম্পর্কে কেউ কোন কথা তুললে সে শঙ্কিত হ'য়ে উঠতো—নিজের জন্য নয়, তার প্রাণাধিক বোন ব্যথা পাবে ব'লে। একাদশী শ্রেণীর চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে একক। ভাই-বোনের এ শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ে কাহিনী-পরিকল্পনাও শরৎ-সাহিত্যে অভিনব। এ প্রসঙ্গে কুঞ্জ-কুসুমের সম্পর্ক স্মরণ করা যেতে পারে। একাদশী জাগতিক ভালমন্দের প্রতি উদাসীন। সমাজ তাকে ত্যাগ করেছে ব'লে সে তার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেনি, ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। সমাজের প্রতি নির্মম নির্লিপ্ততা অবজ্ঞারই নামান্তর মাত্র।

ঘোষালমশাই চিরাচরিত গোমস্তা শ্রেণীর প্রতিরূপ। অপরকে বঞ্চিত ক'রে তারা মনিবের স্বার্থরক্ষার ছদ্মবেশে নিজেদেরই স্বার্থসিদ্ধি করে। মনিবকে এরা অন্তরে শ্রদ্ধা করে না কিন্তু বাইরে সম্ভ্রম দেখায়। এই মনোভাব গড়ে উঠেছে প্রত্যেকের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে, এমনকি নিজের প্রতিও। তাই

কার্যসিদ্ধির উপায় স্বরূপ তারা যেমন সকলের কাছে নীচু হ'তে পারে, তেমনি সুযোগ পেলে কোন রকম হীন কাজে প্রবৃত্ত হতেও তাদের আটকায় না। ঘোষাল মনে করেছিল তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝি মনিব টের পায় না। কিন্তু তার প্রকৃতি একাদশী বা গৌরী কারুর অজানা ছিল না। ঘোষালের কুটিলতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই পরিমাপক যন্ত্রে সে মনিবের মেজাজ বুঝে কাজ করতো। নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে ঘোষাল অত্যন্ত বেশী সচেতন। তাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করার দোহাই দিয়ে সে মুক্তো দুটো আত্মসাৎ করার অপরাধ লঘু ক'রে দিতে চেয়েছিল। যে মনিবের অর্থে ঘোষাল প্রতিপালিত, তার সামনে সে যতই আনুগত্য দেখাক না কেন, অন্তরালে তাকে "ব্যাটা পিচেশ কিনা," "হারামজাদা" এবং মনিব-ভগ্নীকে "বেটি" সম্বোধন করতে সঙ্কুচিত হয়নি। "ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্ধা" যে সে ব্রাহ্মণকে তেষ্টার জল দিতে চেয়েছে। তার জলস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কিন্তু তারই অর্থে নিজের অন্ন-সংস্থান করতে অপরাধ হয় না। এই শ্রেণীর গোমস্তা চরিত্র *Villain* চরিত্রের নামান্তর মাত্র, যারা নিজেদের বিশ্বাসী প্রতিপন্ন ক'রে অন্যের ক্ষতিসাধন করতে চায়। শরৎ-সাহিত্যে এ শ্রেণীর চরিত্র অপ্রচুর নয়। সুরেন্দ্রনাথের নায়েব থেকে সুরু ক'রে বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ঘোষাল শ্রেণী চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি, অন্যদিকে তেমনি চক্রবর্তীমশাই (বৈকুণ্ঠের উইল)-এর মত চরিত্রও দেখতে পাই। মনিবের উদারতা এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঘোষাল শ্রেণীর গোমস্তারা সুবিধে গ্রহণ ক'রে থাকে। কিন্তু একাদশীর হুঁসিয়ারী নজরের কাছে ঘোষালের কুটিলতা বার বার বাধা পেয়েছে, তাই ঘোষালের গাত্রদাহ এত তীব্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

"গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল।" গ্রামের ছেলে অপূর্ব কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শিখে (বি,এ অনার সমেত) দেশে ফিরে আসে। আদর্শবাদের জোয়ার দেশকে তখন প্লাবিত ক'রে দিয়েছে, অপূর্ব শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। সনাতন ধর্মের যৌক্তিকতা বিচার করতে গিয়ে অপূর্ব

প্রাচ্যের অনুসরণ শুরু করেছে তীব্রভাবে। গ্রামের সাধারণের অবস্থার উন্নতি-কল্পে অপূর্ব সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। এই ভাবে নিজের শিক্ষার যোগ্যতা ও ঐতিহ্য নিয়ে অপূর্ব গ্রামীণ যুবকদলের নেতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব তার সঙ্গীদের তুলনায় অনেক মার্জিত—কথায় ও ব্যবহারে ভাষা তার সংযত। তাই বিপিন, অনাথ একাদশীকে কটু কথা বলেছে, শাসিয়েছে, কিন্তু অপূর্ব ক্রোধান্বিত হ'লেও, নিজের সঙ্গে বারুইপুরের জমিদারের আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও কটু কথা বলেনি। সে নিজে বিরক্তির ভাব দেখিয়েছে, কিন্তু ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে তিক্ত বাক্য প্রয়োগ করেনি। এখানেই অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে তার পার্থক্য।

অপূর্ব একাদশীর বাড়ীতে এসে তৃষ্ণার জল চেয়েছে এবং "সমাজ-স্খলিতা" গৌরী জল নিয়ে এলে বিপিন তীক্ষ্ণ কথা বলেছে, অপূর্বের রুচিবোধ সেখানে বাধা দিয়েছে বিপিনকে। কারণ "বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নরনারী-ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ।" একাদশীর ব্যবহারে "অপূর্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই ক্ষুদ্র। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।" কিন্তু তবুও সে কথায় কথায় বক্তৃতা করেনি। যখন সে একাদশীর মনের অন্যদিকের পরিচয় পেলো, সে যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়লো। নির্বাক বিস্ময়ে তার "মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল।" বিপিন-ঘোষাল প্রভৃতি যখন একাদশী সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে, সে নীরব থেকেছে। একাদশী চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাই তার গৃহে জলপান করবার জন্য সে অধীর হ'য়ে উঠেছে, সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও তার দ্বিধা নেই। তাই সেই সমাজ-পরিত্যক্তা নারীর দেওয়া জল পান করতে সে একাদশীর গৃহে যাত্রা করেছে। একাদশী চরিত্রের মাধুর্যপূর্ণ দিক্ আর তার দৃষ্টি এড়ায়নি। যখন সবাই গৌরী সম্পর্কে নানা কটু মন্তব্য প্রকাশ করেছে, একমাত্র অপূর্ব একাদশীর মনের ব্যথা টের পেয়েছে—"তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না। কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।" এর পরেই একাদশীর বিধবাকে

টাকা দেবার ব্যাপার দেখে সে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। অপূর্ব-চরিত্রের সার্থকতা, সে পাঠকমনের প্রতিনিধিত্ব করেছে এই গল্পে এবং সে দ্রষ্টার অংশই গ্রহণ করেছে। চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা হ'য়েও শেষে নীরব দর্শকের মতই সে গল্প শেষে একাদশীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

একাদশীর বোন গৌরী চরিত্র একটু রহস্যজনক। সে "প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির" হ'য়ে যায়, শেষে "লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা" হ'য়ে ভাইয়ের গৃহে ফিরে আসে। একাদশীর স্নেহপুটে পরিবর্ধিত হয়েছে সে বাল্যকাল থেকে। একাদশী তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতো, তার কথায় ও ব্যবহারে তা প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র একাদশী চরিত্রের এই মধুর দিকের পরিচয় দিতে ভোলেননি।

"প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্ধও শুষ্ক হয় নাই…"। বিধবা গৌরী এখন স্নান-আহ্নিক নিয়ে নিজের জীবনকে ঘিরে রেখেছে। ব্রাহ্মণের প্রতি তার ভক্তির অপ্রাচুর্য নেই। তাই জল দিতে সে নিজে ছুটে এসেছে, বাতাসা নিয়ে। কিন্তু বিপিনের কটু ইঙ্গিতে গৌরী আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছে। পরক্ষণেই দ্বারের অন্তরালে গিয়ে চাঁদার কথা তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁর কাঠিন্য প্রকাশ পেয়েছে, চাঁদা দেবার ব্যাপারে নীরব থাকার মধ্যে। কিন্তু পুঁটের মা যখন অসহায় হ'য়ে প্রাপ্য টাকার কথা বলেছে এবং ঘোষাল যখন প্রমাণাভাবে তা দিতে অস্বীকৃত হয়েছে বা তার গৃহে যেতে বলেছে, তখন তার নারী-প্রকৃতির জাগরণ ঘটেছে। সে বিচক্ষণ গৃহিণীর মতই এই সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ ঘোষালকে জানিয়েছে এবং টাকার ব্যাপারে সে যে একাদশীরই যোগ্যা ভগিনী তার পরিচয় দিয়েছে। তার শান্ত সংযত ব্যবহার, আতিশয্যহীন আপাত কাঠিন্য-পুর্ণ উক্তির মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে পেরে অপূর্ব মুগ্ধ হয়েছে। যৌবনের ক্ষণিক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে। গৌরী-চরিত্রের সম্যক প্রকাশ এখানে আশা করা অন্যায়। তবুও যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গৌরী শ্রেণীর চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে নতুন নয়।

নফর, বিপিন, অনাথ, হারুর মা ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে গ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। নফরের কথাবার্তায় গ্রামীণ রুক্ষতা ও অমার্জিত প্রকাশ, বিপিনের অসংযত ভাষা প্রয়োগে গ্রামের শিক্ষাহীন পরিবেশে পরিবর্ধিত মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

"একাদশী বৈরাগী"র ত্রুটি প্রথমদিকের বর্ণনার দীর্ঘতা, যার সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক খুব নিবিড় নয়। এই বর্ণনার কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। পরিবেশ-সৃষ্টির উদ্দেশে এইভাবে কাহিনীর সূত্রপাত করার ইচ্ছা হয়তো শরৎচন্দ্রের ছিল, কিন্তু তাতে আরও পরিমিতি বজায় রাখা উচিত ছিল।

সংলাপের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সার্থক এবং গ্রামীণ নরনারীর কথাবার্তায় যে শ্রেণীর অমার্জিত ভাষা ও ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে, যে সরলতা দেখা যায়, বিধবার অসহায়বোধ যে ভাষায় প্রকাশ পায়—তার যথাযথ বিন্যাস এই গল্পের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। অলঙ্করণ খুব সার্থক নয়, এমন কি একাদশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইক্ষুর যে উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

গল্পের ঘটনাকাল ১৩০৯ সাল (১৯০২ খৃঃ অঃ)। এ সময়ে হয়তো শরৎচন্দ্রের জীবনে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল একাদশী শ্রেণীর কোনও চরিত্রের সঙ্গে; কারণ তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর কাহিনী বেশীরভাগ প্রত্যক্ষ ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শবাদের যে ঢেউ দেশকে প্লাবিত করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, তার জের টেনে ১৯০৫ খৃঃ অঃ জাতীয়তা-বোধ বাঙলা দেশের প্রাণকে হিল্লোলিত করেছিল। এই যুগ-পরিবেশে গল্পটি রচিত ব'লে কাহিনীর প্রথম দিকে সেই সময়ের প্রভাব পড়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের লেখনীও ব্যঙ্গ প্রবণ হ'য়ে উঠেছে এই ব্যাপারে।

(১৪)

বিলাসী

"বিলাসী" গল্পের গঠনভঙ্গীর বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির মধ্যে একটি বিশেষ আলোচনার সামগ্রী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই গল্পটীর মধ্যে

মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী-ঘটিত কাহিনীতেই প্রকৃতপক্ষে গল্প-রস সিঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মূল গল্পটির প্রারম্ভের পূর্বে যে বিবরণ এবং সমাপ্তিলাভের পরের যে বর্ণনা তাতে যথাক্রমে লেখকের অতীত-বাল্যের বিবৃতি এবং প্রবন্ধমূলক সমালোচনা স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী কাহিনীর কোন কোন অংশে শরৎচন্দ্র দীর্ঘ সমালোচনাগন্ধী উক্তির অবতারণা করেছেন।

'বিলাসী' রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই শরৎচন্দ্র কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে এই রচনা—"জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল।" ডায়েরীর স্বত্বাধিকারীর আসল নাম তিনি গোপন করেছেন। আটপৌরে নামটির সন্ধান দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু "ন্যাড়া" নামটি আমাদের বিশেষ পরিচিত। শরৎচন্দ্রের পিতামহী তাঁকে শৈশবে 'ন্যাড়া' নামে সম্বোধন করতেন। সুতরাং এই 'ন্যাড়া'র ডায়েরীতে যে শরৎচন্দ্রের বাল্য জীবনের একটি হর্ষবিষাদ-পূর্ণ অংশ মুদ্রিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'বিলাসী' গল্পের পটভূমিকা ন্যাড়ার স্মৃতিলোক অতিক্রম ক'রে পূর্ণবয়স্ক সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্রের কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই 'বিলাসী' পল্লীবালকের শুধু অ-প্রস্ফুটিত মনের প্রকাশ নয়, পরিণত মানস-লোকের সৃষ্টি-প্রসূত। তবে বীজরূপে ন্যাড়ার বাল্য-অভিজ্ঞতা এই গল্পের প্রাণ-শক্তিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে রেখেছে। দিন-পঞ্জীর নীরস ঘটনা-চয়ন মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর ট্র্যাজিক জীবন-যাপনের বর্ণনায় সরস এবং মধুর হ'য়ে উঠেছে। এমন কি উপসংহারে বাঙলা দেশের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক মন্তব্য এবং নর-নারীর প্রেম-বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রকাশ ক'রেও শরৎচন্দ্র গল্প-সমাপ্তির করুণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর কাহিনী অবতারণার পূর্বে, কাহিনীর বক্তা নিজের বাল্য-পরিবেশ বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং বক্তার বিবৃতিতে কাহিনীর সূত্রপাত "বাল্যস্মৃতি", "আসার আশায়", "স্বামী" প্রভৃতি গল্পে দেখা যায়। কিন্তু 'বিলাসী'তে শুধুমাত্র লেখকের বক্তারূপেই আবির্ভাব ঘটেনি। বক্তার আত্ম-জীবনের পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। "শ্রীকান্ত" প্রথমপর্বে শরৎচন্দ্রের শৈশব-স্মৃতির বিস্তৃত প্রতিফলন রয়েছে—এ কথা প্রামাণ্য রূপেই সকলে

মেনে নিয়েছেন। 'বিলাসী'তেও 'ন্যাড়া'র দিনপঞ্জীর রূপায়ণে বালক শরৎ-চন্দ্রের পাঠ্যজীবন এবং তার পরিবেশের পরিচয় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিস্ফুট হয়েছে। দলবদ্ধভাবে দু'তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে পড়তে যাওয়া, সঙ্গীদের সহযোগিতায় শিশুসুলভ দুর্দান্তপণার বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সরস ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য-সম্বন্ধ। 'ন্যাড়া'র দু' ক্রোশ পথের সহযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়-চরিত্রটি প্রকৃত পক্ষে দেবানন্দপুরের মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারেরই বিকল্প। বিলাসী সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা বিচার সাহিত্য প্রসঙ্গে উত্থাপিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারের জীবনে এ শ্রেণীর ঘটনা যে ঘটেছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

"বিলাসী" গল্পে গ্রামের 'কৃতবিদ্য' শিশুদলের অধ্যবসায়ের চিত্র বিবৃত হয়েছে। প্রাপ্ত বয়সে তাদেরই সমাজধর্ম এবং শাস্ত্রীয় নজির পালনের নিষ্ঠুর পরিচয়স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী কাহিনীর অবতারণা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষে পল্লীর শিশুজীবন সরস্বতীর সাধনায় একনিষ্ঠ হয়। উত্তর জীবনে এদেরই কয়েকজন সমাজের মাথা হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু একনিষ্ঠ হ'য়েও তথাকথিত সামাজিক জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী না হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো অসামাজিক জীবন যাপন করেছে দু'একজন দুর্ভাগা। 'ন্যাড়া'র পাঠ্যজীবনের পরিচয় বহন ক'রে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঘটনার অন্যতম ঘটনারূপে মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর কাহিনী-পরিচিতি 'বিলাসী' গল্পের আঙ্গিক-পরিকল্পনায় স্বাভাবিকত্ব দান করেছে। কায়স্থ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা-নিরতা অস্পৃশ্যা মুসলমান কন্যা বিলাসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণে অন্য একটি ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। তার ফলে মূল কাহিনীর অগ্রগতি আঙ্গিকের দিক দিয়ে ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে ব'লে মনে হয়। তবে বিলাসীর নিষ্ঠাকে আরও আবেদনশীল ক'রে তোলার জন্যে এই বৈপরীত্য সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া আগেই লেখক এই গল্পকে দিন-পঞ্জীর অনুকৃতিরূপে পরিচিত করিয়ে

পাঠকের প্রশ্নের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায়ের কাশীবাসী বিধবা পুত্রবধূর প্রত্যাগমনের ঘটনা সম্পর্কে এবং গল্পের শেষাংশে মৃত্যুঞ্জয়ের অপঘাত মৃত্যু ও বিলাসীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র ক'রে লেখকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এই অংশের বর্ণনা অতীব সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী হ'লেও ছোট গল্পের আঙ্গিক হিসেবে ক্রটিপূর্ণ। তা সত্বেও নিছক প্রবন্ধ বা দিনপঞ্জীর তথ্য-সঙ্কুলতায় পাঠকের রস-তৃপ্তিকে ক্ষুন্ন করতে শরৎচন্দ্র চাননি। জীবনমন্থনে বিষামৃত পান ক'রে যে সব জীবন নষ্ট হ'য়ে যায়, তারই একটি অমর চিত্র অঙ্কন ক'রে শরৎচন্দ্র ডায়েরীর সঞ্জীবরূপ দান করেছেন।

"মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই মানুষ। তবুও এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না।"—তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের রহস্যপূর্ণ দিকটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে। এই আত্মগোপনকারী নির্লিপ্ত পুরুষটি সামাজিক জীবন থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের বহু পিতা পুত্রের স্কুলজীবনের দায় মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর গোপনে অর্পণ করেছে অথচ প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেনি প্রতিবেশী হিসেবে। একমাত্র আত্মীয় মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ো মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে দুর্নাম প্রচার করেছে; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সমাজের এই বিরুদ্ধাচরণের জন্য কখনও ক্ষুব্ধ হয়নি। জাতি-ভেদের সঙ্কীর্ণতা তার ছিল না, তাই অস্পৃশ্য "...মাল-পাড়ার এক বুড়ো মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।" সুবিস্তৃত ও ঘন আমবনের মধ্যে কঙ্কালসার মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য একটি সাপুড়ে কন্যার অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা সমাজের সতী-লক্ষ্মী কন্যার সেবা-গুণ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। এই সত্যটুকু "গাঁজা"-সেবনকারী (?) মৃত্যুঞ্জয়ের কাছেই সর্বাংশে ধরা পড়েছে। থার্ড ক্লাশের অধিক বিদ্যার গণ্ডী অতিক্রম না ক'রে, 'নাল্‌তের

মিত্তির' বংশের সুনাম রক্ষার্থে প্রবৃত্ত না হ'য়েও মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর ভালবাসায় আত্মসমর্পণ ক'রে নিষ্ঠুর মৃত্যুর মতো কঠোর সমাজ-দত্ত বিধানকে প্রতিরোধ ক'রে জয়ী হয়েছে। "দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাত-জাগা! সে যে কত বড় সাহসের কাজ…।" বিলাসীর এই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের মনোভাব কিভাবে আন্দোলিত হয়েছে, আমরা তার প্রত্যক্ষ রূপ গল্পের মধ্যে পাইনি। কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে এই সেবারতা নারীর হাতের অন্ন-জল গ্রহণ না করার কৃতঘ্নতা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'অন্নপাপ' সমগ্র গ্রামকে পাছে ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয় এই ভীতির ফলে গ্রামবাসীদের হাতে বিলাসীর লাঞ্ছনাই বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়কে অধিক সক্রিয় ক'রে তুলেছিল। সমাজের বিরুদ্ধে এত বড় বিদ্রোহ শরৎ-সাহিত্যের পুরুষ-চরিত্রে বিরল। বিলাসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় যত নিকৃষ্ট জীবনই যাপন করুক না কেন, বিলাসীর মর্যাদা সে রক্ষা করেছে। সমাজ-নিন্দিত জীবনে প্রবেশ ক'রে সে সাপুড়ে হয়েছে, ভদ্র-জীবনের স্বাদ থেকে হয়েছে বঞ্চিত, কিন্তু জীবন-ধর্ম অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হয় নি। বিলাসীর প্রেম-স্নেহ-সহানুভূতি-নিষ্ঠা মৃত্যুঞ্জয়কে দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত করেছে—"মানুষ কত মাত্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার"। মৃত্যুঞ্জয়ের সমাজ তাকে চিরকাল দুঃখ দিয়েছে, কোন আশার বাণী তাকে শোনায় নি। রোগশয্যায় যার শীতল করস্পর্শে সে পুনর্জীবন লাভ করেছে, তার প্রতি মৃত্যুঞ্জয় নিজের সমস্ত জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়ে মুক্ত হয়েছে।

বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে বিয়ে না করলে হয়তো 'অন্নপাপে'র জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিলেই সব দিক বজায় থাকতো। কিন্তু বিলাসী আত্মীয়-স্বজনহীন মৃত্যুঞ্জয়কে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারে নি। তাছাড়া বিলাসী তো রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রী-রমার মতো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ করেনি যে, প্রিয়তমের সামাজিক অ-কল্যাণে সদাসতর্ক হ'য়ে

উঠবে! বিলাসী সাপুড়ে মেয়ে, তাই সে তার প্রিয়জনকে একান্ত ভাবেই পেতে চায়—সমাজ সম্পর্কে কোনপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব তার দেখা যায় নি। মৃত্যুঞ্জয়কে বিলাসী কত গভীরভাবে ভালবেসেছিল—যে জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়োগ-ব্যথাকে সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে ভুলতে চেয়েছে!

বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেম সমাজ-অসমর্থিত সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রেমের অপ্রতিহত শক্তি নিয়ে তারা জয়ী হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অপঘাত মৃত্যু এবং বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারে সেদিন অনেকেই 'পাপের প্রতিফল' ব'লে গুরুগম্ভীর সমাজ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। যে সত্য পালনে মানুষ মরেও অমর হয়, প্রেমের সেই মহিমান্বিত পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর ট্র্যাজিক পরিণতি মানব-ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ অলঙ্কৃত করবে। "যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত…"সে দেশের ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর প্রেমকে কোন মর্যাদাই দেবে না; কারণ এ ব্যাপারে দেশের সমাজ দৃষ্টিহীন। কিন্তু শিল্পীর সংস্কারহীন দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে।

"বিলাসী" গল্পে শরৎচন্দ্র পল্লী-প্রতিবেশ রূপায়িত করতে প্রথম থেকেই ব্যঙ্গপূর্ণ মনোভাব নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। পল্লীর মানব ও প্রকৃতি কোন কিছুর প্রতিই লেখকের যেন আস্থা নেই! সমাজের শাস্ত্রীয় বিধানের উগ্রতায় পল্লীর আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন। মানুষগুলিও তাদের সংবুদ্ধি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে জীবন-বিরুদ্ধ প্রবাহে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার ভারে প্রপীড়িত দু'একজন একান্ত অসহিষ্ণু হ'য়ে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছে। শরৎচন্দ্রের মতো জীবন-শিল্পীর রচনার সামগ্রী এখানেই হয়েছে কেন্দ্রায়িত। 'বিলাসী'ও তেমনি পল্লী-সমাজের বাঁধন ছেঁড়ার এক করুণ কাহিনী।

শরৎচন্দ্র এই গল্পে সমালোচকের ভূমিকায় প্রধানভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। পল্লীবালকের দিন-পঞ্জীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সমাজের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এই গল্পে তিনি সামাজিক

বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত বহু স্থানে নিক্ষেপ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কয়েকটি ঘটনার অবতারণা প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর উক্তির উপস্থাপনা করেছেন, যেমন—"বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract ; তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে…"। এইভাবে দিন-পল্লীর 'নকল নবিস' শরৎচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছেন সমাজব্যাখ্যাতা এবং জীবনব্যাখ্যাতা-রূপে। মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর বিবাহিত জীবন শুরু হবার পর শরৎচন্দ্র অনেকটা সংযত হয়েছেন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা দানে। হঠাৎ যেন এক শ্রীকান্ত এসে সাপুড়ে দম্পতির মধ্যে জীবন যাপন আরম্ভ করেছে। তাই মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী প্রসঙ্গে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ কোন প্রকার উক্তি প্রয়োগ থেকে তিনি বিরত থেকেছেন।

'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্র জীবন-রহস্যের কথা, লোকাচার দেশাচারের কথা যেভাবে বিবৃত করেছেন—তা আমাদের কাছে খুব নূতন নয়। এর পূর্ববর্তী গল্পগুলিতে বিভিন্ন চরিত্র-সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত তথ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। সেখানে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব স্রষ্টার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে।

এই গল্পের গ্রাম্য চরিত্রগুলির চিত্রণে, তাদের কার্যকলাপের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের সিদ্ধহস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'বিলাসী' গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ' সৃষ্টি ক'রে। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়োর চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই দেখা দিতে পারে না। ইনি যে বেণী ঘোষাল এবং শম্ভু চাটুয্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আরো খানিকটা নীচতায় অগ্রসর হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভাষা প্রয়োগের দোষ কয়েক স্থানে দৃষ্ট হ'লেও বর্ণনার অপূর্ব ব্যঞ্জনানুসরণে সমাজব্যাখ্যার সুদীর্ঘ উক্তিতে পাঠকের ক্লান্তিবোধ জন্মায় না, বরং উত্তরোত্তর জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। গল্পের এক অংশে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিণতির ইঙ্গিত

শিবু ও শম্ভুর পারিবারিক জীবনে দ্বৈত (joint) সম্পত্তি হিসেবে বাঁশঝাড়টাই অশান্তির অঙ্কুর রূপে বিরাজিত ছিল। এই বাঁশঝাড়ের ওপর স্ব স্ব অধিকার স্থাপন করতে গিয়ে দু'টি পরিবারের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্বন্দ্ব-প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পরিবারের অসন্তোষ স্থানান্তরিত হয়েছে বাঁশঝাড়কে ছেড়ে গয়ারামকে কেন্দ্র ক'রে। মাতৃহীন গয়ারামের জন্য শিবুর স্ত্রী গঙ্গামণির স্নেহ-মমতা তাদের স্বতন্ত্র বসবাস করবার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়নি। তাই অপর পক্ষের সঙ্গে এই বন্ধনের সূত্র ধ'রেই গঙ্গামণি মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতো। অশান্ত গয়ারামের দুর্দান্তপনাকে ভিত্তি ক'রে শিবু শম্ভুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজেছে, অবশেষে গঙ্গামণির ভাই পাঁচুর সহায়তায় শিবু গয়ারামকে জেলে দেবার ব্যবস্থা করেছে। গয়ারামের এই দুর্গতির সময় তার পিতা শম্ভুকে আপাতভাবে নির্বিকার থাকতে দেখা যায়। তারপর গয়ারামকে জেলখানার কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যই হয়তো পিতা শম্ভু গয়ারামকে পাঁচলার সরকারী পুলের কাজে নিযুক্ত করে।

গঙ্গামণির আসল অভিযোগ ছিল শম্ভু এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ষষ্ঠীপুজা উপলক্ষে বাঁশপাতা সংগ্রহ করতে সে শম্ভুর কাছে অপমানিত হয়েছিল—তার প্রতিকার সে চায়। কারণ গয়ারামের হাঁড়ি, ঘটী ভাঙ্গা ইত্যাদি অত্যাচার গঙ্গামণির কাছে অভিনব নয়; এবার বিবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে দেখা দিয়েছে বাঁশপাতা সংক্রান্ত ঘটনার সূত্র ধ'রে। অভিমান-ক্ষুব্ধ চিত্তে গঙ্গামণি স্বামীর কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছে বটে, কিন্তু একমাত্র গয়ারামকেই যখন শাস্তি দেবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো, তখন গঙ্গামণি আর স্থির থাকতে পারে নি। গঙ্গামণির এই অবস্থার বিশদ বিবরণ আমাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ রাখা হয়েছে সমাপ্তির আকস্মিকতা রক্ষা করবার জন্য। তবে গল্পের সমাপ্তিতে গঙ্গামণি এবং গয়ারামের মিলনচিত্র চিত্তাকর্ষক হ'লেও অভূতপুর্ব নয়। এ ধরণের সমাপ্তি-চিত্র শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিতে সহজেই নজরে পড়ে।

"মামলার ফল" কাহিনী গড়ে উঠেছে বাঙলা দেশের এক কৃষক পরিবারকে

কেন্দ্র ক'রে। এ জাতীয় পারিবারিক দ্বন্দ্বের চিত্র শরৎচন্দ্র এ পর্যন্ত উচ্চবর্ণভুক্ত সমাজের মধ্যে সীমায়িত ক'রে রেখেছিলেন। এই গল্পটিতেই তিনি প্রথম কৈবর্ত সমাজের একটি পরিবারকে মনোনীত করেছেন। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে মানবীয় বৃত্তিগুলি কিভাবে একই নির্দেশে পরিচালিত হ'য়ে একই জীবন-সমস্যার সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র এই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে "মামলার ফল" গল্পের অবতারণা করেছেন। তাই কাহিনী-পরিকল্পনায় কোন নতুনত্বের আভাস সূচিত না হ'লেও, অমার্জিত ভাব-ভাষা-পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে গয়ারাম-গঙ্গামণির হৃদয়ের স্পর্শটুকু দেখানোই হয়ত শরৎচন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। গয়ারাম-গঙ্গামণির সম্পর্ক যে রাম-নারায়ণী, কেষ্ট-হেমাঙ্গিনী, অমূল্য-বিন্দু প্রভৃতি সম্পর্কগুলির সূত্র ধ'রেই প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ সম্পূর্ণ গল্পটি শেষ করবার আগেই পাঠক গয়া-গঙ্গামণির ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে একটা আপাত ধারণা ক'রে নিতে পারে। তাই গল্পের পরিণতি এবং আকস্মিকতা পূর্ববর্তী কয়েকটি গল্পের সাদৃশ্য বহন করায় পাঠকমনে তেমন অনুরণন জাগাতে পারেনি। তবুও এই গল্পটির আবেদন শরৎ-সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ হ'য়েও সর্বজনীন হয়েছে এজন্যই যে, তথাকথিত অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, রুক্ষ এবং বিসদৃশ কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যে মানবিকতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনটুকু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি।

শিবু এবং শম্ভু দু'ভাই তাদের পিতার মৃত্যুর পর পৃথগন্ন হ'য়ে যায়; সব কিছুই সমানভাগে দু'ভাই ভাগ ক'রে নেয়, দ্বৈত (joint) সম্পত্তি হিসেবে থেকে যায় শুধু বাঁশঝাড়টা আর শম্ভুর পুত্র গয়ারাম—"তাহার ফল হইল এই যে শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেই শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।" শিবু এবং শম্ভুর মধ্যে এমনিভাবে নিত্যই প্রায় কলহের সূত্রপাত হ'য়ে থাকে। কাহিনীভাগে আমরা কিন্তু দু'ভাইকে মুখোমুখী একবারও বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হ'তে দেখিনি। দু'জনেই দু'জনের অনুপস্থিতিতে মনের আক্রোশ প্রকাশ করেছে। সুতরাং শিবুর প্রতি শম্ভুর এবং শম্ভুর

প্রতি শিবুর ব্যক্তিগত মনোভাব যাই থাকুক না কেন স্পষ্টভাবে কোনও প্রকার নীচ বা হীন আচরণ একের প্রতি অন্যের প্রকাশ পায়নি। শিবুর স্ত্রী গঙ্গামণির কয়েকটি বাঁশপাতা সংগ্রহের অপরাধে দেবর শম্ভু তার সঙ্গে যে অপমানজনক ব্যবহার করেছে, কাহিনীতে বহির্দ্বন্দ্ব শুরু হয় সেখান থেকেই। কিন্তু ঘটনার দিক-পরিবর্তন হয় দ্বিতীয় সম্পত্তি গয়ারামকে নিয়ে। মাতৃহীন গয়ারামকে গঙ্গামণি একবছর বয়স থেকে মানুষ ক'রে এসেছে। শম্ভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গয়ারামের বিমাতা, গয়ারামকে সুনজরে দেখতে পারে নি ব'লেই হয়তো জ্যাঠাইমার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনবার জন্য ব্যগ্র হয়নি। এই স্নেহের আকর্ষণটুকু শত লাঞ্ছিত হ'য়েও গঙ্গামণি এ পর্যন্ত রোধ করতে পারেনি।

"মামলার ফল" গল্পে গয়ারাম চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সাবলীল হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কৈবর্ত-ঘরের ষোল-সতেরো বছরের ছেলে চাষ-বাস না শিখে, শিখ্‌ছে লেখাপড়া। কিন্তু ভাষা প্রয়োগ এবং ব্যবহারে তার গ্রাম্যরুক্ষতা ও দুর্বিনীত ভাব বিন্দুমাত্র দূর হয়নি—"…এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল।" পিতা-পিতৃব্যের নিত্য দ্বন্দ্বের মধ্যে তাকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি; কিন্তু বিমাতা ও জ্যাঠাইমা যখন রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা থেকে প্রায়ই বিমুখ হ'তো গয়ারাম আর স্থির থাকতে পারতো না। অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় সে গুরুজনদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হ'তো না। দুর্দান্তপনায় এবং অশিষ্টতায় গয়ারাম শরৎচন্দ্রের এ শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। বিমাতার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ সেখানে স্নেহের স্পর্শটুকু সে পায়নি। গয়ারামের যত অন্যায় আবদার সবই জ্যাঠাইমার কাছে এবং প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়া সে জ্যাঠাইমার কাছেই সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত।

বাঁশপাতা সংক্রান্ত ঘটনার দিন গয়ারাম এবং তার জ্যাঠাইমা গঙ্গামণির মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। গয়ারাম ষষ্ঠীর দিন না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে যাবার ভয় দেখালে গঙ্গামণির মাতৃ-হৃদয় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

চাঁপাকলা এবং পাটালির প্রলোভন দেখিয়ে গঙ্গামণি গয়াকে অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী থেকে যেতে নিরস্ত করেছে। বিমাতা "দূর দূর" করলেও গঙ্গামণি তা পারেনি। নিঃসন্তান গঙ্গামণির হৃদয়ের সর্বাংশ অধিকার করেছিল গয়ারাম; তাই ষষ্ঠীর দিন তার অমঙ্গল চিন্তায় গঙ্গামণির মন আকুল হয়েছে। কিন্তু গয়ারাম তার লোভের বস্তু না পেয়ে যে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে বাড়ী থেকে অবশেষে প্রস্থান করেছে তাতে গঙ্গামণির সমস্ত রাগ নিক্ষিপ্ত হয়েছে শম্ভু এবং তার স্ত্রীর ওপর। গঙ্গামণির গৃহস্থালীর জিনিষপত্র নষ্ট করায় বা তাকে আঘাত দেওয়ায় সে যত না ক্রুদ্ধ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী সে ব্যথা পেয়েছে গয়াকে খেতে দিতে না পেরে। এ জাতীয় অশান্তির অবতারণা গয়ারামকে দিয়ে প্রায়ই হয়তো গৃহে ঘটে থাকে, কিন্তু এবার যেন মাত্রা ছাড়িয়েছে।

উভয় পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একমাত্র আসামী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল গয়ারাম। তার বিরুদ্ধে সকলেরই অভিযোগ। প্রাত্যহিক বিবাদ বিসম্বাদ যেন গয়ারামের শাস্তি বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশমিত হ'য়ে যাবে। গঙ্গামণির ভ্রাতা পাঁচুর ছিল গয়ার ওপর অসম্ভব বিদ্বেষ, কারণ গয়াকে তার ভয় ক'রেই চলতে হ'তো। তাই গয়ার ক্ষতিসাধনে তার লাভালাভ কিছু হোক না হোক, গয়াকে কঠিন শাস্তি দিতে পারলেই সে খুসী। তা ছাড়া নিঃসন্তান ভগ্নীপতির বিষয় সম্পত্তিকে কেন্দ্র ক'রে একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা তার মনে গড়ে ওঠেনি, একথাও জোর ক'রে বলা যায় না। তাই ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে উত্যক্ত করেছে গয়ার বিরুদ্ধে শম্ভুর গোপন প্ররোচনার অজুহাত দেখিয়ে। শিবু হয়তো গয়ারামের অশান্তপনার ঘটনা নিয়ে থানায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হ'তো না।

শিবু গ্রাম্য চাষা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া শম্ভুকে জব্দ করতে গয়ারামকে জেলে দেওয়াই সে হয়তো সমীচীন বোধ করেছে। কিন্তু মুখে যাই বলুক শেষ পর্যন্ত পুলিশ দারোগা ডেকে গয়ারামকে ধরিয়ে দেওয়া বা তাকে জেলে দেওয়া শিবুর পক্ষে ঘটে উঠতো কিনা সন্দেহ; কারণ গয়ারাম যে গঙ্গামণির কতখানি স্নেহভাজন তা শিবুর অগোচর ছিল না। পাঁচুর সনির্বন্ধ চেষ্টায় গয়ারামের

নামে ওয়ারেন্ট বের হবার পর গঙ্গামণি গৃহত্যাগ করে। তার এমন আকস্মিক নির্লিপ্ত ভাব শিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই স্ত্রীর অদর্শনে "সে মুখে বলিল বটে, যেখানে খুসী যাক্ গে! মরুকগে! কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।" শরৎচন্দ্র গল্পের শেষাংশে গঙ্গামণিকে কেন্দ্র ক'রে শিবুর অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কনেই ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন। গয়ারামের কথা এখানে আত্মগোপন করেছে। এই অংশটুকু বিপিন-হেমাঙ্গিনীর পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শম্ভু এবং তার স্ত্রীর চরিত্র বিস্তৃতভাবে অনুধাবন করা যায় না। কাহিনী-ভাগে তাদের আগমন ক্ষণিকের জন্যই ঘটেছে। গয়ার বিমাতা যে কঠিন হৃদয়-সম্পন্না, তার পরিচয় তার কথাতেই পাওয়া যায়; শম্ভুকে পুত্র সম্বন্ধে আপাতনির্লিপ্ত মনে হ'লেও দু'একটি কথায় তার মনোভাব পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ছোট বউ গয়ারামের ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামীকে সরকারী পুল নির্মাণের কাজে মজুর হিসেবে নিযুক্ত করতে পরামর্শ দিলে শম্ভু বলেছে—"আরে সাধে দিইনি সেখানে? সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়—আর্ধেক লোক মাটি চাপা হ'য়ে কোথায় তলিয়ে যায়, তার তল্লাসই মেলে না"—শম্ভুর পুত্র স্নেহের এমনিভাবেই প্রকাশ ঘটেছে। শিবু গয়াকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে শম্ভুই গোপনে গয়ার নাম পরিবর্তন ক'রে সরকারী পুলের সাহেবের অধীনে কাজে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছে। সুতরাং প্রকাশ্যে ন: হোক কাজে শম্ভু পুত্রের দায়িত্ব বহন করেছে। চাষার ছেলে হ'য়েও স্কুলে পড়বার সুযোগ গয়ারাম পিতার জন্যই লাভ করেছিল। বিমাতার দুর্ব্যবহারে গয়ারাম পিতার পূর্ণ সহানুভূতি পায়নি বটে, সম্পূর্ণ বঞ্চিতও হয়নি।

গয়ারামের দিক থেকে পিতা সম্পর্কে তার কোনরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়নি। বিমাতাকে সে যে মোটেই পছন্দ করতো না, তার নিদর্শন বিমাতার উদ্দেশ্যে কটু বিশেষণ প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়। জ্যাঠাইমাকে সে মায়ের মতোই ভালবেসেছিল—তাই বিমাতার বিতাড়নের পরও সে সদর্পে বলেছে—"তোদের ভাত খেতে আসিনি, আমি জ্যাঠাইমার কাছে

যাচ্ছি।" গঙ্গামণিও যে গয়াকে অত্যন্ত স্নেহ করতো তা গয়ার অজ্ঞাত ছিল না। তাই গঙ্গামণি তাকে জেলে যাবার কথা বললে গয়া বলেছে—"…দে না দিয়ে একবার মজা দেখ না। আপনিই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে!"

গঙ্গামণি এই ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই স্পষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কৃষক-গৃহিণীর সরল বুদ্ধির সীমা খুব গণ্ডীবদ্ধ। তাই স্বামী যখন থানা-দারোগা প্রভৃতি নিয়ে গয়ার বিরুদ্ধে মেতে উঠলো সে বাধা দেবার বুদ্ধিও হারিয়ে ফেললো। তার মনে কিছু অভিযোগ সঞ্চিত ছিল; কিন্তু তাতো গয়ার বিরুদ্ধে নয়, গয়ার পিতার বিরুদ্ধে। গয়ার ওপর তার অভিমান হ'তে পারে কিন্তু সেজন্য সে এত কঠিন শাস্তি প্রদানে উৎসাহিত হবে কেন? গয়া যে গঙ্গামণির নিজ সন্তান অপেক্ষা কম নয়।

গয়ারামকে দারোগার সামনে বেঁধে উপস্থিত করলে গয়া শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। জ্যাঠাইমার স্নেহ-মমতায় সে কখনো মায়ের অভাব অনুভব করেনি। কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় জ্যাঠাইমাও যখন "অস্ফুট স্বরেই" কথা বলেছে যার পরিস্ফুট পরিচয় গয়ারামের বিরোধিতা করতে উদ্যত—…"যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।" এরপর সে আর কোনও মায়ার বন্ধনেই পড়ে রইল না; জ্যাঠাইমার ব্যবহার গয়ার পক্ষে নিদারুণ হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো ব'লেই সে একেবারে নিরুদ্দিষ্ট হ'লো।

এবার গঙ্গামণির নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যই সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে এবং একদিন তাকেও গয়ারামের মতো নিরুদ্দেশ হ'তে দেখা যায়। তার প্রধান "আসামী শম্ভু" সম্পূর্ণ মুক্ত! গয়ারামকে কেন্দ্র ক'রেই কি এতদিনের গৃহবিবাদ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সে পথে বেড়িয়েছে। খুঁজে পেয়েছে তার চির আদরের ধন গয়াকে। অভুক্ত গয়াকে শাস্তি দিতে গিয়ে কঠিন আঘাত গঙ্গামণিই পেয়েছে।

মামলা-মকদ্দমার তদ্বির ক'রে শেষ পর্যন্ত পাঁচুই গয়ারামের শাস্তি বিধানার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু হৃদয়ধর্মের কাছে সমস্ত বিরোধ-ঈর্ষাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাই পাঁচুকেও হ'তে হয়েছে পরাজিত।

"মামলার ফল" গল্পটি উৎকৃষ্ট রচনা-শিল্পের পরিচায়ক নয়। এ জাতীয় চরিত্র-চিত্রণ এবং কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে পূর্ববর্তী পারিবারিক গল্পগুলির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তাই গল্পের চমৎকারিত্ব মনকে আকৃষ্ট করে না। এই ছোট কাহিনীটির মধ্যে শুধু গয়ারাম-গঙ্গামণির সম্পর্কের পরিচয়টুকুই প্রধান নয়; গঙ্গামণি এবং শিবু সামন্তের কথাও প্রাধান্যলাভ করেছে। গয়ারামের চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি তাদের বিশেষ প্রবণতা নিয়ে পরিস্ফুট হয়নি ব'লে মনে হয়। যেমন গঙ্গামণির স্নেহশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনীর পটভূমিকা চাষার গৃহপ্রাঙ্গণ। অনুভূতি তাদের স্থূল, বুদ্ধি তাদের সরল, জীবন তাদের সচল কিন্তু নিষ্ঠা তাদের অচল। গঙ্গামণি তাই গয়াকে ফিরে পেয়ে সুখী হয়েছে—স্বামীর মায়াও তার কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। অনুভূতির গভীরতা এই সরল জীবন অনুসরণকারীদের মধ্যে নেই ব'লেই অসঙ্গত, অসামঞ্জস্যভাবে এদের জীবনধারা অগ্রসর হয়েছে। কূট-কপটতার আড়াল এদের নেই, তাই এদের ব্যবহার রুক্ষ এবং অমার্জিত। মনের মালিন্য সহজেই মুছে ফেলে সরল আনন্দে আত্মসমর্পণ করতে পারে এরা। অমীমাংসিত ··প্রাসঙ্কুল জীবন নিয়ে বেশী দিন দ্বন্দ্বপরায়ণ হ'য়ে এরা থাকে না। তাই শরৎচন্দ্রও তাঁর এই গল্পে "সর্ব সুসঙ্গতি" বজায় রাখতে চেষ্টা করেন নি। বৈচিত্র্যহীন চাষীর গৃহের দৈনন্দিন একটি চিত্র এই "মামলার ফল" গল্পে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ছবিটি সহজভাবে অনুধাবন করাই যুক্তিযুক্ত। জীবনের গূঢ় তত্ত্বের ক্ষণিক স্পর্শ যদিও বা এখানে থেকে থাকে, তার গভীরতর প্রকাশ এখানে নেই। তবে একথা ঠিক সংলাপের স্বাভাবিকতায়, সংযত বর্ণনা রীতিতে, কাহিনীর সচল পরিবেশ এবং গতিভঙ্গীতে "মামলার ফল" অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়েনি। শরৎচন্দ্র যেন একই ধরণের পারিবারিক সমস্যার বীজ বিভিন্ন মাটিতে রোপণ

ক'রে তার ফসল ফলাতে চেয়েছিলেন এই "জাগরণ পর্বে"। "মামলার ফল" বাঙালী কৃষক-জীবনের ফসল ফলিয়েছে।

(১৬)

মহেশ

"মহেশ" নামকরণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মানস-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু জমিদার, প্রজারা হিন্দু—এই হিন্দু-সমাকীর্ণ গ্রামে তাদের মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে বইকি! তাই বোধ করি মহেশ্বরের বাহন হিসেবেই মহেশের আবির্ভাব। হিন্দু জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে গফুরের অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া তার বলদের নামকরণ 'মহেশ'-এ রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্ততঃ শরৎচন্দ্র যে এই প্রবণতা দ্বারা প্রণোদিত হ'য়েই "মহেশ" নামকরণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া গফুর নামে মুসলমান হ'লেও তার ব্যবহারে, চিন্তায়, সংলাপে সে পুরোপুরি হিন্দুই। গো-হত্যার নামে সে কাণে আঙ্গুল দেয়, গরুর চামড়া বা গরু বিক্রীর নামে সে শিউরে ওঠে। জাতে সে মুসলমান জোলা সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অতিরিক্ত মুসলমান-ধর্মত্ব আর কোথাও এই কাহিনীর মধ্যে পাই না। মুসলমান কসাই-য়ের কাছে বলদটির মূল্য যেভাবে, গফুরের মত মুসলমানের কাছে তা সেরকম না হ'লেও হিন্দুর মত দেবতার স্বীকৃতি না দিলেও, যে ভালবাসা বলদটিকে কেন্দ্র ক'রে প্রকাশ পেয়েছে তা কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতা না থাকলে হয়না।

শরৎচন্দ্র তাঁর মুস্‌লিম-বন্ধুদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়েই মুসলমান নায়ক সৃষ্টি ক'রে কাহিনী রচনা করেছিলেন। এর অতিরিক্ত আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া হয়তো বা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্র যতই 'মুস্‌লিম-সাহিত্যসমাজ' গড়ে তোলার আশ্বাসবাণী শোনান না কেন, গফুর মনে-প্রাণে হিন্দুই থেকে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গফুর চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্র

মুসলমান সমাজ অপেক্ষা অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত নিম্ন হিন্দুসমাজের একটি দরিদ্র সংসারের চিত্র এঁকেছেন। মুসলমান সমাজ-চিত্র হিসেবে "মহেশ" গল্পের কোনও অতিরিক্ত মূল্য নেই।

ছোটগল্পের সার্থক গঠনকৌশল শরৎচন্দ্র যে আয়ত্ত করেছিলেন "মহেশ" তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এতোখানি নিখুঁত সার্থক ছোটগল্প শরৎ-সাহিত্যে অদ্বিতীয় তো বটেই, বোধ করি বাঙলা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। শরৎচন্দ্রের পরিণত লেখনীর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর "মহেশ" গল্পে অঙ্কিত রয়েছে।

কাহিনীর মধ্যে কোথাও বর্ণনার আতিশয্য নেই, প্রকাশের অতিব্যগ্রতা নেই, সংলাপে উচ্ছ্বাস নেই। রচনাশৈলীর পরিমিতিবোধে, সংহত প্রকাশের ফলে ছোটগল্পের রসঘন নিবিড়তা "মহেশ" গল্পকে একটি অপূর্ব মহিমা দান করেছে। একটি নগণ্য অকর্মণ্য বলদকে কেন্দ্র ক'রে যে এতখানি অনুভূতিপ্রবণ কাহিনী গড়ে উঠতে পারে, শরৎচন্দ্রের লেখনীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব বলেই স্বাভাবিক।

কাহিনীর সূত্রপাত সার্থক ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট। বৈশাখ দ্বিপ্রাহরিক বর্ণনার সংযত কলাকৌশল অতি অদ্ভুতভাবে শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন। ছোটগল্পে যে রসের একাগ্রতা—এই শ্রেণীর বর্ণনার দ্বারা তা দ্বিধাগ্রস্ত তো হয়ই নি, বরং পুষ্ট হয়েছে। গফুরের পরিচিতি-পর্ব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ জীবন্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে কাহিনীর গতি স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে গেছে এবং মহেশকে কেন্দ্র ক'রে গফুরের জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার পরিচয় পাঠকের অজানা নেই। সেই প্রসঙ্গে আমিনার পরিচয়ে পাঠক অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মহেশকে কেন্দ্র ক'রে যে ঘটনা ঘটে গেল, তাতে একদিকে গফুর-চরিত্র আরও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো, অন্যদিকে পল্লীসমাজের বিচিত্র মানুষের পরিচয় পাঠকের অজানা রইল না। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ণনা অপূর্ব রসঘন অথচ বাস্তব প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের আদি পর্বে 'বারমাস্যা' বর্ণনা কবিদের

একটা প্রচলিত রীতি হিসেবে স্বীকৃত হ'তো ; বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের কবিদের 'বারমাস্যা' বর্ণনা একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করতো তাঁদের কাব্যে। গদ্য মারফৎ শরৎচন্দ্রের এ শ্রেণীর মাসের বিচিত্র রূপের বর্ণনা যেমন বাস্তব, তেমনি প্রত্যক্ষ অথচ ব্যঞ্জনাপূর্ণ এবং রসঘন। ভাবালুতা প্রকাশের কোনও অবসর এখানে নেই। কাব্যে মুকুন্দরাম যেমন 'বারমাস্যা' রচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন, আধুনিককালে গদ্যে শরৎচন্দ্র বাঙলা কাব্যরীতিকে একটি অভিনব রূপায়ণ দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদে মহেশকে কেন্দ্র ক'রে গফুরের জীবনে দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং মহেশকে আঘাত দেওয়ার ফলে তার মৃত্যুবরণ কাহিনীতে climax এনেছে। এখানে মহেশের মরুভূমির মত শুষে জল খাওয়া, মৃত্যুবরণ প্রভৃতি বর্ণনা এতো প্রত্যক্ষ যে চিত্রপটের মতো পাঠকের মানসনেত্রে তা ভেসে ওঠে। এত সংক্ষেপে এতো জীবন্ত রূপায়ণ শরৎ-লেখনীর বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর। গল্পের সমাপ্তিও ছোটগল্পের ইঙ্গিতময়তা নিয়ে অপুর্বভাবে শেষ হয়েছে। মোটকথা, আঙ্গিকের দিক্ দিয়ে বিচার করলে কি বর্ণনাভঙ্গীতে, কি সংলাপে, কি অলঙ্করণে, কি চরিত্র-চিত্রণে "মহেশ" সত্যকার প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প এবং শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসেবে অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গফুর অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। তার এই স্নেহ একদিকে যেমন কন্যা আমিনাকে কেন্দ্র ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পুত্রতুল্য মহেশকে কেন্দ্র ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—"মহেশ! তুই আমার ছেলে,...তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।" মহেশকে ভালবাসার মূলে গফুরের স্নেহপ্রবণ মনই একমাত্র কারণ নয়, কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে মহেশের প্রতি তার স্নেহবোধ জেগেছে—"তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন ক'রে বুড়ো হ'য়েছিস্..."

কোনও মূক জীব যে কাহিনীতে এরকম মুখর হ'য়ে উঠ্তে পারে, তা সত্যই বিস্ময়কর। মহেশ শুধুমাত্র কাহিনীর পটভূমিকায় নেই বা মহেশকে কেন্দ্র ক'রেই শুধু গফুরের জীবনে নানা আন্দোলন দেখা দেয়নি ; মহেশ এখানে কাহিনীর অন্যতম পাত্র হিসেবে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করেছে।

কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকে যেমন প্রকৃতি এবং জীব নীরব ছিল না, নাটকের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করেছিল, "মহেশ" গল্পে যেন তারই প্রতিরূপ লক্ষ্য করি।

শরৎচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্যের ফলে মহেশ চতুষ্পদ জন্তু হিসেবে পরিগণিত হয়নি, অনুভূতিশীল হ'য়ে উঠেছে,—যে অনুভূতির দ্বারা মহেশকে পশুত্বের পর্যায়ভুক্ত ক'রে রাখা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তর্করত্নের হাতে চাল-কলা দেখে মহেশ খাবার ব্যগ্রতায় মাথা নেড়ে অগ্রসর হয়েছে। অভুক্ত সন্তানের আহার-ইচ্ছায় ব্যথিত দরিদ্র পিতা যেমন অপরের কারুণ্য ভিক্ষা করে, সন্তানের লোভকে অন্যায় ব'লে প্রতিপন্ন করে না, গফুরও তেমনই আশান্বিত হ'য়ে তর্করত্নের উদ্দেশ্যে বলেছে—"গন্ধ পেয়েছে কিনা, একমুঠো খেতে চায়"।

মহেশকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বেদনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠার জন্যই মহেশকে এই গল্পের সক্রিয় চরিত্ররূপে পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। "বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা" চোখ দু'টির প্রতি গভীর হতাশায় গফুর যখন অক্ষম পিতৃত্বের গ্লানিতে বিচলিত হয়েছে, আকুলকণ্ঠে মহেশকে জানিয়েছে তার প্রতি ভালবাসার কথা, "মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল।" গফুরের অনুতপ্ত স্বরে মহেশের ক্ষুধার তীব্রতা যেন হ্রাস হ'য়ে গিয়েছে। মহেশের সঙ্গে কথা বলতে বল্‌তে গফুরের চোখের জল উছল হ'য়ে উঠেছে। এই দৃশ্যের বর্ণনায় পাঠক মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত না হ'য়ে পারে না। মহেশের ক্ষুধার্ত এবং তৃষিত জঠর বাঙলার চিরদরিদ্র সংসারের অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। গফুর যেন সেই সংসারের প্রতিপালক যার স্নেহ আছে সাধ্য নেই, চেষ্টা আছে সম্বল নেই, সাহস আছে ক্ষমতা নেই। মহেশের "ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টির"-র নীরব ভাষা গফুরই শুধু বোঝে। তাই গফুর মহেশের সান্নিধ্যে তার সব বিবেচনা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। বিক্রী করা ঠিক ক'রেও বিক্রী করা তার হয়নি। যে মহেশের প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে গফুর সর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নয়, সেই গফুরেরই নির্মম প্রহারে মহেশ প্রাণত্যাগ করেছে।

মহেশের এবং গফুরের মধ্যে যে প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, ভাবের সেই আদানপ্রদানে, মনের সেই নির্বাক অভিব্যক্তিতে মহেশ সবাক হ'য়ে উঠেছিল। তাই বোধ হয় মহেশের অভিযোগপূর্ণ অভিমান নিয়ে মৃত্যুবরণে গফুর মহেশের অতৃপ্ত আত্মার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আদরিনী" ও তারাশঙ্করের "কালাপাহাড়ে"র কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আদরিনীকে কেন্দ্র ক'রে জয়রাম মুখুজ্জের হৃদয় যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, মহেশকে কেন্দ্র ক'রে গফুরের হৃদয়-রসও সেইভাবেই নিঃসৃত হয়েছে। তু'টি মানব-চরিত্র ধর্মে-পরিবেশে-চিন্তায় সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু মানবাত্মার একক অভিব্যক্তিতে তারা নিঃসন্দেহে অভিন্ন।

গফুর কর্তব্যনিষ্ঠ। মহেশকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েও তাকে পালন করতে পারেনি, তাই তার দ্বিধা-সঙ্কোচের অন্ত নেই। নিজেদের তুঃখে সে বিচলিত নয়, কিন্তু "…না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।" —এ বেদনা গফুরকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে; কারণ গফুর বলে যে "মহেশের পাঁজরা গোনা যাচ্ছে…আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই; কিন্তু ও আমার অবলা জীব, কথা বল্‌তে পারেনা, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।" মহেশকে খাওয়াবার জন্য সে নিজেও উপবাস করতে রাজী, দরিয়াপুরের খোঁয়াড় থেকে মহেশকে ছাড়িয়ে আন্‌তে তার একমাত্র সম্পত্তি পিতলের থালাটি জমা দিতেও সে কুণ্ঠিত নয়। মহেশের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও অর্থের লোভে মহেশকে বিক্রী ক'রে ফেল্‌তে সে রাজী নয়।

গফুর শুধু গরীব এবং নিরীহই নয়, "এই লোকটাকে জেদী এবং বদ মেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত।" কাহিনীর মধ্যে গফুরের কোমল ও স্নেহপ্রবণ মনের অন্তরালে একটি অমার্জিত, রুক্ষ মনের প্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে গফুরের অফুরন্ত স্নেহ ও নম্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেশের জন্য তর্করত্নের কাছে অভিযুক্ত হওয়া, আবার তারই জন্য কাহন তুই খড় ধার চাওয়া, নিজের পতনোন্মুখ একমাত্র কুঁড়ের চালা

থেকে কন্যার অজান্তে খড় টেনে নিয়ে মহেশকে খাওয়ানো এবং নিজের অন্ন মহেশকে দেবার প্রস্তাবের মধ্যে তার কোমল অন্তরেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "একজন বুড়ো গোছের মুসলমান" কর্তৃক দশ টাকা মূল্যে মহেশকে ক্রয় করার প্রস্তাবে গফুরের দৃঢ় মনের প্রতিবাদ তার চরিত্রের আর একদিকের পরিচয় বহন ক'রে আনে। মহেশের জন্য তার দুর্ভোগ হয়েছিল ব'লেই সে অভিমানবশে তাকে বিক্রী ক'রে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখনই মহেশের চামড়ার দামের কথা শুনেছে, নিজের স্বাভাবিক ধৈর্য থেকে গফুর বিচ্যুত হয়েছে। এর মধ্যে জেদী বা বদমেজাজী কোন মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মহেশকে গফুর নিছক বলদ হিসেবেই গ্রহণ করেনি, পুত্র-স্নেহে প্রতিপালিত জীবের প্রতি এ শ্রেণীর উক্তি ("চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর কি আছে?") গফুরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। গফুর মহেশকে বিক্রী ক'রে দেবার যে প্রস্তাব করেছিল, এই কাজকে সে এতো বড় অন্যায় মনে করেছে যে নিজেই জমিদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে দুই কান মলে নাকে খদ দিয়েছে; এমন কি সকলের কটূক্তিকে গফুর "যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান এবং সকল তিরস্কার সাবনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে গফুরের যে ক্রুদ্ধ মন ও রুক্ষ স্বভাবের পরিচয় পাই, তার মধ্যে জেদী বা বদমেজাজী মনোভাবে পরিচয় নেই। জৈষ্ঠ-শেষের দ্বিপ্রহরে দুর্বল এবং শ্রান্ত দেহে, ক্ষুধায়-পিপাসায়-ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে গফুর যখন আমিনার কাছে ভাত এমন কি জল চেয়েও পায় নি, তখন শত সহিষ্ণু ব্যক্তির পক্ষেও স্বাভাবিক ধৈর্য রক্ষা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় জমিদারের পেয়াদার যমদূতের মতো আবির্ভাব প্রসন্নচিত্তে না গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে গফুরের সাহস এবং দৃঢ়মনের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু ব্যবহারে অমার্জিত মনের প্রকাশ কোথাও ঘটে নি। গফুর নীরবে মহেশের জন্য এই অবস্থাতেই জমিদারের গৃহে লাঞ্ছিত হয়েছে—"ঘণ্টা খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল, তখন

তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।" এই অবস্থায় মহেশ কর্তৃক পুনরায় উপদ্রুত হওয়ায় গফুর আত্মবিস্মৃত হয়েছে। লাঙ্গলের ফলা দিয়ে আঘাত করার মধ্যে গফুরের কোনও বিপরীত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটে নি। পুত্রের অন্যায়ে পিতার শাসন স্নেহেরই নামান্তর। কিন্তু এর ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিল তার জন্য গফুর প্রস্তুত ছিল না। "গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।" গ্রামান্তের মুচিদের "হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিল।" এর প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুর নিজের জীবনকে লাঞ্ছিত করতে চাইলো। তাই শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে কাজ সে গ্রহণ করতে রাজী হয় নি, আজ মহেশের মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুর জীবনের শেষ সম্বল—নিজের ইজ্জতকে বিসর্জন দিয়ে কন্যার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে গেল। গফুরেব বেদনা, এই ত্যাগ, তার নিজের জন্য নয়, মহেশের জন্য। তাই বিদায় নেবার আগে মহেশের জন্যই সে খোদাতালার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে—"আল্লা! আমাকে যত খুশী সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে।...যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখন মাপ কোরো না।"—এ অভিযোগ শুধু মহেশ বা গফুরের অভিযোগ নয়, লাঞ্ছিত মানবাত্মার মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ।

গফুর হিন্দু-নিগৃহীত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি নয়; সে অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত মানব-গোষ্ঠীর প্রতিভূ। দীনবন্ধুর 'তোরাপ' চরিত্রের মধ্যে একটি নিম্নশ্রেণীর চাষী মুসলমানের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একদিকে কর্কশ এবং বীভৎস মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে অত্যাচারিত বা বিপদগ্রস্ত হ'য়েও বাধ্যতার পরিচয় দেওয়া তোরাপের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ দেখা যায় তোরাপের মধ্যে। গফুরের মধ্যে এই গ্রাম্য চাষীর অসঙ্গতিপূর্ণ চারিত্রিক পরিচয় কোথাও পরিস্ফুট হয় নি। যতটুকু ধৈর্যচ্যুতি তার মধ্যে ঘটেছে, যে কোনও শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন

ব্যক্তির পক্ষে তা অসম্ভব নয়। তাই তোরাপ চরিত্রটি নিম্নশ্রেণীর লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে যতখানি বাস্তব হ'য়ে উঠেছে, গফুরের চরিত্র-চিত্রণে কিছু কল্পনার রস মিশ্রিত হওয়ায় ততখানি বাস্তব ব'লে মনে হয় না।

গফুরের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে তদানীন্তন বাঙলার এক লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত মানবসমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের জমিদার ও তাঁদের দ্বারা পুষ্ট এক শ্রেণীর মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর কতখানি অত্যাচার করতে পারে, তারই জীবন্ত চিত্র 'মহেশ' গল্পে পাই। এই অত্যাচারের পটভূমিকায় গফুর-মহেশ-আমিনার স্নেহ-দ্বন্দ্ব, ব্যথা-বেদনার অশ্রুসজল কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'জাগরণ পর্বে' 'মহেশ'-ই প্রথম গল্প যেখানে কাহিনীর সমাপ্তি সম্পূর্ণ বিষাদময়।

দশ বছরের আমিনা "স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত"। মাতৃহীনা আমিনা গফুরের কাছ থেকে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ পেয়েছে। তাই গফুরের সঙ্গে সেও সুখ-দুঃখের সাথী হ'তে পেরেছে। দুঃখের মধ্যে দিয়েই সত্যকারের জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। দশ বছরের আমিনার জীবন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমিনা শত কষ্টের মধ্যেও গফুরকে জুগিয়েছে অন্ন, স্নেহান্ধে অভিভূত গফুরকে সচেতন করবার চেষ্টা করেছে। গফুরের খরতপ্ত জীবনে আমিনা শরতের স্নিগ্ধছায়া। এটুকু না পেলে হয়তো গফুরকে বহু পূর্বেই মহেশকে বিসর্জন দিতে হ'তো। মহেশকে কেন্দ্র ক'রে গফুরের জীবনে যে দুঃখের ইতিহাস রচিত হয়েছিল, আমিনার উপস্থিতি সেখানে শান্তিরূপ দেখা না দিলে নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে কাহিনী এতো রসঘন হ'য়ে উঠতে পারত না। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতা আরও প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে তখনই, যখন ধরণী স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে প্লাবিত হয়। তাই গফুরের লাঞ্ছনাকে আরও প্রত্যক্ষ ক'রে তোলবার জন্যই আমিনার স্নিগ্ধ-কোমল চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

'মহেশ' গল্পে যে গ্রাম্য পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত, অথচ প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। তর্করত্নের ব্রাহ্মণত্বের সুযোগে নানারূপ কটু মন্তব্যপ্রকাশ, জমিদার শিববাবুর 'সহৃদয়' অত্যাচার অত্যন্ত জীবন্ত রূপ পেয়েছে। সংলাপের পরিমিতি-বোধ ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।

কাশীপুর গ্রামের অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গেরই কোনও এক অংশে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু গফুর প্রভৃতির কথাবার্তায় 'আঞ্চলিক পরিভাষা' ব্যবহারে শরৎচন্দ্র সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। অলঙ্করণ এবং বর্ণনা সম্পূর্ণ সার্থক। তর্করত্নের ক্রিয়া-কলাপের প্রতি শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—"তর্করত্ন···'গো' শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যেজন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।" সৃষ্টির আবেশ মুহূর্তে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' রচনাটি শুধু বাঙলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির অন্যতম গল্প হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে।

গফুরের মতো দরিদ্র চাষীদের ওপর জমিদার সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারে সমাজ-ব্যবস্থায় যে ভাঙন শুরু হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের এই গল্পে তারই পূর্বাভাস পাই। এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পরবর্তীকালে জমিদার ও প্রজাকুলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, অত্যাধুনিক কালের সাহিত্যে তারই রূপায়ণ দেখি। সেই হিসেবে শরৎচন্দ্রকে এই প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের পথ-নির্দেশক বলা যেতে পারে। এই মন্তব্যের পক্ষে আরও যুক্তি এই যে, বর্তমানে শহরাঞ্চলে বা শহরের উপকণ্ঠে বাঙলার চাষীসম্প্রদায় যে ধীরে ধীরে শ্রমিকসম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে জমিদার-সম্প্রদায়ের এই অত্যাচারেরই ইতিবৃত্ত। এই অসহায় প্রজাকুল তাই বাধ্য হয়েছে গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে চাষীজীবনকে বিসর্জন দিয়ে শ্র'মক হ'তে। "মহেশ" গল্পে গফুরের জীবন-মাধ্যমে শরৎচন্দ্র এই জীবনান্তর গ্রহণের পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গল্পটি বিচার করলে শুধুমাত্র অত্যাধুনিক সাহিত্যেরই পূর্বাভাস পাই না, শরৎ-মানসের সুস্পষ্ট অগ্রগতি সহজেই নজরে পড়ে—"···আধুনিক সাহিত্য-রচনায় সমাজের একশ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে; বিরোধের আরম্ভ যে কোনখানে সেদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর ক'রে তোলবার আমার

প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই; শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্যাচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্যপথে চল্‌তে বাধ্য হ'য়ে পড়েছি সেই আভাসটুকু মাত্র···নিবেদন করলাম।"

(১৭)

অভাগীর স্বর্গ

অভাগীর জন্ম-মুহূর্তে তার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। পিতা শিশুকন্যার এই দুর্ভাগ্যকে লক্ষ্য ক'রে নামকরণ কবলেন "অভাগী"। মাতৃহীনা অভাগীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী 'দুলে' সমাজের ইতিহাসে কিছু অভিনব নয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অস্বাস্থ্যে বাঙলা দেশের এই নিম্নশ্রেণী জনসমাজের ভাগ্যাকাশ সমাচ্ছন্ন; উচ্চশ্রেণীর প্রতাপে বিনষ্ট হয়েছে এদের প্রাণশক্তি, নিগৃহীত হয়েছে এরা মানুষের সামান্যতম আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ ক'রে। অভাগীর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি; স্বামী-পরিত্যক্তা হ'য়ে একমাত্র সন্তান কাঙালীকে নিয়েই তার দুঃখের জীবন অতিবা[illegible] হয়। জীবনকে অভাগী পূর্ণতমরূপে আস্বাদ করতে পারেনি ব'লেই মৃত্যু-বরণে সে স্বাধীন ইচ্ছা পোষণ করেছে। কিন্তু অবজ্ঞাত জনসমাজের ক্ষুদ্রতম আশা যেখানে প্রতিপদে লাঞ্ছিত হয়েছে, মৃত্যুর পরপারে তা চরিতার্থ হবে—এ সুখ-কল্পনা করবার অধিকারও তাদের নেই।

"···ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়। স্বামী-পুত্র-[illegible]ই নাতি-নাতিনী, দাসদাসী পরিজন,—সমস্ত রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ"—বা[illegible]ই সমাজে মাতাপিতার একান্ত কামনার সামগ্রী। মৃত্যুর পরে অনন্ত সুখ[illegible]ধুই শান্তির উৎসভূমি স্বর্গধামে যাত্রা-পথের 'ছাড়-পত্র' স্বরূপ (Passport) '[illegible]কে হাতের আগুন' লাভ মাতাপিতার স্ব-কল্পিত সংস্কার হ'তে পারে; কি

সংস্কারকে অকুণ্ঠিতচিত্তে বিশ্বাস ক'রে বাঙালী পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব চিরকাল বহন ক'রে এসেছে। ইহকালের দুর্দশার অবসান ঘটবে সন্তানের হাতের আগুন পাবার সঙ্গে সঙ্গে—এ আকাঙ্ক্ষা 'দুলে'-মেয়ে অভাগীর অন্তরেও দেখা দিয়েছিল। সমাজ-শাসিত গ্রাম্য-জীবনে সমাজ-বহির্ভূত অস্পৃশ্যা অভাগীর মৃতদেহের সৎকার স্বামী-পুত্রের হাতে অগ্নিদাহে সম্পন্ন হ'তে পারেনি। অভাগীর স্বর্গারোহণের কল্পনা সমাজের প্রীতিহীনতায় লাঞ্ছিত হ'লেও পুত্রবতী অভাগী তার একনিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছিল। মৃত্যুর পরপারে 'ছোটজাত' 'বড়জাতে'র জন্যে পৃথক্ ব্যবস্থা হয়তো নেই, তাই অভাগীর অনাদৃত জীবনের বাসনা চরিতার্থের কোনও প্রশ্নই সেখানে দেখা দিতে পারেনা। শরৎচন্দ্র বলেছেন—"...কি জানি এত ছোটজাতের জন্যেও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কিনা, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়",—এর উত্তর পাওয়া যাবে তথাকথিত সমাজ এবং জাতি-বিশারদের অতি-নিপুণ ত্রিকালদর্শী মন্তব্যের মধ্যে। কিন্তু অভাগীর স্বর্গ তার কল্পলোকে দেখা দিয়ে তার বিশ্বাসকে মর্যাদা দান করেছে। মৃতদেহটা অভাগীর অগ্নিতে ভস্মীভূত না হ'য়ে ভূগর্ভে স্থান পেলেও ঠাকুরদাস মুখুজ্যের পুত্রবতী স্ত্রীর মতো অভাগীও একই ভাবে মৃত্যু-পথে যাত্রা করেছে অর্থাৎ অভাগীর নশ্বর দেহে হয়তো অগ্নিদাহ হয়নি, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অভাগীর আমৃত্যু প্রার্থনা সেই স্বর্গ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটেনি।

"বিলাসী", "মামলার ফল", "মহেশ", "অভাগীর স্বর্গ" গল্পে শরৎচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রী নিয়ে কাহিনী-পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অমনিভাবে বিরচিত এই গল্পগুলিতে বাঙলার অনাদৃত সমাজের সহজ-যাত্রার কথা, তাদের স্নেহ-মমতা, প্রেম-কৃতজ্ঞতা-একনিষ্ঠতার পরিচয় ও ভাক আশা-নিরাশার করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কথা-বিরোত্যের যে প্রবণতা আমাদের প্রদর্শন করিয়েছিলেন, সেই ধারায় গল্প-আমার ম শাশ্বত জীবনধর্মের বিচিত্র ব্যাখ্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্রমবিবর্তিত কিন্তু অন্যদিকে জীবনধর্মের বিচিত্র প্রকৃতি এবং প্রবণতা যখন

জটিল এবং কুটিল রাজনীতি, সমাজনীতি এবং মানুষের স্বার্থদুষ্ট প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, সাম্প্রতিক সমস্যার ভারে জীবন তখন প্রপীড়িত। সামাজিক বুদ্ধি হীনতম উপায়ে নিম্নস্তরের জীবন-যাত্রায় আঘাত দিতে উদ্‌গ্রীব। শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকটি গল্পে সামাজিক অধিকারের কাহিনী অঙ্কিত ক'রে পূর্ব-প্রবর্তিত ধারা থেকে কিছু সরে এসেছেন। উচ্চ-নীচ-ধনী-দরিদ্রের সমস্যা শাশ্বত সন্দেহ নেই কিন্তু তার উগ্রতা ক্রমশঃ বিশ্বের শান্তি হরণ করেছে। তার ফলে জীবনের ধারা বক্রগতিতে অগ্রসর হওয়ায় সাহিত্যেরও ঘটেছে রূপান্তর। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের দিক্-পরিবর্তন শরৎচন্দ্র থেকেই যে সূচিত হয়েছে, তার প্রামাণ্য নিদর্শন হিসেবে "মহেশ" এবং "অভাগীর স্বর্গ" গল্প দু'টির স্থান অনস্বীকার্য।

'মহেশ' ছোটগল্পের নিখুঁত রূপায়ণ। এর পরবর্তী রচনা হিসেবে "অভাগীর স্বর্গে"ও আমরা লেখকের উৎকৃষ্ট রচনাভঙ্গী আশা করতে পারি। "অভাগীর স্বর্গ" গল্পের মূল বিষয়বস্তু দেখা দিয়েছে অভাগীর মৃত্যুযাত্রাকে উপলক্ষ ক'রে। এই মূল বিষয়ের প্রারম্ভে ঠাকুরদাস মুখুজ্যের বর্ষীয়সী স্ত্রীর শ্মশানযাত্রার বর্ণনা কাহিনীর প্রারম্ভিক ঘটনা প্রসঙ্গে যথাযথ। এই শ্মশান-যাত্রার সঙ্গে অভাগীর কাহিনীভাগে আবির্ভাব শরৎচন্দ্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে অভাগীর মানসনেত্রে রথের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তার ফলে কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই আত্মপ্রকাশ করলেও পাঠক-মনে কৌতূহল ক্ষুণ্ণ হয়নি।

প্রথম পরিচ্ছেদে শ্মশান-সংকারের পরেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অভাগীর 'কাঙাল জীবনের' পরিচয় দিতে শরৎচন্দ্র সক্রিয় হয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে অভাগী এবং কাঙালীর মধ্যে কেবল "সেই শ্মশানে ও শ্মশান যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তার স্বর্গে যাওয়া"।—একই পরিস্থিতিতে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। শুধুই মাতা-পুত্রের কথোপকথন, অন্য কোনও ঘটনার অবতারণা ক'রে কাহিনীকে ভারগ্রস্ত ক'রে পাঠক-মনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে অভাগীর আসন্ন মৃত্যুকালের বর্ণনা নিয়ে কাহিনী কিছু গতিশীল হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে কাহিনী-সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে করুণ রসের আধিক্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এই অংশটুকু দিয়ে ছোটগল্পের সমাপ্তি-জনিত কৌতূহল ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। এটুকু বাদ দিলেও গল্পের দিক দিয়ে কোন ক্ষতি ছিল না। এই পরিচ্ছেদটিতেও অভাগী এবং কাঙালীকে নিয়ে কাহিনী সক্রিয় হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যে দিয়ে কাহিনী সমাপ্তি লাভ করেছে। এই অংশে বাঙলা-দেশের এক অনাদৃত সমাজের প্রতি জাত্যাভিমানী সমাজের অশ্রদ্ধাকে প্রকাশ ক'রে শরৎচন্দ্র অভাগীর মৃত্যু-কাহিনীকে আরও আবেদনশীল ক'রে তুলেছেন। কাঙালীর প্রতি জমিদার-কর্মচারীর ব্যবহারের বর্ণনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। এ জাতীয় উচ্ছ্বাস-প্রবণতা এই অংশের কয়েক ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়ে থাকলেও পাঠক-মন অভাগীর মৃত-দেহের সংকার সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। এর ফলে ছোট গল্পের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল বজায় থাকে এবং ছোটগল্পের সমাপ্তির দিক দিয়ে এই গল্পটি সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

কাঙালীর মা অভাগীর ভাগ্য শৈশব থেকেই সুপ্রসন্ন ছিল না। কিন্তু অভাগীর অভাগ্যের দেবতা তাকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করেননি। কাঙালীকে পেয়ে অভাগী তার মাতৃত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং এই সন্তান-স্নেহই তাকে আত্মত্যাগের পথ দেখিয়েছে। দুলে-বাগ্দীর ঘরে বহু বিবাহ নারী-পুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে অনুসৃত হয়। সুতরাং অভাগীর স্বামী তাকে ত্যাগ করলে সে অনায়াসেই পুনর্বিবাহ করতে পারতো। কিন্তু কাঙালীর অসহায়তার কথা চিন্তা ক'রে দুঃখী অভাগী নতুন ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোল্‌বার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছে। সুখে-দুঃখে অভাগী কাঙালীকে চোদ্দ-পনের বছরের ক'রে তুলেছে। কাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও সুন্দর সুখ-স্বপ্ন অভাগী মনে মনে পোষণ করতো

কিনা আমরা জানিনা, কারণ কাহিনী মাতা-পুত্রের জীবনগত ভাবনা-চিন্তার কথা নিয়ে আবর্তিত হয়নি। তা ছাড়া অভাগীর ক্ষুদ্র অনুভূতিতে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাঙালীর অন্ন-বস্ত্র জুগিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই অভাগীর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। মাতৃহীনা অভাগীর শৈশব স্নেহ-মমতার স্পর্শ পায়নি; পরবর্তী জীবনে স্বামীও হয়েছে তার প্রতি বিরূপ। তাই কাঙালীকে সে তার চির-বঞ্চিত জীবনের কথা স্মরণ ক'রে সমস্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। মাতৃত্বের গৌরব লাভ ক'রে সে তার ভাগ্যহীন জীবনে শান্তি পেয়েছে।

অভাগী এবং কাঙালীর জীবন-নির্বাহের চিত্র দান করাই এই গল্পে শরৎচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বাঙালীর বর্ণ-ব্যবচ্ছেদে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কতকগুলি নিষ্ঠুর ব্যবস্থার প্রবর্তন দেখা দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র অভাগীর মৃত্যু-কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সমাজের অনুভূতিহীন হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন। দুঃখের সমস্ত ভারটুকু কাঙালীর জন্য রেখে অভাগী মৃত্যুর পরপারে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাঙালীই এই গল্পের ট্র্যাজিডির প্রতিমূর্তি—"হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।"

অস্পৃশ্য দুলের মেয়ে অভাগীর প্রাণের মূল্য কাঙালীর কাছে যত বড়ই হোক্ না কেন, উচ্চবর্ণীয় গ্রাম্য-সমাজের অধিনায়কদের কাছে তা নিতান্তই নগণ্য। বেঁচে থাকাই যাদের পক্ষে বিড়ম্বনা, মৃত্যুর পর কোন অনুষ্ঠানের পর্ব টেনে তাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার স্পর্ধা নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজ সইবে কেন? সমাজের রক্তচক্ষুর অন্তরালে অভাগীর স্বর্গ-গমনের আশা অঙ্কুরিত হয়েছিল; ছেলের হাতে আগুন পেয়ে এই দুঃখময় পৃথিবী থেকে তার মুক্তি ঘটবে—এতবড় আকাঙ্ক্ষা সামান্য অভাগীর মতো মায়ের করা উচিত কিনা, সমাজ-নবিসেরা তার কৈফিয়ৎ চাইবে! কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যকারের দৃষ্টিতে অভাগীর ক্ষুদ্র জীবনের এই স্বাধীন কল্পনা-বিহার দুরাশা ব'লে মনে হ'তে পারেনা। অভাগীর ভাগ্য বিরূপ, সমাজ

সহানুভূতিহীন, কিন্তু আশা দৃঢ়। তাই যে কাঙালীর মঙ্গলেচ্ছায় সে ভোগ-সুখের সৌভাগ্যতেও লুব্ধ হয়নি, সেই প্রিয়তম সন্তানকে নিঃসহায়ভাবে ত্যাগ ক'রে সে মৃত্যু-যাত্রা করেছে। সতীত্ব এবং মাতৃত্ব অর্থাৎ নারীত্বের গৌরব যেন অভাগী তার মৃত্যু দিয়ে প্রমাণ ক'রে গিয়েছে। এ যেন এক জগৎ থেকে অন্য জগতে পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া; "ছাড়-পত্র" স্বরূপ কাঙালীর হাতের আগুনটুকু অভাগীর প্রয়োজন।

অভাগী তার এই সঙ্কীর্ণ জীবনটুকুর সুকৃতির জোরেই যেন মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছে। মুখুজ্যে-গৃহিনীর শ্মশান-যাত্রার এবং শ্মশানের বিচিত্র অনুষ্ঠানের স্মৃতি অভাগীকে এত গভীরভাবে অভিভূত করেছিল যে অসুস্থ অবস্থায় আকণ্ঠ মৃত্যু-স্পৃহায় কাঙালীকে বুকে নিয়ে "...সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়,—নিজের সৃষ্টি।...কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশ-জোড়া ধোঁয়া ত ধোঁয়া নয়, বাবা, সেই ত স্বগ্যের রথ!"—এই বিশ্বাসের আত্যন্তিকতায় অভাগীর সজ্ঞানে মৃত্যু ঘটেছে। সে পরম আগ্রহভরে সধবা নারীর মৃতদেহ সংকারের সর্ববিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের নির্দেশ কাঙালীকে দিয়েছে; যেন স্বর্গের রথ তাকে নিয়ে চলে যেতে কোনও বাধা না পায়। কাঙালীর উপস্থিতি যে অভাগীকে স্বামী সম্পর্কে কখনও অবহিত করেনি, সেই স্বামীর পদধূলি আজ তার কাছে একান্ত কাম্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

বামুন-মার স্বর্গ-যাত্রার কল্পনা অভাগীর গভীর বিশ্বাসের জোরে সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা অভাগীকে জীবনে সহ্য করতে হ'লেও, পুত্রবতী সে। সুতরাং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের সমস্ত ক্ষত সে নিশ্চয়ই মুছে ফেলতে পারবে—এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হ'তে হবে না। "...তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া (অভাগী) বলিতে লাগিল,

ছোটজাত ব'লে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না, দুঃখী ব'লে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন,—রথকে যে আসতেই হবে।" এই অস্বাভাবিক অনুপ্রেরণার উত্তেজনায় অভাগী অসহায় কাঙালীর কথা ভেবে দেখেনি। মায়ের রথ-যাত্রার বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন বর্ণনায়—"কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।" মৃত্যুর মোহে অভাগী কাঙালীর প্রতি উদাসীন হ'য়ে পড়েছে। প্রিয় সন্তানকে ছেড়ে চলে যেতে তার কোন দুঃখবোধই জাগেনি—"ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে" প্রাণ দিয়ে "সতীলক্ষ্মী"র সৌভাগ্যলাভ অভাগীকে অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ করেছে। কিন্তু কাঙালী মায়ের আকুলতায় বিচলিত হয়েছে, দুঃখও পেয়েছে।

অভাগী আশা-নিরাশায় আন্দোলিত হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, কিন্তু অসমাপ্ত অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দান করতে কাঙালীর দুর্ভোগ হয়েছে শুরু। ছোটজাতের শ্মশান-উৎসব যে নিতান্তই মূল্যহীন এবং এই ইচ্ছা পোষণ করাও যে তাদের পক্ষে অযৌক্তিক, কাঙালী কাঠের অভাবে মায়ের মৃতদেহ সংকার করতে না পেরে, তা উপলব্ধি করেছে। জীবিতকালেই যে জাতের উপস্থিতিতে উচ্চবর্ণসমাজ গোবর জলের ছড়া দিয়ে শুচিতা রক্ষা করে, সে জাতের মৃতদেহ নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান শুধু দুঃসা[illegible] নয়, গভীর অপরাধ। একদিকে মৃত মুখুজ্যে-গৃহিণীর শ্রাদ্ধ-বাসর—পুণ্যবতীর উদ্দেশ্যে গ্রামীণ অধিবাসীর শ্রদ্ধাবনত মনোভাব; অন্যদিকে "দুলের মড়া"-র প্রতি কি গভীর ঘৃণাবোধ! কিন্তু অভাগীও তো স্বামী-পুত্র বর্তমানেই প্রাণত্যাগ করেছে, তবে কেন এতো বৈষম্য! পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ—সমাজ সব কিছুরই বিচার করেছে জাতিভেদের দোহাই দিয়ে। বর্ণ-বৈষম্যের গুরুত্বে ধর্মবোধও হয়েছে লুপ্ত; উচ্চবর্ণের গড়ে তোলা নিয়ম-নিষ্ঠার শৃঙ্খলে এই নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রেরা আবদ্ধ হ'তে পারেনি, তাই তো তারা অনাচারীরূপে পরিগণিত হয়েছে এবং সমাজ-বহির্ভূত হ'য়ে ঘৃণিত হয়েছে। অর্থগৌরবে,

জাতিগৌরবে, আচারের প্রাণহীন ব্যবস্থার অনুসরণে তথাকথিত নৈষ্ঠিক উচ্চবর্ণীয় সমাজ যে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছে, যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে, শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ-লাভের চিত্র তারই পটভূমিকায় রচিত। ধর্মের বৃহৎ ক্ষেত্রকে লোকাচার এবং দেশাচার প্রভৃতি ক্ষুদ্রতায় বিভক্ত ক'রে ক্ষয়িষ্ণু সমাজধর্মের ভিত্তি হ'য়ে এসেছে শিথিল। "...পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।" —মায়ের স্বর্গ-রথ দেখা যাবে কি? কিন্তু শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মানস দেখেছে নিঃসহায়, অনাদৃত, লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর গোপন দীর্ঘশ্বাসে আস্ফালন-সর্বস্ব, ধ্বংসপ্রবণ সমাজ-জীবন স্বল্প ধোঁয়াটুকুর মতই বিলীন হ'তে চলেছে। অনাগতকালের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম "অভাগীর স্বর্গ-রথের" মতই শরৎচন্দ্রের মানস-নেত্রে প্রতীয়মান হয়েছে—"যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হ'য়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই...এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে; এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে..."—"অভাগীর স্বর্গ" গল্পে এই নালিশেরই একটি শিল্পময় প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এই গল্পে শরৎচন্দ্র সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তার গুরুত্ব কোনও বিশেষ দেশগত নয়। লোকাচার বা দেশাচারকে উপলক্ষ ক'রে মানব-সমাজে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে পীড়ন করার ফলে বিভিন্ন দেশে বিচিত্র 'সাম্প্রতিক সমস্যা' দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সমস্যাগুলির উদ্ভব সবক্ষেত্রেই সবল এবং দুর্বলের মধ্যে। সুতরাং সমস্যার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটি সর্বজনীন অসন্তোষ মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে দুর্বল এবং অসহায় ক'রে তুলেছে। অধ্যাত্ম-তৃপ্তি নিয়ে মানুষ বস্তুগত জীবনে সহজভাবে চল্‌তে পারছে না। তাই দ্বন্দ্বপ্রবণ সমাজ-জীবনের আসন্ন পরিবর্তন সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হ'তে শুরু করায় সাহিত্যের সর্বজনীনতা যুগের মানদণ্ডেই

প্রমাণিত হয়েছে—"...এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ্‌-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে..."—"মহেশ", "অভাগীর স্বর্গ" গল্প দু'টির দেশ-কালোত্তীর্ণ আবেদন অবশ্যস্বীকার্য।

স্বভাব-সিদ্ধ বর্ণনা সৌকর্যে, ভাষার সুমিষ্টতায়, যথাযথ সংলাপ-প্রয়োগে এবং স্বল্প পরিসর-বদ্ধ অভাগীর জীবন-সমাপ্তির কাহিনী গল্পকার শরৎচন্দ্রের অপসৃয়মান প্রতিভার শেষ নিদর্শন। অত্যাধুনিক সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া-মুখর সুপ্রশস্ত পথের কয়েকটি সুদৃঢ় ভিত্তিমূল শরৎচন্দ্রের এই গল্প ক'টির সঙ্গে অনুবিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

(১৮)

হরিলক্ষ্মী

'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দু'টির প্রকাশকাল 'হরিলক্ষ্মী' 'পরেশ' অপেক্ষা দু'তিন বছর আগে। উৎকৃষ্টতর রচনাভঙ্গীর পরিচয় নিয়ে 'মহেশে'র পরবর্তী গল্পগুলির আবির্ভাব আশা করা আমাদের পক্ষে অন্যায় নয়। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, বিশেষ ক'রে "উদ্বোধন পর্বে"। কিন্তু "জাগরণ পর্বে" তাঁর বিভিন্ন রচনাগুলি সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক মাসিক পত্রিকাগুলিতে সে সময়ে শরৎচন্দ্রের গল্প এবং উপন্যাস অনবরতই প্রকাশিত হ'তে থাকে। সুতরাং কোনও রচনা অমনোনীত হ'য়ে লেখকের পুনর্মার্জনের জন্য অপেক্ষা করেনি। এদিক দিয়ে বিচার ক'রে 'হরিলক্ষ্মী' 'পরেশ' 'সতী' ও 'অনুরাধা' গল্পের ধারাবাহিক প্রকাশকালকে রচনাকাল ব'লেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

'মহেশ' 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দু'টিতে শরৎচন্দ্র সমাজগত ও জাতিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। 'হরিলক্ষ্মী' 'পরেশ' ইত্যাদি গল্পে তিনি আবার পারিবারিক চিত্র সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'পরেশ' গল্পের আঙ্গিক-সংরচনে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছোটগল্পের লক্ষণ এখানে স্বাভাবিক ভাবেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে। 'পরেশ' এবং 'হরিলক্ষ্মী' একই সালে দু'টি মাসিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু আঙ্গিক-গঠনে 'হরিলক্ষ্মী' 'পরেশে'র সমপর্যায়ে স্থান পেতে পারে না। 'হরিলক্ষ্মী'র আঙ্গিক-শৈথিল্যে কয়েকক্ষেত্রে পাঠকের রস-দৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

'হরিলক্ষ্মী' গল্পটির পরিচ্ছেদ-বণ্টন এবং তার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। গল্পটি বেশ দীর্ঘ সময়ের ঘটনা নিয়ে পরিস্ফুট। চারটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ কাহিনীটি বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ অত্যন্ত দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছে। এ শ্রেণীর দীর্ঘ পরিচ্ছেদব্যাপী একই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ঔপন্যাসিক মন্থরতা এনে দেয়। কোনপ্রকার আকস্মিকতার প্রভাবে এক পরিচ্ছেদ থেকে অন্য পরিচ্ছেদে অনিবার্যভাবে পরিক্রমণ করবার কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। "হরিলক্ষ্মী" গল্পে শরৎচন্দ্র পারিবারিক চিত্র অঙ্কন করেছেন কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনের কয়েকটি তথ্য-সঙ্কুল সমস্যার পরিচয় দিতেই নয়, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি-কোণ দিয়ে এখানে তিনি পারিবারিক সমস্যাগুলি বিচার করেছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর যে প্রবণতা আমরা এতদিন লক্ষ্য ক'রে এসেছি, "হরিলক্ষ্মী"তে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবন-প্রবাহে মানুষ (নর-নারী নির্বিশেষে) ক্রমাগত বিপর্যস্ত হচ্ছে; চিরন্তন দুঃখের হাত থেকে কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। ভাগ্যের পরিহাস ব'লেই আমরা এই সমাধানহীন জীবন-যাত্রার ব্যাখ্যা দিতে বসি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবন-দর্শন তাঁর সাহিত্যে শিল্পায়িত হ'য়ে আমাদের এ কথাই জানিয়েছে মানুষের জীবনে ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত রয়েছে তার চরিত্রের মধ্যেই। অনাকাঙ্ক্ষিত এই দুঃখভোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। "হরিলক্ষ্মী" গল্পে হরিলক্ষ্মী এবং

বিপিনের স্ত্রী কমলার মধ্যে তাদের চিত্ত-বৈপরীত্য এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যে কি গভীর ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করেছিল, শরৎচন্দ্র সে দিকটিকেই মুখ্যভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এই গল্পটি ঠিক পারিবারিক স্বার্থ-সঙ্কুলতা, স্নেহবৎসলতা ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি ক'রে দেখা দেয়নি। দু'টি নারী চরিত্রের সংঘাতে এখানে কাহিনী হয়েছে সচল। এই সংঘাতের উপলক্ষ কোন বাইরের ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে দেখা দেয়নি ; সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রবণতাগুলিই প্রবল হ'য়ে কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার সৃষ্টি করেছে। তাই গল্পটিতে পরিচ্ছেদের আধিক্য কম। চরিত্রের সংঘাতজনিত প্রতিক্রিয়ায় পরিচ্ছেদ ক'টি দীর্ঘতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, যেজন্য কাহিনীভাগে ঘটনার জটিলতায় দ্রুত পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

'হরিলক্ষ্মী' গল্পটি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমেই কাহিনী-সূত্রপাতের অসংলগ্নতায় পাঠকের মন কিছু পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রারম্ভেই গল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে একবার "জাহাজ ঠেলে-ডিঙ্গী"র উপমা দিয়ে, আবার "মেঘখণ্ড অকাল ঝঞ্ঝার" উপমা টেনে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বেলপুরের দুই শরিকের অর্থ-সামর্থ্য-শিক্ষার তারতম্য কাহিনী-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উপলব্ধি-গোচর হ'তে পারতো। তা ছাড়া এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের কারণ যাই থাকুক না কেন, বর্তমান সংঘর্ষের উদ্ভব দুই শরিকের গৃহলক্ষ্মীদের উপলক্ষ ক'রে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই কাহিনীগত দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস আমরা উপলব্ধি করি। কাহিনীগত দ্বন্দ্ব এখানে বহির্ঘটনামূলক নয়। শিবচরণ এবং বিপিন যথাক্রমে "ত্রিতল অট্টালিকা" এবং "জীর্ণ গৃহ" রূপেই পাশাপাশি বিরাজমান ; বোধহয় দু'পক্ষের আর্থিক অসমতার জন্যই কোন প্রত্যক্ষ সংঘাত শিবচরণ এবং বিপিনের মধ্যে দেখা দেয়নি। শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যও তা ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংঘাতের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে হরিলক্ষ্মীর অন্তরে এবং বিপিনের স্ত্রী কমলা নিস্পৃহ থেকেও এই সংঘাতে অপর পক্ষরূপে কাহিনীভাগে সক্রিয় হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের দীর্ঘ বিস্তৃতির

মধ্যে হরিলক্ষ্মী এবং কমলার চারিত্রিক স্বরূপ স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শিবচরণের পৌরুষহীন বীর্যবত্তা এবং অহঙ্কারের পরিণাম নির্দেশ করবার জন্যই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল পাঠকমনে জাগ্রত ক'রে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পদার্পণ করেছেন।

হরিলক্ষ্মীর বিদেশ-যাত্রার সুযোগ নিয়ে আবার দুটি নারী-হৃদয় অত্যন্ত সহৃদয় সংযোগ স্থাপনে মগ্ন হয়েছে, কিন্তু ক্রমশঃ কমলার নির্ভীক কাঠিন্যে হরিলক্ষ্মী হয়েছে ক্ষুব্ধ। এবারেও শিবচরণের আক্রোশ-চরিতার্থের মধ্য দিয়ে বিপিনের দুর্ভাগ্যাকাশে বিপদ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিলক্ষ্মী-কমলার পুনরায় সাক্ষাৎ লেখক ঘটতে দেননি। বোধহয় তাতে কমলার দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব হরিলক্ষ্মীর সহানুভূতিশীল মনের স্পর্শে অনেক হ্রাস পেতো। এ পর্যন্ত এসে এই গল্পের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করা যায় যে, হরিলক্ষ্মী-কমলার চরিত্রগত দ্বন্দ্বের অন্তরালে শিবচরণের নিষ্ঠুরতা ক্রিয়াশীল হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হরিলক্ষ্মী স্বামীর ব্যবহারের যে পরিচয় পেয়েছে তা তার কাছে যেমন আকস্মিক এবং দুঃখের, পাঠকের কাছেও তাই। কিন্তু শিবচরণের নিষ্ঠুরতা যে এতখানি প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠবে তার কোন অতি নিশ্চিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠকমণ্ডলী সচেতন হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি। কাহিনী-রূপায়ণের একটি নূতনত্বই এখানে বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে; তা হচ্ছে হরিলক্ষ্মী-কমলার মানসিক দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিবচরণের দ্বারা বিপিনের সর্বনাশ সাধন। হরিলক্ষ্মীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের অবকাশে শিবচরণের দ্বারা বিপিনের ক্ষতিসাধন শরৎচন্দ্র ক্রমশঃ পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু দু'বার একই সুযোগ গ্রহণ করার ফলে কাহিনীর রস কিছু পরিমাণে তরলায়িত হ'য়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় হরিলক্ষ্মীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঘটনায় অনেক অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়।

হরিলক্ষ্মী-কমলা-শিবচরণ-বিপিন সম্পর্ক-বিচার

হরিলক্ষ্মী এই গল্পের প্রধান পাত্রী। অতএব কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য

হরিলক্ষ্মীকে কেন্দ্র ক'রে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেছে। প্রধান পাত্র হিসেবে শিবচরণকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ তার ক্রূর কার্যাবলীর জন্য কাহিনীতে অনেকগুলি দুঃখময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া এই বৈচিত্র্য সম্পাদনার জন্যই 'হরিলক্ষ্মী' গল্পের মধ্যে গতিশীলতা অনুভব করা যায়। তবুও আমরা শিবচরণকে এই কাহিনীর প্রত্যক্ষ মধ্যমণিরূপে গ্রহণ করবো না। শরৎচন্দ্রের মনোবিশ্লেষণের যে পদ্ধতি দ্বারা বর্ণিত চরিত্রগুলি কাহিনীর অনিবার্য উপলক্ষ হ'য়ে দেখা দেয়, সে জাতীয় চরিত্র হিসেবে আমরা প্রধানভাবে পেয়েছি হরিলক্ষ্মী এবং কমলাকে। এই দু'টি নারীচরিত্রের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই 'হরিলক্ষ্মী' গল্পের মুখ্যরস ঘনীভূত হয়েছে এবং শরৎচন্দ্রের অন্যান্য পারিবারিক কাহিনীর মধ্যে এই কাহিনীর দিক্-পরিবর্তন বেশ স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পে যথাক্রমে অন্নপূর্ণা-বিন্দু, সিদ্ধেশ্বরী-শৈলজা, হেমাঙ্গিনী-কাদম্বিনীর মধ্যে কাহিনীগত দ্বন্দ্ব রূপলাভ করলেও পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই সন্তান-স্নেহের সূত্র ধরে সাধারণ ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে নারীচরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে। সে দিক্ দিয়ে হরিলক্ষ্মীর চিত্তচাঞ্চল্য কমলার শিশু-পুত্রকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দেয়নি। হরিলক্ষ্মী শিবচরণের গৃহেই একমাত্র সর্বেসর্বা ছিলনা, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই হরিলক্ষ্মীর মনোরঞ্জন করতে ব্যস্ত থাকতো। সে শিক্ষিতা, বয়স্কা এবং ধনীর গৃহিণী, সুতরাং তার সম্মান রক্ষার্থে আত্মীয়-পরিজন এতবেশী ব্যাপৃত ছিল যে কারুর সঙ্গেই হরিলক্ষ্মী স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারেনি। তখনও পর্যন্ত বিপিনের স্ত্রী কমলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। এই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর কাছে কমলার প্রথম আগমনেই একটি বিশেষ ভাবান্তর হরিলক্ষ্মীর মনে দেখা দিয়েছিল। কমলার নম্র অথচ দৃঢ় ব্যবহারে হরিলক্ষ্মী মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিল এই অতি সাধারণ গৃহস্থ বধূটির চরিত্রে এমন একটি বস্তু আছে যাতে সে সাধারণ হ'য়েও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। শিক্ষা-দীক্ষার ফলেই হোক আর

স্বচরিত্র মাহাত্ম্যেই হোক হরিলক্ষ্মী পল্লীগ্রামে এসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিল। কমলার সঙ্গে পরিচয় হবার পরই হরিলক্ষ্মী বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে কমলাকে কাছে টানতে চেয়েছে; কিন্তু রূপ, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থায় হরিলক্ষ্মী কমলা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন হ'য়েও কমলার কাছে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করলো, "সবচেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশী বিদ্ধ করিল সে ঐ মেয়েটির দূরত্ব।" হরিলক্ষ্মীর কমলাকে কেন্দ্র ক'রে এমন একটা মানসিক বিভ্রান্তি উপস্থিত হ'লো যেজন্য অসুস্থতার মধ্যেও কমলার চিন্তা তার মন থেকে দূর হয়নি।

কমলাকে আমরা কাহিনীতে অনুধাবন করেছি হরিলক্ষ্মীর সান্নিধ্যে। হরিলক্ষ্মীর সঙ্গে তার ব্যবহার এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়েই অনুভব করা যায় যে কমলা দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে থাকলেও আত্ম-সম্ভ্রমটুকু প্রাণপণে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিপিন শিবচরণের কাছে মিথ্যা লাঞ্ছিত হ'লে, কমলা তা নিয়ে হরিলক্ষ্মীর কাছে কোন অনুযোগ আবেদন করেনি; হরিলক্ষ্মীর সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে নিরস্ত করেছে মাত্র। কমলার এই আত্ম-সঙ্কোচনের কঠিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে হরিলক্ষ্মী তার সঙ্গে একটি প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে পারেনি। কমলা তার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং সন্ত্রস্ত। শিবচরণের কাছে তার স্বামীর নানাবিধ অপমান এবং লাঞ্ছনার জন্য তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কমলার মত বাক্-সংযমী নারী-চরিত্র শৈলজা ও জ্ঞানদা ছাড়া শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির মধ্যে আর পাই না। তার চরিত্রের ঐশ্বর্য পল্লীগ্রামের অন্যান্য সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকলেও হরিলক্ষ্মীর অনুভূতিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। সেজন্য হরিলক্ষ্মীকে কমলার সান্নিধ্য অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করেছে। স্বামী শিবচরণ যে নিকৃষ্ট কতকগুলি প্রবৃত্তির অধিকারী, হরিলক্ষ্মী তা জেনেছিল। কিন্তু মেজবউ কমলার কথা স্বামীর কাছে উত্থাপন ক'রে মেজবউ সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী চিত্তকে সে নিরস্ত করতে চেয়েছে। কমলাকে সখিত্বের গভীর বন্ধনে পরিবৃত করতে না পেরে অশান্ত মনের ভার লাঘব করতে গিয়ে শিবচরণের কাছে

থেকে সে যেমন তার কটূক্তিপূর্ণ মন্তব্যে ব্যথা পেয়েছে, তেমনই তার কৌতূহল বিপিন এবং কমলার দুর্ভাগ্যের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শিবচরণের মতো ব্যক্তিরা "দুর্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে।" এই ধারণা হরিলক্ষ্মীকে ক্ষুব্ধ করেছে।

শিবচরণকে নিয়ে হরিলক্ষ্মীর মতো সুরুচি-সম্পন্না স্ত্রীর পক্ষে সুখী হওয়া কষ্টসাধ্য। স্বামীর আচার-ব্যবহার কথাবার্তা হরিলক্ষ্মীকে এমন বিক্ষুব্ধ করেছিল ব'লেই কমলার সংস্পর্শে সে আনন্দ এবং তৃপ্তি খুঁজেছিল। কমলা এবং বিপিনের দাম্পত্যসুখ হরিলক্ষ্মীর দাম্পত্যসুখ-বঞ্চিত জীবনে হয়তো পরিতৃপ্তি বহন ক'রে এনেছিল। সেজন্যই হরিলক্ষ্মী তার সমস্ত ঐশ্বর্যের অহঙ্কার তুচ্ছ ক'রে ছুটে গিয়েছে কমলার সান্নিধ্যলাভ করতে। যেমন দেখি, "দর্পচূর্ণ" গল্পে নরেন তার দুঃখময় পরিস্থিতি ভুলতে বিমলার গৃহসুখ উপভোগ করেছে। "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রনাথ তার দ্বন্দ্বপূর্ণ জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে কমলমুখী ও শ্রীশের সুখাসক্ত পরিবেশে। শিবচরণের দুর্ব্যবহারে বিপিন এবং কমলার অশান্তি যতই বৃদ্ধি পেলো কমলা এবং হরিলক্ষ্মীর মধ্যেও নৈকট্য স্থাপনের পরিবর্তে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হ'লো তত গভীরভাবে। হরিলক্ষ্মীর শারীরিক অসুস্থতা বোধহয় মানসিক অসুস্থতারই প্রকাশ।

রোগক্লিষ্টা হরিলক্ষ্মী নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রথমবার কাশীযাত্রা করেছে কমলার প্রতি গভীর অভিমান নিয়েই। স্বামীর অন্যায়ের জন্য হরিলক্ষ্মীর লজ্জার সীমা নেই এবং এই লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই কমলাকে সে অন্তরঙ্গভাবে আপন করতে চায়। কিন্তু কমলা, শৈলজা-বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি চরিত্রের সমকক্ষ। নিজের দুর্বিনীতভাবকে মিথ্যা অস্বীকার ক'রে গৌরব অন্বেষণে ব্যস্ত নয়, আবার আত্মসম্মানের সত্যকার মূল্য ক্ষুণ্ণ করতে কুণ্ঠিত। তাই হরিলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্রী হ'তে গিয়ে অসম্মানিত এবং অপদস্থ হওয়ার ভয়ে কমলা নিজেকে অত্যন্ত সংযত ক'রে রেখেছিল।

কাশী থেকে ফিরে এসে হরিলক্ষ্মী নিজেই অভিমান ত্যাগ ক'রে কমলার

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছে। কিন্তু কমলার শিশুপুত্র নিখিলকে সোনার হার উপহার দেবার সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে গুরুতর বিরোধের সূচনা দেখা দেয়। কমলা তার এবং তার স্বামীর অযথা অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে সামান্য দু' একটি কথার মধ্য দিয়েই "আমরা গরীব, কিন্তু ভিখিরী নই। কোন একটা দামী জিনিষ হঠাৎ পাওয়া গেল ব'লেই দু'হাত পেতে নেব,—তা নিইনে।" হরিলক্ষ্মীকে তার স্নেহের দান ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কমলা ধনীর প্রীতির বন্ধনকেও প্রত্যাখ্যান করেছে; কারণ হরিলক্ষ্মীর প্রীতিবোধ পরোক্ষভাবে কমলা এবং তার স্বামী বিপিনের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল হ'য়ে ফিরে এসেছে। হরিলক্ষ্মীর পক্ষে কমলার এই ব্যবহার মর্মন্তুদ হ'লেও, কমলার দিক থেকে এই প্রত্যাখ্যান অপমানের সুযোগ-গ্রহণও বলা যেতে পারে আবার স্বর্ণশৃঙ্খলের পরবর্তী পরিণাম থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টাও হ'তে পারে।

হরিলক্ষ্মী এবং কমলার মধ্যে প্রথম থেকেই স্বাভাবিকভাবে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। এর প্রধান কারণ উভয়ের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য, তদুপরি শিবচরণের কার্যকলাপ। এবার একটি প্রত্যক্ষ বিরোধ হরিলক্ষ্মী এবং কমলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিন হরিলক্ষ্মী বিপিনের পরিবারের প্রতি স্বামীর অন্যায় ব্যবহারের সমর্থন করেনি, উভয় পরিবারের মধ্যে থেকে মনোমালিন্যের চিরন্তন বীজটিকে দূর ক'রে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার সে অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে কমলার দম্ভকে দমন করতে প্রয়াসী হয়েছে স্বামীর সাহায্যে।

শিবচরণের নিষ্ঠুরতা এবার আর বিপিনকে রূঢ় কথা ব'লেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে সর্বস্বান্ত ক'রে তার মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য গোয়ালঘরকে কেন্দ্র ক'রে শিবচরণ বিপিনকে এক কঠিন মামলার সম্মুখীন হ'তে বাধ্য করেছে। বিপিন নির্বিরোধী মানুষ, স্ত্রীর একান্ত অনিচ্ছা না থাকলে হয়তো শিবচরণের কাছে মৌখিক অপমান সহ্য ক'রে একটা আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু কমলা অন্যায়কে মেনে নিতে চায়নি, তার মতে—"বাঘের কাছে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি? প্রাণ যা

যাবার তা যাবে, কেবল অপমানটাই উপরি পাওনা হবে।" সুতরাং সংঘর্ষ এবার গভীরভাবেই উভয় পরিবারের মধ্যে রূপলাভ করেছে, কিন্তু পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। হরিলক্ষ্মী—"শুধু একটা ব্যাপার…ঠিক এতখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর স্বভাব। তাহা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই প্রতি-হিংসাপরায়ণ এবং তেমনই বর্বর। পীড়ন করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানে না।" দ্বিতীয়বার রোগগ্রস্ত দেহকে রোগমুক্ত ক'রে যখন হরিলক্ষ্মী দীর্ঘ এক বছর পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো, কমলার সান্নিধ্যের অনুগ্রহ তাকে গ্রহণ করতে হ'ল না। কমলাই হরিলক্ষ্মীর গৃহে তখন তার অনুগৃহীতা এবং আশ্রিতা। দীর্ঘ একবছরের কোন ঘটনা শিবচরণ হরিলক্ষ্মীর কর্ণগোচর করেনি, হরিলক্ষ্মী নিজেও "জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে আবার সেই পূর্ব ক্ষত বাড়িয়া ওঠে, এ আশঙ্কায়" মৌন থেকেছে। কিন্তু কমলার জীবনে তাকে উপলক্ষ ক'রে যে এমন অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে—হরিলক্ষ্মী তা কল্পনাও করতে পারেনি। স্বামীর বর্বরোচিত কার্যের এই নৃশংস পরিচয়ে কমলার বৈধব্য অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে। হরিলক্ষ্মীকে কমলা একদিন অস্বীকার করেছিল তার জীবনে, হরিলক্ষ্মীর সাগ্রহ ব্যাকুল ইচ্ছা সেদিন হয়েছিল আহত। কিন্তু আজকে কমলাকে হরিলক্ষ্মী আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও দুঃখের ভারে মুহ্যমান। কমলার ক্ষতিপূরণ করতে তাই হরিলক্ষ্মী কমলার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ, অপমান, লজ্জা বুক দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছে। হরিলক্ষ্মী-কমলার এ মিলন যত ব্যথারই হোক, কমলার শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন থেকে নৈরাশ্যের কালিমা অপসারিত হ'য়ে গেছে ; কারণ হরিলক্ষ্মী নিঃসন্তান।

উপসংহার

'হরিলক্ষ্মী' গল্পে শরৎ-প্রতিভার বৈচিত্র্য বেশ স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। হরিলক্ষ্মী এবং কমলার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সেখানে পারিবারিক কোন বিশেষ সমস্যা প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। যে কারণটিকে কেন্দ্র ক'রে হরিলক্ষ্মী এবং কমলার মধ্যে কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনার

সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে যেমন বিশেষ কোনও সংজ্ঞায় নির্দেশ করা যায়না, আবার অস্বীকার করাও যায়না। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপনের প্রয়াস নিয়েই নানা সমস্যার অবতারণা।

(১৯)

পরেশ

ব্যক্তি-বিশেষের নাম অনুসরণে গল্পের নামকরণ শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পেই দেখা যায়। যেমন 'দেবদাস,' 'কাশীনাথ' 'চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস' ইত্যাদি গল্প এবং উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে। 'পরেশ' গল্পের প্রধান চরিত্র গুরুচরণ। গুরুচরণকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনী আবর্তিত। সুতরাং কাহিনীর নামকরণ 'গুরুচরণ' হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। 'পরেশ' গল্পের রচনাকালে শরৎচন্দ্র এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যখন তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অমূল্য সম্পদে বাঙলার পাঠকসমাজ অনুগৃহীত। তা ছাড়া গল্পের নামকরণে এবং পাত্র-পাত্রীর নাম নির্বাচনে শরৎচন্দ্র চিরকালই যত্নশীল। সুতরাং 'পরেশ' গল্পের নামকরণে ত্রুটি থাকা আশ্চর্যের বিষয়।

এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার ক'রে আমাদের মনে হয় 'পরেশ' নামকরণ অসার্থক নয়। কাহিনীভাগে গুরুচরণের প্রাধান্য যথেষ্ট এবং পরেশের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু গুরুচরণের অন্তরের পরিচয় এবং চরিত্রের অবাঞ্ছিত বিকাশ পরেশকে উদ্দেশ্য ক'রে রূপ পেয়েছে। পরেশকে ভিত্তি ক'রেই যেন গুরুচরণের অবস্থিতি। তাই পরেশের দুর্ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে যখন গুরুচরণ একটির পর একটি আঘাত পেয়ে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি-নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়লেন, কাহিনীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে তখনই। বার্ধক্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হ'য়ে গুরুচরণের দীর্ঘদিনের চরিত্রবল ভূলুণ্ঠিত হয়েছে পরেশকে কেন্দ্র ক'রেই।

কাহিনীর উপলক্ষ গুরুচরণ হ'লেও, লক্ষ্য পরেশ। পরেশের মৌন অকৃতজ্ঞতার জন্যই গুরুচরণের জীবনের শেষ অধ্যায়ে একটি ট্র্যাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যে পরেশকে অবলম্বন ক'রে বিগতপত্নীক গুরুচরণ আপন বিপথগামী পুত্রের শোক ভুলতে চেষ্টা করেছেন, সেই পরেশের কাছ থেকে আঘাত এবং শেষ পর্যন্ত আন্তরিক আহ্বান পেয়ে গুরুচরণের জীবনের পরিণাম নির্ধারিত হয়েছে। তাই পরেশকে নামকরণের মধ্যে দিয়ে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র গুরুচরণের মানস-প্রবণতাকেই পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন।

'পরেশ' গল্পের আঙ্গিক ছোটগল্পের সার্থক পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হ'য়েও পরিমিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় সুসংবদ্ধ আঙ্গিকে পরিস্ফুট। বৃদ্ধ গুরুচরণের জীবনের একটি দুঃসময় অধ্যায়কে ছোটগল্পের আঙ্গিকে লিপিবদ্ধ ক'রে মানব-জীবনের স্নেহ-মমতাপূর্ণ বন্ধনের একটি রহস্যময় দিকের আবরণ মুক্ত করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারকে নিয়ে যতগুলি গল্প রচনা করেছেন, 'পরেশ' গল্পের নিখুঁত আঙ্গিক তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

চরিত্র-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য 'পরেশ' গল্পের অন্যতম গুণ বলা যেতে পারে। গুরুচরণ এই গল্পের প্রধান চরিত্র; গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি প্রতি পরিচ্ছেদেই আমরা অনুভব করেছি। বিভিন্ন ঘটনা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি গুরুচরণের প্রকৃত স্বরূপ পরিস্ফুটনে সাহায্য করেছে। "অপরিসীম স্বধর্মনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতা"র অধিকারী গুরুচরণের অকস্মাৎ ভাগ্যবিপর্যয়ের চিত্র কাহিনীর মূল উপজীব্য বিষয়। গুরুচরণের অপ্রসন্ন ভাগ্য তাঁর চরিত্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাই পরেশের অভাবনীয় ব্যবহারে গুরুচরণের বিহ্বল এবং অপ্রকৃতিস্থ মনের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে ব'লে সন্দেহ জাগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে গুরুচরণ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটা অপেক্ষা

চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখা দেওয়াই সম্ভব। অসুখের অভিনয় ক'রে পরেশ গুরুচরণের সঙ্গে দেখা করেনি, মেজ বউ সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে অপদস্থ করেছে, হরিচরণের অন্যায়ের সমর্থনও যে পরেশের দিক থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এতগুলি শোকপূর্ণ অভিজ্ঞতা গুরুচরণের দীর্ঘ অতীতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বর্তমানের একমাত্র নির্ভরস্থলটুকুর ভিত্তি-চ্যুতি ঘটিয়েছে। তিনি যেন আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন নন; "ভূতাবিষ্টের" মতো বিচরণ করেছেন।

পরেশের আকস্মিক পরিবর্তন ছোটগল্পের দিক থেকে স্বাভাবিক, কারণ ছোটগল্পে চরিত্রের দিক্-পরিবর্তনের ক্রমগুলি ধীরে ধীরে যুক্তি-পরম্পরায় দেখান সম্ভব নয়। হরিচরণের মতো অন্যায়কারীর পক্ষেও যখন দাদার বেদনাপূর্ণ পরিণতিতে ভাবান্তর দেখা দিয়েছে, তখন পরেশের পক্ষে জ্যাঠামশাইয়ের জন্য চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দেওয়া অসঙ্গত নয়। অতএব চরিত্রগুলি ছোটগল্পের আঙ্গিকে যথা সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হয়েছে।

"পরেশ" গল্পের প্রারম্ভ সূচিত হয়েছে গ্রামের সর্বজন-স্বীকৃত গুরুচরণ মজুমদারের চরিত্র-মর্যাদা, আত্মসম্ভ্রম এবং ন্যায়নিষ্ঠার পরিচিতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা জেনেছি গুরুচরণের বিপথগামী পুত্র বিমলের অভাব ভাইপো পরেশের দ্বারা পূরণ হয়েছে। মেজবউয়ের প্রতি হরিচরণের দুর্ব্যবহার এবং পৃথগান্ন হ'য়ে যাওয়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অতি সংযত বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এভাবে কাহিনী যে ক্রমশঃ ঘটনার অনিবার্যতায় আবর্তনশীল হ'য়েও গতিশীল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরেশের নেপথ্যে আবির্ভাব এবং গুরুচরণকে অসুখের নাম ক'রে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করায় গুরুচরণের সঙ্গে পাঠকেরও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এই পরিচ্ছেদেই মেজবউকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে হরিচরণের বিরুদ্ধে গুরুচরণ আদালতে নালিশ জানায়। কাহিনীতেও বহির্দ্বন্দ্ব এখান থেকেই শুরু। হরিচরণের কৃতবিদ্য সন্তান পরেশ পিতার পক্ষই সমর্থন করেছে জ্যাঠামশাইয়ের অন্তরে গভীর আঘাত দিয়ে।

গুরুচরণের দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। পরেশের কৌশলেই মেজবউকে মিথ্যা সংবাদে বাপের বাড়ী স্থানান্তরিত ক'রে হরিচরণ মোকদ্দমার নির্দিষ্ট তারিখে গুরুচরণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পরেশ ফেরারী আসামী বিমলের কথা তার নিজের কাছে রক্ষিত কিছু কাগজপত্রের দ্বারা পুলিশের গোচর করেছে। বিমলের জন্য গুরুচরণের পিতৃহৃদয়ে যে গভীর ক্ষত লুকিয়ে ছিল, পরেশের দুর্বিনয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। পরেশের দিক থেকে উত্তরোত্তর আঘাত পেয়ে মোক্ষদা গয়লানীকে পদাঘাত করায় গুরুচরণের চরিত্রমহিমার স্খলন হয়নি, হতবুদ্ধি গুরুচরণের মানসিক বৃত্তিগুলির চেতনহীনতার পরিচয় পাই। পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই অভাবনীয় ঘটনায় পরেশের স্তব্ধতা লক্ষ্য করার বিষয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বাইজী-মজলিসে গুরুচরণের উপস্থিতি নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী মহলে বিদ্রূপ-ঠাট্টা চলতে থাকে হরিচরণের সামনেই। গুরুচরণের বিকৃত পরিণতির আলোচনায় হরিচরণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। লেখক এই পরিচ্ছেদে একটি ইঙ্গিতে হরিচরণের মানসিক চাঞ্চল্যের একটি সুন্দর চিত্র দান করেছেন। এরপর থেকে পরেশ এবং হরিচরণের নির্দ্বন্দ্ব মনোভাবের মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ পরিচ্ছেদে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে পরেশ-গুরুচরণের পুনর্মিলনের মধ্যেই উপসংহারের অনিবার্যতা উপলব্ধি করা যায়।

দেবতুল্য চরিত্র গুরুচরণের দুর্ভাগ্যাকাশের মেঘমুক্তি ঘটেছে কাশী যাত্রা ক'রে। শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনীর আঙ্গিক-সজ্জার অপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছেন। কোনপ্রকার অসঙ্গতি বা অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্রের দ্বারা কাহিনীর স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দে বাধা উপস্থিত হয়নি। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য পারিবারিক গল্পের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, জায়ে জায়ে মনোমালিন্য ইত্যাদির সুদীর্ঘ বিস্তৃতির তুলনায় 'পরেশ' গল্পের সংযত রূপ পাঠকের দৃষ্টিতে অভিনব হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

পারিবারিক জীবনে ঐকান্তিক স্নেহ-মমতার সূত্র ধ'রে যে সব সমস্যার উদ্ভব

সাধারণতঃ ঘটে থাকে, সেই সব সমস্যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি' ইত্যাদি। এই সমস্ত গল্পগুলিতে নারী-চরিত্রের স্নেহাতিশয্যের এবং স্নেহভাজনের জন্য অপূর্ব স্বার্থত্যাগের চিত্র শরৎচন্দ্র বিভিন্ন দিক থেকে অঙ্কিত করেছেন। পুরুষ-চরিত্রের স্নেহশীলতা এই পর্বে কর্তব্যবোধের গুরুভারে আবৃত। সংসারের দায়িত্ব সর্বাংশে গ্রহণ ক'রেও যাদব-গিরীশ একান্ত নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছে। গোকুলের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা যায় তার মাতৃ-প্রেম এবং ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের পরিচয়ে, যেজন্য চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাবাকুলতায় সে তার পুরুষোচিত সংযম এবং অবিচলিত চরিত্রবল থেকে প্রায়ই বিচ্যুত হয়েছে।

গুরুচরণ-চরিত্রে একাধারে যাদব-গিরীশ এবং গোকুল-চরিত্রের বিশেষ প্রবণতাগুলির সংমিশ্রণ ঘটেছে। শরৎ-সাহিত্যে মাতৃস্নেহের অপ্রতিহত শক্তি-মহিমা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান শরৎচন্দ্র মাতৃত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'পরেশ' গল্পেই প্রথম পিতৃ-স্নেহের অভূতপূর্ব উজ্জ্বল প্রকাশে পাঠক কাহিনীর রস-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে। যাদব-গিরীশ কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়শীল, নিষ্ঠাবান—বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের সর্বময় কর্তা। পরিবারের প্রত্যেকের স্বার্থই এঁরা সমভাবে রক্ষা করেছেন। এই অপক্ষপাত দৃষ্টিই দৈনন্দিন ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাঁদের উদাসীন ক'রে তুলেছে। কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্নেহবোধে এঁরা চালিত হননি।

গুরুচরণ কেবলমাত্র নিজ পরিবারের শ্রদ্ধাভাজন নন, শ্রীকুঞ্জপুরের 'সর্বমান্য' ব্যক্তি, "তাঁহার অপরিসীম স্বধর্মনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করিত।" ষষ্ঠিতম বয়সে জীবনের প্রান্তভাগে অবতীর্ণ হ'য়ে গুরুচরণ স্বভাবতই অসহায় হ'য়ে পড়েছিলেন; যে অসহায়বোধে গোকুল যৌবনেই অস্থির চিত্তে দিন যাপন করেছে।

গুরুচরণের জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল পুত্র বিমলকে নিয়ে। বিপত্নীক গুরুচরণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। একমাত্র পুত্রের জন্য হয়তো তিনি সমস্ত স্বার্থবোধ পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা যখন

ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়, মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশই তাঁর একমাত্র নির্ভরস্থল হ'য়ে দেখা দেয়। অকৃত্রিম প্রচেষ্টায়, আকুল আকাঙ্ক্ষায় এবং অজস্র স্নেহে পরেশকে "বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও সমস্ত পড়া তিনিই পড়াইয়া আসিতেছিলেন। বিমল যে কিছু শিখিল না, এ দুঃখ তাঁহার এক পরেশ হইতে মিটিয়াছে।" গুরুচরণ যেন তাঁর পিতৃত্বের সাধ্য-অসাধ্য সমস্ত অধ্যবসায় দিয়ে পরেশকে মানুষ ক'রে তুলেছেন। নিজ দুর্ভাগা সন্তানের অসার্থক জীবন তিনি সার্থক দেখতে চেয়েছেন পরেশের মধ্যে। সন্ন্যাসীর পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা সম্ভব, কিন্তু গৃহীর পক্ষে অবলম্বনহীন একাকিত্ব দুর্বহ হ'য়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এ পৃথিবীতে মানুষ আপন অস্তিত্বকে নিরবধিকালের জন্য অমর ক'রে রাখতে চায়। মরণশীল জীবজগতে সৃষ্টির অনিবার্য অগ্রগামিতায় মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা কখনও হয়েছে চরিতার্থ, কখনও বা হয়েছে নিষ্ফল। বিমল তার পিতার যোগ্য অধিকারী হয়নি। পরম শ্রদ্ধেয় পিতার জীবনে অমর্যাদার কলঙ্ক নিক্ষেপ করেছে। গুরুচরণ তাই স্ব-গৌরবের অবমাননায় শঙ্কিত হ'য়ে পরেশের গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে চেয়েছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সযত্ন-পালিত ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্যায় সমর্থন, দুরভিসন্ধি এবং নীচতা দেখে গুরুচরণ সমস্ত পৃথিবীতে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ এবং নিঃসহায় মনে করেছেন। সম্পত্তি-বণ্টনের অভিপ্রায়ে হরিচরণের অসৎ ইচ্ছার প্রতিবাদ তিনি করেছেন। কর্তব্যনিষ্ঠা তখনও তাঁর অটুট। মেজ বউকে তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা দেখে হরিচরণকে তিনি বাধা দিয়েছেন। মেজ বউয়ের প্রতি হরিচরণের দুর্ব্যবহার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, শ্রীকুঞ্জপুরের সুবিচারক ধীরচিত্ত গুরুচরণ আপন পারিবারিক অশান্তি দূর করতে পরেশের মুখ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু একসময়—"বিবাদ মিটাইতে, সালিশ নিষ্পত্তি করিতে, দলাদলির বিচার করিয়া দিতে" এই গুরুচরণই ছিলেন একক।

পরেশকে সুশিক্ষিত ক'রে তুলতে তাঁর সমগ্র জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা নিয়োজিত হয়েছে। গুরুচরণ তাঁর পূর্বের সেই দৃঢ় মনোবল সম্পর্কে সন্দিহান

হ'য়ে উঠেছেন; কারণ হরিচরণের দুর্বিনীত ব্যবহার এবং কার্যকলাপের প্রতিবিধান তিনি কঠোর হস্তে দমন করতে পারছেন না। একটা অজ্ঞাত অক্ষমতা তাঁকে যেন বার্ধক্যের জড়ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিচ্ছে। তাই যেন কল্পনেত্রে গুরুচরণ পরেশের মধ্যে আপন যৌবনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছেন; যেখানে বিরাজ করবে ন্যায় বিচার, ধর্মবোধ এবং সাধু সঙ্কল্প। মেজ বউমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে গুরুচরণ মেজবউয়ের পরেশ সম্বন্ধে সন্দেহ ভঙ্গ ক'রে বলেছেন—"কিন্তু নয় মেজবউমা, আমার পরেশের সম্বন্ধে 'কিন্তু' চলে না। হরি তার বাপ বটে, কিন্তু সে আমারই ছেলে, সমস্ত পৃথিবী যদি একদিকে যায় তবু সে আমারই। তার জ্যাঠামশাই যে কখনো অন্যায় করে না এ যদি সে না বোঝে ত বৃথাই এতদিন পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ ক'রে এলাম।" গুরুচরণের আশা, পরেশের মধ্যেই উত্তরাধিকার সূত্রে দেখা দেবে ন্যায়নিষ্ঠ গুরুচরণের অতীত। পরেশকে কেন্দ্র ক'রে গুরুচরণের স্নেহ-মমতা-প্রীতিবোধই কেবলমাত্র উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেনি, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যও তিনি ব্যগ্র হয়েছেন। উদ্ধত হরিচরণকে প্রতিরোধ করবার জন্য পরেশের সহায়তা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয়।

হরিচরণ চিরকাল বিদেশে চাকরী করাতে, মাতৃহীন পরেশের ভার গুরুচরণকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তা ছাড়া বিগতদার হরিচরণ বড়ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। অন্যদিকে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে কাহিনীভাগে যে ভাবে পাই তাতে সপত্নী-পুত্রের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান যে তার মতো স্বার্থপরায়ণা নারীর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পরেশের সমস্ত দায়িত্ব একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা গুরুচরণের ওপর পড়েছিল। পরেশ উচ্চশিক্ষার কঠিন ধাপগুলি জ্যেষ্ঠতাতের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে অতিক্রম করেছে। এবার পরিবারে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের প্রতি সকলেরই দাবি দেখা দিয়েছে। পরেশ হরিচরণের নিজের সন্তান, সুতরাং কর্তব্যপালন না ক'রেও অধিকার স্থাপনের সাহস তার আছে। সেই অধিকারের জোরেই হরিচরণ পিতৃত্বের গৌরব লাভ

করেছে পরেশকে দিয়ে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ ক'রে। পরেশের প্রতি গুরুচরণ কেবলমাত্র স্নেহ-মমতার দাবি জানাননি, আশা করেছেন তাকে মানুষ ক'রে তোলার স্বীকৃতি। কিন্তু পরেশ তাঁকে বঞ্চিত করেছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে। গুরুচরণের দেবতুল্য সত্তা হরিচরণের দুরভিসন্ধির কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে পরেশের মৌন সক্রিয়তায়। পরেশ পিতাকে দুষ্কার্যে সমর্থন ক'রে আপন মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে। জ্ঞান ও সত্যের আলো পরেশের চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে গুরুচরণের একনিষ্ঠ সাধনায়। মায়ের স্নেহমণ্ডিত উৎকণ্ঠা নিয়ে গুরুচরণ কঠিন রোগগ্রস্ত পরেশকে সেবা এবং যত্নে সুস্থ ক'রে তুলেছেন—"তখন কোথাই বা ছোটবাবু আর কোথাই বা তার সৎ-মা। ভয়ে একবার দেখতে পর্যন্ত এলো না। তখন একলা জ্যাঠামশাই কিবা দিন কিবা রাত্রি"।—দাসী পঞ্চুর মায়ের এই মন্তব্যে গুরুচরণের অন্তর ব্যথায় এবং আনন্দে আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে; অথচ পুত্রসম প্রিয় পরেশের ঘরে ঢুকতে গিয়ে তিনি বাধা পেয়েছেন। মেজবউয়ের প্রতি হরিচরণের গুরুতর অন্যায়ের কোনও প্রকার প্রতিবিধান না ক'রেই পরেশ কলকাতা চলে যাওয়ায় "গুরুচরণের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত যেন দুলিতে লাগিল।" মুহূর্তের জন্য তাঁর চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দিলেও "সাবেকদিনের সোনার চেন বিক্রী" ক'রে তিনি মেজ ভ্রাতৃজায়ার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প। পরেশের প্রবঞ্চনায় এবার গুরুচরণ বিচারালয়ে সর্বসমক্ষে অপদস্থ হলেন। একটা অসম্ভব দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতায় তাঁর অন্তরে তখন বোধহয় এ প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল—পরেশের পক্ষে এ কাজ সম্ভব কি?

আপাতদৃষ্টিতে পরেশ-চরিত্রের এই নিকৃষ্ট পরিচয়ে যেন পাঠকও পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। পূর্বাপর বলতে এখানে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথাই বলা হয়েছে; কারণ অতীতের পরেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের নেই। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র হয়তো আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গুরুচরণ এবং হরিচরণ সহোদর ভাই, কিন্তু স্বভাব তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'সর্বগুণান্বিত' গুরুচরণের 'সবদোষাশ্রিত'

পুত্র বিমল পিতার কোন সৎগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকলেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। পরেশের পক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে হরিচরণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লাভ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুচরণের সাধু সঙ্কল্পের প্রেরণা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রভাবে পরেশ সুশিক্ষিত, কিন্তু মানসিক গঠন তার কতদূর ত্রুটিশূন্য তা সন্দেহের বিষয়। পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে যতদিন পরেশ ছিল, ততদিন হয়তো তার পিতৃদত্ত প্রবণতাগুলি প্রকাশ পায়নি। কিন্তু পিতার সংশ্রবে এসে পৈত্রিক প্রবৃত্তিগুলি তার জেগে উঠেছে; পিতা এবং বিমাতার পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছে। পরেশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, ব্যক্তিত্বহীন। বিমল মন্দ হ'য়ে গেল কেন এবং গুরুচরণ বিমলকে সৎপথে আনতে চেষ্টা ক'রে কতখানি অকৃতকার্য হয়েছিলেন তা আমরা জানিনা।

পরেশ যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেও যে কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছে, তার সম্বন্ধে কোন ভাল ধারণা প্রথমে পাঠকের মনে দেখা দিতে পারেনা। তার ব্যক্তিত্বহীনতার ফলে সে যে কতদূর নিম্নস্তরে নেমে যেতে পারে, বিমলের সাত বছর জেল সংক্রান্ত ঘটনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়েছে। সামান্য সম্ভ্রমবোধটুকুও পরেশের লোপ পেয়েছিল। পরেশের এই ব্যবহারে গুরুচরণ মর্মাহত—"কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের প্রতি···চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে সেই নিষ্প্রভ অপলক দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল···", কিন্তু পরেশের দিক থেকে কোনও প্রকার ভাবান্তরই প্রকাশ পেল না।

গুরুচরণকে আমরা প্রথম থেকেই দেখেছি মিতভাষী, আত্মসংযমী এবং দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন। পরেশের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে বটে, কিন্তু পরেশের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের কথা বিবৃত ক'রে স্বল্পক্ষেত্রেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। পারিবারিক লজ্জাজনক কলহের কথা তাঁর আশৈশবের বন্ধুকেও তিনি 'ঔদাস্যের আবরণে' গোপন করেছেন। কিন্তু পরেশের কাছ থেকে উপর্যুপরি দু'টি আঘাত পেয়ে গুরুচরণের ঐকান্তিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে। তাঁর মতো সংযমী পুরুষ ক্রোধান্ধ

হ'য়ে গয়লানী মোক্ষদাকে পদাঘাত করেছেন। বিপথগামী বিমলের স্থানে পরেশকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গুরুচরণ পুত্রশোক ভুলেছিলেন, কিন্তু সেই শোক যখন দ্বিগুণতর হ'য়ে তাঁর বুকে অগ্নিশিখার মতো জলে উঠলো—"তাঁহার কাজ বা কথার মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই ছিল না, তবুও পঞ্চুর মার কেমন যেন ভারি খারাপ ঠেকিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ যেন সে বড় বাবু নয়।" গুরুচরণের চরিত্রের দীপ্তি তাঁর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যখন বাইরের লোকের কাছে ম্লান হ'য়ে যেতে লাগলো, সত্যপ্রাণতায় তখনও তিনি অটুট। দাদার সত্যবাদিতার সুযোগ নিয়ে হরিচরণ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো বটে, কিন্তু পরেশ যেন পিতার এই কর্মোদ্যমে কোন উৎসাহই পেলো না।

অন্ধ যেমন তার যষ্টির অভাবে নিজের অসহায়তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে, বার্ধক্যের শেষ আশাস্থল এবং নির্ভরস্থল পরেশের অভাবে গুরুচরণ সেইরূপ নিঃসহায়তার বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছেন। সুতরাং ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু একাকার ক'রে জীবনের কোন অর্থই গুরুচরণ খুঁজে পাননি। তাই নাচের মজলিসে গুরুচরণকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরেশ দেখেছে—"চোখে সেই জ্যোতি নাই, মুখে সে তেজ নাই, সমস্ত মানুষটাই যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায়।" সমস্ত সমালোচনার বাইরে গুরুচরণ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন—"…অর্ধচেতন দেহ ছাড়িয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেছেন।" সুতরাং চরিত্রের পরিবর্তন তাঁর ঘটেনি, মানসিক বৃত্তিগুলি অসীম সহিষ্ণুতা এবং গভীর ধৈর্যের বাঁধ অতিক্রম ক'রে বিকলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

পরেশের পরিবর্তন আকস্মিক হ'লেও স্বাভাবিক। ব্যক্তিত্বহীনের ব্যক্তিত্বের জাগরণ এমনিভাবেই ঘটে থাকে। কঠিন আঘাতে গুরুচরণ যেমন ভেঙে পড়েছেন, তাঁর এই আত্মদানের মধ্য দিয়েই পরেশ মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছে। এতদিন তার শিক্ষা-দীক্ষা সবই ছিল পুঁথিগত এবং মৌখিক। এবার জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যে পরেশের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে।

গুরুচরণের জীবনে আর কোন বন্ধনই রইলো না। তাই পরেশের শেষ

আহ্বানে "কাঙালের মত" তিনি স্বার্থপূর্ণ সংসার থেকে মুক্তির সন্ধান পেলেন। গুরুচরণের এই অসহায় কাঙালপনা পরেশের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়ও নয়, পরেশের সুবিচারের প্রত্যাশায়ও নয়। মালিন্যপূর্ণ জগৎ থেকে মালিন্যহীন জগতে যাত্রার আগ্রহে তিনি ব্যাকুল! তাই বোধহয় কাশীবাসী হ'য়ে গুরুচরণ তাঁর জীবনের শেষ দিনটির জন্যই প্রতীক্ষারত। এইভাবেই পরেশ তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক গল্পগুলিতে হরিচরণের মতো আর দ্বিতীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সে শুধু নিকৃষ্টমনা নয়, নিষ্ঠুর। হরিচরণ হরিশের চেয়ে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে অসৎ প্রবৃত্তির প্রকাশে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট ছোটভাইরা বড়ভাইকে সবক্ষেত্রেই মান্য ক'রে চলেছে। কখনও উদ্ধত ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি হরিচরণের মতো। গিরীশের প্রতি হরিশ এবং রমেশের ব্যবহার, শ্যামলালের প্রতি রামের, নবীনের প্রতি বিপিনের, যাদবের প্রতি মাধবের এবং গোকুলের প্রতি বিনোদের কোন প্রকার দুর্বিনীত মনোভাব প্রকাশ পায়নি। হরিশের মনোভাব যাই হোক না কেন, আচরণে তার অশিষ্টতা ছিল না। এমন কি অমার্জিত চাষী শম্ভু ও শিবুর কাহিনীতে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা পাইনি। সাধারণতঃ 'মেয়েলী বিবাদে' পুরুষেরা নির্লিপ্ত থেকেছে গল্পের মধ্যে। যেখানে পুরুষ সক্রিয় হয়েছে, সেখানেও বড়ভাইয়ের মর্যাদা ছোট ভাই কখনও ক্ষুণ্ণ করেনি।

হরিচরণের মধ্যে এ দিক দিয়ে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গেল। স্বার্থবোধের উগ্রতায় সে শুধু অকৃতজ্ঞই নয়, দেব-প্রতিম অগ্রজের সম্মান নষ্ট করতেও অকুণ্ঠিত। মৃত মেজভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে হরিচরণ গুরুচরণের বিরোধিতা শুরু করেছে। বিধবাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবার প্রবৃত্তি হরিচরণের মতো নীচাশয়ের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। গুরুচরণকে প্রতি পদে অপদস্থ এবং মিথ্যা অসম্মানে লাঞ্ছিত ক'রে সে উল্লাস করেছে 'শুভচণ্ডীর' পুজা ক'রে। এই হরিচরণই তার স্বভাবানুযায়ী কুচক্রান্ত থেকে বিরত হয়েছে নাচের মজলিসে গুরুচরণের

উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে—"তাহার কেমন যেন আজ ছেলেবেলার কথা মনে হইতে লাগিল, একি তাহার বড়দা? একি গুরুচরণ মজুমদার?"—সত্যকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। হরিচরণের মতো উগ্র স্বার্থ-চেতন ব্যক্তিকেও তাই সত্যের মর্যাদা দিতে হয়েছে।

'পরেশ' গল্পটি "জাগরণ পর্বে"র শেষ পর্যায়ের রচনা। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে, অতি গূঢ় মানসিক অবস্থার এত স্পষ্ট বিশ্লেষণ 'পরেশ' গল্পের অভিনব উপাদান। প্রকাশভঙ্গীর সংযমে, ছোটগল্পের সংবেদনশীলতা যে সর্বাংশে পাঠকের চিত্তে রসোপলব্ধি ঘটাতে পারে এখানে তার পরিচয় নিহিত রয়েছে। এই গল্পের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় উচ্ছ্বাসহীনতা। দু'একটি অংশে গুরুচরণের সামান্য ভাবাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়; তবুও তার স্নেহ-প্রবণ নির্বাক চিত্তের খবর আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। পরিমিত সংলাপে চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'য়ে উঠতে কোন বাধা পায়নি।

প্রধান চরিত্রগুলি ছাড়া অন্যান্য পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলিও 'পরেশ' গল্পে স্বাভাবিক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। হরিচরণের স্ত্রীর মতো চরিত্র-বিশিষ্টা নারী শরৎ-সাহিত্যে বিরল নয়। ভাশুর গুরুচরণ তার তীব্র কটূক্তি শ্রবণ ক'রে থাকলেও এই সত্যনিষ্ঠ ভাশুরের প্রতি ছোট বউয়ের অবচেতন মনে শ্রদ্ধা লুকিয়ে ছিল। তাই গয়লা মেয়ের গায়ে পদাঘাত করার কথা সে বিশ্বাস করেনি এবং স্বামীকেও এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারে লিপ্ত হ'তে বাধা দিয়েছে।

পঞ্চুর মার চরিত্রে মনিবানুগত্য এবং বড় বাবুর দুঃখে ব্যথিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শরৎ-সাহিত্যে সেবক-সেবিকা সম্প্রদায়ের শাশ্বত প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে রতন, নৃত্যকালী, ভোলা, ধর্মদাস, হরিচরণ ইত্যাদি চরিত্রের কথা স্মরণীয়।

এই গল্পে পল্লী-প্রতিবেশ খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হ'লেও সজীব ব'লেই মনে হয়। যে গ্রামের লোক গুরুচরণকে একদিন দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেছে, তারাই আবার নাচের উৎসবে গুরুচরণকে দেখতে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অসম্মানসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেছে। গুরুচরণের প্রকৃত দুঃখ তাদের মনের

পর্দায় সামান্য আন্দোলনও ঘটাতে পারেনি। জনসাধারণের ভাল-মন্দ বিচারের এই স্বাভাবিক প্রবণতাটুকু শরৎচন্দ্র অতি স্বল্প কথায় প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন। লেখকের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করবার চেষ্টা কোথাও প্রকাশ পায়নি; গল্পের সহজগতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জীবন-চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(২০)

সতী

"সতী" গল্পের পাণ্ডুলিপিতে গল্পটির নাম পাই "সতীর স্বামী"। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র নামটি সংক্ষেপিত করেন। "সতী" গল্পটি শরৎ-প্রতিভার অন্তিমকালীন অন্যতম রচনা। এরপর একমাত্র 'অনুরাধা' ভিন্ন আর কোনও ছোটগল্প তিনি রচনা করেননি। এই গল্পে শরৎচন্দ্রের লেখনী সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর ব্যঙ্গ-কুশলী ক্ষমতার প্রত্যক্ষ বিকাশ স্বরূপ 'সতী' গল্পের নাম স্মরণীয় এবং বাঙলা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে এই গল্পের একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট।

শরৎ-সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবণতার যে পরিচয় এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার কোনরূপ প্রকাশ এখানে ঘটেনি। 'সতী' নামকরণের মধ্যেও শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ-নিপুণ লেখনী ক্রিয়াশীল। নারী-চরিত্রের প্রতি এ শ্রেণীর ব্যঙ্গ শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু এখানে সতীত্বের তথাকথিত সংস্কারের প্রতি ব্যঙ্গ-প্রবণ হ'য়ে উঠেছেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন, "...পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সতীত্ব একটা অঙ্গ বই তো নয়। কাজেই মনুষ্যত্বকে যে সে ছাপিয়ে যাবে, তা হ'তে পারে না।" দৈহিক শুচিতাকেই তিনি সতীত্বের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করতে রাজী নন। যে নারী স্বামীর প্রতি হীন মনোভাব পোষণ করে, স্বামীর প্রতি অনুক্ষণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিদানকে যে কর্তব্য ব'লে মনে করে, মাতৃদত্ত 'মন্ত্র'কেই যে

জীবনে একমাত্র সত্যরূপে জানে, স্বামীর প্রতি যার কোনও হৃদয়-বোধের প্রকাশ নেই, তাকেও সনাতন সমাজ 'সতী' নামেই আখ্যাত করে। তাদের প্রতিই শরৎচন্দ্রের বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে। যার হৃদয়-বোধ নেই, অনুভূতি নেই, আছে শুধু নিষ্প্রাণ বিকৃত 'কর্তব্যে'র স্তূপীকৃত বোঝা, সেই স্ত্রী সমাজের দৃষ্টিতে সতী হ'লেও শরৎচন্দ্র তার মহিমা-কীর্তন করতে প্রস্তুত নন; নির্মলা সতীত্বের পরাকাষ্ঠা; একনিষ্ঠ প্রেমের দোহাই দিয়ে সে স্বামীর জীবনকে দুর্বিসহ ক'রে তুলেছে। স্বামীর পাদোদক গ্রহণ না ক'রে সে অন্য খাদ্য কোন দিন স্পর্শও করেনি। কিন্তু তাদের পারিবারিক জীবন থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে। যখন সতীত্বের মূর্তিমতী বিগ্রহ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে মানসিক বিকৃতির ফলে এবং সতীমায়ের সতীকন্যা ব'লে হরিশের সেবা না ক'রে শীতলার মন্দিরে ধন্না দিয়েছে—সামাজিক ব্যক্তিরা (সাধারণে) নির্মলার সতীত্বের ব্যাখ্যানে মুখরিত এবং সমস্ত দোষ হতভাগ্য হরিশের ওপর গিয়ে পড়েছে। কাহিনীর সমাপ্তিতে শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেমের তীব্রতার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আত্মগোপন করেছিলেন—এই শ্রেণীর ব্যঙ্গ-প্রবণ বর্ণনার তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নির্মলা জাতীয় নারী-চরিত্রের প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং লেখকের এই ব্যঙ্গ-প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে 'সতী' নামকরণ যথার্থই সার্থক হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

শরৎ-প্রতিভার অবসানকালীন রচনা ব'লেই বোধ করি 'সতী' গল্পের আঙ্গিক ত্রুটিপূর্ণ। কাহিনী বা চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করলে একে ছোটগল্প বলতেই হবে; কিন্তু ঘটনাবিন্যাস অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ছোটগল্পের সংজ্ঞাকে ক্ষুণ্ণ করেছে কয়েকক্ষেত্রে। কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে ছোটগল্পের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়েই। প্রারম্ভে হরিশের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সে পরিচিতির কোনও সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মাত্র ঘটনার সূত্রপাত ক'রে ছোটগল্পের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রেও কিছুক্ষণ বাদেই—"এইখানে হরিশের একটু পূর্ব বৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন।"—

উক্তির পর দীর্ঘ পরিচ্ছেদটিতে হরিশের সমগ্র জীবনের ও পরবর্তী ঘটনারাজির সারাংশ দিয়ে কাহিনী-সমাপ্তির পূর্বাভাস দেওয়াতে ছোটগল্পের কৌতূহল যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই অংশে হরিশের পূর্ব জীবনের দীর্ঘ বর্ণনা, সেই প্রসঙ্গে পিতা রামমোহনের পরিচয় ও জীবনযাত্রা প্রণালী, লাবণ্যের পিতার সুদীর্ঘ পরিচিতি-পর্ব এবং রামমোহন ও হরকুমারের মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। হরিশের সঙ্গে লাবণ্যের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে হরিশের সঙ্গে নির্মলার বিবাহ বর্ণনা করলেই ছোটগল্পের দিক দিয়ে তা ত্রুটিহীন হ'তো। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদটি শুধু অহেতুক নয়, কাহিনীর সমস্ত কৌতূহলকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়েছে। এই অংশটুকু বাদ দিলেই ভাল হ'তো; কারণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই মূল কাহিনী শুরু হয়েছে। আঙ্গিক-শুদ্ধির দিক দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিলে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গল্পের Suspense পুরোপুরি বজায় থাকতো।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখি, নির্মলার সতীত্বের কর্তব্য-পালনে হরিশের জীবন দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদটি, কাহিনী সূত্রপাতে যে ঘটনাটি ঘটে, তারই অনুবৃত্তি হিসেবে রচিত। এখানে নির্মলা-হরিশের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে এবং শেষ পরিচ্ছেদে কাহিনী climax-এ উঠেছে নির্মলার আফিং খেয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। কাহিনী-সমাপ্তির শেষ অনুচ্ছেদটিও অহেতুক এবং অতিরিক্ত। এই অনুচ্ছেদটি বাদ দিলে কাহিনী অপূর্বভাবে শেষ হ'তো। অবশ্য শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ-প্রবণ লেখনীর গতি সক্রিয় হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেম-প্রকৃতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে। আমাদের দেশে শ্রীরাধার প্রেম আদর্শায়িত, তাই আদর্শের প্রতি ব্যঙ্গ ক'রে শরৎচন্দ্র হরিশের মানসিক অবস্থা চিত্রিত করেছেন।

'পথনির্দেশ' গল্পের সমাপ্তিতে এবং 'সতী' গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেমের দু'টি বিপরীত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম গল্পে শরৎচন্দ্র হেমের বিরহপূর্ণ ভালবাসাকে শ্রীরাধার চিরবিরহী বেদনার পটভূমিকায়

বর্ণনা করেছেন—যে রীতিতে যুগে যুগে কবিরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্তন করেছেন। কিন্তু 'সতী' গল্পে নির্মলার আত্যন্তিক 'পতিপ্রাণতা'য় উৎকণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত হরিশ ব্রজনাথের মথুরায় পলায়ন শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেমের আতিশয্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে—এ কথা ভেবে নিজেকে যেন সাময়িকভাবে সান্ত্বনা দিয়েছে। নির্মলা মনে করেছে, হরিশের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম। তারই তথাকথিত আধিক্যে হরিশ ক্ষোভে এবং ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বিচার করেছে।

শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন—"···একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?···" শরৎচন্দ্রের এই ভাষণ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই 'সতী' গল্পটি রচিত হয়। এ থেকে মনে হয়, এই মন্তব্যটিকে প্রমাণ করতেই শরৎচন্দ্র 'সতী' গল্পের অবতারণা করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে এতো অধিক ব্যঙ্গ-প্রবণ হ'য়ে উঠেছেন।

নির্মলাকে ঘরে আনবার আগে হরিশের পিতা চেয়েছিলেন "সে যদি তার (নির্মলার) মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে" সেটাই পরম ভাগ্যের কথা। "নির্মলার সতী সাধ্বী মাতাঠাকুরাণী" বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন,···পুরুষ মানুষকে চোখে চোখে না রাখলেই সে গেল।" নির্মলার এই মাতৃদত্ত মন্ত্র তার পরবর্তী জীবনে কি গভীর প্রতিক্রিয়া নিয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে হরিশ-নির্মলার সম্পর্কের মধ্যে যে ট্র্যাজিডির সূত্রপাত হয়েছিল, বর্তমান কাহিনীতে সে চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর মিলনের মধ্যে যে ট্র্যাজিডি নিহিত রয়েছে, হরিশ ও নির্মলার মিলনের মধ্যেও সেই শ্রেণীর একটা বিচ্ছেদজনিত রস নিহিত আছে। স্বামী-স্ত্রী হ'য়েও কাশীনাথ ও কমলা নিজেদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য (বিশেষ ক'রে কাশীনাথের জন্য) পরস্পর মিলিত হ'তে পারেনি। নির্মলা ও হরিশ স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের হৃদয়-সান্নিধ্যে

আসতে পারেনি। প্রথম ক্ষেত্রে কাশীনাথ ও কমলা উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মিলতে পারেনি। নায়ক-নায়িকা চরিত্রের এই বিপর্যয় পাঠক-মনে ট্র্যাজিক রসের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হরিশ ও নির্মলার পরস্পরের মধ্যে প্রেমবোধ ছিল না; তা ছাড়া নির্মলা-চরিত্রে মর্যাদা দেবার মতো এমন কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। নির্মলা ও হরিশের দুর্ভাগ্যে পাঠকমনে করুণার (Pathetic রস) সঞ্চার হয়, ট্র্যাজিডির রস উপজাত হয় না। নির্মলার চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন হীনতার প্রকাশ ঘটেছে, যার ফলে কাহিনীতে ট্র্যাজিক রস সঞ্চারিত হয়নি। ব্যঙ্গ-সাহিত্য অনেক সময় ট্র্যাজিক রস সঞ্চার করতে পারে বটে, কিন্তু এই গল্পে ব্যঙ্গরস জীবনের গভীরতর প্রদেশে প্রসারিত নয় ব'লেই কিছু পরিমাণে তরলায়িত আকার ধারণ করেছে। শরৎ-সাহিত্যে নর-নারীর মিলনের মধ্যে যে চিরন্তন বাধা রয়ে গেছে (তা ঘটনাগত বা চরিত্রগত যে কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্য হোক না কেন) এখানে সেই ট্র্যাজিডির স্বরূপ ব্যঙ্গোক্তির ফলে স্বাভাবিকত্ব লাভ করেনি বটে, কিন্তু নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি ক'রেই কাহিনীর গতি সচল।

হরিশের "সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোন পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।" প্রেম এবং প্রাণহীন কর্তব্য যে এক জিনিস নয় নির্মলার সে বোধ ছিল না। সতীত্বের যে চিরাচরিত আদর্শ হিন্দুসমাজে প্রচলিত, তার প্রতি নির্মলার অনুভূতিহীন মন আকৃষ্ট হয়েছে। হরিশকে নির্মলা হৃদয়ের কোন অনুভূতি দিয়ে জানতে চায়নি, চেয়েছে তথাকথিত কর্তব্যপালনের মধ্যে দিয়ে। তাই হরিশকে নির্মলা স্ত্রী হ'য়েও ভালবাসতে পারেনি ব'লেই, বিশ্বাসও করতে পারেনি; কারণ সে নিজেকেই বিশ্বাস করতে জানে না। স্বামীর হৃদয়কে অস্বীকার ক'রে সে সতীত্বের প্রতিমূর্তি হ'তে চেয়েছে। স্বামীর অসুস্থতায় তার হৃদয় বেদনায় অভিভূত হয়নি, মগ্ন হয়েছে নিজ সতীত্বের মহিমা কীর্তনে। অসুস্থ স্বামীকে সেবা এবং সান্ত্বনা দেওয়া অপেক্ষা সে শীতলার মন্দিরে ধন্না দিয়ে উপবাসের মাধ্যমে সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব। এই কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারাই

স্বামীর আরোগ্যলাভ সম্ভব—এই দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে ক্রিয়াশীল। হরিশের কার্যকলাপে সন্দেহ ক'রে নির্মলা কটূক্তি করেছে, বিবাদ করেছে। কিন্তু স্বামীকে নীচ এবং হীন সন্দেহ করলেও "স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্মলা কোনদিন জলস্পর্শ করিত না।" লাবণ্য এবং হরিশের পুর্ব ঘনিষ্ঠতা তার অজানা ছিল না। তাই এ সম্পর্কে নির্মলার ব্যবহারে উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধেই হয়তো লাবণ্যের সামনে নির্মলা কোন কটু মন্তব্য করেনি। কিন্তু পরে আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। নারী স্বভাবতই তার 'প্রিয়তমে'র জীবনে অন্য নারীর অস্তিত্ব সহ্য করতে পারেনা। সেদিক দিয়ে হয়তো নির্মলা অস্বাভাবিক চরিত্র-বিশিষ্টা নয়। কিন্তু নির্মলার ব্যবহারে অতি উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে নিজেকে সতীত্বের পরাকাষ্ঠারূপে প্রমাণ করতে। তা ছাড়া "সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধ হয় তাহাকেও (নির্মলাকে) হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।"

হরিশের প্রতি নির্মলার সত্যকারের প্রেমবোধ ছিল না ব'লেই কাহিনীর নানা ঘটনার মধ্যে দেখি, নির্মলা হরিশের বিরুদ্ধে কুৎসিত মন্তব্য এবং অকারণ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তাই "এক জোড়া অতি সতর্ক চক্ষু কর্ণ যে তাহাকে পাহারা দিয়া আছে,"—সে কথা হরিশের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব ছিল। হরিশের জীবন থেকে শান্তির চিহ্নমাত্র লোপ পেয়েছিল। স্ত্রীর বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় হরিশ আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু নিজের জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দেখেও হরিশ দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি—"স্ত্রী ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের ত নেই।" হরিশের এই আত্মত্যাগ কর্তব্যপ্রসূত, প্রেমজাত নয়। নির্মলার কোন সন্তান নেই, হয়তো এই নিঃসন্তান অবস্থার জন্য নির্মলার মানসিক-বিকৃতি এত প্রাধান্য পেয়েছে।

নির্মলার সতীত্ববোধ ঠিক আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত নয়; তা হ'লে 'স্বামী' নামের প্রতি হিন্দুনারীর বহুদিনের যে সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে আছে,

নির্মলারও সেই সংস্কারের প্রতি গভীর বিশ্বাস দেখা দিতো। কিন্তু নির্মলা হরিশের প্রতি স্বামিত্বের কোন মর্যাদাই দেয়নি। হরিশকে সকলের কাছে অপদস্থ করতে সে তাই কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। প্রাচীন সংস্কারকে আধুনিক যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে নেবার ক্ষমতাও যেমন নির্মলার ছিল না, প্রাচীন সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করবার নিষ্ঠাও তার চরিত্রে ছিল না। এই অসামঞ্জস্যতার ফলেই নির্মলা চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

স্ত্রী স্বামীর জীবনে যদি কল্যাণী মূর্তিতে দেখা না দিয়ে বিপরীত রূপ নিয়ে আবির্ভূতা হয়, তখন স্বামীর "আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব" সত্য হ'য়ে দেখা দেয়। একনিষ্ঠ প্রেমের উপলব্ধি জীবনে ঐশ্বর্য আনে সত্য, কিন্তু তার নামে অন্য কিছুর আত্যন্তিকতায় জীবনের সুখ-সৌন্দর্যে যে দারিদ্র্য দেখা দেয় তা জীবনকে ক'রে তোলে নিঃস্ব, রিক্ত, বেদনাসিক্ত। হরিশ ও নির্মলার জীবনেও এই বিপর্যয় এসেছিল। লাবণ্যের প্রতি হরিশের দুর্বলতা ছিল না, একথা জোর ক'রে বলা যায় না সত্য, কিন্তু নির্মলার সেজন্য ঈর্ষাজনিত কোন বোধ জাগেনি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার সন্দেহপ্রবণ মন সমভাবে হরিশকে বিদ্ধ করেছে, লাবণ্যপ্রভার ঘটনাও কিছু নূতনত্ব আনতে পারেনি। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে লাবণ্যপ্রভার চরিত্র হরিশ-নির্মলা সম্পর্কের মধ্যে কোন অতিরিক্ত স্থান অধিকার করেনি।

লাবণ্যপ্রভা সম্পর্কে হরিশের গোপনতা প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় নির্মলা কটূক্তি করেছে, তাতে হরিশের ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। লাবণ্যের পত্র নির্মলা গোপনে দেখে অকারণ সন্দেহ প্রকাশ করায় নিজের নিষ্ক্রিয়তার প্রতি হরিশের ঘৃণাবোধ জেগেছে, তাতে—"একমুহূর্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিল,—ইহার কি সীমা নাই, যতই সহিতেছে ততই পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে ?" বাইরের লোক নির্মলার সতীত্বের মহিমায় এবং ত্যাগনিষ্ঠায় বিমুগ্ধ হয়েছিল ; কারণ তারা নির্মলার বাহ্য আচরণই দেখেছিল, অন্তরের পরিচয় পায়নি। তাই শেষের দিকে হরিশের প্রতি কটূক্তি করতে তারা ছাড়েনি হরিশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি না ক'রে তারা নির্মলার আত্মহত্যার

চেষ্টাকেই গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু নির্মলার আত্মহত্যার চেষ্টা অনুশোচনার জন্য নয়, মানসিক বিকৃতির ফলে ঝোঁকের মাথায় সে এ কাজে অগ্রসর হয়েছিল।

পাবনার যে পরিবেশ শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন তা সার্থক হয়েছে। হরিশের বন্ধুদের পরিচয় যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে। বীরেন উকিলের ভক্তি বিহ্বলতা, তারিণী চাটুজ্যের অসহায়তা এবং অন্যান্য চরিত্র বিশেষ ক'রে ছোট বোন উমা স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছে।

শরৎ-সাহিত্যে অগ্রগতি দেখা দিয়েছে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যুগের প্রভাব যে শরৎ-সাহিত্যে পড়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারতা, অধিক বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া রাখা ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক বিধান যথেষ্ট শিথিল হওয়ায় শরৎচন্দ্রের এই পর্বের পাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তি এবং অধিক বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকা সামাজিক দৃষ্টিতে তত দোষাবহ হ'য়ে দেখা দেয়নি। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ও নৈষ্ঠিক হিন্দু সমাজের মধ্যে যে একটা চিরদিনের দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে তার চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে পরিণত লেখনীর স্বাক্ষর যথেষ্ট পাওয়া যায়। সংলাপ, ভাষা-প্রয়োগ পরিমিতি বজায় রেখে রচিত। অলঙ্করণ স্বাভাবিক। অসঙ্গতির মধ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হরিশের মোটর-ড্রাইভার আবদুল "···গাড়ী আস্তাবলে লইয়া গেল।" মাতা বসুমতীকে "হরিলক্ষ্মী" গল্পের মতো এই গল্পেও কয়েকবার দ্বিধাগ্রস্ত হ'তে অনুরোধ জানান হয়েছে।

এখানে শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা অপেক্ষা সমালোচক মনটি অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যকার স্রষ্টা কখনো ব্যঙ্গপ্রবণ হ'য়ে উঠতে পারেন না। সৃষ্টির আবিষ্ট মুহূর্তে জীবন-রহস্যের সমাধানে কোনও উদ্দেশ্যমূলকতা বা সচেতনতা পদে পদে সৃষ্টির বাধা হ'য়ে দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্য থাকার জন্য সচেতন-ভাবে ব্যঙ্গ করা যায় কিন্তু নর-নারীর জীবন-জিজ্ঞাসার কোন রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ-প্রবণ মন মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে তিক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছে। যেমন, নির্মলার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব-চিন্তায়,

হরিশের মানসিক অবস্থা বর্ণনায় ব্যঙ্গ অপেক্ষা তিক্ত মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গকুশল সৃষ্টির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন, তারিণী চাটুজ্যের কথাবার্তায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ দিকে লাবণ্যের পাবনায় আগমনের পর সুদীর্ঘ বর্ণনায় এবং শেষ অনুচ্ছেদে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রূপকে তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতি ব্যঙ্গ-পূর্ণ বর্ণনায়।

(২১)

"অনুরাধা"

শরৎ-সাহিত্যের নর-নারীর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে জানা যায়, নারী অহরহ চেষ্টা করছে বাঁধন-ছেঁড়া পুরুষকে বন্ধনগ্রস্ত করতে নানা উপায়ে। কোন পুরুষ উদাসীন নির্লিপ্ত, কেউ বা নারীর প্রতি আপাত বীতরাগ। নারী তার সম্মোহনী শক্তি নিয়ে পুরুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। কেউ কেউ নিজেই পড়েছে খসে পুরুষের পদতলে উল্কার মত, আবার কোন কোন পুরুষ নক্ষত্রের দ্যুতির আকর্ষণে এসেছে ছুটে; সেই আকর্ষণী শক্তির টানে নারী-প্রকৃতির রহস্যভেদ করতে হয়েছে উন্মুখ। নরনারীর এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য "অনুরাধা" গল্পের নামকরণে অভিব্যঞ্জিত।

আকাশের বিস্তৃতির মাঝে নক্ষত্ররাজি আছে ছড়িয়ে। এক একটি নক্ষত্রের দ্যুতি হঠাৎ কোন মানুষকে আকর্ষণ করে। বাস্তব পরিবেশ ছাড়িয়ে সে মানুষের মনকে কোন এক রহস্যলোকে নিয়ে যায়। মানুষ তার আকর্ষণ অনুভব করে কিন্তু তাকে পায় না, তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু রহস্য ভেদ করতে পারে না। এমনি দূর-গগনের একটি তারা—'অনুরাধা'।

বিজয়ের জীবন ছিল নিতান্ত রূঢ় বাস্তব দিয়ে পরিবৃত। জমিদারীর সে তত্ত্বাবধান করেছে, সেই উপলক্ষে কর্তব্য পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

তার জীবনে নক্ষত্রের (নারী) দর্শন ঘটেনি তা নয়, কিন্তু এমন আকর্ষণ সে আর কখনও অনুভব করেনি। এই নক্ষত্রের (নারী) আকর্ষণ তার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলির জাগরণ ঘটিয়েছে, যা প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তরালে ছিল সুপ্ত। বিজয়ের জীবনের এই পরিবর্তন (সুপ্ত বৃত্তির জাগরণ) অনুরাধার এই আকর্ষণী শক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই "অনুরাধা" নামকরণ, শুধু গল্পের নায়িকা ব'লেই নয়, অতিরিক্ত ইঙ্গিত দেওয়ায় সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

'অনুরাধা' শরৎ-সাহিত্যের শেষ পূর্ণাঙ্গ গল্প। সেদিক দিয়ে গল্পটির কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। গল্পটি গ্রন্থনে শরৎ-প্রতিভার ম্রিয়মান ছায়াটুকু সহজেই নজরে পড়ে।

"অনুরাধা" গল্পের সূত্রপাত ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু সামান্য কাহিনী বিবৃতির পরেই "একটা অতিপুর ইতিহাস" বর্ণনায় শরৎ-লেখনীর শিথিলতা দেখা যায়। গণেশপুর গ্রামের বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনুরাধা এবং বিজয়ের দীর্ঘ পূর্ব-পরিচিতি কিছু অতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছে। বিজয়ের পরিবার পরিবেশ বর্ণনায় এত দীর্ঘ অংশ জুড়ে বউদি প্রভাময়ী ইত্যাদির পরিচয়, বউদির বোন অনীতার পরিচয় প্রসঙ্গে পুনরুক্তি গল্পের ত্রুটি বৃদ্ধি করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনী ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয়েছে। অনুরাধা ও বিজয়ের মধ্যে সন্তোষ ও কুম...ক উপলক্ষ ক'রে ধীরে ধীরে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে, সেই রূপান্তর বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চিত্রিত হয়েছে। তবে অনুরাধার কথা-বার্তার মধ্যে এত অধিক মনীষার প্রকাশ না ঘটালে বোধ করি স্বাভাবিক হ'তো। বিজয় ও অনুরাধার পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণবোধ—সে সম্পর্কে দু'জনেই যথেষ্ট সচেতন। এত সচেতনতা ও বাস্তববোধ থাকা সত্ত্বেও দু'জনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের চিত্র সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বেশ সঙ্কেতপূর্ণভাবে ছোটগল্পের লক্ষণ বজায় রেখে চিত্রিত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদের তারকা-চিহ্নিত অংশের পর থেকে কাহিনী-সমাপ্তি পর্যন্ত যে ঘটনা চিত্রিত হয়েছে তা শুধু অতিরিক্ত নয়,

অনাবশ্যক এবং ত্রুটিপূর্ণ। এই অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিলে কাহিনী অপূর্বভাবে শেষ হ'তো এবং ছোটগল্পের আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা ইঙ্গিতপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে উঠতো। শেষ অংশটি থাকার ফলে কাহিনীর কৌতূহল সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং গল্পের নিবিড়তা ক্ষুন্ন হয়। চরিত্রগুলি বিচার করলে দেখা যায়, প্রধান চরিত্র হিসেবে অনুরাধা এবং বিজয় পরিবর্তিত হয়নি। অনুরাধা চরিত্রের কমনীয় দৃঢ়তা, আত্মসচেতন ব্যবহার, সংযত বাচনভঙ্গী, স্নেহ-প্রবণতা, নম্রতা কাহিনীতে পূর্বাপর একইভাবে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম পরিচয়ে অনুরাধাকে যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের সঙ্গে পরিচয়, কুমারকে কেন্দ্র ক'রে বাৎসল্য রসের প্রকাশ, শেষে বাৎসল্য রসের ভিত্তিতে মধুর রসের স্ফুরণ কাহিনীতে ঘটনার পর ঘটনার উপস্থাপনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অনুরাধাকে কেন্দ্র ক'রে এই যে বিভিন্ন ঘটনাগত পরিবর্তন, তা তার চরিত্রের মূলগত কোনও পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয়নি। শুধুমাত্র বাৎসল্য রসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের অভিঘাতে মধুর রসের জাগরণ অনুরাধা চরিত্রের একটি নতুন দিকের পরিচয় দান করেছে।

বিজয়-চরিত্র সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করবার আগে কাহিনীর শেষের দিকে বিজয়ের নিজস্ব উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"···প্রথমে এসে যে ব্যবহার করেচি ঠিক সেই আমার প্রকৃতি নয়।" বিজয় সম্পর্কে লেখক যে সুদীর্ঘ পরিচিতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে সমগ্র কাহিনীতে বিজয়ের কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং লেখকের বর্ণনার চেয়ে ঘটনার বক্তব্যকেই পাঠক অধিক প্রাধান্য দেবে। সেদিক দিয়ে বিজয়-চরিত্র অপরিবর্তিত। প্রথম ঘটনায় বিজয়ের রুক্ষতা আপাত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্যে বিজয়ের হৃদয়ের নিঃস্বতা-জনিত ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে এবং অনুরাধার কাছ থেকে অনভ্যস্ত আতিথ্য পেয়ে বিহ্বল বিজয়ের মনের গতি বিশেষ একদিকে যাত্রা করেছে। বিজয়-অনুরাধার পারস্পরিক আকর্ষণজনিত ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য ক'রেই

কাহিনীর অগ্রগতি দেখা যায়। সেদিক দিয়ে কাহিনীর একমুখিনতা বজায় আছে এবং অনুরাধা-বিজয়ের চরিত্রগত কোন পরিবর্তন সাধন না ক'রে ঘটনাগত পরিবর্তনের দ্বারা পারস্পরিক আকর্ষণ চিত্রিত হ'য়ে কাহিনী স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে। কুমার-সন্তোষকে কেন্দ্র ক'রে অনুরাধার বাৎসল্য রসের যে প্রকাশ—তারই পটভূমিকায় বিজয়-অনুরাধার প্রেম-প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে। তাই রসের এই বিভিন্নতা মূলতঃ একই উদ্দেশ্যজনিত। সেদিক দিয়ে অনুরাধা নিখুঁত ছোটগল্প না হ'লেও ছোটগল্পের লক্ষণ এখানে অনেকাংশে বজায় রাখতে শরৎচন্দ্র সমর্থ হয়েছেন। তবে বিদায় বেলার রচনায় গ্রন্থন-শৈথিল্য থাকা খুব আশ্চর্যের নয়, কারণ শরৎ-প্রতিভার জ্যোতি "অনুরাধা"য় গোধূলিলগ্ন পেরিয়ে দিগন্তের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। শরৎ-প্রতিভার নব নব রশ্মি আর দেখা যাবে না, শুধু বিরাজ করবে শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধালোক বাঙলার কথাশিল্পকে মাধুর্যে মণ্ডিত ক'রে, মহিমান্বিত ক'রে।

বিজয়-অনুরাধার প্রেম-প্রকৃতি চিত্রণের মধ্যে শরৎচন্দ্র কোন অভিনবত্ব দেখাতে পারেননি। অতুল-জ্ঞানদার প্রেম-প্রকৃতির সঙ্গে বিজয়-অনুরাধার সম্পর্কের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে "অরক্ষণীয়া" গল্পে সমাজ-সমস্যার প্রাধান্য বিশেষতঃ জ্ঞানদার বিবাহ সমস্যা, অতুল-জ্ঞানদার প্রেম-প্রকৃতিকে গৌণ ক'রে দিয়েছে। ঠিক বিপরীত পরিচয় লক্ষ্য করা যায় "অনুরাধা" গল্পে। এখানে গ্রামীণ পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও অনুরাধা-বিজয়ের প্রেম-প্রকৃতি চিত্রণে সমাজ একেবারে গৌণ হ'য়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র যেখানে সমাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে নর-নারীর হৃদয় বোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। আবার যখন নর-নারীর প্রেমবোধের চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সেখানে সমাজ একেবারে নীরব থেকেছে। সমাজের পট-ভূমিকায় নর-নারীর হৃদয়কে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্যার উদ্ভব, তা অত্যন্ত গুরুতর এবং জটিল, সুতরাং উপন্যাসধর্মী। তাই ছোটগল্পের মধ্যে উভয় দিকের প্রতি সমান প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকত্বের দিক দিয়ে এখানে প্রশ্ন জাগ্‌লেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করলে একে মেনে নিতেই হবে।

অনুরাধার প্রতি বিজয়ের যে আকর্ষণ গড়ে উঠেছে, তা ঠিক অতুলের মত নয়। জ্ঞানদার প্রতি অতুলের ছিল সহানুভূতি, ছিল কৃতজ্ঞতা; তারই রূপান্তর ঘটেছে মাত্র যা অত্যন্ত অপরিস্ফুট। জ্ঞানদার প্রতি অতুলের 'স্নেহ' কাহিনী-সূত্রপাতের পূর্বেই ছিল কিন্তু এখানে তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং কাহিনীর শেষে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছে।

অনুরাধার প্রতি বিজয়ের যে আকর্ষণ, তার মূলে রয়েছে বিজয়ের জীবনে অভাবজনিত দুর্বলতা। বিজয়ের স্ত্রী নেই। বউদি নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং হৃদয়ের আতিথ্য বিজয়ের জীবনে একটা বড় অভাব। এই দুর্বলতার (অভাবজনিত) পথ দিয়ে অনুরাধা তার মন জয় ক'রে নিয়েছে। বিজয়ের কথাতেই তার অভাববোধ বেদনা-সিক্ত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে—"মার্জিত-রুচি-সম্মত উদাস অবহেলায় তাঁদের নেতিয়ে পড়া আত্মীয়তায় বর্বরতার লেশ নেই।...এর শেকড় টানে না রস, পাতার রঙ সবুজ না হ'তেই ধরে হলুদ বর্ণ।"

অনুরাধা তেইশ চব্বিশ বছরের অনূঢ়া। বৈমাত্রেয় ভাই গগন চাটুজ্যে জমিদারীর টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় অনুরাধাকে একা ফেলে। অনুরাধা এই অসহায় অবস্থায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েনি। তার পূর্ব-পুরুষ এ গ্রামেরই জমিদার ছিলেন। এই আভিজাত্য অভিমানবোধ অনুরাধা কোনক্রমেই বিস্মৃত হ'তে পারেনি—"আভিজাত্যের চিহ্ন ইহার মন হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।" তার চরিত্রের দৃঢ়তা, ধৈর্য, সৎসাহস ও প্রগতি-পন্থী মনোভাব শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির নারী-চরিত্রে এর আগে দেখা যায় নি। যুগ-প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে অনুরাধা-চরিত্র এইভাবে চিত্রিত হয়েছে—"...ঘটনা সে যুগের নয় নিতান্তই আধুনিক কালের।" চরিত্রের দৃঢ়তা থাকার জন্যই অনুরাধা নিজের বিবাহ সম্পর্কে দাদাকে বলতে পেরেছে—"কুল নিয়ে উপোস করার চেয়ে দু'মুঠো ভাত ডাল পাওয়া ভাল দাদা।" গগনের পলায়নের পর অনুরাধার দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতা তাকে সমস্ত বিক্ষোভের মধ্যেও চঞ্চল ক'রে ফেলতে পারেনি। একমাত্র "দূর সম্পর্কের একটি ছেলেমানুষ ভাগিনেয়"কে

নিয়েই সে অভিভাবকহীন অবস্থায় বাস করতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েনি। বিজয় যখন সদলবলে পিস্তল ও দারোয়ানের লাঠিসোটা নিয়ে অনুরাধার বসত-বাটি দখল করতে এলো, অনুরাধা স্থিরচিত্তে এই বিপদকে সহজরূপে গ্রহণ ক'রে নিজেকে সাময়িকভাবে রক্ষা করলো।

অন্তরাল থেকে অনুরাধার "অশ্রুসিঞ্চিত কণ্ঠস্বর বিজয়ের কানে বড় মধুর ঠেকিয়াছিল।" যে ধারণা নিয়ে বিজয় অনুরাধার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিল অনুরাধার ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় বিজয়ের মন অনুরাধার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছিল। তা ছাড়া বিজয় বিপত্নীক। "স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে তাহার মেজাজটা কিছু রুক্ষ", কারণ স্ত্রীর সান্নিধ্য বিজয় বেশীদিন লাভ করেনি। বউদি প্রভাময়ীর স্বার্থপরতা নারী সম্পর্কে বিজয়ের ধারণাকে বিপরীতমুখী ক'রে তুলেছিল। কিন্তু অনুরাধার স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠস্বর, নম্র ব্যবহার আনুগত্যপুর্ণ উক্তি "তাহার এতকালের ধারণাকে···যেন ধাক্কা দিয়া নড়বড়ে করিয়া দিল।" অনুরাধার প্রতি বিজয়ের মনোভাব ভিন্ন পথ ধরলো।

অনুরাধা চরিত্রের অস্মিতা (personality), আত্মমর্যাদাবোধ, তেজস্বিতা বিজয়কে চুম্বকশক্তির মতো আকৃষ্ট করেছিল। অনুরাধার মধ্যে এই আকর্ষণ-শক্তি রূপজ নয়; কারণ রূপ তার ছিল না। আত্মসম্ভ্রম সম্পর্কে এতটা সচেতনতা অথবা বিজয়ের রুক্ষ উক্তিতে অবিচলিত নম উক্তি ও কণ্ঠস্বর বিজয়ের মনকে অনুরাধামুখী ক'রে তুললো। নারীর কাছ থেকে স্নিগ্ধতা সে পায়নি, তার জীবনের এই অভাববোধ বিজয়ের মনকে তিক্ত ক'রে দিয়েছিল। তার ওপর কুমারের প্রতি অনুরাধার স্নেহাতিশয্য ও কুমার-অনুরাধাকে কেন্দ্র ক'রে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ও বাৎসল্য রসের অজস্র স্ফুরণ বিজয়ের মনকে আরও দুর্বল ক'রে তুলেছে অনুরাধার প্রতি। বিজয়ের মনে হয়েছে তার একমাত্র পুত্র কুমারের অযত্নের কথা, যখন বিজয় বিলাতে।

সুতরাং বিজয়ের মনকে একদিকে নারীর সেবাপরায়ণতা ও মাধুর্যপুর্ণ স্নিগ্ধতা অন্যদিকে কুমারের মাতৃস্নেহের অভাবের পুর্ণতা—অনুরাধাকে কেন্দ্র ক'রে

এই দুই পথ ধ'রে এসে একেবারে বশীভূত ক'রে ফেলেছে। কিন্তু অনুরাধা থেকেছে অবিচলিত। তার প্রতি বিজয়ের আকর্ষণ প্রথম দিকে খুব স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি কুমারের প্রতি বাৎসল্য রসের চিত্র পরিস্ফুট করতে গিয়ে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পারি কুমার ও সন্তোষের বন্ধুত্ব স্থাপন এবং কুমারের সঙ্গে অনুরাধার মাসিমা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কুমারের প্রতি অনুরাধার স্নেহাতিশয্যের প্রকাশ বিজয়ের মনকে আরও দ্রবীভূত করেছে—"প্রথম দিনটির মতো আজও সেই কণ্ঠস্বর বড় মধুর লাগিল, তাই বলার জন্য নহে, কেবল শোনার জন্যই" বিজয় অনুরাধাকে কুমার সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে নানা কথাবার্তা বলেছে।

এর পর বিজয় কোন কাজের অছিলায় অনুরাধার সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে এবং নিজের তথাকথিত দুর্ভাগ্যের প্রতি অনুরাধার দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করেছে। ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনুরাধার বিবাহের প্রস্তাবে বিজয়ের আকুলতাই তার প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটিয়েছে—"লোকটি চলিয়া গেলে বিজয় চুপ করিয়া বসিয়া নিজেকে বুঝাইতেছিল যে তাহার মাথা ব্যথা করিবার কি আছে ? ···তবে তাহার দুশ্চিন্তা কিসের ?" এর পর বিজয়ের উপযাচক হ'য়ে অনুরাধার কাছে নিজ আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং অনুরাধার ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুলতা ও উচ্ছ্বাসময় কথাবার্তায়—"নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা একবার ভেবে দেখলেন না—আমার এই বড় পরিতাপ···এ সময় আমি কি আপনার কোন উপকারই করতে পারিনে ? পারলে খুসী হবো।" অনুরাধার প্রতি বিজয়ের প্রেমবোধ আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে বিজয়ের অনুরাধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। অনুরাধাকে কি নামে ডাকবে—এই প্রশ্ন করার মধ্যে বিজয়ের মনের গোপন প্রবণতা ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে। অনুরাধাকে 'রাধা' সম্বোধনে ডাকতে বিজয়ের "আপত্তি নেই, কিন্তু মনিবানা সত্ত্বের জোরে নয়।" বিজয়ের পক্ষ থেকে এত আকুলতা প্রকাশ পেলেও "বিজয় এটা দেখিয়াছে যে ঘনিষ্ঠতা করার আগ্রহ তাহার দিক দিয়া যত প্রবলই হোক ওপক্ষ হইতে

লেশমাত্র নাই। সে কিছুতে সুমুখে আসে না এবং সংক্ষেপে ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বরাবরই আড়াল হইতে উত্তর দেয়।" অনুরাধা-চরিত্রে এ শ্রেণীর আচরণ বঙ্কিম-সাহিত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। শরৎ-সাহিত্যে কোথাও নারী এত স্থির অচঞ্চল হ'য়ে শুধু নিজ আকর্ষণের দ্বারা পুরুষকে চঞ্চল ক'রে তোলেনি। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী এসেছে পুরুষের কাছে পৌরুষের পরীক্ষা গ্রহণ করতে। যে পুরুষ নারীর সেই আকর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে পৌরুষের সঙ্গে, তার হয়েছে জয়। নতুবা নারী-রূপের আগুনে পুরুষ হয়েছে ভস্মীভূত। 'অনুরাধা' গল্পে রূপজ-মোহের কোন স্থান নেই ব'লেই বিজয়-অনুরাধার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে বঙ্কিম-সাহিত্যের মত এতটা তীব্রতা নেই। তথাপি 'অনুরাধা' গল্পে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির যে লীলা-চঞ্চল রূপ চিত্রিত হয়েছে তা শরৎচন্দ্রের সমস্ত গল্পের নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী।

কুমারকে উপলক্ষ ক'রে অনুরাধার প্রতি বিজয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। মাসির যত্নে কুমারের স্বর্গলাভ ইত্যাদি কথাবার্তা অথবা নিজের সম্পর্কে আবেগময় উক্তি "তাকে যত পাষণ্ড লোকে ভাবে সে তা নয়" ইত্যাদি বিজয়ের প্রেম-প্রকৃতির চঞ্চলতাই প্রকাশ করে। এইভাবে বিজয়-অনুরাধার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। অনুরাধার পক্ষ থেকে প্রেমবোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে, যখন বিজয় তার প্রথম দিনের রুক্ষ ব্যবহারের জন্য মাপ চেয়েছে। তখন অনুরাধার সহাস্য উক্তি তার অন্তরের গোপন রহস্যকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। যাকে 'মনিব' মনে ক'রে সে সর্বদা দূর থেকে সম্ভ্রম বজায় রেখে কথা বলেছে, তার মুখে এ শ্রেণীর সহাস্য কৌতুক "বিজয়ের চোখে পড়িল এবং মুহূর্তকালের এক অজানা বিস্ময়ে সমস্ত অন্তরটা দুলিয়া উঠিয়াই আবার স্থির হইল।" এরপরে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে, তাতে শরৎ-লেখনীর পরিণতির চিহ্ন স্বরূপ সংলাপে যথেষ্ট পরিমিতিবোধ এবং সংযম বজায় রাখা হয়েছে। এই সংযত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমবোধের প্রকাশ গোপন থাকেনি।

ক্রমে বিজয় অনুরাধার গৃহে ভোজন করতে সুরু করেছে। ঘনিষ্ঠতা এখন অত্যন্ত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তাদের নৈকট্য-স্থাপনার মধ্যেও ব্যবধান রয়ে গিয়েছে অনুরাধার সংযত প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য—"এই কয়দিন বিজয় ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিল যে আতিথ্যের ত্রুটি কোনদিকে নাই, কিন্তু পরিচয়ের দূরত্ব তেমনি অবিচলিত রহিল। কোন ছলেই তিলার্ধ সন্নিকটবর্তী হইল না।" অনুরাধার পক্ষে কোন প্রতিকূলতাই ছিলনা। সে যদি বিজয়ের আকুল আগ্রহে উপযুক্তভাবে সাড়া দিতো তবে হয়তো উভয়ের মধ্যে মিলন হওয়া অসম্ভব হ'তো না। কিন্তু তাতে কাহিনী রসময় হ'য়ে উঠতো না এবং গতানুগতিক হ'য়ে পড়তো। অনুরাধার দূরত্ব বজায় রেখে কথাবার্তা অথচ বিজয়ের রহস্যালাপে অংশ গ্রহণ তার চরিত্রের মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিদায় নেবার প্রাক্কালে অনুরাধার প্রতি বিজয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, প্রেমবোধেরই নামান্তর মাত্র। নিজের সামাজিক পরিবেশ, গৃহ ইত্যাদির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অনুরাধার সেবাপরায়ণতার প্রতি বিজয় শ্রদ্ধায় অবনত, আবেগে উচ্ছ্বসিত, প্রকাশে উদ্‌গ্রীব। এ শ্রদ্ধার মধ্যে ভালবাসার পরিমাণ অধিক। তাই কথা বলতে গিয়ে "আজ বিজয়কে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইল।" এরপর দীর্ঘ অংশ ধ'রে নিজেদের পরিবারের মেয়েদের তথা শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় গ্রামের তথাকথিত অশিক্ষিতা মেয়েদের হৃদয়ের প্রশস্ততা, সেবায় অকুণ্ঠিত মনোভাব অনুরাধার প্রতি প্রেমবোধ থেকেই জাত হয়েছে সন্দেহ নেই। বিজয়ের এই আকুলতায় অনুরাধা আর নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারেনি; এবার তার হৃদয় হ'য়ে উঠেছে উদ্বেল। বিজয়ের বিদায় নেবার সময়ে "তাহার চোখের পাতা দু'টি জলে ভিজা।" বিজয়কে প্রণাম ক'রে অনুরাধার উক্তি "গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে ভিক্ষুকের মতোই আমাকে চাইতে হবে…কিন্তু আপনার কাছে তা নয়। যা চাইবো স্বচ্ছন্দে চাইবো।" তা ছাড়া বিজয়কে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন মত অনুরাধার সাহায্য গ্রহণ—

"আমার আর কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিয়ে সেবা করতেও তো পারবো।...আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।" কাহিনীতে অনুরাধার এই শেষ উক্তি তার প্রেমবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ সূচিত করে। কাহিনীর প্রথমদিকে বিজয়ের সঙ্গে অনুরাধার সাক্ষাতের পর অনুরাধার প্রেমের অত্যন্ত সংযত প্রকাশ ও ব্যবহার বিজয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে শুধু তার মনে প্রেমবোধ জাগায়নি তাকে অভিভূত ক'রে দিয়েছে, কাহিনীর শেষের দিকে বিজয়ের মায়ের বা বউদির কাছে উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুমার-সন্তোষকে কেন্দ্র ক'রে অনুরাধা-চরিত্রের আর একদিকের পরিচয় কাহিনীতে চিত্রিত হয়েছে। নারী শুধু প্রেমস্বরূপা নয়, স্নেহনির্ঝরিণীও। শুধু মধুর রসেই মানুষের জীবনে নারী দেখা দেয়নি, বাৎসল্য রসের পরাকাষ্ঠা-রূপে নারী আবির্ভূতা।

কুমার কাহিনীতে দেখা দিয়েছে বিজয়ের অনুরাধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সহায়করূপে। কুমারের জীবনে অর্থের অভাব ছিল না, ছিল স্নেহের অভাব। তাই তার শিশুমন অনুরাধার দরদপূর্ণ ব্যবহারে প্রথমদিনই আকৃষ্ট হয়েছে। তার ক্ষুদ্র জীবনেও একটা অভাববোধ ছিল, যেটা না বুঝলেও সে অনুভব করতো। অনুরাধার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে ও যত্নে এবং সন্তোষের বন্ধুত্বে সে অল্পদিনেই তাদের অত্যন্ত আপন হ'য়ে উঠলো। সমস্তদিন তার অনুরাধার কাছে কেটে যেতো। কুমারের অভাববোধ অনুরাধা অনুভব ক'রে তার সহজাত মাতৃত্ববোধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। তাই নিঃসম্পর্কিত হওয়া সত্বেও মাসির উৎকণ্ঠা নিয়ে সে কুমারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়েছিল। কুমারের কোনরকম অনাদরের কথা চিন্তা করতেও তার মন শঙ্কিত হয়েছে। কুমারকে বিদায় দেবার প্রাক্কালে বিজয়ের কাছ থেকে সে কুমার সম্পর্কে আশ্বাস পেয়ে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও তার উৎকণ্ঠা দূর হয়নি।

কুমারকে কেন্দ্র ক'রে অনুরাধার হৃদয়ে যে বাৎসল্য রসের আলোড়ন জেগেছিল ক্রমশঃ তা বিজয়ের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়; অনুরাধা

এখানেও অনুভব করেছিল একটি অসহায় আবেদন যেন তাকে চঞ্চল ক'রে তুলছে।

বিজয় সম্পর্কে যে পরিচয় শরৎচন্দ্র বর্ণনা করেছেন বা কাহিনীর প্রথমদিকে তার ব্যবহারে এবং অনুরাধার সঙ্গে কথাবার্তায় যে রুক্ষতা বা অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে প্রথমদিকের এই রুক্ষতার আবরণ খসে পড়েছে। মাতৃহীন কুমারের প্রতি বিজয়ের স্নেহ অত্যন্ত প্রগাঢ়। তার পরিচয় পাই তার কথাবার্তা ও আচরণে। যখন সে বিলেতে গিয়েছিল তখন তার অবর্তমানে কুমারের অযত্নের সংবাদ তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিয়েছে। সেই ব্যথা সে ভুলতে পারেনি ব'লেই পাড়াগাঁয়ে সাপ ইত্যাদির ভীতি জেনেও কুমারকে নিজের সঙ্গছাড়া করেনি। কুমারের দুর্ভাগ্যের জন্য বিজয় মর্মাহত হয়েছিল। এই কুমারকে যখন অনুরাধা স্নেহে-যত্নে আপনার ক'রে নিল, বিজয় তখন কৃতজ্ঞতায় অবনত হ'য়ে পড়েছিল। তা থেকেই অনুরাধার প্রতি তার মন কিছুটা দ্রবীভূত হয়েছিল। এরপর অনুরাধা-চরিত্রের পরিচয় পেয়ে তার প্রেমবোধের জাগরণ। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত অসহায়তা অনুরাধার সান্নিধ্যে একটা নির্ভরস্থল খুঁজে পেয়েছিল ব'লেই দু'জনেই অনুরাধাকে বড় আপনার ক'রে পেতে চেয়েছিল।

সমালোচক শরৎ-মানসের সুস্পষ্ট অগ্রগতির চিহ্ন এবং যুগের অগ্রগতি "অনুরাধা" গল্প থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগ-প্রভাব শরৎ-সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার প্রমাণ শরৎচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের রচনাগুলি থেকে সহজেই নজরে পড়ে। "অনুরাধা" তাঁর ষষ্টিতম বসন্তের একগাছি মালা—ফুলগুলি সেখানে ম্লান হ'লেও সুনির্বাচিত, তার সৌরভের মধ্যে মাদকতা নেই, কিন্তু মৃদু স্নিগ্ধতায় পরিব্যাপ্ত। প্রথম পর্বের ফুলগুলির সঙ্গে 'অনুরাধা' যুগের ফুলগুলির পার্থক্য যথেষ্ট। সমসাময়িক জলহাওয়ামাটিতে এই পর্যায়ের ফুলগুলির বিকাশ ব'লে সুরভির মধ্যেও এই সময়ের প্রভাব বিদ্যমান।

'অনুরাধা' তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সেও অনূঢ়া, তবুও সমাজের দৃষ্টিতে বা সমসাময়িক প্রভাবে তার এ অযোগ্যতা একেবারে অসহনীয় হ'য়ে ওঠেনি। আধুনিক কালের ঘটনা ব'লেই বোধ করি তা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানদার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্ঞানদার বয়স তের পার না হ'তেই সমাজ-সংসার এবং রচনাকার প্রত্যেকেই অত্যন্ত চঞ্চল এবং অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন। জ্ঞানদার তের বছর বয়স যেখানে গুরুতর অপরাধ, সেখানে অনুরাধার তেইশ বছর বয়স সহনীয় হয়েছে।

এ ছাড়া যুগের অগ্রগতির সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার লক্ষণীয়। 'অনুরাধা' গল্পে স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। "হরিলক্ষ্মী" গল্পে নায়িকা 'একটু বেশী বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে 'পাশ দিয়েছিল', কিন্তু 'অনুরাধা' গল্পে বিজয়ের বউদি প্রভাময়ী বিশেষ ক'রে বউদির বোন অনীতা বি. এ. অনার্স পাশ ক'রে এম. এ. পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শুধু নায়িকার নামকরণের মধ্যেই প্রগতি নেই, তার আচার-ব্যবহারে ও শিক্ষায় যুগের প্রভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। শরৎ-সাহিত্যে নারীর এত উচ্চশিক্ষা এর আগে আর দেখা যায়নি। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীদের মধ্যে হেমনলিনী, বিন্দু, শৈলজা, হেমাঙ্গিনী, ইন্দু, সৌদামিনীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে হেমনলিনী ও সৌদামিনী কিছু উচ্চশিক্ষা পেয়েছে ব'লে মনে হয়। বিশেষ ক'রে সৌদামিনী Philosophy নিয়ে আলোচনা করেছে তার মামা ও নরেনের সঙ্গে। বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরতার দ্বারা এই আলোচনা করা যায় না। কলেজে পড়ে মেয়েদের শিক্ষাপ্রাপ্তি যুগের অনিবার্য প্রভাব ব'লে শরৎচন্দ্র তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু কলেজে-পড়া মেয়েদের সম্পর্কে তিনি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁর উক্তি থেকেই তার প্রমাণ মেলে—"কলেজের মেয়ে—বই মুখস্থ করে, আর পরীক্ষা পাশ করার চেষ্টায় ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। আর সব লোকসানই পূরণ হ'তে পারে কিন্তু যে সন্তান এদের জন্মাবে সে চিররুগ্ন হ'য়েই থাকবে।" "অনুরাধা" গল্পে কলেজের মেয়ে বা সাহেবীয়ানায় দুরন্ত শহরের মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্রের

প্রবণতা খুব শ্রদ্ধাশীল নয় এবং গ্রামের তথাকথিত প্রগতিপন্থী মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় যদিও বিজয়ের মা বলেছেন, "আমরা যখনকার সে পাড়াগাঁ কি আর আছে···দিন কাল সব বদলে গেছে।" তবুও বিজয়ের মুখ দিয়ে গ্রামের মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্র অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সেখানে 'অনুরাধা' উপলক্ষ হ'য়ে পড়েছে।

বিজয় শুধু বিলেত-ফেরত নয়, সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছে। বিলেত যাওয়া যে সময়ে গর্হিত অপরাধ ছিল, (যেমন 'বামুনের মেয়ে' গল্পে অরুণ-চরিত্র) সে যুগ অতিক্রম ক'রে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নিজের কর্মচারীর কাছে অনুরাধা সম্পর্কে বিজয়ের অশোভন উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক। পরবর্তী আচরণের সঙ্গে বিজয়ের এ শ্রেণীর ইতরজনোচিত উক্তির কোনই সাদৃশ্য নেই। কাহিনী-সমাপ্তির ঠিক পুর্বে দাদা-বউদির প্রতি বিজয়ের অতি উচ্ছ্বাসপ্রবণতা অস্বাভাবিক এবং আতিশয্যপুর্ণ হ'য়ে পড়ায় সামঞ্জস্য হারিয়েছে। বিজয়ের সঙ্গে প্রভাময়ী ও দাদার যে সম্পর্ক কাহিনীতে পাই, তাতে এ শ্রেণীর ভ্রাতৃভক্তি ও গদগদ আচরণ অসঙ্গত সন্দেহ নেই।

'অনুরাধা' গল্পে আর একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে কোন পাত্র বা পাত্রীর চেহারার বর্ণনা। অনুরাধা সম্পর্কে বিশেষ ক'রে ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর পরিচয় দিতে গিয়ে সুদীর্ঘ অংশ ধ'রে তার চেহারার বর্ণনা শরৎচন্দ্রের পুর্ববর্তী রচনাগুলিতে এত মুখ্য অংশ গ্রহণ করেনি।

বিনোদ ঘোষ চরিত্রটি গ্রামের নিষ্ঠাবান প্রজার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এককালে যিনি গ্রামের জমিদার ছিলেন, অবস্থা বিপাকে তাঁদের পতন হ'লেও তাঁদের বংশের প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা কমেনি। প্রজাকুল যে জমিদারের কাছ থেকে একবার সহৃদয়তা পেয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বিস্মৃত হ'তে পারেনি—"তাহার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গীতে বুঝা গেল আজও এ বাড়ীর অমর্যাদা করিতে তাহাদের বাধে।"

বর্ণনাভঙ্গীর পরিমিতি বোধে, সংলাপের তীক্ষ্ণতায়, অলঙ্করণের স্বাভাবিকত্বে,

ব্যঙ্গপ্রবণ মন্তব্যে "অনুরাধা" গল্পে শরৎপ্রতিভার চিহ্ন লুপ্ত হয়নি। কাহিনীর যে কোনও অংশের বর্ণনা এবং সংলাপ লক্ষ্য করলেই এ মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। শরৎচন্দ্রের স্রষ্টাধর্ম মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে যখন নায়ক-নায়িকার কথাবার্তার মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের মানসটি উগ্র হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে বিজয় আপত্তি করাতে অনুরাধা যে দীর্ঘ উক্তি করেছে, তা অনুরাধার জিজ্ঞাসার চেয়ে শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। "বি. এ, এম. এ, বি. এল টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি···"—শরৎচন্দ্রের একটি পত্রে এই উক্তি দেখা যায়। কিন্তু শহরের মেয়ের বি. এ, এম. এ পাশ করাকে শরৎচন্দ্র সম্মতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি ব'লেই বিজয় ইত্যাদির কথাবার্তার মাধ্যমে এদের সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

'অনুরাধা' গল্প থেকে প্রমাণ পাই শরৎচন্দ্র যে বাঙলা সাহিত্যকে আরও সম্পদশালী ক'রে তুলতে পারতেন, এ আশা করা খুব অযৌক্তিক নয়। প্রতিভা-দ্যুতি ম্লান হ'লেও অস্ত যাবার দেরী ছিল—শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মনের মৃত্যু তখনও হয়নি, যখন মানুষ শরৎচন্দ্রকে চির আদরের পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়েছে। জীবনে আঘাত পেয়ে, বঞ্চনা পেয়ে, জীবন-সিন্ধু মন্থন ক'রে নীলকণ্ঠের মতো বিষ পান করেছেন, কিন্তু পাঠককে দান করেছেন জীবনামৃত! জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজের খুব আশা ছিল না—বিদায় নিতে উৎকণ্ঠা ছিল না! তাঁর সৃষ্ট নরনারী পাঠকমনে চির আদরের সামগ্রী হ'য়ে রইল—স্রষ্টা নিলেন বিদায়, সৃষ্টি তাঁকে রাখলো বরণ ক'রে।

(২২)

ছেলেবেলার গল্প

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "এ যেন কুমোরের কাছে কুড়ুল গড়বার ফরমাশ।" ছোটদের জন্য গল্প লেখবার পশ্চাতে শরৎচন্দ্রের সচেতন মন সক্রিয় থাকায় সত্যকার সৃষ্টিনিপুণ প্রতিভার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। শেষ বয়সে (৫৮-৫৯ বছর বয়সে) একান্ত অনুরুদ্ধ হ'য়ে তিনি সাতটি রচনা লিখেছিলেন ("...সম্পাদকেরা অনুরোধ করেছেন কয়টি গল্প লিখে দিতে।")। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কিশোর-পাঠ্য সাহিত্যোপযোগী উপাদান, বর্ণনাভঙ্গী, মন্তব্য রচনাগুলিতে রক্ষিত হয়নি। কতকগুলি ক্ষেত্রে তা অতি লঘু হ'য়ে উঠেছে এবং কয়েকস্থানে মন্তব্যের গভীরতায় ভাবপুষ্ট মানসের প্রকাশ ঘটেছে—যেগুলি কিশোর পাঠকদের কাছে অতিরিক্ত, তাই সুখপাঠ্য হ'য়ে ওঠেনি।

এই রচনাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে, তা হচ্ছে চলতি ভাষায় এগুলি রচিত। শুধুমাত্র "কলকাতার নতুনদা" গল্পাংশটি সাধু ভাষায়। কিন্তু এটি হুবহু 'শ্রীকান্ত' (২য়) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ব'লে এর বৈশিষ্ট্য অন্য রচনাগুলি থেকে পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। এই রচনাগুলি বিরচনে শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন অপেক্ষা সমালোচক মন অধিক ক্রিয়াশীল হয়েছে এবং শরৎচন্দ্র যে ছোটদের জন্য গল্প লিখতে বসেছেন, এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই রচনাগুলির মধ্যে অহেতুক মন্তব্য কাহিনীর ত্রুটি বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

"ছেলেবেলার গল্প" নামকরণের মধ্যে কোনরূপ অতিরিক্ত ইঙ্গিত না থাকলেও, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ছেলেবেলার গল্প হ'লেই যে তা ছোটদের উপযোগী হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। ছোটদের জীবনের ঘটনা নিয়ে সত্যকার গল্প রচিত হয়েছে যা জীবন-রহস্যের গভীরতায় কিশোরদের বুদ্ধিগম্য নয়। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রয়োগ করা চলে। এই রচনাগুলিকে আমরা 'গল্প' বলিনি কেননা এর মধ্যে কয়েকটি গল্প থাকলেও, দু'একটি প্রবন্ধ হ'য়ে উঠেছে, অন্ততঃ গল্পপদবাচ্য থেকে চ্যুতি ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের এই রচনা সাতটির মধ্যে এমন কোন বিশেষ তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই না, এমন কোন জীবন-সত্যের সন্ধান পাই না, যেজন্য সাধারণ-ভাবে রচনাগুলি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

লালু

'লালু' নামের অর্থটি প্রণিধানযোগ্য। প্রাকৃতজ শব্দ 'লাল' অর্থ 'প্রিয়', বাঙলাতে আদরার্থে 'উক্' প্রত্যয় (?) যোগ করা হয়েছে। লালু সর্বজনের প্রিয়, স্নেহের পাত্র ছিল। তাই তার নামটি ইঙ্গিতপূর্ণ।

'লালু' চরিত্রটি যেন ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ। লালু সাহসী, উদার, নির্ভীক—সর্বোপরি সে সত্যকার রসিক। এই রসিক-চিত্ততা তার বাল্যবয়সেই বিচিত্র অভিনব পন্থা উদ্ভাবনে সহায়তা করেছে। "মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই।" অথবা "কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো গুরুজন সবাই তার কাছে সমান।"

লালুর এই দুষ্টুমি রাম, ইন্দ্রনাথের সগোত্রীয়। লালুর বাবা উকিল, ধনী গৃহস্থের সন্তান সে। পড়াশুনায় বীতশ্রদ্ধ না হ'লেও মনোযোগী বলা চলে না। লালুর কর্মবহুল জীবনের তিনটি ঘটনা তিনটি কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে বিবৃত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র মূল কাহিনীতে অবতরণের পূর্বে পরিবেশ সৃষ্টিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যে, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। লালুর জন্য মাষ্টার নিয়োগের প্রতিবাদে লালু তার মাকে জব্দ করবার জন্য অভাবনীয় কৌশল উদ্ভাবন করেছে। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মূল কাহিনীর অবতারণা এবং লালুর জয়লাভ তার কৌশলের সফলতা সূচিত করেছে। বালক লালুর বুদ্ধিমত্তার এই তীক্ষ্ণতা পরবর্তীকালে সাহস, ও ঔদার্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে

শরৎচন্দ্রের নিজের বাল্যজীবন ডানপিটে স্বভাবের ছিল। নিজ জীবনের ছাপ যে এখানে পড়েনি, তা কে জোর গলায় বলতে পারে ?

এখানকার বর্ণনাভঙ্গী বেশ সরস এবং কৌতুকাবহ। যেমন—নন্দরাণীর গুরুদেবের গুরুভোজনের পর রাত্রিযাপনের দুর্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরুভোজন ও রাত্রি জাগরণে দু'একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না।" —বর্ণনাভঙ্গীটি বাস্তব। নন্দরাণীর নারীজনোচিত উদ্বেগ বেশ প্রকাশ পেয়েছে। মোট কথা ছোটদের জন্য লেখা হ'লেও গল্পটি সবাইকে তৃপ্তি দেবে ব'লেই মনে হয়।

লালুর দ্বিতীয় কাহিনীটি যে সময়ের তখন—"ইস্কুল ছেড়ে আমরা কলেজে ভর্তি হলুম; লালু বললে, সে ব্যবসা করবে।" অর্থাৎ লালু কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার চরিত্রের ঔদার্য, মহনীয়তা, কৌতুকপ্রিয়তা তার নামের সার্থকতা সূচিত করে।

বলির পাঁঠার অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ লালুর মনে যে গভীর প্রতিক্রিয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে, তার ব্যথাতুর প্রাণ চেয়েছে এর প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করতে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় যাঁরা, তাঁদের কার্যকলাপের সোজাসুজি প্রতিবাদ করা যায় না, তাই তার কৌতুক-চিত্ত এক অভিনব পন্থার মাধ্যমে এই বলি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। অসহায় জীবের প্রতি এই কারুণ্যবোধ শরৎচন্দ্রের আজন্ম। তাঁর রচিত "মহেশ" গল্পটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বর্ণনার মধ্যে সেই ভারাতুর, অসহায়, করুণ আবেদনশীল মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। লালুর অন্তঃকরণ যে কেঁদে উঠেছে, সেই দুরন্ত, বেপরোয়া ছেলেটির অন্তস্তলে যে প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি সেই অন্তরের স্পর্শ পেয়েছে। ধর্মের নামে যে আত্মপ্রতারণা যুগের পর যুগ ধ'রে চলে আসছে শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যঙ্গ-নিপুণ লেখনীর সাহায্যে তা বর্ণনা করেছেন—"...বাড়ীশুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল,...লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল।" অথবা "সেই ভয়ঙ্কর

অন্তিম আবেদন…পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার কয়েক হাত পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হ'লো ; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিল।" এই প্রসঙ্গে "শ্রীকান্তের" (৪র্থ) কুকুরের কথা বা এই গ্রন্থে "দেওঘরের স্মৃতি" গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে।

লালুর দুরন্তপনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল তার অফুরন্ত প্রাণবান সত্তা। তৃতীয় কাহিনীটিতে লালুর সাহসিকতা ও নিঃশঙ্কচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটিতে যেমন রসিকচিত্তের প্রকাশ, দ্বিতীয়টিতে প্রেমিকচিত্তের, তেমনি তৃতীয়টিতে নির্ভীকচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেওয়া সত্বেও কলেরার মড়ার সঙ্গে একশয্যায় একাকী শ্মশানে থাকা, শুধু মৃত্যুঞ্জয়ী লালুকে চিত্রিত করেনি, করেছে সর্বজয়ী লালুকে প্রকাশিত।—"এতবড় ভয়শূন্যতা…এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ সব সে গ্রাহ্যই করলে না।" কিন্তু এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যেও তার চিত্তের প্রবণতা লুপ্ত হয়নি। এই কৌতুকপ্রিয়তা তার কৃত্রিম নয়, সমগ্র সত্তার সঙ্গে এক হ'য়ে আছে ব'লেই এই শ্মশানের ঘাটেও তার রসিকতা এবং অন্যকে জব্দ করবার আজীবন লুব্ধতা কমেনি।

"অতি গরীব বিষ্টু ভট্টাচার্যের" স্ত্রী-বিয়োগে ব্যথাতুর বিষ্টুর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দরদ দিয়ে চিত্রিত করেছেন। লালুর ঘটনাবহুল জীবনের যে তিনটি কাহিনী আমরা পাই তাতে লালুর সঙ্গে আমাদের সমগ্রভাবে পরিচয় ঘটেছে এবং ইন্দ্রনাথ তথা শরৎচন্দ্রের বাল্য-জীবনের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়।

দেওঘরের স্মৃতি

রচনাকৌশলের দিক দিয়ে হয়তো অনবদ্য নয়, কিন্তু গল্পটির আবেদন হৃদয়স্পর্শী ; প্রকৃতি ও জীবের সঙ্গে কবিহৃদয়ের একাত্মতার একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে কাহিনীটিতে।

দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনে এসেছেন শরৎচন্দ্র। প্রাচীর-ঘেরা বাগানের মধ্যে একটি বড় বাড়ীতে তাঁর বাস। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত, ভোরের আগমনবার্তা, নিস্তব্ধ প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্য, সাধারণ জীবের প্রতি মমত্ববোধ অপূর্ব রসরূপ পরিগ্রহ করেছে। হলদে রঙের একজোড়া রঙীন পাখীর জন্য তাঁর আগ্রহ-বোধ, তাদের দাম্পত্যজীবনের সুখে আনন্দ অনুভব করা কবি-হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

এর পরবর্তী ঘটনা একটি শীর্ণ ক্লান্ত বাঙালী মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে। সে প্রসঙ্গে দরদপূর্ণ বর্ণনা শরৎ-মানসের প্রবণতার পরিচয় বহন ক'রে আনে। মেয়েটি সুস্থ হ'য়ে দেশে ফিরে যাবে, "স্বামী পুত্রের সেবায় সংসারে নারী-জীবনটা সার্থক ক'রে তুলতে পারবে। নিজের মনে বসে বসে ভাবতাম, এ ছাড়া আর কি-ই বা কামনা আছে তার? বাঙলা দেশের মেয়ে,—এর বেশী চাইতে কে কবে শেখালে তারে? ···সে কার মেয়ে, কার বউ, কোথায় বাড়ী কিছুই জানিনে,—শুধু এই বাঙলাদেশের অসংখ্য মেয়ের প্রতীক হ'য়ে সে যেন আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে রেখে গেল।" এই বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন নারী-দরদী শরৎ-মানসের পরিচয় বিধৃত, অন্যদিকে বাঙলা দেশের নারীর অসহায়তার জন্য তাদের প্রতি ক্ষোভজনিত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে। এই উপকাহিনীটি যতই রসঘন হোক না কেন, ছোটদের বুদ্ধিগম্য হবে ব'লে মনে হয় না।

এরপরে কাহিনীতে এসেছে একটি কুকুর। "কুকুরটির বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তি সামর্থ্য ছিল তা বুঝা যায়।" শরৎচন্দ্র এই অনাদৃত কুকুরকে সম্বোধন করেছেন "অতিথি" নামে। অনাদৃতের প্রতি দরদ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে "শ্রীকান্ত" (৪র্থ) উপন্যাসের কুকুরটির চিত্র স্মরণ করা যেতে পারে।

যখন শরৎচন্দ্র কুকুরটিকে একদিন খাওয়াতে ব্যস্ত, তাঁর বন্ধু জানায়, 'মানুষকে না দিয়ে কুকুরকে দেওয়া'! তাঁর মন কেঁদে ওঠে অনাদৃতের প্রতি

চরম অবহেলায়—"সংসারে কার দাবি যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয়, সে ওদের আমি বোঝাবো কি দিয়ে?"

এবার বিদায় নেবার পালা। শরৎচন্দ্র তাঁর নিপুণ লেখনীর সাহায্যে অপূর্ব করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং 'অতিথের' প্রতি পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি নিঃশেষে সিঞ্চিত হয়েছে। কতকগুলি উদ্ধৃতি উৎকলন করলে বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে—"অতিথ মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি ক'রে খবরদারি করতে লাগলো…তার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকসিস পেলে সবাই, পেলেনা কেবল অতিথ।…স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথ। ট্রেন ছেড়ে দিলে…কেবলি মনে হ'তে লাগলো অতিথ আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ীর লোহার গেট বন্ধ, ঢোক্‌বার যো নেই। পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা—তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।…হয়তো ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব সহরে আর নেই…।" শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিনিপুণ মানসটির প্রকাশ ঘটেছে সত্যকার রূপ নিয়ে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র প্রাবন্ধিক হ'য়ে উঠেছেন। যেমন, একদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে "কংগ্রেসী পাণ্ডা যাঁরা, মন্ত্রী হবার তাঁদের কি উগ্র বাসনা। অথচ নিস্পৃহতার আবরণে সেটা গোপন করার কত না কৌশল।" —ইত্যাদি দীর্ঘ বর্ণনা যেমন অপ্রাসঙ্গিক তেমনি অহেতুক এবং কাহিনীর ত্রুটি সূচিত করেছে। আর একটি স্থানে বাগানের মালির মালিনীকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত প্রকাশে শরৎচন্দ্রের সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

বর্ণনাভঙ্গী বেশ সরস ও সরল। স্থানে স্থানে ব্যঙ্গরস শ্লেষাত্মকরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—"দেখি জন কয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা আহরণের কর্তব্যটা সমাধা ক'রে যথারীতি দ্রুতপদেই ত্রস্ত বাসায় ফিরছেন।" অথবা—"প্রথমেই যেতো পা ফোলা ফোলা অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম, এরা বেরীবেরীর আসামী।"

কলকাতার নতুনদা

"শ্রীকান্ত" থেকে উৎকলিত। সেজন্য এখানে আলাদাভাবে এই অংশের আলোচনা করা থেকে বিরত রইলাম।

ইন্দ্রের নতুনদার সমগ্র পরিচয় তার মাসতুতো ভাই হিসেবেই নয়, নতুনদা "কলকাতার বাবু অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু।" নিজের চেয়ে তাঁর পোশাকের প্রতিই যত্ন এবং লক্ষ্য অধিক। তার প্রমাণ পাই, শীতের রাত্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে ডাঙায় উঠেই প্রথম কথা বললেন, "আমার একপাটি পাম্প।...তারপরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" নিজের শরীরের জন্য নয়।

শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গকুশলী লেখনী এখানে অপরূপভাবে সক্রিয় হ'তে দেখা যায়। এই পোশাকপ্রীতির আধিক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—"উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।" এখানে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ঔদার্য, দৃঢ়তা ও স্নেহপরায়ণতার চিত্র বেশ প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্রের চরিত্রবল ও মনের বিস্তৃতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছে। শীতের রাত্রির পরিবেশ বিরচনে শরৎচন্দ্র বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নতুনদার চরিত্রটি যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি বাস্তবরূপ নিয়ে ছবির মত আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। নতুনদা একটা type চরিত্র। তাঁর কাহিনী বর্ণনায় শরৎ-লেখনীর ব্যঙ্গপ্রবণতা মাঝে মাঝে সামঞ্জস্য হারিয়ে আক্রোশে পরিণত হয়েছে। যেমন—নতুনদা যে ডেপুটি হয়েছেন, তার প্রমাণ স্বরূপ শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—"...না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া?" অথবা "ইহারা অম্লরোগী, নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়, সুতরাং ঘুমাইতে জানে।" এখানে তিক্তরসের প্রাধান্য ঘটেছে এবং আমাদের চিত্ত স্মিত হাস্যরসের চেয়ে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত ক'রে খানিকটা তিক্তরস পান করেছে।

গল্পটি বড় কাহিনী থেকে উদ্ধৃত হ'লেও সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী, ভাষা, সংলাপ বেশ হৃদয়গ্রাহী। মোট কথা সব কটি রচনাকে একত্রে বিচার করলে উপভোগের দিক দিয়ে "কলকাতার নতুনদা" "লালু"র সগোত্র।

ছেলেধরা

শরৎচন্দ্র গল্পের উপসংহার টেনেছেন—"ঘটনাটি ছেলে ভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।" এটুকু মন্তব্য না করলেও কাহিনীটির মূল্য কিছু কম হ'তো না। ছোটদের জন্য গল্প লেখা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের এই সচেতনতা এতো বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে সত্যকার গল্প রচনা সম্ভব হয়নি। কাহিনী-বিবৃতির মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর 'ছেলেমানুষি উক্তি' গল্পরস উপভোগের অন্তরায়। ছোটদের জন্য রচিত গল্পও যে প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প হ'তে পারে, এ বিষয়ে বোধ করি শরৎচন্দ্রের সচেতনতা ছিল না। তাই ছোটদের জন্য গল্প রচনায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। চালকে কুলো দিয়ে ঝেড়ে খুদ, কাঁকর ও অন্যান্য পদার্থ বাদ দিলে যেমন রন্ধনযোগ্য চাল হয়, তেমনি এই রচনাগুলি থেকে অহেতুক মন্তব্য, দীর্ঘ প্রাবন্ধিক বক্তৃতা ইত্যাদি বাদ দিলে যে গল্পগুলি পাওয়া যাবে, সেটা ছোটদের উপযোগী হবে কিনা জানিনা, তবে গল্পের দিক দিয়ে বোধ করি উপভোগ্য হওয়া সম্ভব হবে; কিন্তু বর্তমান রূপে তা রসাস্বাদনযোগ্য নয়।

গল্পের দিক দিয়ে 'ছেলেধরা' একটি সার্থক সৃষ্টি। যে কথা পূর্বেও বার বার উল্লেখ করেছি যে পরিবেশ রচনায় শরৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই গল্পের মধ্যেও মুদ্রিত রয়েছে। 'ছেলেধরা' নামকরণের মধ্যেই যথেষ্ট কৌতূহল সূচিত হয় এবং কাহিনীর আরম্ভে যে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে আগ্রহ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। ছোটগল্পের পক্ষে এ শ্রেণীর কৌতূহলের তীব্রতা সার্থক।

হীরুর কাহিনীই 'ছেলেধরা' গল্পের মূল বিষয়। হীরুর কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে একটি কৌতুকাবহ পরিবেশ রচিত হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে কাহিনী পাঠ করে। ছেলেধরার যে পরিবেশ তা

উপলক্ষ হ'য়েও কাহিনী রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং সার্থক ছোটগল্প হয়েছে। আঙ্গিকের ছোটখাট ত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা এখানে অহেতুক। শরৎচন্দ্র যদিও বলেছেন, তিনি ছোটদের জন্য গল্প লিখেছেন, কিন্তু হীরু ও তার খুড়ীর মধ্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার শালীনতার মাত্রা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অবহিত হওয়া উচিত ছিল।

রাইপুরের মুসলমান পল্লীতে লতিফ ও মামুদ দুই ভায়ের চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে দেখি, এ দু'ভায়ের স্থান সেখানে আছে। চির অনুগত, শান্ত অথচ জেদী প্রকৃতির মুসলমান চরিত্র অঙ্কনই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। লতিফ চরিত্রে সেই প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ পাই। লতিফের ভ্রাতৃ-প্রীতির পরিচয় পাই যখন নিজের প্রাণরক্ষা ক'রেও মামুদের সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়েছে। রাইপুরের মুসলমানদের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধান। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মতো লাঠি খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই।" মোটকথা 'ছেলেধরা' ছোটদের কাছে বেশ উপভোগ্য গল্প।

বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটি দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়েদের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য। সেই ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে, সেই প্রসঙ্গে তখনকার সাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মন্তব্য করার পর শরৎচন্দ্র মূল কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তখনকার দিনে পুলিশ সম্পর্কে সাধারণের যে ধারণা ছিল তার পরিচয় পাই একটি মন্তব্য থেকে—"...পুলিশ ঘাঁটাতে নেই, তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপদজনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়।"

অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি শরৎচন্দ্রের আজীবনের। নয়ন বাগ্‌দী চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভার এক অপূর্ব স্বাক্ষর। নয়ন স্থির, ধীর, অনুগত অথচ দৃঢ়চেতা, নির্ভীক। সে যেমন বিনয়ে অবনত,

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিপ্রবণ, অন্যদিকে সে তেমনি সাহসী, মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়েও নিঃশঙ্কিত চিত্ত। তার পরিচয় এই কাহিনীটির মধ্যে বেশ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

নয়ন বৈষ্ণব, তবে জাত নয়, দীক্ষা নিয়ে সে বৈষ্ণব হয়েছে। তাই বৈষ্ণবসুলভ বিনয় তার পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। "…বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে সুর ক'রে পড়ে। মাংস সে খায় না; সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।" কিন্তু তার স্বভাবজাত যে প্রতিহিংসাপরায়ণতা—এ প্রবৃত্তি যেন সব কিছুকে অস্বীকার ক'রে প্রকাশ পেতে চায়। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্তবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে নয়নচাঁদ চরিত্রের মধ্যে।

গল্পের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর এবং ভয়াবহতার পরিবেশ-সৃষ্টি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাজারে প্রচলিত হাল্কা ধরনের যে সব ডিটেকটিভ বই পাওয়া যায়, যেগুলি কিশোর সম্প্রদায় গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে, তাদের কাছে এই ধরণের সত্যকার ডিটেকটিভ গল্পের আস্বাদ ক্ষণিক হ'লেও চিরস্থায়ী দাগ আঁকতে পারবে ব'লে মনে হয়।

গ্রামে বর্ণভেদের যে গুরুতর তারতম্য, তার মর্মান্তিক ইঙ্গিত গল্পটির মধ্যে আছে। কিশোর পাঠকের মনে এ চিত্র নানা সংশয় জাগিয়ে দেবে, হয়তো বা তার মনকে বিদ্রোহী ক'রে তুলবে। নয়নচাঁদ ঠ্যাঙাড়েদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে—"ব্রাহ্মণের ছেলে সঙ্গে আছে"। তাদের আক্রমণ করলে তেমন গুরুতর অপরাধ হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতি যেন কোনও অসম্মান দেখান না হয়। এমন মানুষও আছে যে মানুষ হ'য়েও তাদের মানুষকে স্পর্শ করার অধিকার নেই। এই মর্মান্তিক বর্ণবৈষম্যের ফলেই যে সমাজে ক্রমে অসন্তোষ সঞ্চারিত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই ধরনের একটি চিত্র এখানে পাই—"ব্রাহ্মণের বিধবা, স্পর্শ করার অধিকার নেই, যে-কোন একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখতো, তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে দিলেই সেই পাতাটি সে…বার বার বুলিয়ে বলতো…এবার

মরে সংজাত হ'য়ে জন্মাই, যেন হাত দিয়ে তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় রাখতে পারি।" জাতিভেদের নামে এই স্বেচ্ছাচারিতা এবং তার প্রতিক্রিয়া আধুনিক সাহিত্যে দেখা দিয়েছে।

নয়নের বিস্ময়ের ভান—"বল কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা?"—এই উক্তির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র আইন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। জীবন নিয়ে যে জীবনের মূল্য পরিশোধ করা যায় না, দরকার মানসিক পরিশোধন, তারই একটা ব্যঞ্জনা এখানে ধ্বনিত হয়েছে। তা ঠিক এই উক্তির পরের সংলাপগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

গল্পের পরিসমাপ্তি শরৎচন্দ্রের নিজস্ব গল্প-সমাপ্তির পদ্ধতিতে। আবেগপ্রবণ উক্তি, নিজের পুর্ব কর্মের প্রতি ধিক্কার নয়নের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। "মেজ বউয়ের ভাইদের দল"—কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস লুক্কায়িত। গল্পের পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণ অনুধরণের অর্থাৎ যেভাবে কাহিনী শুরু হয়েছিল, সেটা শরৎ-সাহিত্যে নতুন ধরনের কিন্তু শেষ হয়েছে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই 'গল্পটি' আমাদের শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের বা ইন্দ্রের সঙ্গে মাছ চুরির দৃশ্য ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ শ্রেণীর ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি যে সিদ্ধহস্ত, তার প্রমাণ এই রচনাটিতেও আমরা পেয়েছি।

মোট কথা, "ছেলেবেলার গল্প" গ্রন্থটি ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে রচিত হ'লেও সম্পূর্ণভাবে ছোটদের উপযোগী হয়নি, বরং এই গ্রন্থের 'গল্প' কয়টি সর্বশ্রেণীর পাঠককেই আনন্দ দিতে সমর্থ হবে এবং 'গল্পকার শরৎচন্দ্রে'র কৃতিত্ব সেখানেই। আঙ্গিকের ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে স্থানে স্থানে অহেতুক মন্তব্যের ক্লান্তিকর দীর্ঘতাকে বেশী গুরুত্ব না দিলে, গল্পরস আস্বাদনের জন্য গল্পগুলি পাঠ করলে পাঠক নিরাশ হবেন না বা তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না—এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। ভূমিকায় শরৎচন্দ্র যে বলেছেন, ছোটদের জন্য তিনি এই গ্রন্থটি লিখেছেন—এ মত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। তবে শরৎ-প্রতিভার শেষ রশ্মির দু'একটি ছটার সাক্ষাৎ যে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শেষ

অনুক্রমণিকা